...ত হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে
...র্শনিক গ্রন্থ। প্রায় ৫০০ বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান
... অধঃপতিত মানুষদের কৃষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা দান করার
...ধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন
...করছিলেন তখন ভারতের সমস্ত মনীষী ও পণ্ডিতেরা
...গবানরূপে চিনতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন।
...ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত
...ন্দে মগ্ন হয়েছিল।
... কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"
...নুবাদ করে সারা পৃথিবীকে আজ ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ
... মহাপ্রভুরই এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
...বিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই গ্রন্থটি শ্রীল
Sri Caitanya Caritamrita-এর বাংলা অনুবাদ।
...ত্তর প্রতিটি শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য
...য় প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে
...ই গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর
...কৃত তত্ত্ব যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মধ্যলীলা প্রথম খণ্ড
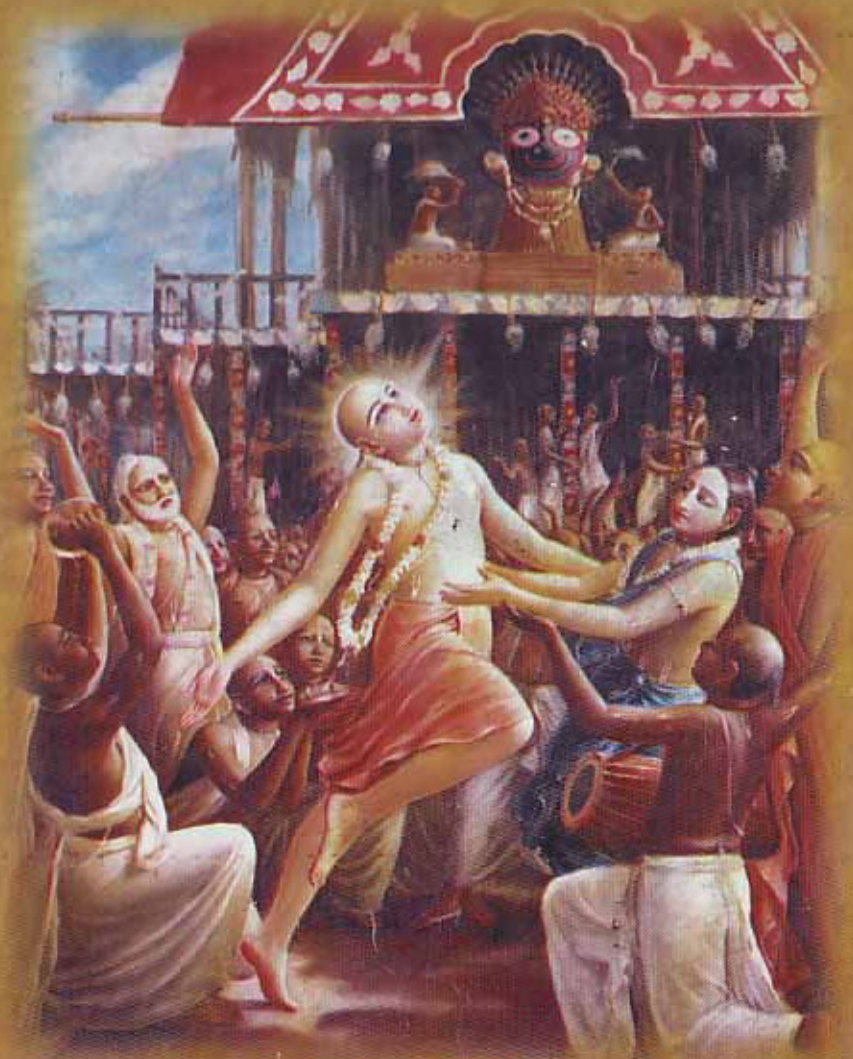
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত (বারো খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (চার খণ্ড)
গীতার রহস্য
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
শ্রীঈশোপনিষদ
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
জ্ঞান কথা
ভক্তি কথা
ভক্তি রত্নাবলী
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
বুদ্ধিযোগ
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (মাসিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর (৭৪১ ৩১৩)
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ১ঈ,
দোতলা, ১০ গুরুসদয় রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৯

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

মধ্যলীলা

(প্রথম খণ্ড ঃ ১ম-১৪শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল বাংলা শ্লোকের শ্লোকার্থ, সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ
এবং বিশদ তাৎপর্য সহ ইংরেজী

Sri Caitanya-Caritamrita

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Sri Caitanya Caritamrita

Madhya Lila-Volume One (Bengali)

প্রকাশক :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	:	১৯৮৮—৩,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	১৯৮৯—২,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	:	১৯৯১—৩,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	:	১৯৯৩—৩,৫০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	:	১৯৯৪—৪,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	:	১৯৯৫—৩,০০০ কপি
সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ	:	২০০৩—২,০০০ কপি

মুদ্রণ :
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

E-mail : shyamrup@pamho.net
Web : www. krishna.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মুখ্য গ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে যে মহান সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ভারতবর্ষের তথা সারা পৃথিবীর ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই আন্দোলনের সূচনা করেন। এই মহৎ গ্রন্থের অনুবাদক ও ভাষ্যকার এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন মহান ঐতিহ্য সমন্বিত ব্যক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, আধুনিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে তার কালের পটভূমিকায় দর্শন করা হয়—তা এখানে ব্যর্থ হয়েছে, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একজন পুরুষ যিনি ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মানুষ যখন নতুনের সন্ধানে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশ ও মহাসমুদ্র আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল এবং জড় ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করছিল, তখন ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে অন্তর্মুখী করে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় তার চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধির জন্য এক পারমার্থিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীর সব চাইতে প্রামাণিক তথ্য হচ্ছে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা। বৈদ্য মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রথম চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভৌমলীলার বাকি চব্বিশ বছরের কার্যকলাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁর কড়চায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। আদিলীলা রচিত হয়েছে শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চার ভিত্তিতে এবং মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা রচিত হয়েছে শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কড়চার ভিত্তিতে।

আদিলীলার প্রথম দ্বাদশটি পরিচ্ছেদ হচ্ছে সমগ্র গ্রন্থটির ভূমিকা। বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবানের অবতার। এই কলিযুগ শুরু হয়েছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এবং জড়বাদ, ভণ্ডামি, কলহ—এগুলি হচ্ছে এই যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আরও প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, অধঃপতিত কলিযুগে অধঃপতিত জীবদের সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। তা ছাড়া, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমন্বিত ভূমিকায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই জগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় কারণ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর অংশ-অবতার, মুখ্য পার্ষদ ও তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসারও বর্ণনা করেছেন। আদিলীলার অবশিষ্ট অংশ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জন্মলীলা এবং তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্তী গার্হস্থ্যলীলা উল্লেখ

করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বাল্যলীলার চপলতা, বিদ্যাভ্যাস, বিবাহলীলা, দার্শনিক তর্কযুদ্ধ, ব্যাপকভাবে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার এবং মুসলমান শাসকের উৎপীড়নের প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন। মধ্যলীলার বিষয়বস্তু সব চাইতে দীর্ঘ। এই অংশটিতে একজন সন্ন্যাসীরূপে, শিক্ষকরূপে, দার্শনিকরূপে, গুরুরূপে ও অধ্যাত্মবাদীরূপে সারা ভারত জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘটনাবহুল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই ছয় বছরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের কাছে তাঁর শিক্ষা প্রদান করেছেন। তখনকার দিনে অদ্বৈতবাদী, বৌদ্ধ এবং মুসলমান আদি বহু বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মীয় নেতাদের তিনি তর্কে পরাস্ত করে তাদের হাজার হাজার অনুগামী ও শিষ্যসহ তাদের আত্মসাৎ করেছেন। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক নাটকীয় বিবরণও গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অন্ত্যলীলায় নীলাচলে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিরের নিকটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ আঠারো বছরের নির্জনলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমের সমাধিতে গভীর থেকে গভীরতর অবস্থায় প্রবেশ করেছেন, যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য বর্ধমান দিব্য উন্মাদনার কথা তাঁর সেই সময়কার নিত্য সহচর স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সাবলীল বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে, যা আধুনিক মনতত্ত্ববিদ এবং প্রপঞ্চবাদীদের অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার অতীত।

এই মহাকাব্যটির রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম হয় ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ অনুগামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য। সর্বত্যাগী মহাপুরুষ রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমগ্র কার্যকলাপের বর্ণনা শুনে তাঁর স্মৃতিপটে গেঁথে রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীল স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর, তাঁদের বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার বাসনা নিয়ে বৃন্দাবনে যান। কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে অন্তরঙ্গ দুই শিষ্য রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তাঁকে তাঁর আত্মহত্যার পরিকল্পনা থেকে নিরস্ত করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা তাঁদের কাছে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেন। সেই সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনে ছিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপায় তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জীবন-চরিত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কয়েক জন ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রীমুরারিগুপ্তের *শ্রীচৈতন্য চরিত*, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের *চৈতন্য-মঙ্গল* এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের *চৈতন্য-ভাগবত*। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সব চাইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হত। তিনি যখন সেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করছিলেন, তখন গ্রন্থটি আয়তনে অত্যন্ত বড় হয়ে যাবার ভয়ে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেননি, বিশেষ করে তাঁর শেষ জীবনের লীলাগুলি।

সেই সমস্ত লীলা শুনতে আগ্রহী বৃন্দাবনের ভক্তরা মহাত্মা শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে সেই সমস্ত লীলাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করতে। অনুরোধ করেন সেই সমস্ত লীলাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করতে। তাদের অনুরোধে এবং বৃন্দাবনের মদনমোহন বিগ্রহের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনা করতে শুরু করেন। জীবন-চরিত রূপে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন ও শিক্ষা সমন্বিত এই গ্রন্থটি যেহেতু উৎকর্ষতায় অতুলনীয়, তাই এই গ্রন্থটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন এই গ্রন্থটি রচনা করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় একশর কাছাকাছি এবং তাঁর শরীর অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও দুর্বল। সেই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি'—এ বড় বিস্ময় ॥"

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ২/৯০)

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। এই মহান গ্রন্থটি মধ্য যুগের ভারতীয় সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন এবং সাহিত্য জগতের একটি বিস্ময়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই সংস্করণটি ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারকারী এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবিৎ ও শিক্ষাগুরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্যের বাংলা সংস্করণ। তাঁর ভাষ্য তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুভাষ্য এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যের ভিত্তিতে রচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর মহান প্রচারক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একদিন আসবে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করার জন্য বাংলা ভাষা শিখবে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি তিনি প্রথম সুসংবদ্ধভাবে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীরভাবে অবগত হওয়ার ফলে ইংরেজী ভাষায় এই সমস্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করার যোগ্যতা তাঁর অতুলনীয়। যে সরল এবং সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি এই অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব অনুবাদ করেছেন তা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকও অনায়াসে এই সুগভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ বহু রঙ্গিন চিত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা বর্ণিত হয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে সুমেধা, সংস্কৃতি-সম্পন্ন ও পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী মানুষদের কাছে এক অমূল্য সম্পদরূপে আদরণীয় হবে।

—প্রকাশক

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত *মধ্যলীলার* ও *শেষলীলার* প্রথম ছয় বৎসরের লীলাসমূহ সূত্রের আকারে বর্ণিত হয়েছে। *যঃ কৌমারহরঃ* শ্লোকটি পাঠ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভাব প্রকাশ করেন, তা শ্রীল রূপ গোস্বামীর *প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ* শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি বিশেষভাবে কৃপা করেন। এই পরিচ্ছেদে শ্রীল রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর বিরচিত সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামকেলি-গ্রামে শ্রীল রূপ-সনাতনকে কৃপা করেন।

শ্লোক ১

**যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ১ ॥**

যস্য—যাঁর; প্রসাদাৎ—কৃপার প্রভাবে; অজ্ঞঃ অপি—অজ্ঞান ব্যক্তিও; সদ্যঃ—অচিরেই; সর্বজ্ঞতাম্—সর্বজ্ঞতা; ব্রজেৎ—প্রাপ্ত হতে পারে; সঃ—সেই; শ্রীচৈতন্য-দেবঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; মে—আমার উপর; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সংপ্রসীদতু—তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন।

অনুবাদ

অজ্ঞ ব্যক্তিও যাঁর প্রসাদে অচিরেই সর্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার উপর তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন।

শ্লোক ২

**বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥**

বন্দে—আমি বন্দনা করি; শ্রী-কৃষ্ণ-চৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; নিত্যানন্দৌ—এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে; সহ-উদিতৌ—একসঙ্গে যাঁরা উদিত হয়েছেন; গৌড়-উদয়ে—গৌড়ের পূর্বদিগন্তে; পুষ্পবন্তৌ—সূর্য ও চন্দ্র একত্রে; চিত্রৌ—আশ্চর্যরূপে; শম্-দৌ—কল্যাণপ্রদ; তমঃ-নুদৌ—অন্ধকার বিনাশকারী।

অনুবাদ

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ সূর্য ও চন্দ্রস্বরূপ আশ্চর্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ৩

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

জয়তাম্—সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোন; সুরতৌ—সব চাইতে কৃপাময়, অথবা মাধুর্যপ্রেমে অনুরক্ত; পঙ্গোঃ—পঙ্গু; মম—আমার; মন্দ-মতেঃ—মূঢ়; গতী—আশ্রয়; মৎ—আমার; সর্বস্ব—সর্বস্ব; পদ-অম্ভোজৌ—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; রাধা-মদন-মোহনৌ—শ্রীমতী রাধারাণী ও মদনমোহন।

অনুবাদ

আমি পঙ্গু ও মন্দমতি; যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের শ্রীপাদপদ্ম আমার সর্বস্ব ধন, সেই পরম কৃপালু শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ৪

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

দীব্যৎ—জ্যোতির্ময়; বৃন্দা-অরণ্য—বৃন্দাবন; কল্পদ্রুম—কল্পবৃক্ষ; অধঃ—নীচে; শ্রীমৎ—সব চাইতে সুন্দর; রত্ন-আগার—এক রত্ননির্মিত মন্দিরে; সিংহ-আসন-স্থৌ—সিংহাসনে উপবিষ্ট; শ্রীমৎ—অত্যন্ত সুন্দর; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; শ্রীল-গোবিন্দ-দেবৌ—এবং শ্রীগোবিন্দদেব; প্রেষ্ঠ-আলীভিঃ—সব চাইতে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দ্বারা; সেব্যমানৌ—সেবিত হচ্ছেন; স্মরামি—আমি স্মরণ করি।

অনুবাদ

জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে, রত্নমন্দিরে সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে প্রিয়সখীরা সেবা করছেন। আমি তাঁদের স্মরণ করি।

শ্লোক ৫

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীমান্—পরম শোভাময় বিগ্রহ; রাস—রাসনৃত্যের; রস-আরম্ভী—রসের প্রবর্তক; বংশী-বট—বংশীবট নামক বিখ্যাত স্থান; তট—যমুনার তীরে; স্থিতঃ—অবস্থিত হয়ে; কর্ষন্—আকর্ষণ করছেন; বেণু-স্বনৈঃ—বংশীধ্বনি দ্বারা; গোপীঃ—সমস্ত গোপিকা; গোপী-নাথঃ—গোপীনাথ; শ্রিয়ে—এই প্রেম-সম্পত্তির দ্বারা; অস্তু—হোক; নঃ—আমাদের প্রতি।

অনুবাদ

যমুনার তীরে বংশীবটের তলায় রাসরস-প্রবর্তক শ্রীগোপীনাথ বংশীধ্বনি দ্বারা সমস্ত গোপীদের আকর্ষণ করছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক ৬

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু ।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃপার সমুদ্র শ্রীগৌরচন্দ্রের জয় হোক! দীনবন্ধু শ্রীশচীনন্দনের জয় হোক!

শ্লোক ৭

জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র ।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জয় হোক এবং শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ গৌরভক্তবৃন্দের জয় হোক!

শ্লোক ৮

পূর্বে কহিলুঁ আদিলীলার সূত্রগণ ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

আমি পূর্বে আদিলীলা সূত্রের আকারে বর্ণনা করেছি, যা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৯

অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈলুঁ ।
যে কিছু বিশেষ, সূত্রমধ্যেই কহিলুঁ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি সেই সমস্ত ঘটনা সূত্রের আকারে বর্ণনা করেছি এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি সূত্রের মধ্যেই বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১০

এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তহীন লীলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তবে এখন আমি শেষলীলার মুখ্য ঘটনাগুলি সূত্রের আকারে বর্ণনা করছি।

শ্লোক ১১-১২

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিলা বর্ণন ॥ ১১ ॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব ।
তাহাঁ যে বিশেষ কিছু, ইহাঁ বিস্তারিব ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে যে-সমস্ত লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, সেগুলি আমি কেবল সূত্রের আকারে বর্ণনা করব এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি আমি এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৩

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন ।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনাকারী শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেবের অবতার। তাঁরই আজ্ঞায় আমি কেবল তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ করছি।

শ্লোক ১৪

ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তিভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করে, আমি এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলার বিষয়বস্তু সূত্রাকারে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৫

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান ।
তাহাঁ যে করিলা লীলা—'আদি-লীলা' নাম ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর গৃহে অবস্থান করেছিলেন এবং সেই সময় তিনি যে লীলাবিলাস করেছিলেন তাকে বলা হয় আদিলীলা।

শ্লোক ১৬

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

চব্বিশ বৎসর শেষে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৭

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ।
তাঁহা যেই লীলা, তার 'শেষলীলা' নাম ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও চব্বিশ বৎসর এই জড় জগতে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর যে লীলা তাকে বলা হয় শেষলীলা।

শ্লোক ১৮

শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য',—দুই নাম হয় ।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয় ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শেষলীলার মধ্য ও অন্ত্য নামক দুটি ভাগ। লীলাভেদে বৈষ্ণবেরা এই বিভাগ করেছেন।

শ্লোক ১৯

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শেষ চব্বিশ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন আদি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

তাঁহা যেই লীলা, তার 'মধ্যলীলা' নাম ।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত স্থানে মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা সেগুলিকে বলা হয় মধ্যলীলা এবং তারপর যে সমস্ত লীলা সেগুলিকে বলা হয় অন্ত্যলীলা।

শ্লোক ২১

'আদিলীলা', 'মধ্যলীলা', 'অন্ত্যলীলা' আর ।
এবে 'মধ্যলীলার' কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। এখন আমি বিস্তারিতভাবে মধ্যলীলার বর্ণনা করব।

শ্লোক ২২

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

আঠারো বছর ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করেছিলেন এবং স্বয়ং আচরণ করে সমস্ত জীবদের ভগবদ্ভক্তি শিক্ষাদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইলা নৃত্যগীতরঙ্গে ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার মধ্যে ছয় বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য-গীত করার মাধ্যমে প্রেমভক্তি প্রবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জগন্নাথপুরী থেকে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন, তখন বঙ্গদেশের নাম ছিল গৌড়দেশ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত ভক্তিরসের দ্বারা সারা দেশ প্লাবিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বাভাবিকভাবে ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা। আর তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি যেখানে সেখানে কৃষ্ণপ্রেম দান করলেন।

শ্লোক ২৬

তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমি অসংখ্য প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সারা জগৎকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি প্রদান করেছেন।

শ্লোক ২৭

চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে 'বড় ভাই' ।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বড় ভাই বলতেন, আর সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রভু বলে সম্বোধন করতেন।

শ্লোক ২৮

যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম ।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলরাম, তবুও তিনি নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে মনে করতেন।

শ্লোক ২৯

'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম ।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গ্রহণ করতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করতে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন, "যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভক্তি করে, সে আমার প্রাণের মতো প্রিয়।"

শ্লোক ৩০

এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল ।
দীনহীন, নিন্দক, সবারে নিস্তারিল ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দান করলেন। তার ফলে দীন-হীন, অধঃপতিত ও নিন্দুকদের পর্যন্ত তিনি নিস্তার করলেন।

শ্লোক ৩১

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী দুই ভাইকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যেতে আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশে তাঁরা তখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

ভক্তি প্রচারিয়া সর্বতীর্থ প্রকাশিল ।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে গিয়ে এই দুই ভাই ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেছিলেন এবং বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা প্রবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

নানা শাস্ত্র আনি' কৈলা ভক্তিগ্রন্থ সার ।
মূঢ় অধমজনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে বহু শাস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন এবং সেগুলির সার সংগ্রহ করে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। এভাবেই তাঁরা সমস্ত মূর্খ ও অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য গেয়েছেন—

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রমুখ ষড়্গোস্বামীরা অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে নানা শাস্ত্র বিচার করে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তিরূপ সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ, এই সমস্ত গোস্বামীরা বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে ভক্তি বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভগবদ্ভক্তি কতকগুলি আবেগপ্রবণ কার্যকলাপ নয়। সমস্ত বৈদিক শিক্ষার সারমর্ম যে ভগবদ্ভক্তি, সেই সত্য প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়, তা বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা এত সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করেছেন যে, মহামূর্খ এবং অতি অধঃপতিত মানুষেরাও এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৪

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করে তাঁরা ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি প্রচার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবদ্ভক্তি বৈদিক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা প্রাকৃত সহজিয়াদের লোক দেখানো কৃত্রিম আবেগ নয়। প্রাকৃত সহজিয়ারা বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে না। তারা হচ্ছে গাঁজা আর স্ত্রীলোকদের প্রতি আসক্ত লম্পট। কখনও কখনও তারা ভগবদ্ভক্তির অভিনয় করে এবং কপট অশ্রু বিসর্জন করে। অবশ্যই তাদের সেই চোখের জলে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ভেসে যায়। প্রাকৃত সহজিয়ারা বুঝতে পারে না যে, তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে বলে গেছেন যে, বৃন্দাবনধাম ও বৃন্দাবনলীলা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১২) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।* অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করতে হয় বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে। *তচ্ছ্রদ্দধানাঃ মুনয়ঃ।* বৈদিক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করার ফলে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্তরা ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করেন (*ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া*)। সহজিয়াদের মনগড়া মত কখনই ভগবদ্ভক্তি নয়। তবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সহজিয়াদের সম্পূর্ণরূপে নাস্তিক মায়াবাদীদের চেয়ে অনুকূল বলে বর্ণনা করেছেন। নির্বিশেষবাদীদের পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। সহজিয়াদের অবস্থা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের অপেক্ষা ভাল। সহজিয়ারা যদিও বৈদিক জ্ঞান আহরণে উৎসুক নয়, কিন্তু তবুও তারা অন্তত শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে। তবে দুর্ভাগ্যবশত, তারা যে পন্থা প্রদর্শন করে, সেটি যথার্থ ভক্তিপথ না হওয়ার ফলে জনসাধারণকে বিপথগামী করে।

শ্লোক ৩৫

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত ।
দশম-টিপ্পনী, আর দশম-চরিত ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ হরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত, দশম-টিপ্পনী ও দশম-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* অর্থ যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং আস্বাদন করেছিলেন, তা বৈষ্ণবতোষণী নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যে প্রকাশ করেছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামী সরাসরিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে যে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তা তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণী* নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য সম্পাদন করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামীকে দিয়েছিলেন এবং শ্রীল জীব গোস্বামী *লঘুতোষণী* নামে তা সম্পাদনা করেছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বৈষ্ণবতোষণী* লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৪৭৬ শকাব্দে। শ্রীল জীব গোস্বামী *লঘুতোষণী* সমাপ্ত করেছিলেন ১৫০৪ শকাব্দে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী রচিত *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থটি শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী সংগ্রহ করেন এবং তা *বৈষ্ণবস্মৃতি* নামে পরিচিত হয়। এই *বৈষ্ণবস্মৃতি* গ্রন্থ কুড়িটি *বিলাসে* সমাপ্ত। প্রথম *বিলাসে* বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মন্ত্র কি। দ্বিতীয় *বিলাসে*—দীক্ষারীতির বর্ণনা রয়েছে। তৃতীয় *বিলাসে*—বৈষ্ণব আচার, শুচি, নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ এবং সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র উচ্চারণ বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ *বিলাসে*—সংস্কার, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ, অঙ্গে মুদ্রা ধারণ, জপমালা, জপবিধি এবং গুরুপূজা বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম *বিলাসে*—আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান এবং বিষ্ণুবিগ্রহ শালগ্রাম শিলার পূজা বর্ণনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ *বিলাসে*—শ্রীবিগ্রহের আবাহন এবং তাঁকে স্নান করাবার বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম *বিলাসে*—শ্রীবিষ্ণুর পূজার যোগ্য পুষ্প আহরণের বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম *বিলাসে*—শ্রীমূর্তির সম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, নমস্কার ও অপরাধ ক্ষালন বর্ণনা করা হয়েছে। নবম *বিলাসে*—তুলসী চয়ন, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য বর্ণনা করা হয়েছে। দশম *বিলাসে*—ভগবদ্ভক্ত (বৈষ্ণব বা সাধু) সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। একাদশ *বিলাসে*—শ্রীমূর্তির অর্চন, শ্রীহরিনাম, শ্রীনামের জপ-কীর্তন, নাম-অপরাধ ও তার মোচন, ভক্তিমাহাত্ম্য ও শরণাগতি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশ *বিলাসে*—একাদশী-বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ *বিলাসে*—উপবাস এবং মহাদ্বাদশী ব্রত পালনবিধি বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্দশ *বিলাসে*—বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন কৃত্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ

বিলাসে—নির্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রা ধারণ, চাতুর্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণা-দ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়াদশমী পালন করার বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। ষোড়শ *বিলাসে*—কার্তিকব্রত বা দামোদর-ব্রত বা ঊর্জব্রত পালন, মন্দিরে দীপদান, গোবর্ধন-পূজা এবং রথযাত্রা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তদশ *বিলাসে*—শ্রীবিগ্রহপূজা, মহামন্ত্র-জপ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ *বিলাসে*—শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন বিগ্রহ বর্ণনা করা হয়েছে। ঊনবিংশতি *বিলাসে*—শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এবং অভিষেক-বিধির বর্ণনা করা হয়েছে। বিংশতি *বিলাসে*—শ্রীমন্দির নির্মাণ এবং ঐকান্তিক ভক্তদের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *মধ্যলীলায়* (২৪/৩২৯-৩৪৫) প্রদান করেছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত অংশেরই বর্ণনা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই শ্লোক কয়টিতে প্রদান করেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী সংকলিত গ্রন্থে বৈষ্ণবস্মৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ অনুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিপুল স্মৃতি-সংগ্রহের তৎকালোচিত আংশিক বিষয়সমূহ নির্দেশিত হয়েছে মাত্র। *বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমের* বা শ্রীসনাতন গোস্বামীর *শ্রীহরিভক্তিবিলাস* প্রকাশিত হলেই বৈষ্ণব-সমাজের সমস্ত ব্যবহারিক অভাব বিদূরিত হবে। *শ্রীহরিভক্তিবিলাস* থেকেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর *ভক্তিবিলাস* গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হয়েছে বলে স্মার্ত সমাজের প্রভাবে এই *ভক্তিবিলাস* গ্রন্থ দ্বারা সমস্ত ব্যবহারিক কার্যের মীমাংসা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত ও সংকলিত *হরিভক্তিবিলাসের* টীকা *দিগ্‌দর্শিনী-টীকার* কিয়দংশ, যা বর্তমান কালের *ভক্তিবিলাস* গ্রন্থের টীকারূপে প্রকাশিত হয়েছে, তা শ্রীগোপীনাথ পূজাধিকারীর সংকলিত *দিগ্‌দর্শিনী* বলে কেউ কেউ প্রচার করেন। এই শ্রীগোপীনাথ বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণজীর সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর একজন শিষ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের দুই খণ্ডে ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত নিরূপিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ভগবদ্ভক্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তাতে ভৌম, দিব্য, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে ভক্তদের বর্ণনা করা হয়েছে, যথা—প্রিয় ভক্ত, প্রিয়তম ভক্ত ও পূর্ণ ভক্ত। *গোলোক-মাহাত্ম্য-নিরূপণ* নামক দ্বিতীয় খণ্ডে চিৎ-জগতের মহিমা বর্ণনা হয়েছে। তাতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, বৈকুণ্ঠ, প্রেম, অভীষ্ট লাভ ও জগদানন্দ—এই সাতটি অধ্যায় রয়েছে। এই গ্রন্থটি মোট চোদ্দটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

দশম-টিপ্পনী হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা। এই গ্রন্থটির আর একটি নাম বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী-টীকা। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ১৪৭৬ শকাব্দে *দশম-টিপ্পনী* সম্পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৩৬

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করু গণন ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী রচিত চারটি গ্রন্থের আলোচনা করেছি। তেমনই, শ্রীল রূপ গোস্বামীও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ৩৭

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি উল্লেখ করব। তিনি শত সহস্র গ্রন্থে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব ।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি ও ললিতমাধব।

শ্লোক ৩৯-৪০

দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী ।
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥ ৩৯ ॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী দানকেলিকৌমুদী, স্তবাবলী, লীলাচ্ছন্দ, পদ্যাবলী, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, মথুরা-মাহাত্ম্য এবং নাটক-বর্ণন আদি গ্রন্থগুলিও রচনা করেছেন।

শ্লোক ৪১

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন ।
সর্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

লঘুভাগবতামৃত আদি গ্রন্থের বর্ণনা কে করতে পারে? সেই সমস্ত গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনা করেছেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* হচ্ছে এক মহান গ্রন্থ যাতে কৃষ্ণভক্তি ও ভক্তিরস সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচিত হয় ১৪৬৩ শকাব্দে। এই গ্রন্থের চারটি বিভাগ, যথাক্রমে—*পূর্ব-বিভাগ, দক্ষিণ-বিভাগ, পশ্চিম-বিভাগ* ও *উত্তর-বিভাগ*। *পূর্ব-বিভাগে* স্থায়ীভাব বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে সামান্যভক্তি, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই চারটি লহরী রয়েছে।

দক্ষিণ-বিভাগে সাধারণভাবে ভক্তিরস নিরূপিত হয়েছে। তাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়ীভাব—এই পাঁচটি লহরী রয়েছে। *পশ্চিম-বিভাগে* ভগবদ্ভক্তির মুখ্যরস-সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের নাম 'মুখ্যভক্তিরস-নিরূপণ'। তাতে শান্ত, প্রীতি-ভক্তিরস বা দাস্য, প্রেয়ো-ভক্তিরস বা সখ্য, বাৎসল্য-ভক্তিরস ও মধুর-ভক্তিরস—এই পাঁচটি লহরী রয়েছে।

উত্তর-বিভাগের নাম গৌণভক্তিরসাদি-নিরূপণ এবং তাতে হাস্য-ভক্তিরস, অদ্ভুত-ভক্তিরস, বীর-ভক্তিরস, করুণ-ভক্তিরস, রৌদ্র-ভক্তিরস, ভয়ানক-ভক্তিরস, বীভৎস-ভক্তিরস, মৈত্র-বৈরস্থিতি ও রসাভাস—এই নয়টি লহরী রয়েছে। এটি হচ্ছে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* একটি সংক্ষিপ্তসার।

বিদগ্ধমাধব গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক নাটক। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই গ্রন্থটি রচনা করেন ১৪৫৪ শকাব্দে। এই নাটকটির প্রথম অঙ্কের নাম—বেণুনাদ-বিলাস, দ্বিতীয় অঙ্কের নাম—মন্মথলেখ, তৃতীয় অঙ্কের নাম—রাধাসঙ্গ, চতুর্থ অঙ্কের নাম—বেণুহরণ, পঞ্চম অঙ্কের নাম—রাধাপ্রসাদন, ষষ্ঠ অঙ্কের নাম—শরদ্বিহার এবং সপ্তম অঙ্কের নাম—গৌরীবিহার।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থটি অপ্রাকৃত মধুর ব্রজরস বিষয়ক অলংকার গ্রন্থ। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে মধুর রসের বর্ণনা সংক্ষেপে করা হয়েছে, কিন্তু *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের প্রেমিক, তাঁদের সহায়ক শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়জনদের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শ্রীমতী রাধারাণী ও অন্যান্য প্রেমিকাদের বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন যূথেশ্বরীদের বর্ণনা করা হয়েছে। দূতী, সখী এবং আর যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় তাঁদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপন, অনুভাব, উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-ভাব, স্থায়ীভাব, বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, সংযোগ, বিয়োগ, স্থিতি, সম্ভোগ (মুখ্য ও গৌণ)—এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তেমনই, *ললিতমাধব* গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বিষয়ক নাটক। ১৪৫৯ শকাব্দে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। এই নাটকের প্রথম অঙ্কে সান্ধ্যকালীন উৎসবের বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে শঙ্খচূড়-বধ বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা শ্রীমতী রাধারাণীর বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে শ্রীমতী রাধারাণীর অভিসার বর্ণনা করা

হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে চন্দ্রাবলীকে লাভ করার বর্ণনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে ললিতাদেবীকে প্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম অঙ্কে নব-বৃন্দাবনে মিলনের বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম অঙ্কে নব-বৃন্দাবনে আনন্দ উপভোগের বর্ণনা করা হয়েছে। নবম অঙ্কে চিত্র-দর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে এবং দশম অঙ্কে মনোরথ পূর্ণ হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। এই নাটকে এই দশটি অঙ্ক রয়েছে।

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম *কৃষ্ণামৃত* এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম *ভক্তামৃত*। প্রথম খণ্ডে বৈদিক শব্দ প্রমাণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর বিলাস, স্বাংশ ও আবেশভেদে তদেকাত্মরূপ, ত্রিবিধ অবতার (তিনটি পুরুষাবতার), তিনটি গুণাবতারের মধ্যে বিষ্ণুর ও বিষ্ণুভক্তির নির্গুণতা এবং পঁচিশটি লীলাবতার (চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ ঋষি, দেবহূতি-পুত্র কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বলরাম বা শেষ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, বুদ্ধ ও কল্কি) বর্ণিত হয়েছে। তারপর চোদ্দটি মন্বন্তর অবতার—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু এবং চারটি যুগের চার যুগাবতার ও তাঁদের বর্ণ—শ্বেত, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ (কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পীতবর্ণ) বর্ণিত হয়েছে। তারপর বিভিন্ন কল্প ও সেই সমস্ত কল্পের অবতার এবং আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পর—এই চারটি অবস্থায় অবস্থিত অবতারদের বিচার, লীলাভেদে ভগবানের নামের মহিমার বৈচিত্র্য এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্যেরও বর্ণনা করা হয়েছে। তা ছাড়া ভগবানের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী গুণসমূহের অচিন্ত্য সমন্বয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর থেকে শ্রেয় আর কেউ নেই। তিনি সমস্ত অবতারদের অবতারী। *লঘুভাগবতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত অবতারদের অংশী, সমস্ত অবতারেরা তাঁর অংশ এবং তিনি সর্ব ঈশ্বরের ঈশ্বর। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ নরলীলার মাধুর্য এবং অসমোর্ধ্বত্বও বর্ণিত হয়েছে। চিৎ-জগতে (বৈকুণ্ঠলোকে) দেহ ও দেহীর ভেদ নেই। জড় জগতে দেহীকে বলা হয় আত্মা এবং দেহ হচ্ছে জড় প্রকাশ। কিন্তু চিৎ-জগতে এই রকম কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জন্মরহিত এবং তাঁর আবির্ভাব অনাদি। তাঁর লীলা নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুভাগে বিভক্ত—প্রকট ও অপ্রকট। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর লীলা প্রকট হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি অন্তর্হিত হলেন, তখন মনে করা উচিত নয় যে, তাঁর সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, কেন না অপ্রকটরূপেও তখন তাঁর লীলা চলতে থাকে। তাঁর প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তরা বিভিন্ন রস আস্বাদন করেন। মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারকায় তাঁর লীলা নিত্য এবং কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও তাঁর সেই নিত্যলীলা নিরন্তর বিলাস হচ্ছে।

শ্লোক ৪২

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম—শ্রীজীবগোসাঞি ।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীব গোস্বামী এত ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেছেন যে, সেগুলি গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ৪৩

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নাম গ্রন্থ-বিস্তার ।
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী ভগবদ্ভক্তির চরম সিদ্ধান্ত নিরূপণ করেছেন।

তাৎপর্য

ভাগবতসন্দর্ভ *ষট্‌সন্দর্ভ* নামেও পরিচিত। *তত্ত্বসন্দর্ভ* নামক প্রথম বিভাগে নিরূপিত হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। *ভগবৎসন্দর্ভ* নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে এবং চিৎ-জগৎ ও জড় কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, শুদ্ধ সত্ত্বের চিন্ময় স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। জড় জগতের যে সত্ত্বগুণ তা রজ ও তমোগুণের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু কেউ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন আর তাঁর এই ধরনের কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেটি শুদ্ধ সত্ত্বের চিন্ময় স্তর। সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের ও জীবের শক্তির বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভগবানের বৈচিত্র্যময় অচিন্ত্য শক্তিরও বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের শক্তিসমূহকে চিৎ-শক্তি, জীবশক্তি, স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি আদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রীবিগ্রহ আরাধনার নিত্যত্ব, শ্রীবিগ্রহের সর্বশক্তিমত্তা, বিভুতা, সর্বাশ্রয়তা, তাঁর সূক্ষ্ম ও স্থূল শক্তিসমূহ, তাঁর স্বপ্রকাশত্ব, রূপ-গুণ-লীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণ স্বরূপত্ব আদির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন এবং চিৎ-জগৎ, ভগবানের পার্ষদ ও ভগবানের তিন প্রকার শক্তি, সবই চিন্ময়। এই গ্রন্থে নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর ভগবানের তারতম্য, ভগবানের পূর্ণত্ব, সকল বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য, ভগবানের স্বরূপশক্তি এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের আদি প্রণেতা যে পরমেশ্বর ভগবান, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় সন্দর্ভটির নাম *পরমাত্মসন্দর্ভ*। এই গ্রন্থে পরমাত্মার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে পরমাত্মা কিভাবে অসংখ্য জীবের সঙ্গে বিরাজ করেন তা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ, বিবর্ত-সমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার

অনন্যত্ব এবং জগতের সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামীর
মত প্রদান করা হয়েছে। এই গ্রন্থে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান
যদিও সমস্ত জড় গুণরহিত, তবুও তিনি সমস্ত জড় কার্যকলাপের নিয়ন্তা। লীলাবতারেরা
যে কিভাবে ভক্তের বাসনায় সাড়া দেন তার এবং ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের বর্ণনা এতে
করা হয়েছে।

চতুর্থ সন্দর্ভটির নাম *কৃষ্ণসন্দর্ভ* এবং এই গ্রন্থে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন
পরমেশ্বর ভগবান। এতে কৃষ্ণলীলাসমূহ ও গুণাবলী, পুরুষাবতারের কর্তৃত্ব আদি বর্ণিত
হয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীধর স্বামীর মত সমর্থন করা হয়েছে। সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের
পরম ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। বলদেব, সংকর্ষণ আদি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অংশ-কলারা
হচ্ছেন মহাসঙ্কর্ষণের প্রকাশ। সমস্ত অংশ ও কলা অবতারেরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরে নিত্য
বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজত্ব, গোলোক নিরূপণ, বৃন্দাবন আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম,
গোলোক ও বৃন্দাবনের অভিন্নত্ব, যাদব ও গোপেরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের
প্রকটলীলা ও অপ্রকট লীলা, প্রকট ও অপ্রকট লীলার সমন্বয়, গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ,
দ্বারকায় মহিষীরা তাঁর স্বরূপশক্তির প্রকাশ, তাঁদের থেকেও ব্রজগোপিকাদের উৎকর্ষ আদি
বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে গোপিকাদের নাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং শ্রীমতী
রাধারাণীর সর্বোৎকর্ষতা নিরূপিত হয়েছে।

পঞ্চম সন্দর্ভের নাম *ভক্তিসন্দর্ভ*। এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে
সাক্ষাৎভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা যায় এবং কিভাবে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সেবা
সম্পাদন করা যায়। এই গ্রন্থে সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান, বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচরণ এবং
ভগবদ্ভক্তি যে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা
হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণও নিন্দনীয়। এই গ্রন্থে কর্মত্যাগ (ভগবানে অর্পিত
কর্ম), অষ্টাঙ্গযোগ ও মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানকে অর্থহীন পরিশ্রম বলে অনুযোগ করা হয়েছে।
এতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা থেকে ভগবদ্ভক্ত-বৈষ্ণবের পূজার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয়েছে।
যারা ভগবানের ভক্ত নয় তাদের কোন রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়নি। সেখানে আলোচনা
করা হয়েছে, কিভাবে এই জন্মে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। দেবাদিদেব মহাদেবকে
ভগবদ্ভক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভক্ত ও ভক্তির নিত্যত্ব নিরূপিত হয়েছে। সেখানে
উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তির মাধ্যমে সব রকম সাফল্য অর্জন করা যায়, কেন না
ভগবদ্ভক্তি জড় জগতের সমস্ত গুণের অতীত। সেখানে আরও আলোচনা করা হয়েছে,
কিভাবে ভক্তির মাধ্যমে আত্মার প্রকাশ হয়। ভক্তির মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ লাভ এবং
এমন কি অপূর্ণ ভগবদ্ভক্তির ফলে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ
করা যায় তার বর্ণনাও করা হয়েছে এবং অহৈতুকী ভক্তির প্রশংসা করা হয়েছে এবং
বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভক্তসঙ্গের প্রভাবে কিভাবে অহৈতুকী সেবার স্তরে উন্নত হওয়া
যায়। সেখানে মহাভাগবত ও সাধারণ ভক্তের পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে এবং
মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের লক্ষণ, অহংগ্রহোপাসনা বা নিজের পূজা করার লক্ষণ, ভগবদ্ভক্তির

লক্ষণ, মনোকল্পিত সিদ্ধির লক্ষণ, বৈধীভক্তি স্বীকার, গুরুসেবা, মহাভাগবত (মুক্ত ভক্ত)
এবং তাঁর সেবা, বৈষ্ণবসেবা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য,
আত্মনিবেদন, সেবা-অপরাধ, অপরাধের ফল—এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।
রাগানুগাভক্তি (স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদ্ভক্তি), কৃষ্ণভক্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধির ক্রম সম্বন্ধেও
আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ সন্দর্ভের নাম *প্রীতিসন্দর্ভ*। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবৎ প্রীতির মাধ্যমে
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। এখানে সবিশেষ ও
নির্বিশেষ মুক্তির পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে এবং জীবন্মুক্তি ও জড় বন্ধনমুক্তির আলোচনা
করা হয়েছে। এই গ্রন্থে সর্বপ্রকার মুক্তির মধ্যে ভগবৎ-প্রেম জনিত মুক্তিকে সর্বোৎকৃষ্ট
বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করাকে পরম পুরুষার্থ
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সদ্য মুক্তির সঙ্গে ক্রমপর্যায়ে লব্ধ মুক্তির পার্থক্য
নিরূপিত হয়েছে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ও ভগবৎ সাক্ষাৎকারকে জীবন্মুক্তি বলে বর্ণনা করা
হয়েছে, তবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে ভগবৎ সাক্ষাৎকার যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা
নিরূপিত হয়েছে। ভগবৎ-উপলব্ধিকে ব্রহ্মজ্ঞানের বহু উপরের বিষয় বলে বর্ণনা করা
হয়েছে এবং সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।
সালোক্য মুক্তির থেকে সামীপ্য মুক্তি শ্রেয়। ভগবদ্ভক্তির মুক্তিত্ব ও উপাদেয়ত্ব আলোচনা
করা হয়েছে এবং কিভাবে তা লাভ করা যায় তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির
স্তরে অধিষ্ঠিত হলে জীব যে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়, সেই কথা এবং ভগবৎ-প্রেমের
যথার্থ স্থিতি সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। চিন্ময় প্রেমের তটস্থ লক্ষণ, তার উন্মেষ,
অধ্যাকল্পিত প্রেম ও ভগবৎ-প্রেমের পার্থক্য, বিভিন্ন প্রকার রস এবং ব্রজদেবীদের কামের
শুদ্ধ প্রেমত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির মিশ্রণ, গোপীর প্রেমের
চরম উৎকর্ষতা, ঐশ্বর্যপর ভক্তি ও মাধুর্যপর ভক্তির পার্থক্য, গোকুলবাসীদের শ্রেষ্ঠতা,
তাঁদের থেকে শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপগণের, বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত গোপ-
গোপীদের উৎকর্ষতা এবং চরমে ব্রজগোপীদের এবং তাদের মধ্যে আবার শ্রীমতী
রাধারাণীর প্রেমের উৎকর্ষতা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আরও আলোচনা করা হয়েছে,
শ্রবণ কীর্তন করার মাধ্যমেও কিভাবে চিন্ময় অনুভূতির বিকাশ হয় এবং এই অনুভূতি জড়-
জাগতিক কাম থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের দিব্যভাব, ভাবের উদ্দীপন,
দিব্য গুণাবলী, ধীরোদাত্ত আদি ভেদ, মাধুর্যপ্রেমের চরম আকর্ষকতা, অনুভাব, সঞ্চারী
স্থায়ীভাব, পাঁচটি মুখ্যরস ও সাতটি গৌণরস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে
রসাভাস, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য,
প্রবাস এবং শ্রীমতী রাধারাণীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থমহাশূর ।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সব চাইতে প্রসিদ্ধ ও মহা প্রভাবশালী চিন্ময় গ্রন্থ হচ্ছে *গোপালচম্পূ*। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলাবিলাস ও ব্রজরস পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে, *গোপালচম্পূ* সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেছেন। *গোপালচম্পূ* গ্রন্থের দুটি বিভাগ—*পূর্বচম্পূ* ও *উত্তরচম্পূ*। *পূর্বচম্পূতে* তেত্রিশটি পূরণ (পরিচ্ছেদ) এবং *উত্তরচম্পূতে* সাঁইত্রিশটি পূরণ রয়েছে। *পূর্বচম্পূ* রচিত হয় ১৫১০ শকাব্দে। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হয়েছে—১) বৃন্দাবন ও গোলোক; ২) পূতনা বধলীলা, যশোদা মায়ের আদেশে গোপীগণের গৃহে প্রত্যাগমন, কৃষ্ণ ও বলরামের স্নান, স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের সংলাপ; ৩) মা যশোদার স্বপ্ন; ৪) জন্মোৎসব; ৫) নন্দ ও বসুদেবের মিলন এবং পূতনা বধ; ৬) উত্থানলীলা, শকটভঞ্জন ও নামকরণ; ৭) তৃণাবর্তাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের বাল চাপল্য ও চৌর্য; ৮) দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের মা যশোদার স্তনপান, দধিভাণ্ড ভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনলীলা, যমলার্জুন উদ্ধার ও মা যশোদার বিলাপ; ৯) বৃন্দাবনে প্রবেশ; ১০) বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ ও ব্যোমাসুর বধ; ১১) অঘাসুর বধ ও ব্রহ্মমোহন; ১২) গোষ্ঠগমন; ১৩) গোচারণ ও কালীয়দমন; ১৪) গর্দভাসুর বধ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি; ১৫) গোপীগণের পূর্বানুরাগ; ১৬) প্রলম্বাসুর বধ ও দাবাগ্নি ভক্ষণ; ১৭) গোপিকাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার প্রচেষ্টা; ১৮) গোবর্ধন ধারণ; ১৯) শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক; ২০) বরুণের আলয় থেকে নন্দ মহারাজের প্রত্যাবর্তন এবং গোপীগণের গোলোক দর্শন; ২১) কাত্যায়নীব্রত অনুষ্ঠান; ২২) যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত ব্রাহ্মণদের পত্নীদের কাছে অন্নভিক্ষা; ২৩) গোপীগণের মিলন; ২৪) গোপীবিহার, রাধা-কৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং গোপীগণের অন্বেষণ; ২৫) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; ২৬) গোপীগণের সংকথা; ২৭) জলকেলি; ২৮) সর্পের কবল থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার; ২৯) নির্জন স্থানে বিবিধ লীলা; ৩০) শঙ্খচূড় বধ ও হোরি; ৩১) অরিষ্টাসুর বধ; ৩২) কেশীদানব বধ; ৩৩) নারদ মুনির আগমন এবং কোন্ বৎসর গ্রন্থ রচনা হয়েছিল তার বর্ণনা।

উত্তরচম্পূ নামক দ্বিতীয় বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে—১) ব্রজভূমির প্রতি অনুরাগ; ২) অক্রূরের ক্রূরতা; ৩) মথুরাপুরীর উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান; ৪) মথুরাপুরীর বর্ণনা, ৫) কংস বধ; ৬) নন্দ মহারাজের কৃষ্ণ-বলরামের বিরহ জনিত কষ্ট; ৭) কৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়া নন্দ মহারাজের ব্রজে প্রবেশ; ৮) কৃষ্ণ-বলরামের অধ্যয়ন; ৯) গুরুপুত্র আনয়ন; ১০) উদ্ধবের ব্রজে আগমন; ১১) দূত রূপে ভ্রমরের সঙ্গে সংলাপন; ১২) বৃন্দাবন থেকে উদ্ধবের প্রত্যাগমন; ১৩) জরাসন্ধ বন্ধন; ১৪) যবন জরাসন্ধ বধ; ১৫) বলরামের বিবাহ; ১৬) রুক্মিণীর বিবাহ; ১৭) সপ্তবিবাহ; ১৮) নরকাসুর বধ, পারিজাত হরণ ও ষোল সহস্র মহিষীর বিবাহ; ১৯) বাণাসুর বিজয়; ২০) বলরামের বৃন্দাবনে আগমনের বর্ণনা; ২১) পৌণ্ড্রক বধ; ২২) দ্বিবিদ বধ ও হস্তিনাপুরের চিন্তা; ২৩) কুরুক্ষেত্রে যাত্রা; ২৪) ব্রজবাসীদের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা; ২৫) উদ্ধবের সঙ্গে

মন্ত্রণা; ২৬) রাজন্যদের মোচন; ২৭) রাজসূয় যজ্ঞ; ২৮) শাল্ব বধ; ২৯) বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের বিবেচনা; ৩০) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে পুনরাগমন; ৩১) শ্রীমতী রাধারাণী আদির বাধা সমাধান; ৩২) সর্বসমাধান; ৩৩) রাধা-মাধবের অধিবাস; ৩৪) রাধা-কৃষ্ণের অলঙ্করণ; ৩৫) শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ; ৩৬) শ্রীরাধা-মাধবের মিলন ও ৩৭) গোলোক প্রবেশ।

শ্লোক ৪৫

এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীব গোস্বামী এবং তাঁদের পরিবারের সমস্ত সদস্য বৃন্দাবনে বাস করে ভক্তি বিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৪৬

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল, নীলাদ্রি গমন ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম বৎসর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরীতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৭

রথযাত্রা দেখি' তাহাঁ রহিলা চারিমাস ।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে রথযাত্রা মহোৎসব দেখে তাঁরা চার মাস সেখানে ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-কীর্তন করে পরম আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে ।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

বিদায় সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করে বলেছিলেন, "প্রতি বৎসর জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরে যাওয়ার রথযাত্রা অনুষ্ঠান দর্শন করার জন্য তোমরা এসো।"

তাৎপর্য

সুন্দরাচলে গুণ্ডিচা নামে একটি মন্দির রয়েছে। তিনটি রথে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাকে পুরীর মন্দির থেকে সুন্দরাচলে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। উড়িষ্যায় এই রথযাত্রা মহোৎসবের নাম জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা গমন। এই অনুষ্ঠানকে অন্যেরা বলে রথযাত্রা মহোৎসব, কিন্তু উড়িষ্যাবাসীরা এই অনুষ্ঠানকে বলে গুণ্ডিচাযাত্রা।

শ্লোক ৪৯

প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে সমস্ত ভক্তরা প্রতি বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসতেন। তাঁরা জগন্নাথপুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাযাত্রা দর্শন করে চার মাস পর গৃহে ফিরে যেতেন।

শ্লোক ৫০

বিংশতি বৎসর ঐছে কৈলা গতাগতি ।
অন্যোন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কুড়ি বছর ধরে গমনাগমন হয় এবং তার ফলে পরিস্থিতি এত গভীর হয়ে ওঠে যে, মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকতে পারতেন না।

শ্লোক ৫১

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভু অন্তরে কৃষ্ণের বিরহলীলা আস্বাদন করে অতিবাহিত করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে ব্রজগোপিকাদের ভাব অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিকাদের ছেড়ে মথুরায় চলে যান, তখন গোপিকারা নিরন্তর গভীর কৃষ্ণবিরহে আকুল হয়ে ক্রন্দন করেছিলেন। এই বিরহভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন।

শ্লোক ৫২

নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিন-রাত উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। কখনও তিনি হাসতেন, আবার কখনও কাঁদতেন; কখনও তিনি নাচতেন এবং কখনও তিনি গভীর বিষাদে ক্রন্দন করতেন।

শ্লোক ৫৩

যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন ।
মনে ভাবে, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন, তখন তিনি ব্রজগোপিকারা দীর্ঘ বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যে ভাব অনুভব করেছিলেন, সেই ভাব অনুভব করতেন।

তাৎপর্য

সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে যান, তখন ব্রজবাসীরাও সেখানে এসেছিলেন এবং তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের মিলন হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর সর্বদাই কৃষ্ণবিরহে আকুল ছিল। কিন্তু যখন তিনি জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন, তখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে ব্রজগোপিকারা যে ভাব অনুভব করেছিলেন, সেই ভাবে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকতেন।

শ্লোক ৫৪

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্তন ।
তাঁহা এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

রথযাত্রার সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রথাগ্রে নৃত্য করতেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত দুটি পদ গাইতেন।

শ্লোক ৫৫

"সেইত পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥" ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি এখন আমার প্রাণনাথকে পেয়েছি, যাঁর জন্য আমি মদনদহনে (কামাগ্নিতে) দগ্ধ হচ্ছিলাম।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥

"কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ আদি প্রবৃত্তিগুলি প্রয়োগ করার মাধ্যমে যদি শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হওয়া যায়, তা হলে জীবন সার্থক হয়।" ব্রজগোপিকারা কামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এক অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত বালক, আর তাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। তবে এই কাম জড় জগতের কাম থেকে ভিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে তা কাম বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন সন্ন্যাসী; তিনি তাঁর যুবতী পত্নী, বৃদ্ধা মাতা, গৃহ আদি সব কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি অবশ্যই জাগতিক কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন না। সুতরাং, তিনি যখন *মদনদহনে* কথাটি ব্যবহার করছেন, তখন বুঝাতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে কৃষ্ণবিরহে তাঁর অন্তর দগ্ধ হচ্ছিল। যখনই তাঁর সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ হয়েছে, তা মন্দিরেই হোক অথবা রথযাত্রা অনুষ্ঠানেই হোক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভাবতেন, "এখন আমি আমার প্রাণনাথকে ফিরে পেয়েছি।"

শ্লোক ৫৬

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর ।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তর ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিবসের শেষার্ধে (দ্বিতীয় প্রহরে) 'সেইত পরাণ-নাথ পাইনু' গানটি গেয়ে নাচতেন এবং তিনি অন্তরে ভাবতেন, "আমি এখন কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" এই ভাবে তাঁর হৃদয় সর্বদা পূর্ণ থাকত।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে মগ্ন থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে যাওয়ায়, শ্রীমতী রাধারাণী যে বিরহ অনুভব করেছিলেন, সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে মগ্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই ভাব অনুভব করেছিলেন। এই ভাব বিরহ জনিত ভগবৎ-প্রেম লাভের সহায়ক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ভগবানের দর্শন লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল না হয়ে, বরং ভাবাবিষ্ট চিত্তে তাঁর বিরহ অনুভব করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করার বাসনা থেকে তাঁর

বিরহ অনুভব করা শ্রেয়। বৃন্দাবনের গোপিকারা, গোকুলের অধিবাসীরা যখন সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও মন্দিরে অথবা রথের উপর শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করে সেই ভাব অনুভব করতেন। বৃন্দাবনের গোপিকাদের কাছে দ্বারকার ঐশ্বর্য ভাল লাগেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এবং কুঞ্জে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই বাসনা করেছিলেন এবং গুণ্ডিচা গমনে জগন্নাথের সামনে ভাবাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের সামনে নৃত্য করতে করতে একটি শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন। সেই শ্লোকের অর্থ কেউই বুঝতে পারছিল না।

শ্লোক ৫৮

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৫৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **কৌমার-হরঃ**—কৌমারকালে আমার হৃদয় হরণ করেছিলেন; সঃ—তিনি; এব হি—অবশ্যই; বরঃ—পতি; তাঃ—এই সমস্ত; এব—নিশ্চিতভাবে; **চৈত্রক্ষপাঃ**—চৈত্রমাসে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি; তে—তারা; চ—এবং; **উন্মীলিত**—প্রস্ফুটিত; মালতী—মালতী পুষ্পের; **সুরভয়ঃ**—সৌরভ; **প্রৌঢ়াঃ**—পূর্ণ; কদম্ব—কদম্ব পুষ্পের সৌরভ; অনিলাঃ—সমীরণ; **সা**—সেই; চ—ও; এব—নিশ্চিতভাবে; **অস্মি**—আমি; তথাপি—তবুও; তত্র—সেখানে; **সুরত-ব্যাপার**—অন্তরঙ্গ ভাবের বিনিময়ে; **লীলা**—লীলাবিলাস; **বিধৌ**—আচরণে; রেবা—রেবা নামক নদীর; **রোধসি**—তটে; **বেতসী-তরুতলে**—বেতসী গাছের তলায়; চেতঃ—আমার চিত্ত; **সমুৎকণ্ঠতে**—উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ

"যিনি কৌমারকালে রেবা নদীর তীরে আমার চিত্ত হরণ করেছিলেন, তিনিই এখন আমার পতি হয়েছেন। এখন সেই চৈত্রমাসের জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে, সেই প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের সৌরভও রয়েছে এবং কদম্ব কানন থেকে সেই মধুর সমীরণও প্রবাহিত হচ্ছে। সুরতব্যাপার লীলাকার্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তবুও আমার চিত্ত এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবা নদীর তীরে বেতসী তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এটি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ রচিত *পদ্যাবলী* (৩৮৬) থেকে উদ্ধৃত একটি শ্লোক।

শ্লোক ৫৭

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই শ্লোকটি যেন এক সাধারণ যুবক-যুবতীর প্রণয়ানুরাগ, কিন্তু এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কেবল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীই জানতেন। ঘটনাক্রমে সেই বৎসর শ্রীল রূপ গোস্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ৬০

প্রভুমুখে শ্লোক শুনি' শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীই কেবল সেই শ্লোকটির অর্থ জানতেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে সেই শ্লোকটি শুনে শ্রীল রূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করে আর একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৬১

শ্লোক করি' এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঞ্জিয়া ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি রচনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী একটি তালপাতায় লিখে তার পর্ণকুটিরের চালে সেটি গুঁজে রেখেছিলেন।

শ্লোক ৬২

শ্লোক রাখি' গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি তালপাতায় লিখে তাঁর পর্ণকুটিরের চালে সেটি গুঁজে রেখে শ্রীল রূপ গোস্বামী সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর পর্ণকুটিরে এসেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

হরিদাস ঠাকুর আর রূপ-সনাতন।
জগন্নাথ-মন্দিরে না যা'ন তিন জন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

বিরুদ্ধমতি জনসাধারণের বিরূপভাব এড়াবার জন্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী—এই তিনজন মহাত্মা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতেন না।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ হিন্দুধর্ম নামক বৈদিক সংস্কৃতি নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করে না, তাদের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার প্রচলন এখনও রয়েছে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী পূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল মুসলমান পরিবারে, আর শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী মুসলমান নবাবের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। নবাবের দেওয়া উপাধি অনুসারে তাঁদের নাম হয়েছিল সাকর মল্লিক ও দবির খাস। তার ফলে তাঁরা তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাই, দৈন্যবশত তাঁরা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতেন না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী জগন্নাথদেব স্বয়ং প্রতিদিন এসে তাঁদের দর্শন করতেন। তেমনই, আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদেরও অনেক সময় ভারতবর্ষে অনেক মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেই জন্য দুঃখ করার কিছু নেই, কেন না ততক্ষণ আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে মগ্ন থাকতে পারছি। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁদের সঙ্গদান করেন। তাই, কোন মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে আক্ষেপ করার কিছুই নেই। এই ধরনের সংকীর্ণ নিষেধাজ্ঞা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও অনুমোদন করেননি। যাঁদের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করার অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রতিদিন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেননি। কিন্তু অনর্থক উত্তেজনার সৃষ্টি না করার জন্য এই মহান ভগবদ্ভক্তেরা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতেন না।

শ্লোক ৬৪

মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যা'ন এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে উপলভোগ উৎসব দর্শন করতেন এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে এই তিনজন মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

তাৎপর্য

উপলভোগ হচ্ছে ছত্রভোগ। শ্রীজগন্নাথদেবের অন্য সমস্ত ভোগ মণিকোঠার মধ্যে নিবেদিত হয়। দিনের বেলায় দ্বিতীয় প্রহরের পর যে বৃহৎ ভোগ হয়, তা গরুড় স্তম্ভের পিছনে যে একটি বৃহৎ প্রস্তরময় স্থল আছে, তার উপর নিবেদন করা হয়। *উপল* শব্দটির অর্থ প্রস্তর; সেই প্রস্তরময় ভূমির উপর ওই ভোগটি হয় বলে তার নাম *উপলভোগ*। এই *উপলভোগ* জনসাধারণের সমক্ষে নিবেদিত হয়।

শ্লোক ৬৫

এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন ।
তাঁরে আসি' আপনে মিলে,—প্রভুর নিয়ম ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিন জনের মধ্যে যখন যিনি সেখানে থাকতেন, তখন তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সেটি ছিল তাঁর প্রাত্যহিক নিয়ম।

শ্লোক ৬৬

দৈবে আসি' প্রভু যবে উর্ধ্বেতে চাহিলা ।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীল রূপ গোস্বামীর পর্ণকুটিরে এলেন, তখন তিনি দৈবাৎ উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে চালে গোঁজা তালপাতায় লেখা সেই শ্লোকটি দেখতে পেলেন এবং তিনি তখন সেটি পাঠ করলেন।

শ্লোক ৬৭

শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া ।
রূপগোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি পাঠ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

দণ্ড মানে হচ্ছে লাঠি। শরীরের আটটি অঙ্গ দিয়ে প্রণতি নিবেদন করে কেউ যখন দণ্ডের মতো ভূপতিত হয়, তাকে বলা হয় *দণ্ডবৎ*। কখনও কখনও আমরা মুখে বলি *দণ্ডবৎ*, কিন্তু ভূপতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করি না। কিন্তু তবুও দণ্ডবৎ মানে হচ্ছে গুরুজনের সম্মুখে দণ্ডের মতো ভূপতিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করা।

শ্লোক ৬৮

উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া ।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠে গিয়ে তাঁকে স্নেহভরে একটি চাপড় মারলেন। তারপর তাঁকে কোলে করে বললেন।

শ্লোক ৬৯

মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে ।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে? ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমার শ্লোকের অভিপ্রায় কেউ জানে না, কিন্তু তুমি আমার মনের কথা জানলে কি করে?"

শ্লোক ৭০

এত বলি' তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বহু কৃপা করলেন এবং তারপর সেই শ্লোকটি শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে দেখালেন।

শ্লোক ৭১

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে ।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকটি শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে দেখিয়ে অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর মনের কথা জানলেন কিভাবে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে এক প্রবন্ধ রচনা করার জন্য এই রকমের এক আশীর্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। সেই রচনাটি পাঠ করে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডেকে তিনি সেটি তাঁদের দেখিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর মনের কথা আমরা জানলাম কিভাবে?

শ্লোক ৭২

স্বরূপ কহে,—যাতে জানিল তোমার মন ।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

উত্তরে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন, "শ্রীরূপ যে তোমার মনের কথা জানতে পেরেছে তা থেকে বুঝতে পারছি যে, সে তোমার বিশেষ কৃপা লাভ করেছে।"

শ্লোক ৭৩

প্রভু কহে,—তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা ।
আলিঙ্গন কৈলু সর্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন—"শ্রীরূপের প্রতি আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, ভগবদ্ভক্তির প্রচার করার জন্য তার মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে তাকে আমি আলিঙ্গন করেছি।

শ্লোক ৭৪

যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে ।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি মনে করি, শ্রীরূপ ভগবদ্ভক্তের গূঢ় রস হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ এবং তাই তুমিও তার কাছে ভগবদ্ভক্তির গূঢ় রস বিশ্লেষণ কর।"

শ্লোক ৭৫

এসব কহিব আগে বিস্তার করিঞা ।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইঞা ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

পরে আমি এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। এখন আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম মাত্র।

শ্লোক ৭৬

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৬ ॥

প্রিয়ঃ—অতি প্রিয়; সঃ—সে; অয়ম্—এই; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; সহচরি—হে প্রিয় সখী; কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ—কুরুক্ষেত্রে যাঁর সঙ্গে মিলন হয়েছে; তথা—ও; অহম্—আমি; সা—সেই; রাধা—রাধারাণী; তৎ—সেই; ইদম্—এই; উভয়োঃ—আমাদের উভয়ের; সঙ্গম-সুখম্—মিলনের আনন্দ; তথাপি—তবুও; অন্তঃ—অন্তরে; খেলন্—ক্রীড়ারত; মধুর—মধুর; মুরলী—বাঁশির; পঞ্চম—পঞ্চম সুর; জুষে—উৎফুল্ল; মনঃ—মন; মে—আমার; কালিন্দী—যমুনার; পুলিন—তটে; বিপিনায়—বৃক্ষরাজি; স্পৃহয়তি—আকাঙ্ক্ষা করছে।

অনুবাদ

(এটি শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি।) "হে সহচরী! আমার সেই অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই কুরুক্ষেত্রে আমার মিলন হয়েছে। আমিও সেই রাধা আর এখন আমাদের মিলন হয়েছে। তা অত্যন্ত সুখকর, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম সুরে আনন্দ-প্লাবিত যমুনার তীরের বনের জন্য আমার চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *পদ্যাবলী* (৩৮৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৭

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন, ভক্তগণ ।
জগন্নাথ দেখি' যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

হে ভক্তগণ! এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অর্থ শ্রবণ করুন। জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এভাবেই ভাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৮

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন ।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল শ্রীমতী রাধারাণীর যে ভাবনার উদয় হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হওয়া সত্ত্বেও তিনি এভাবেই ভাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৯

রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন ।
কাঁহা গোপ-বেশ, কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বৃন্দাবনের নির্জন পরিবেশে গোপবালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তাঁর পরনে রাজবেশ আর তাঁর সঙ্গে রয়েছে কত হাতি, ঘোড়া, কত মানুষ। তাই সেই পরিবেশ তাঁদের মিলনের উপযুক্ত ছিল না।

শ্লোক ৮০

সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন ।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীমতী রাধারাণী তখন মনে মনে ভেবেছিলেন, "আমার বৃন্দাবনের নির্জন পরিবেশে যদি সেভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে পাই, তা হলেই আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।"

শ্লোক ৮১

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮১ ॥

আহুঃ—গোপিকারা বললেন; চ—এবং; তে—তোমার; নলিন-নাভ—হে পদ্মনাভ; পদ-অরবিন্দম্—চরণকমল; যোগ-ঈশ্বরৈঃ—বিষয় বাসনামুক্ত যোগীদের; হৃদি—হৃদয়ে; বিচিন্ত্যম্—সর্বতোভাবে চিন্তনীয়; অগাধবোধৈঃ—অসীম জ্ঞানসম্পন্ন; সংসার-কূপ—সংসাররূপী অন্ধকূপ; পতিত—যারা পতিত হয়েছে; উত্তরণ—উদ্ধারকারী; অবলম্বম্—একমাত্র আশ্রয়; গেহম্—গৃহস্থালি; জুষাম্—যুক্ত; অপি—যদিও; মনসি—মনে; উদিয়াৎ—উদিত হোক; সদা—সর্বদা; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন, "হে কমলনাভ! সংসারকূপে পতিত মানুষদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম, যা অসীম জ্ঞানসম্পন্ন মহান যোগীরা সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, তা গৃহসেবায় রত আমাদের মনে উদিত হোক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮২/৪৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮২

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে ।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপিকারা ভাবলেন, "তোমার চরণ যদি আমাদের বৃন্দাবনের গৃহে পুনরায় উদিত হয়, তা হলে আমাদের বাসনা পূর্ণ হয়।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* মন্তব্য করেছেন—"ব্রজগোপিকারা কোন

রকম উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরায়ণা। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে, অথবা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে তাঁর প্রতি আকৃষ্টা হননি।" তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা, কেন না শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৃন্দাবনের অপূর্ব সুন্দর নবীন বালক। ব্রজবালারা হচ্ছেন গ্রাম্য বালিকা, তাই হাতি, ঘোড়া ও রাজবেশ পরিহিত শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দর্শন করে তাঁরা তাঁর প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করেননি। সেই পরিবেশ তাঁদের ভাল লাগেনি। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ঐশ্বর্য বা সৌন্দর্যের জন্য নয়, তাদের বিশুদ্ধ প্রেমের জন্যই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, গোপিকারাও গোপবালকরূপ কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্টা হয়েছিলেন, তাঁর রাজবেশের প্রতি নয়। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। তাঁকে জানবার জন্য মহান যোগী ও মুনি-ঋষিরা সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে তাঁর ধ্যান করেন। তেমনই, যাঁরা জড় বিষয়ের প্রতি, জড় ঐশ্বর্য লাভের প্রতি, পরিবার প্রতিপালনের প্রতি অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রতি আসক্ত, তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণাশ্রয় করেন। কিন্তু ব্রজগোপিকারা এই সমস্ত উদ্দেশ্য রহিত; এই ধরনের পুণ্যকর্ম সম্পাদনে তাঁরা একেবারে পারদর্শী নন। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন গোপিকারা কেবল বৃন্দাবনের নির্জন পরিবেশে তাঁদের বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন। গোপিকারা শুষ্ক জ্ঞান, শিল্পকলা অথবা অন্য কোন জাগতিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহী নন। তাঁরা সব রকমের জড় সুখভোগ ও ত্যাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ যেন বৃন্দাবনে ঘুরে যান এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস উপভোগ করেন। গোপিকারা চান তিনি যেন সর্বদা বৃন্দাবনে থাকেন, যাতে তাঁরা সর্বদা তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর সেবা করতে পারেন। তাঁদের এই অপ্রাকৃত বাসনায় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের লেশমাত্র অভিপ্রায় নেই।

শ্লোক ৮৩

ভাগবতের শ্লোক-গূঢ়ার্থ বিশদ করিঞা ।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইঞা ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের গূঢ় অর্থ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে, শ্রীল রূপ গোস্বামী জনসাধারণের বোধগম্য করার জন্য একটি শ্লোক রচনা করেছেন।

শ্লোক ৮৪

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্ ॥ ৮৪ ॥

যা—যা; **তে**—তোমার; **লীলা-রস**—লীলাবিলাসের রসসমূহের; **পরিমল**—সৌরভ; **উদ্‌গারি**—বিস্তার করে; **বন্য-আপরীতা**—বনসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত; **ধন্যা**—গৌরবান্বিতা; **ক্ষৌণী**—ভূমি; **বিলসতি**—উপভোগ করে; **বৃতা**—আবৃত; **মাধুরী**—মথুরা-মণ্ডলের; **মাধুরীভিঃ**—মাধুর্য দ্বারা; **তত্র**—সেখানে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **চটুল**—চঞ্চল; **পশুপী-ভাব**—গোপীভাব; **মুগ্ধ-অন্তরাভিঃ**—যাঁদের অন্তঃকরণ মুগ্ধ হয়েছে তাঁদের দ্বারা; **সম্বীতঃ**—সম্মিলিত; **ত্বম্**—তুমি; **কলয়**—অনুগ্রহপূর্বক সম্পাদন কর; **বদন**—মুখে; **উল্লাসি**—ক্রীড়াশীল; **বেণুঃ**—বংশী; **বিহারম্**—লীলাবিলাস।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন, "হে কৃষ্ণ! মথুরা-মণ্ডলের মাধুরী দ্বারা পরিবৃত ধন্য বৃন্দাবন-ভূমির বনসমূহ তোমার লীলাবিলাসের সৌরভ দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে। সেই অনুকূল পরিবেশের ভাব দ্বারা বিমুগ্ধ চিত্ত আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বংশীবদন তুমি সেই লীলাবিলাস কর।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ললিতমাধব* নাটক (১০/২৫৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৫

এইমত মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথে ।
সুভদ্রা-সহিত দেখে, বংশী নাহি হাতে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে দেখলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর হাতে বাঁশি নেই।

শ্লোক ৮৬

ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাহাঁ পাব, এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীভাবে মগ্ন হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনে ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে দর্শন করতে চাইলেন এবং তাঁর সেই রূপে তাঁকে দর্শন করার বাসনা অনুক্ষণ বাড়তে লাগল।

শ্লোক ৮৭

রাধিকা-উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

ঠিক যেমন শ্রীমতী রাধারাণী উদ্ধবকে দর্শন করে ভ্রমরের সঙ্গে প্রলাপ করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনই রাত্রি-দিন ভাবাবিষ্ট হয়ে উন্মাদের মতো প্রলাপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই উন্মাদনা সাধারণ উন্মত্ততা নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে উন্মাদের মতো নিরন্তর প্রলাপ বলছিলেন, তা ছিল তাঁর দিব্য ভগবৎ-প্রেমের বিকার। অধিরূঢ় মহাভাবে *মোদন* ও *মাদন*—দুই প্রকার ভেদ। মোদনভাব প্রবিশ্লেষ দশায় *মোহন* নামে প্রসিদ্ধ। মোহনে বিচ্ছেদহেতু বিবশতা-ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রদীপ্ত হয়। কোন অনির্বচনীয়া-বৃত্তিলব্ধ মোহনের ভ্রমতুল্য বিচিত্রতাপূর্ণ অবস্থাকে *দিব্যোন্মাদ* বলে। তখন উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপাদি উন্মাদনা প্রকাশ পায়। শ্রীমতী রাধারাণীর উন্মাদনার কথা বর্ণনা করে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে অত্যন্ত অধীরা হয়ে, শ্রীমতী রাধারাণী কখনও কুঞ্জে সজ্জা রচনা করছিলেন, কখনও শ্যামবর্ণ মেঘকে তিরস্কার করছিলেন এবং কখনও কখনও গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যে বিচরণ করছিলেন। এভাবেই তিনি উন্মাদিনীর মতো হয়ে গেছেন।"

শ্লোক ৮৮

দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল ।
এই মত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর এই রকম অপ্রাকৃত উন্মাদনায় অতিবাহিত করেছিলেন। এভাবেই তাঁর শেষলীলা তিনভাবে সম্পাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৮৯

সন্ন্যাস করি' চব্বিশ বৎসর কৈলা যে যে কর্ম ।
অনন্ত, অপার—তার কে জানিবে মর্ম ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করে চব্বিশ বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে যে লীলাবিলাস করেছিলেন তা অনন্ত ও অপার। তার মর্ম কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ৯০

উদ্দেশ করিতে করি দিগ্-দরশন ।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত লীলার উদ্দেশ করার জন্য আমি তাঁর মুখ্য লীলার সূত্র গণনা করে দিগ্‌দর্শন করছি।

Print pt. 1/3

শ্লোক ৯১

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ ।
সন্ন্যাস করি' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথম সূত্র হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের যথাযথ বিবরণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে মায়াবাদীদের সন্ন্যাস গ্রহণের কোন তুলনা হয় না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বৃন্দাবনে যাওয়া। তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতো ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেননি। বৈষ্ণবদের সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সব রকম জড় কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৫৫) শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—*অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ/নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।* বৈষ্ণবের সন্ন্যাস গ্রহণের অর্থ হচ্ছে পূর্ণরূপে সব রকম জড় আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্বক নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা জানে না কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হয়। কারণ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তারা কোন শিক্ষা লাভ করেনি এবং তারা মনে করে জড় বিষয় অস্পৃশ্য। *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—মায়াবাদীরা মনে করে যে, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা সেই রকম মনে করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, জগৎ মিথ্যা হতে যাবে কেন? জগৎ সত্য এবং ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন কিছু গ্রহণ না করা। ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু যুক্ত করা।

শ্লোক ৯২

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন এবং তাঁর বাহ্যজ্ঞান সর্বতোভাবে লোপ পেয়েছিল। এভাবেই তিনি তিনদিন রাঢ়দেশে (যে স্থানে গঙ্গানদী প্রবাহিতা হয় না) ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯৩

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া ।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা 'যমুনা' বলিয়া ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভুলিয়ে গঙ্গার তীরে এনে বললেন যে, সেটি হচ্ছে যমুনা নদী।

শ্লোক ৯৪

শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে আগমন ।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহাঁ রাত্রে সংকীর্তন ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিন দিন পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে এসে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই দিন রাত্রে তিনি সংকীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিন দিন কিছুই খাননি। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে ভুলপথে নিয়ে এসে গঙ্গাকে যমুনা বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন। যেহেতু মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রেমে বিহ্বল ছিলেন, তাই যমুনা দর্শনে তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন, যদিও সেটি ছিল গঙ্গানদী। এভাবেই মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেখানে তিনি তিন দিন পর প্রথম আহার গ্রহণ করেছিলেন। যে কয়দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে ছিলেন, তিনি শচীমাতাকে দর্শন করেছিলেন এবং প্রতি রাত্রে ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৯৫

মাতা ভক্তগণের তাহাঁ করিল মিলন ।
সর্ব সমাধান করি' কৈল নীলাদ্রিগমন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে তাঁর মায়ের সঙ্গে এবং মায়াপুরের ভক্তদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। সেখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে তিনি নীলাচলে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে, তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে তাঁর মায়ের বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাকে ও মায়াপুরের ভক্তদের ডাকিয়েছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আয়োজনে তিনি শেষবারের মতো তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুণ্ডিত মস্তক দর্শন করে তাঁর মা গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মস্তকে আর কুঞ্চিত সুন্দর কেশদাম ছিল না। সমস্ত ভক্তরা শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে রন্ধন করতে অনুরোধ করেছিলেন, কেন না তিন দিন কিছু না খাওয়ার ফলে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁর মা

তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিলেন এবং সমস্ত শোক ভুলে যে কয়দিন তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে ছিলেন, সেই কয়দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য রন্ধন করেছিলেন। তারপর কয়েকদিন পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে জগন্নাথপুরীতে যেতে অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি জগন্নাথপুরীতে থাকবেন বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এভাবেই সব কিছুর সমাধান হয়েছিল এবং তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ৯৬

পথে নানা লীলারস, দেব-দরশন ।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু রকম লীলাবিলাস করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েছিলেন এবং মাধবেন্দ্র পুরীর কথা এবং গোপালদেব বিগ্রহ স্থাপনের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই মাধবপুরী হচ্ছেন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। অপর মাধবপুরী হচ্ছেন মাধবাচার্য, যিনি *শ্রীমঙ্গল-ভাষ্য* নামক গ্রন্থের রচয়িতা এবং গদাধর পণ্ডিতের শাখায় একজন দীক্ষাগুরু। এই শ্লোকে যে মাধবেন্দ্র পুরীর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মাধবাচার্য থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৯৭

ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষি-গোপাল-বিবরণ ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কথাও বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে সাক্ষীগোপালের কাহিনী শ্রবণ করেছিলেন। তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড ভঙ্গ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ উত্তর-পূর্ব রেল লাইনে বালেশ্বর স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে শ্রীপাট রেমুনায় বিরাজিত। বালেশ্বর স্টেশন প্রসিদ্ধ খড়গপুর জংশন থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময়ে এই মন্দিরের সেবায় ছিলেন গোপীবল্লভপুর নিবাসী শ্রীশ্যামসুন্দর অধিকারী। তিনি ছিলেন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অধস্তন শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি প্রভুর শাখা।

জগন্নাথপুরীর থেকে কিছুদূরে সাক্ষীগোপাল নামক একটি ছোট্ট রেল স্টেশন রয়েছে। এই স্টেশনের নিকটে রয়েছে সত্যবাদী নামক একটি গ্রাম। সেখানে সাক্ষীগোপালের মন্দির বিরাজমান।

শ্লোক ৯৮

ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড ভঙ্গ করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে, একলা জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যাত্রা করেন এবং জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

শ্লোক ৯৯

সার্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত অচেতন ছিলেন, পরে তাঁর চেতনা ফিরে আসে।

শ্লোক ১০০

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে, একলা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁকে দর্শন করে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০১

তবে সার্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল ।
আপন-ঈশ্বরমূর্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

এই ঘটনার পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তাঁর ভগবৎ-স্বরূপ দেখিয়ে তাঁকে কৃপা করেছিলেন।

শ্লোক ১০২

তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন ।
কূর্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে গমন করেন। সেখানে কূর্মক্ষেত্রে তিনি বাসুদেব নামক এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন।

শ্লোক ১০৩

জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন ।
পথে-পথে গ্রামে-গ্রামে নামপ্রবর্তন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

কূর্মক্ষেত্র দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে জিয়ড়-নৃসিংহ মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের বন্দনা করেন। পথে প্রতিটি গ্রামে তিনি কৃষ্ণনাম-কীর্তন প্রবর্তন করেন।

শ্লোক ১০৪

গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম ।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

গোদাবরী নদীর তীরের বনকে তিনি বৃন্দাবন বলে মনে করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎকার হয়।

শ্লোক ১০৫

ত্রিমল্ল-ত্রিপদী-স্থান কৈল দরশন ।
সর্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তিরুমল ও ত্রিপদী (তিরুপতি) নামক তীর্থস্থান দর্শন করেন এবং সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করেন।

তাৎপর্য

এই পবিত্র স্থানটি দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত। ত্রিপদী (তিরুপতি) মন্দির ব্যেঙ্কটাচল উপত্যকায় অবস্থিত এবং সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ রয়েছে। ব্যেঙ্কটাচল পাহাড়ের উপর বিখ্যাত বালাজী মন্দির অবস্থিত।

শ্লোক ১০৬

তবে ত' পাষণ্ডিগণে করিল দলন ।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিমল্ল ও ত্রিপদী (তিরুপতি) মন্দির দর্শন করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কয়েকজন পাষণ্ডীদের দমন করেছিলেন। তারপর তিনি অহোবল-নৃসিংহ মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই অহোবল মন্দির দাক্ষিণাত্যের কর্ণুল জেলার সার্বেল মহকুমায় অবস্থিত। সমগ্র জেলায় এই নৃসিংহদেবের মন্দিরটিই বিখ্যাত। সেখানে আরও নয়টি মন্দির রয়েছে এবং সেগুলিকে একত্রে বলা হয় নবনৃসিংহ মন্দির। এই মন্দিরগুলির কারুকার্য স্থাপত্য শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য কারুকার্যের নিদর্শনরূপে এক অপূর্ব সুন্দর শ্বেতপাথরের নির্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত অতি বিচিত্র মণ্ডপ বিদ্যমান। তবে, কর্ণুল ম্যানুয়েল নামক স্থানীয় গেজেটে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই শিল্পকলার কাজ অসম্পূর্ণ।

শ্লোক ১০৭

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর ।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির দর্শন করেছিলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০৮

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস ।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

বর্ষার চার মাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ১০৯

শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট—পরম পণ্ডিত ।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট ছিলেন শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এবং মহাপণ্ডিত; তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্য ও ভগবৎ-প্রেম দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১০

চাতুর্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে ।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসংকীর্তনে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করে বর্ষার চার মাস অতিবাহিত করেছিলেন।

শ্লোক ১১১

চাতুর্মাস্য-অন্তে পুনঃ দক্ষিণ গমন ।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঁঞি মিলন ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

চাতুর্মাস্যের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে শুরু করেন। সেই সময়ে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।

শ্লোক ১১২

তবে ভট্টথারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভট্টথারিদের কাছ থেকে তাঁর ভৃত্য কালাকৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর রামনাম জপকারী এক অতি নিষ্ঠাবান রামভক্ত ব্রাহ্মণের মাধ্যমে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন।

তাৎপর্য

মালাবার প্রদেশে নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণ নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাস করে এবং ভট্টথারিরা হচ্ছে তাদের পুরোহিত। ভট্টথারিরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ আদি তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে অত্যন্ত পারদর্শী। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী কালাকৃষ্ণদাস ভট্টথারিদের কবলে পড়ে জীবের একমাত্র ধর্ম মহাপ্রভুর দাস্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। পতিতপাবন প্রভু তাঁর চুলে ধরে তাঁকে মায়ার দশা থেকে উদ্ধার করে তাঁর অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ভট্টথারি শব্দই লিপিকার প্রমাদে বঙ্গীয় পাঠসমূহে ভট্টমারি হয়ে গেছে।

শ্লোক ১১৩

শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন ।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তারপর শ্রীরঙ্গপুরীর মিলন হয় এবং তিনি রামদাস নামক বিপ্রের সমস্ত দুঃখ মোচন করেন।

শ্লোক ১১৪

তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার ।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে ভগবৎ-তত্ত্ব বিচার করেছিলেন এবং তত্ত্ববাদীরা তখন নিজেদের নিকৃষ্ট স্তরের বৈষ্ণব বলে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

তত্ত্ববাদীরা মধ্বাচার্যের এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে মধ্বাচার্যের নিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণব বিধি-নিষেধ থেকে এদের আচরণ একটু ভিন্ন। এই তত্ত্ববাদীদের উত্তররাঢ়ী নামে একটি মঠ আছে। তত্র মঠাধীশের নাম শ্রীরঘুবর্যতীর্থ-মধ্বাচার্য।

শ্লোক ১১৫

অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দন ।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর অনন্তদেব, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দন, পদ্মনাভ ও বাসুদেব আদি বিষ্ণুমন্দির দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ত্রিবান্দ্রম জেলায় অনন্ত পদ্মনাভ নামক একটি বিষ্ণুমন্দির রয়েছে। এই অঞ্চলে এই মন্দিরটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ত্রিবান্দ্রম জেলার ছাব্বিশ মাইল উত্তরে বর্কালা স্টেশনের নিকট শ্রীজনার্দন নামক আর একটি মন্দির রয়েছে।

শ্লোক ১১৬

তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন ।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর দরশন ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিখ্যাত সপ্ততাল বৃক্ষ উদ্ধার করেন, রামেশ্বর সেতুবন্ধে স্নান করেন এবং রামেশ্বর নামক শিবমন্দির দর্শন করেন।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, সপ্ততাল হচ্ছে অতি প্রাচীন এবং অতি বিশাল তালবৃক্ষ। এক সময়ে

বালি ও সুগ্রীবের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করে এই বিখ্যাত সপ্ততালবৃক্ষের একটির আড়ালে থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বালিকে হত্যা করেন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করেন এবং তার ফলে এই বৃক্ষগুলি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়।

শ্লোক ১১৭

তাহাঞি করিল কূর্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ, তাহাতে লিখন ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামেশ্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কূর্ম পুরাণ শ্রবণ করেন এবং রাবণ যে প্রকৃত সীতাদেবীর পরিবর্তে মায়াসীতা হরণ করেছিল, সেই তত্ত্ব উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

কূর্ম পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় এই মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং প্রকৃত সীতাদেবী অগ্নি থেকে বেরিয়ে আসেন।

শ্লোক ১১৮

শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই তত্ত্ব শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর রামদাস বিপ্রের কথা মনে পড়েছিল, যিনি রাবণের সীতা হরণের ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৯

সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি' নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

মহা আগ্রহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই অতি পুরাতন পুঁথিটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে তিনি তা রামদাস বিপ্রকে দেখিয়ে তাঁর দুঃখ মোচন করেছিলেন।

শ্লোক ১২০

ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সময় শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—এই দুটি গ্রন্থও পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থ দুটি অত্যন্ত উত্তম জেনে, তিনি গ্রন্থ দুটি তাঁর ভক্তদের দান করার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রাচীনকালে ছাপাখানা ছিল না এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ হাতে লিখে বড় বড় মন্দিরে সংরক্ষিত হত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুঁথির আকারে হাতে লেখা *শ্রীব্রহ্মসংহিতা* ও *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত* পেয়েছিলেন এবং সেই গ্রন্থ দুটির অত্যন্ত প্রামাণিকতা জেনে, তিনি গ্রন্থ দুটি তাঁর ভক্তদের দেওয়ার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তা অবশ্য তিনি মন্দির অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমানে *শ্রীব্রহ্মসংহিতা* ও *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্যসহ ছাপার আকারে পাওয়া যায়।

শ্লোক ১২১

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে ফিরে এসেছিলেন। সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং তিনি ভক্তসহ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১২২

অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেব যখন মন্দিরে অনবসরে ছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দর্শন না পেয়ে বিরহে আকুল হয়ে জগন্নাথপুরী থেকে আলালনাথ নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আলালনাথ ব্রহ্মগিরি নামেও পরিচিত। এই স্থানটি জগন্নাথপুরী থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত। সেখানে একটি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির রয়েছে। বহু লোক সেখানে মন্দির দর্শন করতে যায় বলে, বর্তমানে সেখানে একটি থানা ও একটি ডাকঘর স্থাপন করা হয়েছে।

স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথদেব অসুস্থ হওয়ার লীলাবিলাস করেন। তাই, সেই সময় মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না। সেই সময়কে বলা হয় *অনবসর* কাল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ নতুন করে রং (অঙ্গরাগ) করা হয়। তাকে

বলা হয় *নবযৌবন*। রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সময় শ্রীজগন্নাথদেব আবার জনসাধারণকে দর্শন দান করেন। এভাবেই স্নানযাত্রার পর পনের দিন শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনার্থীদের গোচরীভূত হন না।

শ্লোক ১২৩

ভক্তসনে দিন কত তাহাঞি রহিলা ।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইলা ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কয়েকদিন আলালনাথে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে, গৌড়বঙ্গের ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে আসছেন।

শ্লোক ১২৪

নিত্যানন্দ-সার্বভৌম আগ্রহ করিঞা ।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ের ভক্তরা যখন জগন্নাথপুরীতে এসে পৌছলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য অনেক অনুনয়বিনয় করে মহাপ্রভুকে জগন্নাথপুরীতে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১২৫

বিরহে বিহ্বল প্রভু না জানে রাত্রি-দিনে ।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আলালনাথ থেকে জগন্নাথপুরীতে গেলেন, তখন শ্রীজগন্নাথদেবের বিরহে তিনি দিন-রাত অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন। সেই সময় গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ এবং বিশেষ করে নবদ্বীপের ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে এসে পৌঁছলেন।

শ্লোক ১২৬

সবে মিলি' যুক্তি করি' কীর্তন আরম্ভিল ।
কীর্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সমস্ত ভক্তরা যুক্তি করে সমবেতভাবে কীর্তন করতে শুরু করলেন। সেই কীর্তনের আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন স্থির হল।

তাৎপর্য

শ্রীজগন্নাথদেব অপ্রাকৃত তত্ত্ব, তাই তাঁর রূপ, সত্তা, আলেখ্য, কীর্তন আদি সব কিছুই অভিন্ন। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভগবানের দিব্য নামকীর্তন শ্রবণ করলেন, তখন তাঁর মন স্থির হল। পূর্বে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, শুদ্ধ ভক্তরা যখন কীর্তন করেন, তখন ভগবান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাবে আমরা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারি।

শ্লোক ১২৭

পূর্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা ।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছিলেন, তখন গোদাবরীর তীরে তাঁর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি তাঁকে রাজ্যপালের পদ পরিত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২৮

রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কত দিনে ।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দসনে ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীরামানন্দ রায় রাজার অনুমতি নিয়ে জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিন-রাত তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকথায় মগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ১২৯

কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি-মিলন ।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীমিশ্রকে কৃপা করেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন পরমানন্দ পুরী, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরীতে আসেন।

শ্লোক ১৩০

দামোদরস্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ ।
শিখিমাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে মিলনের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হয়েছিলেন। তারপর শিখিমাহিতি ও রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।

শ্লোক ১৩১

গৌড় হইতে সর্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসি-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রমে ক্রমে গৌড়বঙ্গ থেকে সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তরা শ্রীজগন্নাথপুরীতে এলেন। সেই সময়ে কুলীন গ্রামবাসীরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য সেখানে আসেন এবং সেই বারই প্রথম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলন হয়।

শ্লোক ১৩২

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দসেন-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

নরহরি দাস আদি সমস্ত শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশিবানন্দ সেনের সঙ্গে সেখানে আসেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলন হয়।

শ্লোক ১৩৩

স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা মার্জন ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৪

সবা-সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি' উদ্যানে গমন ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে রথযাত্রা দর্শন করেছিলেন। তখন মহাপ্রভু স্বয়ং রথের সম্মুখে নৃত্য করেছিলেন এবং নৃত্য করার পর উদ্যানে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৫

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়ীয়াভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই উদ্যানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেছিলেন। তারপর গৌড়ীয় ভক্তরা যখন স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের প্রত্যেককে একে একে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩৬

প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতি বৎসর গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। তাই, তিনি তাঁদের প্রতি বৎসর রথযাত্রা মহোৎসব দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরীতে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩৭

সার্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে, যাতে রাণ্ডী হউক্ ষাঠী ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মহাপ্রভু যখন ভোজন করছিলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা (তাঁর কন্যা ষাঠীর পতি) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমালোচনা করে। সেই জন্য ষাঠীর মাতা তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যাতে ষাঠী বিধবা হয়। অর্থাৎ, তিনি তাঁর জামাইয়ের মৃত্যু হোক বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩৮

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এক বৎসর পর অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ গৌড়ের সমস্ত ভক্তরা আবার মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসেন। এই সময় জগন্নাথপুরীতে যথার্থই সমস্ত ভক্তসমাগম হয়েছিল।

শ্লোক ১৩৯

আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ীয় ভক্তরা যখন সেখানে আসেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে তাঁদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করেন এবং শিবানন্দ সেন তাঁদের সবার তত্ত্বাবধান করেন।

শ্লোক ১৪০

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্ ।
প্রভুর চরণ দেখি' কৈল অন্তর্ধান ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের সঙ্গে একটি কুকুর সেখানে এসেছিল এবং সেই কুকুরটি এতই ভাগ্যবান ছিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে সে ভগবৎ-ধামে ফিরে গিয়েছিল।

শ্লোক ১৪১

পথে সার্বভৌম সহ সবার মিলন ।
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাশীতে গমন ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন কাশীতে যাচ্ছিলেন, তখন পথে তাঁর সঙ্গে সকলের মিলন হয়েছিল।

শ্লোক ১৪২

প্রভুরে মিলিলা সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া ।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে আসার পর সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জলক্রীড়া করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৩

সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সংমার্জন ।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্তন ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সকলকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করেছিলেন। তারপর সকলে রথযাত্রা এবং রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৪

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথমন্দির থেকে গুণ্ডিচায় যাওয়ার পথে উপবনে মহাপ্রভু বিবিধ লীলাবিলাস করেছিলেন। কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেক করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৫

গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি ।
হেরা-পঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলী ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

গুণ্ডিচা মন্দিরে নৃত্য করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে জলকেলি করেছিলেন এবং হেরা-পঞ্চমীর দিন তাঁরা সকলে লক্ষ্মীদেবীর ক্রিয়াকলাপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৬

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা ।
দধিভার বহি' তবে লগুড় ফিরাইলা ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোপবালকের বেশ ধারণ করে দধির ভার বহন করেছিলেন এবং লগুড় ফিরিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪৭

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্তন সদায় ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায় জানিয়েছিলেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে নিরন্তর নামকীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৮

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মহাপ্রভু গৌড়দেশে গিয়েছিলেন। পথে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিবিধ সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৯

পুরীগোসাঞি-সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান-প্রসঙ্গ ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্যন্ত ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

বঙ্গদেশ হয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে পুরী গোসাঞির সঙ্গে বস্ত্র বিনিময় হয়েছিল। রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ভদ্রক পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫০

আসি' বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা ।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিদ্যানগরে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়েছিল।

শ্লোক ১৫১

পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য একনাগাড়ে পাঁচদিন ধরে লোক সমাগম হয়েছিল এবং তখন মুহূর্তের জন্যও কোন বিরাম ছিল না। তাই, লোকভয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাত্রিবেলায় সেই স্থান ত্যাগ করে কুলিয়া-গ্রামে (বর্তমান নবদ্বীপ) এসেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনায় এবং লোচনদাস ঠাকুরের বিবৃতি বিবেচনা করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বর্তমান নবদ্বীপ পূর্বে কুলিয়া-গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কুলিয়া-গ্রামে যান, তখন তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করেছিলেন এবং গোপাল চাপাল ও অন্যান্য যারা তাঁর শ্রীচরণে অপরাধ করেছিল তাদের উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময়ে বিদ্যানগর থেকে কুলিয়া-গ্রাম যেতে হলে গঙ্গার একটি শাখা পার হয়ে যেতে হত। সেই সমস্ত প্রাচীন স্থান এখনও বর্তমান। চিনাডাঙ্গা বর্তমানে কোলের গঞ্জ নামে পরিচিত, পূর্বে তা কুলিয়া-গ্রামে অবস্থিত ছিল।

শ্লোক ১৫২

কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন ।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

কুলিয়া-গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের কথা শুনে, কোটি কোটি লোক তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল।

শ্লোক ১৫৩

কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ।
গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

কুলিয়া-গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করেছিলেন এবং শ্রীবাস প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গোপাল চাপাল নামক ব্রাহ্মণের অপরাধ খণ্ডন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫৪

পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে ।
অপরাধ ক্ষমি' তাঁরে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

বহু পাষণ্ডী ও নিন্দুক এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে পড়েছিলেন এবং মহাপ্রভু তাদের অপরাধ ক্ষমা করে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৫

বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শুনলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মানসে পথ সাজাতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৬

কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল ।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী কুলিয়া নগর থেকে একটি প্রশস্ত পথ রত্ন দিয়ে বাঁধাতে শুরু করলেন এবং তার উপর বৃন্তহীন পুষ্প পেতে দিলেন।

শ্লোক ১৫৭

পথে দুই দিকে পুষ্পবকুলের শ্রেণী ।
মধ্যে মধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি মানসে পথের দুইদিকে বকুল গাছের সারি দিয়ে সাজালেন এবং মাঝে মাঝে পথের দুপাশে সরোবর স্থাপন করলেন।

শ্লোক ১৫৮

রত্নবাঁধা ঘাট, তাহে প্রফুল্ল কমল ।
নানা পক্ষি-কোলাহল, সুধা-সম জল ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সরোবরগুলিতে মণিময় ঘাট বাঁধানো ছিল এবং সেগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পে পূর্ণ ছিল। তাতে নানা রকম পক্ষী কোলাহল করছিল এবং তার জল ছিল ঠিক অমৃতের মতো।

শ্লোক ১৫৯

শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা ।
'কানাইর নাটশালা' পর্যন্ত লইল বান্ধিঞা ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সারাটা পথে নানাদিকের সুগন্ধ বহন করে শীতল সমীর প্রবাহিত হচ্ছিল। কানাইর নাটশালা পর্যন্ত তিনি সেই পথ বেঁধেছিলেন।

তাৎপর্য

কানাইর নাটশালা পূর্ব রেলপথে কলকাতা থেকে প্রায় দুশো কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। এই রেল স্টেশনটির নাম তালঝাড়ি এবং সেখান থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে কানাইর নাটশালা অবস্থিত।

শ্লোক ১৬০

আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে ।
পথবান্ধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী মানসে কানাইর নাটশালার পরে আর পথ বাঁধতে পারলেন না। এভাবেই পথ বাঁধতে না পেরে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬১

নিশ্চয় করিয়া কহি, শুন, ভক্তগণ ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তিনি ভক্তদের বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবার শ্রীবৃন্দাবনে যাবেন না।"

তাৎপর্য

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন মহান ভক্ত, তাই যখন তিনি শুনলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুলিয়া থেকে বৃন্দাবনে যাচ্ছেন, তখন জাগতিক ধন-সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও তিনি মানসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণের জন্য এক অতি আকর্ষণীয় পথ প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। সেই পথের কিছু বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এমন কি মানসে তিনি সেই পথ কানাইয়ের নাটশালার পরে আর তৈরি করতে পারলেন না। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন পর্যন্ত যাবেন না।

শুদ্ধ ভক্তের মানসে তৈরি করা আর বাস্তবিকভাবে পথ তৈরি করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন হচ্ছেন ভাবগ্রাহী, অর্থাৎ তিনি কেবল ভাবই গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে প্রকৃত মণিরত্ন দিয়ে তৈরি পথ আর মানসে মণিরত্ন দিয়ে তৈরি পথ একই। সূক্ষ্ম হলেও মনও জড় পদার্থ। সুতরাং যে কোন পথ—প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের সেবার উপকরণ তা স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম হোক—তা পরমেশ্বর ভগবান গ্রহণ করেন। ভগবান তাঁর ভক্তের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন এবং তিনি দেখেন যে, সে তাঁকে কতটা সেবা করতে প্রস্তুত। ভক্ত ভগবানকে স্থূল জড় পদার্থ দিয়ে অথবা সূক্ষ্ম জড় পদার্থ দিয়ে সেবা করতে পারেন। আসল কথা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে সেবা করতে হবে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি ভক্তিভাবে আমাকে একটি পত্র, একটি পুষ্প, ফল অথবা আমাকে একটু জল নিবেদন করে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করি।" প্রকৃত বস্তুটি হচ্ছে ভক্তি। শুদ্ধ ভক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। *অহৈতুক্যপ্রতিহতা*—অহৈতুকী ভক্তি কখনও জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হলে অত্যন্ত ধনবান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমন কি দরিদ্রতম মানুষও শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হলে সমানভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে পারেন। কোন রকম জাগতিক উদ্দেশ্য না থাকলে, ভগবদ্ভক্তি কখনই জাগতিক অবস্থার দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না।

শ্লোক ১৬২

'কানাঞির নাটশালা' হৈতে আসিব ফিরিঞা ।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিলু নিশ্চয় করিঞা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, "মহাপ্রভু কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত যাবেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসবেন। পরে তোমরা সকলে সেই কথা জানতে পারবে, কিন্তু এখন আমি তা দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারি।"

শ্লোক ১৬৩

গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন ।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কুলিয়া থেকে বৃন্দাবনের দিকে চললেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন ভক্ত।

শ্লোক ১৬৪

যাহাঁ যায় প্রভু, তাহাঁ কোটিসংখ্য লোক ।
দেখিতে আইসে, দেখি' খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যেখানেই যাচ্ছিলেন, অসংখ্য লোক তাঁকে দর্শন করতে আসছিল এবং তাঁকে দর্শন করে তাদের সমস্ত দুঃখ ও শোক বিদূরিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৬৫

যাহাঁ যাহাঁ প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে ।
সে মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত হয় পথে ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

যেখানে যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ভূমি স্পর্শ করেছে, অগণিত মানুষ তৎক্ষণাৎ সেখানকার মাটি সংগ্রহ করেছে। তাই সেখানে সেখানে গর্ত হয়ে গেছে।

শ্লোক ১৬৬

ঐছে চলি' আইলা প্রভু 'রামকেলি' গ্রাম ।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। অতি সুন্দর ওই গ্রামটি গৌড়ের নিকট অবস্থিত।

তাৎপর্য

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রাম অবস্থিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী সেই গ্রামে বাস করতেন।

শ্লোক ১৬৭

তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামকেলি গ্রামে সংকীর্তন করার সময়ে মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমে অচেতন হয়ে নৃত্য করেছিলেন। তখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার জন্য কোটি কোটি লোক এসেছিল।

শ্লোক ১৬৮

গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিঞা ।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হঞা ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়ের মুসলমান রাজা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রভাবের কথা শুনলেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—

তাৎপর্য

সেই সময়ে বাংলার মুসলমান রাজা ছিলেন নবাব হুসেন শাহ বাদশাহ।

শ্লোক ১৬৯

বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয় ।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন রকম জাগতিক বস্তু লাভ না করা সত্ত্বেও এত মানুষ যাঁর অনুগমন করে, তাঁকে নিশ্চয় মহাপুরুষ বলেই জেনো। তা আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি।"

শ্লোক ১৭০

কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন ।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাহাঁ উঁহার মন ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

মুসলমান নবাব হিন্দুবিদ্বেষী কাজীকে আদেশ দিলেন, "এই হিন্দু মহাপুরুষকে হিংসা করো না। তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো আচরণ করতে দাও।"

তাৎপর্য

মুসলমান রাজা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; তাই তিনি তাঁর প্রতি হিংসা পরায়ণ না হতে এবং তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো আচরণ করতে দিতে স্থানীয় কাজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭১

কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল ।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

মুসলমান নবাব তাঁর অনুচর কেশব-ছত্রীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেশব-ছত্রী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ না করার চেষ্টা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে কেশব-ছত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি রাজনীতিবিদের মতো সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। যদিও তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন, কিন্তু তাঁর ভয় হচ্ছিল যে, মুসলমান রাজা হয়ত তাঁর প্রভাবের কথা শুনলে তাঁর অনিষ্ট সাধন করার চেষ্টা করতে পারেন। তাই তিনি মহাপ্রভুর কার্যকলাপের গুরুত্ব না দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে মুসলমান রাজা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ না হন।

শ্লোক ১৭২

ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন ।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

কেশব-ছত্রী মুসলমান নবাবকে খবর দিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন পর্যটনকারী সন্ন্যাসী এবং তাঁকে দেখার জন্য কেবল দুই-একজন মানুষ আসছে।

শ্লোক ১৭৩

যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি ।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আর হানি ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

কেশব-ছত্রী বললেন, "আপনার যবন অনুচরেরা হিংসা করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। আমার মনে হয় তাঁর প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে কোন লাভ নেই। পক্ষান্তরে, তার ফলে ক্ষতিই হবে।"

শ্লোক ১৭৪

রাজারে প্রবোধি' কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাঞা ।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিঞা ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

নবাবকে প্রবোধ দিয়ে কেশব-ছত্রী এক ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অবিলম্বে সেখান থেকে চলে যান।

শ্লোক ১৭৫

দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিভৃতে নবাব দবির খাসকে (শ্রীল রূপ গোস্বামীকে) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী তখন তাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা শোনাতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৬

যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা ।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বললেন, "যে পরমেশ্বর ভগবান তোমাকে এই রাজ্য দিয়েছেন এবং যাঁকে তুমি পরম মঙ্গলময় বলে জান, তিনি তোমার মহা সৌভাগ্যের ফলে তোমার দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ১৭৭

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, কার্যসিদ্ধি হয় ।
ইহার আশীর্বাদে তোমার সর্বত্রই জয় ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পরম মঙ্গলময় সর্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করেন। তাঁর কৃপায় তোমার সব কাজ সফল হয়। তাঁর আশীর্বাদে সর্বত্র তোমার জয় হয়।

শ্লোক ১৭৮

মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন ।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ? তুমি তোমার মনকেই বরং জিজ্ঞাসা কর। যেহেতু

তুমি হচ্ছ জনগণের রাজা, তাই তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। সুতরাং তুমি আমার থেকে ভালভাবেই জান।"

শ্লোক ১৭৯

তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও বললেন, "তোমার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে যে-রকম বলে মনে হয়, তাই হচ্ছে যথার্থ প্রমাণ এবং সেই রকমভাবেই তুমি তাঁকে গ্রহণ কর।"

শ্লোক ১৮০

রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ নাহিক সংশয় ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা উত্তর দিলেন, "আমার মনে হয় এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। সেই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

শ্লোক ১৮১

এত কহি' রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে এভাবেই আলোচনা করে, রাজা তাঁর প্রাসাদের অভ্যন্তরে গেলেন। তখন শ্রীল রূপ গোস্বামী, যিনি সেই সময়ে দবির খাস নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

রাজা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *সর্বলোকমহেশ্বরম্*—পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের অধীশ্বর। প্রতিটি গ্রহে রাজা বা শাসক বা রাষ্ট্রপতি রয়েছে। সেই সমস্ত প্রধানেরা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর প্রতিনিধি। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করা। তাই, পরমাত্মারূপে শ্রীবিষ্ণু রাজাকে রাজকার্য পরিচালনা করার বুদ্ধি প্রদান করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই নবাবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাঁর কি মনে হচ্ছে এবং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সেই মনোভাবকে যথার্থ প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে।

শ্লোক ১৮২

ঘরে আসি' দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরে ফিরে আসার পর দবির খাস ও তাঁর ভাই যুক্তি করে ঠিক করলেন যে, তাঁরা ছদ্মবেশে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যাবেন।

শ্লোক ১৮৩

অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

অর্ধরাত্রে দুই ভাই দবির খাস ও সাকর মল্লিক ছদ্মবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁদের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের মিলন হয়েছিল।

শ্লোক ১৮৪

তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা' দেখিবারে ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানালেন যে, দবির খাস ও সাকর মল্লিক (শ্রীরূপ ও সনাতন) তাঁকে দর্শন করার জন্য এসেছেন।

তাৎপর্য

সাকর মল্লিক ছিল শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নাম এবং দবির খাস ছিল শ্রীল রূপ গোস্বামীর নাম। মুসলমান নবাবের দরবারে তাঁরা এই নামে পরিচিত ছিলেন। এগুলি ছিল মুসলমান নবাবের দেওয়া উপাধি। নবাবের কর্মচারীরূপে এই দুই ভাই মুসলমানের প্রথা অনুসারে আচরণ করতেন।

শ্লোক ১৮৫

দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত নম্রতা সহকারে তাঁরা দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করে, গলবস্ত্র হয়ে মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১৮৬

দৈন্য রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল ।
প্রভু কহে,—উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে দুই ভাই আনন্দে বিহ্বল হলেন এবং দৈন্যবশত ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁদের বললেন, "ওঠ, ওঠ, তোমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হল।"

শ্লোক ১৮৭

উঠি, দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি' ।
দৈন্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

দুই ভাই তখন উঠে পুনরায় দন্তে তৃণ ধারণ করলেন এবং দৈন্য সহকারে করজোড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৮৮

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয় ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পরম দয়াময়, পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! পরমেশ্বর ভগবানের জয়!

শ্লোক ১৮৯

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু, আমরা সব চাইতে অধঃপতিত স্তরের মানুষ, আমাদের সঙ্গীরাও অত্যন্ত নীচ এবং আমরা অত্যন্ত নীচ কাজ করি। তাই আপনার সামনে আমরা নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি, এমন কি আপনার সামনে আসতেও আমরা লজ্জা বোধ করি।

তাৎপর্য

এই দুই ভাই শ্রীরূপ ও সনাতন (তৎকালীন দবির খাস ও সাকর মল্লিক) যদিও পবিত্র কর্ণাটকের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও নিজেদের নীচ জাতি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আসলে তাঁরা অতি উন্নত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমান নবাবের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে এবং মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে তাঁদের আচার-আচরণ মুসলমানদের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা নিজেদের *নীচ-জাতি* বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। *জাতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জন্ম। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জন্ম তিন প্রকার। প্রথম জন্ম হচ্ছে শৌক্র—পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম হচ্ছে সাবিত্র্য—সংস্কার বিধি গ্রহণ এবং তৃতীয় জন্ম হচ্ছে দৈক্ষ্য—সদ্‌গুরুর কাছে ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ। নীচ বৃত্তি গ্রহণ করার ফলে এবং নীচ মানুষদের সঙ্গ করার ফলে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই নীচ হয়ে যায়। দবির খাস ও সাকর মল্লিক গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষই বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত। শাস্ত্রে বর্ণিত বিশেষ লক্ষণের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে চিনতে পারা যায়। যার যে লক্ষণ, সেই লক্ষণ অনুসারে সে বিভিন্ন স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। দবির খাস ও সাকর মল্লিক উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ছিলেন, কিন্তু মুসলমান নবাবের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে এবং মুসলমানের সঙ্গ প্রভাবে তাঁদের চিত্তবৃত্তি মুসলমান ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। যেহেতু ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি তাঁদের প্রায় লোপ পেয়েছিল, তাই তাঁরা নিজেদের নীচ জাতি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেহেতু সাকর মল্লিক ও দবির খাস নিম্নস্তরের মানুষদের সঙ্গ করেছিলেন, তাই তাঁরা নিজেদের নীচ জাতি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অতি উন্নত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯০

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥ ১৯০ ॥

মৎ—আমার; তুল্যঃ—মতো; ন অস্তি—নেই; পাপ-আত্মা—পাপী; ন—নেই; অপরাধী—অপরাধী; চ—ও; কশ্চন—কেউ; পরিহারে—ক্ষমা প্রার্থনা করতে; অপি—এমন কি; লজ্জা—লজ্জিত; মে—আমার; কিম্—কি; ব্রুবে—আমি বলব; পুরুষোত্তম—হে পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

" 'হে পুরুষোত্তম! আমাদের মতো পাপী নেই, আমাদের মতো অপরাধীও নেই। আমাদের পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করে সেগুলি পরিহার করতেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে।' "

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/১৫৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯১

পতিত-পাবন-হেতু তোমার অবতার ।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

দুই ভাই বললেন, "হে প্রভু! পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের চেয়ে পতিত এই জগতে আর কেউ নেই।

শ্লোক ১৯২

জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার ।
তাহাঁ উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করেছেন এবং তাদের উদ্ধার করতে আপনার কোন পরিশ্রম হয়নি।

শ্লোক ১৯৩

ব্রাহ্মণজাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর ।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জগাই ও মাধাই ছিল ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত এবং তারা ছিল পুণ্যভূমি নবদ্বীপের অধিবাসী। তারা কখনও নীচ স্তরের মানুষের সেবা করেনি এবং তারা কারও নীচ কাজ সাধনের মাধ্যমও ছিল না।

শ্লোক ১৯৪

সবে এক দোষ তার, হয় পাপাচার ।
পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"জগাই ও মাধাইয়ের কেবল একটি মাত্র দোষ ছিল—তারা পাপকার্যে আসক্ত ছিল। কিন্তু আপনার পবিত্র নামের আভাসেই কেবল সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নিজেদের জগাই এবং মাধাইয়ের থেকেও অধম বলে ঘোষণা করেছিলেন। মদ্যপ ও দুরাচারী জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করতে মহাপ্রভুর কোন শ্রম স্বীকার করতে হয়নি বলে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী নিজেদের জগাই-মাধাই থেকেও অধিক পতিত বলে মনে করেছিলেন। কারণ তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন যে, জগাই-মাধাই পাপী হলেও তাদের জীবন অন্যান্য দিক থেকে অধিক উন্নত ছিল। তারা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত ছিল এবং এই ধরনের ব্রাহ্মণেরা সাধারণত পুণ্যবান। যদিও অসৎসঙ্গের প্রভাবের ফলে তারা পাপকর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিল, তবুও ভগবানের দিব্যনাম গ্রহণের ফলে সেই সমস্ত অনর্থ অনায়াসেই নিবৃত্তি হয়। জগাই-

মাধাইয়ের চরিত্রের আর একটি গুণ ছিল এই যে, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত হওয়ায় তাঁরা অন্য কারও দাসত্ব গ্রহণ করেনি। ব্রাহ্মণের পক্ষে অপরের অধীনে চাকুরি করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। চাকুরি করাকে কুকুরের বৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুকুর মনিব ছাড়া থাকতে পারে না এবং তার মনিবকে তুষ্ট করার জন্য সে বহু মানুষের অসন্তোষের কারণ হয়। মনিবকে তুষ্ট করার জন্য সে নিরীহ মানুষের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে। তেমনই, কেউ যখন কারও দাসত্ব করে, তখন তার প্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাকে নানা রকম জঘন্য কাজ করতে হয়। তাই, দবির খাস ও সাকর মল্লিক নিজেদের জগাই-মাধাই থেকেও অধম বলে মনে করেছিলেন। জগাই এবং মাধাই কখনও নীচ ব্যক্তির দাসত্ব গ্রহণ করেনি এবং নীচ ব্যক্তির আদেশ অনুসারে জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়নি। তারা কেবল পাপাচারী ছিল মাত্র। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম নিয়ে তার নিন্দা করার ফলে, সেই নামাভাসের প্রভাবে তারা তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল। এভাবেই পরে তারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯৫

তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন ।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার নাম নিয়ে তারা তোমার নিন্দা করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সেই নামই তাদের মুক্তির কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ১৯৬

জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা দুজন জগাই-মাধাই থেকেও কোটি কোটি গুণ অধম, পতিত এবং পাপী।

শ্লোক ১৯৭

ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসেবী, করি ম্লেচ্ছকর্ম ।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রকৃতপক্ষে জাতিতে আমরা ম্লেচ্ছ, কেন না আমরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করি। আমাদের কার্যকলাপও ম্লেচ্ছের মতো এবং গো-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আমরা সঙ্গ করি।"

তাৎপর্য

ম্লেচ্ছ দুই প্রকার—জন্ম অনুসারে ম্লেচ্ছ ও সঙ্গ দ্বারা ম্লেচ্ছ। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও

সনাতন গোস্বামীর এই উক্তির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ম্লেচ্ছদের সঙ্গ প্রভাবেও চরিত্র কলুষিত হয়। বর্তমানে ভারতের অনেক রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন তথাকথিত ব্রাহ্মণ, কিন্তু ভারতের বহু প্রদেশে কসাইখানায় প্রতিদিন গোহত্যা হচ্ছে এবং বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচার হচ্ছে। বৈদিক সভ্যতায় আমিষ আহার ও মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে আমিষ আহার ও মাদক দ্রব্য গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। তথাকথিত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সারা রাষ্ট্রে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন এবং তাঁরা যে কত অধঃপতিত হয়েছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা মোটা টাকা পাওয়ার আশায় কসাইখানা খুলতেও অনুমতি দিচ্ছেন এবং এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য প্রতিবাদ না করে, বরং এই কর্মে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। তাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির নীতিগুলি অবমাননা করছেন এবং গোহত্যা করতেও সহযোগিতা করছেন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ম্লেচ্ছ ও যবনে পরিণত হচ্ছেন। ম্লেচ্ছ হচ্ছে মাংসাহারী, আর যবন হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি-বিদ্বেষী। দুর্ভাগ্যবশত, আজ এই ম্লেচ্ছ ও যবনেরা নেতা হয়ে গদিতে বসেছেন। তা হলে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে কি করে? রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হতে হবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ভারতবর্ষের (সসাগরা পৃথিবীর) পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ভীষ্মদেব ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ সমস্ত মহাজনদের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। এখন রাষ্ট্রপ্রধানেরা ধর্মনীতির কোন পরোয়া করে না। অধার্মিক লোকদের ভোটের জোরে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলেও বিল পাশ হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা এই সমস্ত পাপকার্য অনুমোদন করার ফলে পাপ সঞ্চয় করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য পাপ স্বীকার করেছিলেন; তাই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের ম্লেচ্ছ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯৮

মোর কর্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিয়া ।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সাকর মল্লিক ও দবির খাস এই দুই ভাই অত্যন্ত বিনীতভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্বকৃত কর্ম তাঁদের হাতে ও গলায় বেঁধে কুবিষয়-বিষ্ঠা গর্তে তাঁদের ফেলে দিয়েছে।

তাৎপর্য

কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাসমূহ দ্বারা ভোগ পরবশ হয়ে সংসারে যা গৃহীত হয়, তা-ই *কু-বিষয়*। যে কর্মের দ্বারা পুণ্য উপার্জিত হয়, তা *সু-বিষয়*, আর যে কর্মের দ্বারা পাপ অর্জিত হয়, তা *কু-বিষয়*। *কু-বিষয়* অথবা *সু-বিষয়* উভয়ই জড় বিষয়। তারা উভয়ই বিষ্ঠাতুল্য অর্থাৎ

পরিত্যাজ্য। *সু-বিষয়* ও *কু-বিষয়* থেকে মুক্ত হতে হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। ভগবৎ-সেবা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই, *কু-বিষয়* ও *সু-বিষয়* থেকে মুক্ত হতে হলে ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করতেই হবে। তার ফলে জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" সেই সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

সু-বিষয় ও *কু-বিষয়* উভয়ই কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এ ছাড়া আর একটি কাণ্ড রয়েছে যাকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড, বা জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসে *কু-বিষয়* ও *সু-বিষয়ের* পরিণাম সম্বন্ধে মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক মতবাদ। জ্ঞানকাণ্ডের স্তরে *কু-বিষয়* ও *সু-বিষয়ের* প্রয়াস ত্যাগ হতে পারে, কিন্তু তা জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অতীত ভগবদ্ভক্তি। আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করি, তা হলে আমাদের এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কু-বিষয় অথবা *সু-বিষয়ে* আসক্ত মানুষের অবস্থা বিষ্ঠার কীটের মতো। পাপকর্ম অথবা পুণ্যকর্ম উভয়ই জড় কর্ম, তাই তাদের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিষ্ঠার কীট যেমন স্বেচ্ছায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, তেমনই যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত তারা বিষয়বিষ্ঠা-গর্তরূপ জড় ভোগ ত্যাগ করে হঠাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। তারা জড় আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩০) বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

"যারা এই জড় জগতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বদ্ধপরিকর, তারা কখনও কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে না। জড় জগতের প্রতি আসক্তির ফলে তারা অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে

না। যেহেতু তারা অসংযত ইন্দ্রিয় পরায়ণ, তাই তারা জড় জগতের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে পুনঃপুনঃ চর্বিত বস্তু চর্বণ করে আনন্দ আস্বাদনের ব্যর্থ প্রয়াস করে।"

শ্লোক ১৯৯

আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে ।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ত্রিভুবনে আমাদের উদ্ধার করার মতো যথেষ্ট বলবান কেউ নেই। তুমিই কেবল একমাত্র পতিতপাবন; তাই তুমি ছাড়া আর কেউ এই কাজ করতে পারবে না।

শ্লোক ২০০

আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ-বল ।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"যদি আমাদের উদ্ধার করে তুমি তোমার অপ্রাকৃত বল প্রদর্শন কর, তা হলেই তোমার পতিতপাবন নাম সফল হবে।

শ্লোক ২০১

সত্য এক ৰাত কহোঁ, শুন, দয়াময় ।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

"হে দয়াময়! একটি সত্য কথা আমরা বলছি, দয়া করে তুমি তা শ্রবণ কর। আমরা ছাড়া এই জগতে আর দয়ার পাত্র কেউ নেই।

শ্লোক ২০২

মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা সব চাইতে অধঃপতিত; তাই আমাদের দয়া করে তুমি তোমার দয়া সফল কর। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার দয়ার বল দর্শন করুক।

শ্লোক ২০৩

ন মৃষা পরমার্থমেব মে, শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা, দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥ ২০৩ ॥

ন—না; মৃষা—অসত্য; পরম-অর্থম্—পরম অর্থপূর্ণ; এব—অবশ্যই; মে—আমার; শৃণু—দয়া করে শ্রবণ কর; বিজ্ঞাপনম্—বিশেষ আবেদন; একম্—এক; অগ্রতঃ—প্রথম; যদি—যদি; মে—আমাকে; ন দয়িষ্যসে—তুমি যদি দয়া প্রদর্শন না কর; তদা—তা হলে; দয়নীয়ঃ—দয়ার পাত্র; তব—তোমার; নাথ—হে নাথ; দুর্লভঃ—দুর্লভ।

অনুবাদ

" 'হে প্রভু! তোমার কাছে আমাদের এক বিশেষ আবেদন তুমি শ্রবণ কর। আমাদের এই আবেদন অসত্য নয়, পক্ষান্তরে তা পরম অর্থপূর্ণ। তা হচ্ছে তুমি যদি আমাদেরকে দয়া না কর, তা হলে তোমার দয়া করার পাত্র খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ হবে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীযামুনাচার্যের *স্তোত্ররত্ন* (৪৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২০৪

আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"নিজেদের তোমার কৃপা লাভের অযোগ্য দেখে আমরা মনে অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছি। তবুও তোমার অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা শুনে আমরা তোমার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছি।

শ্লোক ২০৫

বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে ।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাদের অবস্থা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার মতো। যদিও আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবুও তোমার কৃপা লাভ করার বাসনা আমাদের অন্তরে উদিত হচ্ছে।

শ্লোক ২০৬

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥ ২০৬ ॥

ভবন্তম্—আপনি; এব—অবশ্যই; অনুচরন্—সেবার দ্বারা; নিরন্তরঃ—সর্বদা; প্রশান্ত—প্রশান্ত; নিঃশেষ—সমস্ত; মনঃ-রথ—বাসনা; অন্তরঃ—অন্য; কদা—কখন; অহম্—আমি; ঐকান্তিক—ঐকান্তিক; নিত্য—নিত্য; কিঙ্করঃ—সেবক; প্রহর্ষয়িষ্যামি—সর্বতোভাবে সুখী হব; স-নাথ—উপযুক্ত প্রভুসহ; জীবিতম্—জীবিত।

অনুবাদ

" 'আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হয়ে, প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্য কিঙ্কর বলে নিজেকে জেনে এবং আপনার দাসত্ব স্বীকার করে আনন্দে উৎফুল্ল হব?' "

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।" প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস। একটি কুকুর যেমন উপযুক্ত প্রভু লাভ করে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়, অথবা শিশু যেমন উপযুক্ত পিতা লাভ করে সম্পূর্ণভাবে সুখী হয়, ঠিক তেমনই জীব পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত আনন্দ লাভ করে। তার ফলে সে জানতে পারে যে, তার এক অতি সুযোগ্য প্রভু রয়েছেন, যিনি তাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় লাভ করছে, ততক্ষণ তার চেতনা নানা রকম উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে। এই উৎকণ্ঠাপূর্ণ জীবনকে বলা হয় জড় জীবন। সব রকম উৎকণ্ঠাশূন্য সন্তুষ্ট জীবন লাভ করতে হলে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসত্ব অবলম্বন করতে হবে। এই শ্লোকটি শ্রীযামুনাচার্যের *স্তোত্ররত্ন* (৪৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২০৭

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—শুন, দবির-খাস ।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

দবির খাস ও সাকর মল্লিকের প্রার্থনা শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "প্রিয় দবির খাস! তোমরা দুভাই আমার পুরাতন ভৃত্য।

শ্লোক ২০৮

আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন' ।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ থেকে তোমাদের নাম রূপ ও সনাতন। তোমাদের এই দৈন্য ত্যাগ কর, কেন না তোমাদের দৈন্য দেখে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দবির খাস ও সাকর মল্লিককে দীক্ষা দিলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিনীতভাবে মহাপ্রভুর শরণাগত হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁদের তাঁর পুরাতন ভৃত্য বা

নিত্য দাসরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের নাম পরিবর্তন করেছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, দীক্ষার সময় শ্রীগুরুদেব কর্তৃক শিষ্যের নাম পরিবর্তন করাও দীক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ।

শঙ্খচক্রাদ্যূর্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্ ।
তন্নামকরণং চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥

"দীক্ষার পর দীক্ষিত শিষ্য যে শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত তা নির্দেশ করার জন্য শিষ্যের নাম পরিবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। দীক্ষার পর শিষ্যকে অবশ্য অবশ্যই তার শরীরের দ্বাদশ-অঙ্গে, বিশেষ করে ললাটে তিলক (ঊর্ধ্বপুণ্ড্র) ধারণ করতে হয়। এগুলি হচ্ছে যথার্থ বৈষ্ণবের লক্ষণ।" এই শ্লোকটি *পদ্ম পুরাণের* উত্তর-খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সহজিয়ারা নাম পরিবর্তন করে না, তাই তাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলে স্বীকার করা যায় না। কেউ যদি দীক্ষার পর তার নাম পরিবর্তন না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে তার দেহাত্মবুদ্ধি বজায় রেখেছে।

শ্লোক ২০৯

দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার ।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা বারবার অত্যন্ত দৈন্যভাবে আমাকে পত্র লিখেছ। সেই পত্র থেকে আমি তোমাদের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে পেরেছি।

শ্লোক ২১০

তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে ।
তোমা শিখাইতে শ্লোক পাঠাইল তোমারে ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমাদের পত্রের দ্বারা আমি তোমাদের হৃদয় জানতে পেরেছি। তাই, তোমাদের শিক্ষাদান করার জন্য আমি তোমাদের একটি শ্লোক পাঠিয়েছিলাম।

শ্লোক ২১১

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ২১১ ॥

পর-ব্যসনিনী—পরপুরুষে আসক্তা; নারী—স্ত্রীলোক; ব্যগ্রা অপি—ব্যগ্র থেকেও; গৃহ-কর্মসু—গৃহকার্যে; তৎ এব—তাই কেবল; আস্বাদয়তি—আস্বাদন করে; অন্তঃ—অন্তরে; নব-সঙ্গ—নতুন প্রিয়সঙ্গ; রস-অয়নম্—রস।

অনুবাদ

"'পরপুরুষে আসক্তা নারী গৃহকর্মে ব্যগ্র থেকেও অন্তরে নতুন প্রিয় সঙ্গরস আস্বাদন করতে থাকে।'

শ্লোক ২১২

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন ।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গৌড়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তোমাদের দুজনকে দেখবার জন্যই কেবল আমি এখানে এসেছি।

শ্লোক ২১৩

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কেন আমি এই রামকেলি-গ্রামে এসেছি। কিন্তু আমার মনের এই কথা কেউ জানে না।

শ্লোক ২১৪

ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এটি খুব ভাল হল যে, তোমরা দুভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। এখন তোমরা ঘরে যাও। মনে কোন ভয় করো না।

শ্লোক ২১৫

জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"জন্মে জন্মে তোমরা দুজন আমার নিত্যসেবক। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করবেন।"

শ্লোক ২১৬

এত বলি দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে ।
দুই ভাই প্রভু-পদ নিল নিজ মাথে ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের দুজনের মাথায় তাঁর দুহাত রাখলেন এবং দুভাই তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তাঁদের মস্তকে ধারণ করলেন।

শ্লোক ২১৭

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে ।
সবে কৃপা করি' উদ্ধার' এই দুই জনে ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর মহাপ্রভু তাঁদের দুজনকে আলিঙ্গন করলেন এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন কৃপা করে তাঁদের উদ্ধার করেন।

শ্লোক ২১৮

দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণে ।
'হরি' 'হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দুভাইয়ের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দর্শন করে, সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দিত অন্তরে 'হরি! হরি!' ধ্বনি দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা*—বৈষ্ণবদের সেবা না করে কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সদ্গুরু শিষ্যকে উদ্ধার করার জন্য দীক্ষা দান করেন এবং শিষ্য যদি অন্য বৈষ্ণবদের চরণে অপরাধ না করে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেন, তা হলে তার পথ সুগম হয়। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে সমবেত সমস্ত বৈষ্ণবদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন নবদীক্ষিত রূপ ও সনাতনকে কৃপা করেন। কোন বৈষ্ণব যখন দেখেন যে, অন্য কোন বৈষ্ণব ভগবানের কৃপা লাভ করছেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। বৈষ্ণবেরা ঈর্ষাপরায়ণ নন। কোন বৈষ্ণব যদি মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের নাম প্রচার করেন, তা হলে অন্য বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হন—অর্থাৎ, যদি তাঁরা যথার্থ বৈষ্ণব হন। যারা বৈষ্ণবের সাফল্য দর্শন করে ঈর্ষাপরায়ণ হন তারা বৈষ্ণব নন, পক্ষান্তরে তারা হচ্ছেন সাধারণ বিষয়ী মানুষ। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য এগুলি বিষয়াসক্ত মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, বৈষ্ণবের মধ্যে নয়। ভগবানের দিব্যনাম প্রচারে কোন বৈষ্ণব যদি সফল হন, তা হলে অন্য বৈষ্ণবেরা তাঁর প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ হবেন কেন? কোন বৈষ্ণব যখন ভগবানের করুণা বিতরণ করেন, তখন অন্য বৈষ্ণবেরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। বৈষ্ণবের পোশাক পরিহিত বিষয়ীদের শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে বর্জন করা উচিত। এটি শাস্ত্রের নির্দেশ (উপেক্ষা করা)। মাৎসর্য পরায়ণ মানুষকে উপেক্ষা

করতে হবে। প্রচারকের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমপরায়ণ হওয়া, বৈষ্ণবদের প্রতি বন্ধুত্ব-পরায়ণ হওয়া, তত্ত্বজ্ঞান রহিতদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া এবং যাঁরা ঈর্ষা বা মাৎসর্য পরায়ণ ভগবৎ-বিদ্বেষী তাদের উপেক্ষা করা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে বৈষ্ণবের পোশাক পরিহিত বহু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ রয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা কর্তব্য। বৈষ্ণবের বেশ পরিহিত ঈর্ষাপরায়ণ মানুষদের সেবা করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর যখন গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা*—তিনি এখানে প্রকৃত বৈষ্ণবদের কথা বলেছেন, বৈষ্ণবের পোশাক পরিহিত ঈর্ষা বা মাৎসর্য পরায়ণ মানুষদের কথা বলেননি।

শ্লোক ২১৯

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর ।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ২২০

সবার চরণে ধরি, পড়ে দুই ভাই ।
সবে বলে,—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী, দুই ভাই সমস্ত বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবেরা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে তোমরা ধন্য হলে।"

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে যথার্থ বৈষ্ণবের ব্যবহার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করায় রূপ ও সনাতনকে তাঁরা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বৈষ্ণবের বেশ পরিহিত ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ অন্য বৈষ্ণবকে ভগবানের কৃপা লাভ করতে দেখে কখনও আনন্দিত হতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, এই কলিযুগে বহু জড় বিষয়ে আসক্ত লোক বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের কলির চেলা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

এও ত' এক কলির চেলা ।
মাথা নেড়া, কপ্নি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা ॥

দেখতে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা ।
সহজ-ভজন করছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥

এই ধরনের বৈষ্ণবের বেশধারী বিষয়াসক্ত মানুষেরা কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্ত এবং তারা বৈষ্ণবের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই এই ধরনের বৈষ্ণবের বেশধারী প্রবঞ্চকদের কলির চেলা বলে বর্ণনা করেছেন। কলির চেলা হাইকোর্টের রায়ে আচার্য হতে পারেন না। বিষয়ীদের ভোটে বৈষ্ণব-আচার্য নির্বাচন করা যায় না। বৈষ্ণব-আচার্য ভগবদ্ভক্তির জ্যোতিতে স্বয়ং প্রকাশিত হন এবং সেই জন্য হাইকোর্টের রায়ের প্রয়োজন হয় না। ভণ্ড আচার্যেরা হাইকোর্টের রায়ের জোরে মাতব্বরি করতে পারে, কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্পষ্টভাবে বলে গেছেন যে, তারা কলির চেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লোক ২২১

সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময় ।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণবদের আদেশ গ্রহণ করে বিদায় গ্রহণ করার সময়, দুভাই শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—

শ্লোক ২২২

ইহাঁ হৈতে চল, প্রভু, ইহাঁ নাহি কাজ ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু! যদিও বাংলার নবাব হুসেন শাহ তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তবুও যেহেতু তোমার এখানে আর কোন কাজ নেই, তাই আর এখানে থেকো না।

শ্লোক ২২৩

তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি ।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও নবাব তোমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, কিন্তু তবুও জাতিতে সে যবন এবং তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবনের তীর্থযাত্রায় যখন আপনি যাচ্ছেন, তখন এত লোকের আপনার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না।

শ্লোক ২২৪

যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি ।
বৃন্দাবন-যাত্রার এ নহে পরিপাটী ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু! হাজার হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করতে যাওয়া ঠিক নয়।"

তাৎপর্য

কখনও কখনও ব্যবসা করার জন্য বহু লোক নিয়ে তীর্থ ভ্রমণ করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয়। তাই এটি বেশ ভাল ব্যবসা, কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে বলেছিলেন এত লোক সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রায় না যেতে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি একলাই গিয়েছিলেন এবং ভক্তদের অনুরোধে মাত্র একজন সেবক সঙ্গে নিয়েছিলেন।

শ্লোক ২২৫

যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময় ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাই তাঁর কোন ভয় ছিল না, তবুও মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২২৬

এত বলি' চরণ বন্দি' গেলা দুইজন ।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে দুভাই তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার বাসনা করলেন।

শ্লোক ২২৭

প্রাতে চলি' আইলা প্রভু 'কানাইর নাটশালা' ।
দেখিল সকল তাহাঁ কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সকালবেলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কানাইয়ের নাটশালা নামক স্থানে এলেন। সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

তখনকার দিনে বঙ্গদেশে 'কানাইয়ের নাটশালা' নামে বহু স্থান ছিল, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের চিত্র রাখা হত। মানুষ সেখানে সেই সমস্ত লীলা দর্শন করতে যেত। তাকে বলা হয় *কৃষ্ণ-চরিত্রলীলা*। বঙ্গদেশে এখনও বহু হরিসভা রয়েছে, যেখানে মানুষ সমবেত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা আলোচনা করেন। *কানাই* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম, আর *নাটশালা* হচ্ছে যেখানে লীলাবিলাস প্রদর্শিত হয়। সুতরাং এখন যাকে হরিসভা বলা হয়, পূর্বে সেগুলি হয়ত কানাইয়ের নাটশালা নামে পরিচিত ছিল।

শ্লোক ২২৮

সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন ।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, কৈল সনাতন ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রস্তাব মনে মনে বিবেচনা করে দেখলেন যে, এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া ঠিক হবে না।

শ্লোক ২২৯

মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ।
কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু ভাবলেন, "এত লোক সঙ্গে নিয়ে মথুরায় যাওয়া সুখকর হবে না, কেন না তা হলে রসভঙ্গ হবে।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে করেছিলেন যে, অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে তীর্থস্থানে গেলে কেবল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। সেভাবেই ধাম দর্শনে গেলে তিনি মোটেই আনন্দ পাবেন না।

শ্লোক ২৩০

একাকী যাইব, কিম্বা সঙ্গে এক জন ।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু ঠিক করলেন যে, তিনি একলা বৃন্দাবনে যাবেন অথবা সঙ্গে বড় জোর একজন সঙ্গী নিয়ে যাবেন। তা হলে বৃন্দাবনে গমন অত্যন্ত সুখকর হবে।

শ্লোক ২৩১

এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি' ।
'নীলাচলে যাব' বলি' চলিলা গৌরহরি ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

মনে মনে এভাবেই বিবেচনা করে, মহাপ্রভু সকালে গঙ্গাস্নান করলেন এবং "আমি নীলাচলে যাব" বলে নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২৩২

এই মত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে ।
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্যের ঘরে ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

পদব্রজে চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে এলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে পাঁচ-সাত দিন থাকলেন।

শ্লোক ২৩৩

শচীদেবী আনি' তাঁরে কৈল নমস্কার ।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সুযোগে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শচীমাতাকে সেখানে আনালেন এবং শচীমাতা সাতদিন তাঁর বাড়িতে থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য রান্না করলেন।

শ্লোক ২৩৪

তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে ।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা করলেন। ভক্তরা যখন তাঁর অনুগমন করছিল, তখন তিনি বিনীতভাবে তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

শ্লোক ২৩৫

জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ।
আমারে মিলিবা আসি' রথযাত্রা-কালে ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "দুই-একজনকে কেবল সঙ্গে নিয়ে আমি নীলাচলে যাব, আর তোমরা রথযাত্রার সময় এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ো।"

শ্লোক ২৩৬

বলভদ্র ভট্টাচার্য, আর পণ্ডিত দামোদর ।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

বলভদ্র ভট্টাচার্য আর দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে এলেন।

শ্লোক ২৩৭

দিন কত রহি' তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন ।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

কয়েকদিন জগন্নাথপুরীতে থাকার পর মহাপ্রভু রাত্রিবেলায় সকলের অগোচরে শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন এবং কেউ তা জানতে পারল না।

শ্লোক ২৩৮

বলভদ্র ভট্টাচার্য রহে মাত্র সঙ্গে ।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা মহারঙ্গে ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন, তখন কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এভাবেই তিনি ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে মহা আনন্দে বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ২৩৯

দিন চার কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন ।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল চার দিন কাশীতে ছিলেন এবং তারপর সেখান থেকে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। মথুরা দর্শন করে তিনি দ্বাদশ কানন দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

আজকাল যারা বৃন্দাবনে যান, তাঁরা সাধারণত দ্বাদশ কানন নামক বারোটি বনও দর্শন করতে যান। মথুরায় কাম্যবন থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে যান তাঁরা তালবন, তমালবন, মধুবন, কুসুমবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, ভদ্রবন, খদিরবন, লৌহবন, কুমুদবন ও গোকুল মহাবন।

শ্লোক ২৪০

লীলাস্থল দেখি' প্রেমে হইলা অস্থির ।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দ্বাদশ-কানন দর্শন করে মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমে অধীর হলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য তখন তাঁকে মথুরার বাইরে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ২৪১

গঙ্গাতীর-পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি' প্রভুকে তথাই মিলিলা ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরা ত্যাগ করে গঙ্গার তীরের এক পথ ধরে মহাপ্রভু প্রয়াগ (এলাহাবাদ) নামক পবিত্র স্থানে এলেন। সেখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২৪২

দণ্ডবৎ করি' রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়াগে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর, শ্রীল রূপ গোস্বামী ভূমিতে পতিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং মহাপ্রভু তাঁকে পরম আনন্দে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২৪৩

শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দান করে মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবন যেতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি স্বয়ং বারাণসীর দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

শ্লোক ২৪৪

কাশীতে প্রভুকে আসি' মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি' তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামীও তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। মহাপ্রভু সেখানে দুই মাস ছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৫

মথুরা পাঠাইলা তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি' গেলা নীলাচল ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দান করে এবং তাঁর মধ্যে ভক্তিবল সঞ্চার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে মথুরায় পাঠালেন। বারাণসীতে অবস্থান কালে তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদেরও কৃপা করেছিলেন। তারপর তিনি জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৬

ছয় বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রবাস ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছয় বছর ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন। কখনও কখনও তিনি এখানে ওখানে ভ্রমণ করে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেছিলেন এবং কখনও তিনি শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৭

আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্তন-বিলাস।
জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের বিলাস ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে অবস্থান কালে মহাপ্রভু মহা আনন্দে ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করে এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে ভগবৎ-প্রেম আস্বাদনের লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৮

মধ্যলীলার কৈলুঁ এই সূত্র-বিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সূত্রাকারে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যলীলা বর্ণনা করলাম। এখন আমি মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনা করব। হে ভক্তগণ! দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২৪৯

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আঠারো বছর সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং সেই আঠারো বছর তিনি কোথাও যাননি।

শ্লোক ২৫০

প্রতিবর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এই আঠারো বছর গৌড়ের সমস্ত ভক্তরা প্রতি বছর সেখানে আসতেন এবং চার মাস সেখানে থেকে মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের আনন্দ উপভোগ করতেন।

শ্লোক ২৫১

নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্তন-বিলাস ।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করে ভগবৎ-প্রেম আস্বাদনের লীলাবিলাস করেছিলেন। আচণ্ডালে প্রেমভক্তি দান করে তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫২

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস ।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

পণ্ডিত-গোসাঞি, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুর আদি সকলে মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে ছিলেন।

শ্লোক ২৫৩

জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দ পুরী ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীও মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

শ্লোক ২৫৪

ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি ।
প্রভুসঙ্গে এই সব কৈল নিত্যস্থিতি ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় এবং জগন্নাথপুরীর নিবাসী অন্যান্য ভক্তগণও মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

শ্লোক ২৫৫-২৫৬

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস ।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস ॥ ২৫৫ ॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস ।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, মুকুন্দ, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, বাসুদেব ও মুরারি আদি মহাপ্রভুর যত দাস, প্রতি বছর তাঁরা জগন্নাথপুরীতে এসে চার মাস থাকতেন এবং তাঁদের সঙ্গে মহাপ্রভু বিবিধ লীলাবিলাস করতেন।

শ্লোক ২৫৭

হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি,—অদ্ভুত সে সব ।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর অপ্রকট হন। সেই লীলা ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, কেন না মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব করেছিলেন।

শ্লোক ২৫৮

তবে রূপ-গোসাঞির পুনরাগমন ।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে শ্রীল রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন এবং মহাপ্রভু তাঁর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেন।

শ্লোক ২৫৯

তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড ।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্য-দণ্ড ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে দণ্ড দান করেন এবং দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বাক্য-দণ্ড দান করেন।

তাৎপর্য

দামোদর পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসেবক। কোন অবস্থাতেই তিনি মহাপ্রভুকে দণ্ড দিতে পারেন না এবং সেই রকম কোন বাসনাও তাঁর ছিল না, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে বাক্য-দণ্ড দান করেছিলেন যাতে অন্যরা তাঁর নিন্দা না করে। অবশ্য

তাঁর জানা উচিত ছিল যে, মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি তাঁর ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারেন। কখনও তাঁকে সাবধান করার প্রয়োজন নেই এবং উত্তম ভক্তরা এই ধরনের ব্যবহার খুব একটা অনুমোদন করেন না।

শ্লোক ২৬০

তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীল সনাতন গোস্বামী পুনরায় মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র রৌদ্রতাপে মহাপ্রভু তাঁকে পরীক্ষা করলেন।

শ্লোক ২৬১

তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন ।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে পুনরায় বৃন্দাবনে পাঠালেন। তারপর অদ্বৈত প্রভুর হস্তে তিনি অদ্ভুতভাবে ভোজন করেন।

শ্লোক ২৬২

নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে ।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠাবার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করেন এবং ভগবৎ-প্রেম প্রচার করার জন্য তাঁকে গৌড়ে প্রেরণ করেন।

শ্লোক ২৬৩

তবে ত' বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা ।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার অল্পকাল পরে বল্লভ ভট্ট জগন্নাথপুরীতে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং মহাপ্রভু তাঁকে কৃষ্ণনামের অর্থ বিশ্লেষণ করে শোনান।

তাৎপর্য

এই বল্লভ ভট্ট হচ্ছেন পশ্চিম ভারতের বল্লভ-সম্প্রদায় নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলার উনবিংশতি পরিচ্ছেদে এবং *অন্ত্যলীলার* সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভাচার্যের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রয়াগে যমুনার অপর পারে আড়াইল নামক গ্রামে বল্লভাচার্যের গৃহে মহাপ্রভু গিয়েছিলেন। তারপর বল্লভাচার্য জগন্নাথপুরীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতের* টীকা শুনিয়েছিলেন। তাঁর সেই টীকা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের কর্তব্য হচ্ছে বিনীতভাবে পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, এই শিক্ষা দান করে মহাপ্রভু তাঁকে সংশোধন করেন। মহাপ্রভু তাঁকে বলেন যে, নিজেকে শ্রীধর স্বামীর থেকে বড় বলে অভিমান করাটা বৈষ্ণবোচিত আচরণ নয়।

শ্লোক ২৬৪

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে ।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি' তাঁর গুণে ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দ রায়ের অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা বিশ্লেষণ করে, মহাপ্রভু তাঁকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার জন্য রামানন্দ রায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬৫

গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা ।
রাজা মারিতেছিল, প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ককে মহারাজ প্রতাপরুদ্র দণ্ড দান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ২৬৬

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল ।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি' অর্ধেক রাখিল ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামচন্দ্রপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভোজনের সমালোচনা করেছিলেন; তাই মহাপ্রভু তাঁর আহারের মাত্রা অধিক পরিমাণে হ্রাস করেন। কিন্তু তা দেখে সমস্ত বৈষ্ণবেরা যখন অত্যন্ত দুঃখিত হন, তখন মহাপ্রভু তাঁর আহারের মাত্রা বর্ধিত করে, সাধারণত তিনি যতটা আহার করতেন তার অর্ধমাত্রা রাখলেন।

শ্লোক ২৬৭-২৬৮

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দ ভুবন ।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৬৭ ॥

মনুষ্যের বেশ ধরি' যাত্রিকের ছলে ।
প্রভুর দর্শন করে আসি' নীলাচলে ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর চোদ্দটি ভুবন রয়েছে এবং সেই চোদ্দ ভুবনের সমস্ত জীব মানুষের বেশ ধারণ করে তীর্থযাত্রীরূপে জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতেন।

শ্লোক ২৬৯

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীবাসাদি সমস্ত ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ২৭০

শুনি' ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি, কি কর কীর্তনে ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর নিজের গুণাবলী শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের তিরস্কার করে বললেন, "তোমরা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ কীর্তন ছেড়ে কি কীর্তন করছ?"

শ্লোক ২৭১

ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশা'বে ভুবন ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সমস্ত ভক্তদের তিরস্কার করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করতে এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের মনগড়া পথ সৃষ্টি করে সারা পৃথিবীর সর্বনাশ না করতে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত অনুগামীদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের মত তৈরি না করতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বহু অপসম্প্রদায় নিজেদের মনগড়া সমস্ত পথ সৃষ্টি করেছে, যেগুলি আচার্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সমস্ত অপসম্প্রদায়গুলিকে আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গনাগরী বলে বর্ণনা করেছেন।

আউল, বাউল আদি এই সমস্ত অপসম্প্রদায়গুলি পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে তাদের মনগড়া পথ সৃষ্টি করেছে। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, এই ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁর শিক্ষার মর্ম কলুষিত করে সারা পৃথিবীর সর্বনাশ করছে।

শ্লোক ২৭২

দশদিকে কোটী কোটী লোক হেন কালে ।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করে কোলাহলে ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আপাতদৃষ্টিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ভক্তদের তিরস্কার করছিলেন, তখন দশদিক থেকে কোটি কোটি লোক 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে কোলাহল করছিলেন।

শ্লোক ২৭৩

জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার ।
জগৎ তারিতে প্রভু, তোমার অবতার ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

অতি উচ্চৈঃস্বরে তারা বলতে লাগলেন, "জয় জয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার! সমস্ত জগৎ উদ্ধার করার জন্য তুমি এখানে অবতীর্ণ হয়েছ।

শ্লোক ২৭৪

বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত ।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু! অত্যন্ত আর্ত হয়ে আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। দয়া করে আমাদের দর্শন দিয়ে তুমি আমাদের কৃতার্থ কর।"

শ্লোক ২৭৫

শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয় ।
বাহিরে আসি' দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মানুষের এই দৈন্যপূর্ণ আবেদন শ্রবণ করলেন, তখন তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হল। অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তিনি বাইরে এসে তাঁদের দর্শন দান করলেন।

শ্লোক ২৭৬

বাহু তুলি' বলে প্রভু বল' 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল—শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দিক্ ভরি' ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

বাহু তুলে মহাপ্রভু সকলকে 'হরি, হরি' বলতে বললেন। তৎক্ষণাৎ হরিধ্বনিতে চতুর্দিক পূর্ণ হল।

শ্লোক ২৭৭

প্রভু দেখি' প্রেমে লোক আনন্দিত মন ।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি' করয়ে স্তবন ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে প্রেমানন্দে সকলের হৃদয় পূর্ণ হল এবং তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে তাঁরা তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭৮

স্তব শুনি' প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস ।
ঘরে গুপ্ত হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্তব শুনে শ্রীবাস ঠাকুর ঠাট্টা করে মহাপ্রভুকে বললেন, "ঘরে নিজের পরিচয় গোপন রেখে, বাইরে কেন নিজেকে প্রকাশ করছ?"

শ্লোক ২৭৯

কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত ।
ইহা-সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর আরও বললেন, "এই সমস্ত মানুষদের কে এই কথা শিখাল? এরা কি বলছে? এখন তুমি নিজের হাত দিয়ে এদের মুখ ঢাক।

শ্লোক ২৮০

সূর্য যৈছে উদয় করি' চাহে লুকাইতে ।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"সূর্য যদি উদয় হওয়ার পর নিজেকে লুকাতে চায় তা যেমন অসম্ভব, তেমনই তুমি যে তোমার ভগবত্তা গোপন করার চেষ্টা করছ তাও অসম্ভব।"

শ্লোক ২৮১

প্রভু কহেন,—শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা ।
সবে মেলি' কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "শ্রীনিবাস! দয়া করে এভাবে বিড়ম্বনা করো না। তোমরা সকলে মিলে আমাকে এভাবে অপদস্থ করো না।"

শ্লোক ২৮২

এত বলি' লোকে করি' শুভদৃষ্টি দান ।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করে গৃহাভ্যন্তরে গেলেন এবং সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

শ্লোক ২৮৩

রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা ।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গেলেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে সেখানে দধি-চিড়া মহোৎসবের আয়োজন করলেন।

তাৎপর্য

আম ও কলা দিয়ে চিড়া-দই মেখে এক অতি উপাদেয় পদ তৈরি করা হয় এবং কখনও কখনও তার সঙ্গে সন্দেশ মেশানো হয়। ভগবানকে সেই ভোগ নিবেদন করে তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। শ্রীরঘুনাথ দাস যিনি তখন ছিলেন গৃহস্থ, তিনি পানিহাটিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশ অনুসারে তিনি সেখানে চিড়া-দধি মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮৪

তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে ।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে ॥ ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে শ্রীরঘুনাথ দাস গৃহত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে পারমার্থিক শিক্ষা লাভের জন্য শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর হাতে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

সেই বিষয়ে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী *বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে* (৫) লিখেছেন—

যো মাং দুস্তরগেহনির্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥

"যিনি তাঁর অপার করুণাবশত আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আমাকে গৃহরূপ দুস্তর অন্ধকূপ থেকে রক্ষা করে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীরূপ আনন্দ-সমুদ্র-রসের চরণপ্রান্তে অর্পণ করেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণারবিন্দে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ২৮৫

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্মাম্বর ।
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মৃগচর্ম পরিধান করার অভ্যাস ত্যাগ করালেন। এভাবেই ছয় বৎসর মহাপ্রভু বিবিধ লীলাবিলাস করলেন।

শ্লোক ২৮৬

এই ত' কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি মধ্যলীলার সূত্রসমূহ বর্ণনা করলাম। এখন আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

শ্রীব্যাসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* লীলাসমূহের সূত্র বর্ণনা করেছেন। *আদিলীলায়* তাঁর বয়সের পাঁচটি অবস্থাভেদে সূত্রমাত্র লিখে কয়েকটি লীলার বর্ণনা করে, তিনি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিস্তারিত বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। *শেষলীলা* অর্থাৎ *মধ্যলীলা* ও *অন্ত্যলীলার* সূত্র এই অধ্যায়ে লিখে শেষ দ্বাদশ বৎসরের সূত্র-বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন এবং তিনি ক্রমশ *মধ্য* ও *অন্ত্যলীলা* বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৮৭

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ প্রলাপ

মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের ভাব-আস্বাদন লীলার সূত্র বর্ণনা করেছেন। এই ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ তত্ত্ব সহজে লোকে বুঝতে পারে না। তাই গ্রন্থকারের ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শুনতে শুনতে জীবের হৃদয়ে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম ক্রমশ জাগরিত হবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃদ্ধ-অবস্থায় এই গ্রন্থ লিখছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত তিনি এই গ্রন্থ শেষ করতে পারবেন না। তাই *অন্ত্যলীলার* সূত্র ভক্তদের উপকারের জন্য এই পরিচ্ছেদে সংগ্রহ করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মতই ভজন সম্বন্ধে প্রধান মত। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা কণ্ঠস্থ করে তাঁর অন্তর্ধানের পর ব্রজে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হয় এবং তাঁর কণ্ঠস্থ কড়চার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তিনি এই অপ্রাকৃত গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনা করেন।

শ্লোক ১

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে ।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিচ্ছেদে—পরিচ্ছেদে; **অস্মিন্**—এই; **প্রভোঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **অন্ত্যলীলা**—অন্ত্যলীলার; **সূত্র**—সূত্রের; **অনুবর্ণনে**—বর্ণনা বিষয়ে; **গৌরস্য**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে; **প্রলাপ**—প্রলাপ; **আদি**—প্রভৃতি; **অনুবর্ণ্যতে**—বর্ণনা করা হচ্ছে।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণনা করার সময় আমি (গ্রন্থকার) এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রলাপ আদি অপ্রাকৃত ভাব বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্য-কলাপের একটি সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে *গৌর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেন না তাঁর অঙ্গের বর্ণ গৌর। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, কিন্তু তিনি যখন গৌরাঙ্গী ব্রজগোপিকাদের ভাবে মগ্ন হন, তখন তাঁর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ ধারণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গভীরভাবে কৃষ্ণবিরহ অনুভব করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার বিরহ-বেদনা অনুভব করে। *মধ্যলীলার* এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের কৃষ্ণবিরহ জনিত উন্মাদনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের জয়! গৌরভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর কৃষ্ণবিরহ জনিত ভাব প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৪

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে ।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে উদ্ধবকে দর্শন করে শ্রীমতী রাধারাণীর যে অবস্থা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থাও দিবা-রাত্র ঠিক সেই রকমই হয়েছিল।

শ্লোক ৫

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর কৃষ্ণবিরহ জনিত অপ্রাকৃত উন্মাদনা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ছিল ভ্রমময় এবং তাঁর কথাবার্তা ছিল প্রলাপময়।

শ্লোক ৬

রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে ।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অবস্থায় কখনও কখনও তাঁর শরীরের লোমকূপে রক্তোদ্গম হত এবং আবার কখনও কখনও তাঁর দাঁতগুলি আলগা হয়ে যেত। কখনও তাঁর সমগ্র দেহটি ক্ষীণ হয়ে যেত এবং আবার কখনও তাঁর সমগ্র দেহটি ফুলে যেত।

শ্লোক ৭

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব ।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গম্ভীরায় থাকতেন, কিন্তু তিনি এক নিমেষের জন্যও ঘুমোতেন না। সারা রাত তিনি মেঝেতে মুখ ও মাথা ঘষতেন এবং তার ফলে তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত।

তাৎপর্য

আঙিনার পর দালান, তার ভিতরে ক্ষুদ্র গৃহকে *গম্ভীরা* বলে।

শ্লোক ৮

তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে ।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও গৃহের তিনটি দ্বার সর্বক্ষণ বন্ধ থাকত, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতেন। কখনও জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বারে তাঁকে পাওয়া যেত, আবার কখনও কখনও সমুদ্রের জলে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যেত।

শ্লোক ৯

চটক পর্বত দেখি' 'গোবর্ধন' ভ্রমে ।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

চটক পর্বতকে গোবর্ধন পর্বত মনে করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর্তনাদপূর্বক ক্রন্দন করতে করতে সেদিকে ছুটে যেতেন।

তাৎপর্য

সমুদ্রতীরে যে সমস্ত বালুর পাহাড় আছে তাদের *চটক পর্বত* বলা হয়। গুণ্ডিচামন্দির ও সমুদ্রের মধ্যে একটি বড় *চটক পর্বত* আছে। সেই স্থানটিকে দেখে অনেক সময় মহাপ্রভুর গোবর্ধন পর্বত বলে মনে হত এবং তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব প্রকাশ করে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে প্রবল বেগে সেই বালুর পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতেন। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর এই মনোভাব তাঁকে বৃন্দাবন ও গোবর্ধন পর্বতে নিয়ে যেত এবং এভাবেই তিনি কৃষ্ণবিরহ-লীলাময় ভাবে এক অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতেন।

শ্লোক ১০

উপবনোদ্যান দেখি' বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাহাঁ যাই' নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যা'ন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নগরের উপবন দর্শন করে মনে করতেন যে, সেগুলি হচ্ছে বৃন্দাবন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে নাচতেন, কীর্তন করতেন এবং কখনও কখনও অপ্রাকৃত আনন্দে মূর্ছিত হতেন।

শ্লোক ১১

কাহাঁ নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে যে সকল অস্বাভাবিক ভাবের বিকার দেখা যেত, সেই বিকার অন্য কারও শরীরে সম্ভব ছিল না।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আদি গ্রন্থে যে সমস্ত ভাবের বিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে দেখা যায় না। কিন্তু, সেই সমস্ত লক্ষণগুলি পূর্ণরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমস্ত বিকার মহাভাবের লক্ষণ। কখনও কখনও সহজিয়ারা কৃত্রিমভাবে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশের চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত তা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তা বর্জন করেন। গ্রন্থকার এখানে বলেছেন যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হয় না।

শ্লোক ১২

হস্তপদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে, চর্ম রহে স্থানে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর হস্ত-পদের গ্রন্থিসমূহ কখনও কখনও প্রায় এক বিঘত (আট ইঞ্চি) দূরে দূরে সরে যেত এবং সেগুলি চামড়ার আচ্ছাদনে কেবল যুক্ত থাকত।

শ্লোক ১৩

হস্ত, পদ, শির, সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হাত, পা ও মাথা শরীরের মধ্যে কচ্ছপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই ঢুকে যেত।

শ্লোক ১৪

এই মত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা-হুতাশ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরে ভগবৎ-প্রেমের সমস্ত অদ্ভুত ভাব প্রকাশ পেত। আর তাঁর মনে শূন্যতা এবং বাক্য আদিতে হা-হুতাশ প্রকাশ পেত।

শ্লোক ১৫

কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করে ক্রন্দন করতে করতে বলতেন, "আমার প্রাণনাথ মুরলীবদন কোথায়? আমি এখন কি করব? কোথায় গেলে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে খুঁজে পাব?

শ্লোক ১৬

কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কাকে আমি আমার হৃদয়ের কথা বলব? আমার দুঃখ কে বুঝবে? ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিরহে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।"

শ্লোক ১৭

এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর বিলাপ করতেন। সেই সময় তিনি শ্রীরামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক পাঠ করতেন।

শ্লোক ১৮

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধে কা গতিঃ ॥ ১৮ ॥

প্রেম-ছেদ-রুজঃ—প্রেম-বিচ্ছেদ জনিত বেদনা; অবগচ্ছতি—অবগত হই; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ন—না; অয়ম্—এই; ন চ—নয়; প্রেম—প্রেম; বা—অথবা; স্থান—উপযুক্ত স্থান; অস্থানম্—অনুপযুক্ত স্থান; অবৈতি—জেনে; ন—না; অপি—ও; মদনঃ—মদন; জানাতি—জানে; নঃ—আমাদের; দুর্বলাঃ—অবলা নারীগণ; অন্যঃ—অপর; বেদ—জানে; ন—না; চ—ও; অন্য-দুঃখম্—অন্যের দুঃখ; অখিলম্—সমস্ত; নঃ—আমাদের; জীবনম্—জীবন; বা—অথবা; আশ্রবম্—কেবল দুঃখময়; দ্বি—দুই; ত্রাণি—তিন; এব—অবশ্যই; দিনানি—দিন; যৌবনম্—যৌবন; ইদম্—এই; হা-হা—হায়; বিধে—হে বিধাতা; কা—কি; গতিঃ—আমাদের গতি।

অনুবাদ

[শ্রীমতী রাধারাণী বিলাপ করে বলতেন—] "আমাদের কৃষ্ণ বুঝতে পারে না যে, প্রেম জনিত আঘাতে আমরা কি বেদনা অনুভব করি। প্রেমের কথাই বা কি বলব, তা স্থানাস্থান না জেনে আঘাত করে। মঙ্গলের তো কথাই নেই, কেন না আমরা যে অবলা নারী, তা সে বুঝল না! কাকেই বা কি বলব, কেউই অন্যের গভীর দুঃখ বুঝতে পারে না! আমাদের জীবন আমাদের বশে নয়, যৌবনও দুই-তিন দিনের মতো অল্পক্ষণ স্থায়ী! হায়! এই অবস্থায় হে বিধাতা, আমাদের কি গতি হবে?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীরামানন্দ রায়ের *শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক* (৩/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান ।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

[কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতী রাধারাণী বলছেন—] "হায়, আমার দুঃখের কথা কি বলব! কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ফলে আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণবিচ্ছেদ হেতু সেই প্রেমাঙ্কুরে আঘাত লেগে এখন দুঃখের প্রবাহ বইছে। এই রোগের কৃষ্ণই একমাত্র চিকিৎসক, কিন্তু সে এই প্রেমাঙ্কুর রক্ষা করবার কোন চেষ্টাই করছে না! কৃষ্ণের ব্যবহার কি বলব! —সে বাইরে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, নবযৌবন-সম্পন্ন প্রেমিক-শিরোমণি, কিন্তু অন্তরে সে হচ্ছে এক মহা প্রতারক এবং পরনারী বধ করতে সে অত্যন্ত দক্ষ।"

শ্লোক ২০

সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান ।
সুখ লাগি' কৈলুঁ প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায়, না রহে পরাণ ॥ ২০ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

[কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল শ্রীমতী রাধারাণীর প্রলাপ—] "হে সখী, এই বিধির বিধান বুঝতে না পেরে সুখের জন্য প্রীতি করেছিলাম, কিন্তু এই দুঃখিনীর পক্ষে তা বিপরীত ফল দেখা দিয়েছে! এখন আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা!

শ্লোক ২১

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে ।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে-গলে বান্ধি' মোরে,
রাখিয়াছে, নারি' উকাশিতে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাদের কৃষ্ণ তো এই রকম, আবার প্রেম বলে যে একটি বস্তু আছে তার কথাই বা আর কি বলব! প্রেম স্বভাবতই কুটিল ও অজ্ঞান বা অন্ধ, স্থানাস্থান না বুঝে এবং মন্দ ফলাফল বিচার না করে সেই কৃষ্ণরূপ ক্রূর শঠের গুণরজ্জুতে আমাকে হাতে-গলায় বেঁধে রেখেছে এবং আমি তা ছাড়াতে পারছি না।

শ্লোক ২২

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই প্রীতিকার্যে মদন বলে আর একজন রয়েছেন। তার গুণ এই যে, তিনি স্বয়ং তনুহীন, অথচ পরদ্রোহে বড়ই প্রবীণ—পঞ্চবাণ বিদ্ধ করে তিনি অবলাদের শরীর জরজর করেন। তিনি যদি একেবারে জীবন নিয়ে নিতেন, তা হলে ভালই হত, কিন্তু তা না করে তিনি কেবল দুঃখই দিয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৩

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে ।
অন্য জন কাহাঁ লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য ধরিবারে ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শাস্ত্রে বলেন যে, একের দুঃখ অন্যে জানতে পারে না। এই সম্বন্ধে অপরের কথা কি বলব, আমার ললিতা আদি প্রাণসখীরাও আমার দুঃখ বুঝতে না পেরে, 'হে সখী, ধৈর্য ধর,' এই কথা বারবার বলতে থাকেন।

শ্লোক ২৪

'কৃষ্ণ—কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার',
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন ।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বলি, 'হে সখী! তুমি বলছ, কৃষ্ণ কৃপাসমুদ্র—কখনও না কখনও তোমাকে অঙ্গীকার করবেন—তোমার এই কথা কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ, এই জীবন পদ্মপাতার জলের মতো চঞ্চল এবং কৃষ্ণের কৃপা লাভ করা পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবে?

শ্লোক ২৫

শত বৎসর পর্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি' ।
নারীর যৌবন-ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই-চারি ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"'মানুষ একশো বছরের বেশি বাঁচে না। আবার বিচার করে দেখ, কৃষ্ণের চিত্ত আকর্ষণকারী রমণীর যৌবনধনও অল্প কয়েক দিনের জন্যই কেবলমাত্র স্থায়ী হয়।

শ্লোক ২৬

অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে ।

কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ভাবে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"'তুমি যদি বল যে, কৃষ্ণ হচ্ছে অপ্রাকৃত গুণের সমুদ্রস্বরূপ এবং কোন এক সময়ে অবশ্যই সে কৃপা করবে, তা হলে আমি বলি, অগ্নি যেমন নিজের আলোক দেখিয়ে পতঙ্গীদের আকর্ষণ করে মেরে ফেলে, কৃষ্ণগুণও তেমনই গুণের চাকচিক্য দেখিয়ে নারীদের মন আকর্ষণ করে তাদের বিচ্ছেদরূপ দুঃখ-সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়।'"

শ্লোক ২৭

এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট ।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই গভীর বিষাদে বিলাপ করে শ্রীগৌরহরি তাঁর দুঃখের কপাট উন্মুক্ত করলেন। ভাবের তরঙ্গ-প্রবাহে তাঁর চিত্ত প্রবাহিত হয় এবং সেই অবস্থায় তিনি আর একটি শ্লোক পাঠ করেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্ ।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-কৃষ্ণ-রূপ-আদি—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ ও লীলা আদির; নিষেবণম্—সেবা; বিনা—ব্যতীত; ব্যর্থানি—অর্থহীন; মে—আমার; অহানি—দিন; অখিল—সমস্ত; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; অলম্—সম্পূর্ণরূপে; পাষাণ—পাষাণ; শুষ্ক—শুষ্ক; ইন্ধন—আগুন জ্বালাবার কাঠ; ভারকাণি—ভার; অহো—হায়; বিভর্মি—আমি বহন করব; বা—অথবা; তানি—সেগুলিকে; কথম্—কিভাবে; হতত্রপঃ—নির্লজ্জ হয়ে।

অনুবাদ

"'হে সখী! শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা আদি সেবন না করে আমার দিনগুলি এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ব্যর্থ হয়েছে। এখন পাষাণ ও শুকনো কাঠের ভারের মতো এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হয়ে কিভাবে ধারণ করতে সমর্থ হব?'

শ্লোক ২৯

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন ।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যে চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ সুন্দর বদন দর্শন করে না, যা হচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্য এবং বংশী-গীতরূপ অমৃতের উৎস, সেই চক্ষুর কি প্রয়োজন? তাঁর মাথায় বাজ পড়ুক। সেই চোখ রেখে কি লাভ?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন সমস্ত অমৃতময় সঙ্গীত ও তাঁর বংশীধ্বনির মূল আধার। তা সমস্ত দৈহিক সৌন্দর্যের মূল কারণও। তাই গোপিকারা মনে করতেন, যদি তাঁদের নয়ন শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত বদন দর্শন করতে না পারে, তা হলে তাঁদের মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়াই শ্রেয়। গোপিকাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আর সমস্ত কিছু দর্শন ছিল অর্থহীন ও বিরক্তিকর। গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য আর কিছু দর্শন করে আনন্দ লাভ করতেন না। তাঁদের নয়নের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ শ্রীমুখমণ্ডল, যা হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একমাত্র আরাধ্য বস্তু। তাঁরা যখন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত মুখ দর্শন করতে পারতেন না, তখন তাঁদের কাছে সব কিছু শূন্য বলে মনে হত এবং তখন তাঁরা কামনা করতেন যেন তাঁদের মাথায় বজ্রপাত হয়। তখন তাঁরা ভাবতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শনে তাঁরা বঞ্চিতা। সুতরাং, তাঁদের নয়নের কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ৩০

সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল ।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল ॥ ৩০ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"হে সখী, কৃপা করে আমার কথা শুন। বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত আমার সমস্ত বল আমি হারিয়ে ফেলেছি। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আমার দেহ, চেতনা, মন এবং আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ব্যর্থ হয়েছে।

শ্লোক ৩১

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গের মতো। সেই অমৃত যদি কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, তা হলে সেই কর্ণ কাণাকড়ির ছিদ্রের মতো। অকারণে সেই কর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (২/৩/১৭-২৪) নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উল্লেখ করেছেন—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া ॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত ।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্ ।
শাবৌ করৌ নো কুরুতে সপর্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে ।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু ।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

"উদয় ও অস্ত দ্বারা সূর্য সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী ব্যতীত আর সকলের আয়ু হরণ করে। বৃক্ষ কি জীবন ধারণ করে না? কামারের হাপর কি শ্বাস গ্রহণ করে না? আমাদের চতুর্দিকে পশুরা কি আহার ও মৈথুন করে না? কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভসদৃশ মানুষেরা কেবল সেই সমস্ত নর-পশুদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অমঙ্গল বিনাশকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ করে না। যারা পরমেশ্বর ভগবানের অপূর্ব বিক্রম ও অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেনি এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁর মহিমা কীর্তন করেনি, তাদের কর্ণ সাপের গর্তের মতো এবং জিহ্বা ব্যাঙের জিহ্বার মতো। পট্টবস্ত্র বা কিরীটে ভূষিত মস্তক এক বিশাল ভারস্বরূপ, যদি না তা মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করে। আর নানা অলঙ্কারে ভূষিত হস্ত এক মৃত ব্যক্তির হস্তের মতো, যদি না তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত হয়। যে চক্ষু পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আদি দর্শন না করে, তা ময়ূরপুচ্ছের মধ্যবর্তী একটি গোল কালো ছাপের মতো, আর যে পা পবিত্র স্থানে (যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তন হয়) গমন করে না, তা গাছের কাণ্ডের মতো। যে মানুষ কখনও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের পদরেণু মস্তকে গ্রহণ করেনি, তার দেহ অবশ্যই একটি মৃতদেহের মতো। আর যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করেনি, সে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলেও মৃত। একাগ্রতা সহকারে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা সত্ত্বেও যদি অঙ্গে বিকার দেখা না দেয়, চক্ষু যদি অশ্রুপূর্ণ না হয় এবং অঙ্গ যদি পুলকিত না হয়, তা হলে তার হৃদয় ইস্পাত দিয়ে মোড়া।"

শ্লোক ৩২

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন ।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের অধরামৃত এবং কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ ও বৈশিষ্ট্য সকল প্রকার সুধার নির্যাসের স্বাদকেও তুচ্ছ করে দেয়। সেই স্বাদ যে আস্বাদন না করে, সে জন্মেই মরে গেল না কেন এবং তার জিহ্বা ব্যাঙের জিহ্বারই মতো।

শ্লোক ৩৩

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব-মান ।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কস্তুরী আর নীল-কমলের সৌরভের মিলনে যে অপূর্ব সুন্দর গন্ধের উৎপত্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ সেই গন্ধকেও খর্ব করে দেয়। সেই কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ যে আঘ্রাণ করল না, তার নাসিকা কামারের হাপরের মতো।

শ্লোক ৩৪

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের করকমল ও পদতল এত স্নিগ্ধ যে, তাঁর সঙ্গে কোটি কোটি চন্দ্রের সুশীতলতার তুলনা করা যায়। তাঁর স্পর্শ যেন স্পর্শমণির স্পর্শের মতো। কিন্তু যে সেই হস্ত ও পদ স্পর্শ করল না, তার জীবন ব্যর্থ এবং তার দেহ লোহার মতো।"

শ্লোক ৩৫

করি' এত বিলাপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ।
দৈন্য-নির্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিলাপ করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হৃদয়ের শোক ব্যক্ত করেছিলেন এবং দৈন্য, নির্বেদ, বিষাদ ও হৃদয়ের অবসাদে পুনরায় একটি শ্লোক পাঠ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে *দৈন্য* শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—"যখন দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধবোধ আদি মিলিত হলে নিজেকে যে নিকৃষ্ট বলে মনে হয়, সেই অনুভূতিকে বলা হয় *দৈন্য*। সেই দীনতার প্রভাবে দৈন্যময়ী যাচ্ঞা, হৃদয়ের অপটুতা, অস্বচ্ছন্দতা, নানা ভাবনা ও অঙ্গের জড়তা প্রকাশ পায়।" *নির্বেদ* শব্দটির বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলা হয়েছে—"অত্যন্ত দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা, অকর্তব্য অনুষ্ঠানের জন্য ও কর্তব্যের অনাচরণ-হেতু শোকযুক্ত নিজের অপমানবোধকেই *নির্বেদ* বলে। নির্বেদ হলে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিঃশ্বাস আদি হয়ে থাকে। *বিষাদ* শব্দটির বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলা হয়েছে—"ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, সংকল্পিত প্রারব্ধকার্যে অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধ আদির থেকে যে অনুতাপ হয়, তাকে বলা হয় *বিষাদ*। *বিষাদ* হলে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশুষ্ক আদি হয়ে থাকে।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে *দৈন্য, নির্বেদ* ও *বিষাদ* আদি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি বাক্য, জ্রনেত্র আদি ভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত হয়। ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলে ব্যভিচারী ভাবকে *সঞ্চারী ভাব* বলে।

শ্লোক ৩৬

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

যদা—যখন; **যাতঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **দৈবাৎ**—দৈবক্রমে; **মধু-রিপুঃ**—মধু নামক অসুরের শত্রু; **অসৌ**—তিনি; **লোচন-পথম্**—নেত্রপথে; **তদা**—সেই সময়ে; **অস্মাকম্**—আমাদের; **চেতঃ**—চেতনা; **মদন-হতকেন**—হতভাগা মদনের দ্বারা; **আহৃতম্**—অপহৃত; **অভূৎ**—হয়েছিল; **পুনঃ**—পুনরায়; **যস্মিন্**—যখন; **এষঃ**—কৃষ্ণ; **ক্ষণম্ অপি**—এক পলকের জন্যও; **দৃশোঃ**—দুই চক্ষুর; **এতি**—গমন করে; **পদবীম্**—পথ; **বিধাস্যামঃ**—আমরা তৈরি করব; **তস্মিন্**—সেই সময়ে; **অখিল**—সমস্ত; **ঘটিকাঃ**—সময়ের; **রত্নখচিতাঃ**—মনি-রত্ন খচিত।

অনুবাদ

" 'দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার নয়ন-পথগামী হলে আমার চিত্ত দর্শন-সৌভাগ্যমদ কর্তৃক হত হওয়ায়, মদন ও আনন্দ নামক কোন তত্ত্ব তা অপহরণ করেছিল এবং আমাকে প্রাণভরে সেই ইষ্টদেবকে দেখতে দেয়নি। আবার, যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখতে পাব, তখন সেই সময়কে আমি বহু রত্ন দিয়ে অলঙ্কৃত করব।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীরামানন্দ রায়ের রচিত *জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক* (৩/১১) থেকে উদ্ধৃত শ্রীমতী রাধারাণীর উক্তি।

শ্লোক ৩৭

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরি ।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি' ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যে সময়ে বা স্বপ্নে, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে আমার দেখার সৌভাগ্য হল, তখন আমার দুটি শত্রু এসে উপস্থিত হল। তারা হচ্ছে আনন্দ আর মদন। তারা যেহেতু আমার মন হরণ করে নিল, তাই আমি আমার নেত্র ভরে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করতে পারলাম না।

শ্লোক ৩৮

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল ।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পুনরায় যদি আমার কোন সময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়, তা হলে মালা চন্দন ও নানা রত্ন-অলঙ্কার দিয়ে আমি সেই সময়টিকে অলঙ্কৃত করব।"

শ্লোক ৩৯

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তাঁরে পুছে,—আমি না চৈতন্য ?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ? ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করলেন, তখন তিনি তাঁর সামনে দুজন মানুষকে দেখতে পেলেন। তাঁদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি সচেতন? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? আমি কি প্রলাপ বলছিলাম? তোমরা কি আমাকে কোন দৈন্যোক্তি করতে শুনেছ?"

তাৎপর্য

ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এভাবেই দৈন্যোক্তি করছিলেন, তখন তিনি তাঁর সম্মুখে দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন তাঁর সচিব শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং অপরজন হচ্ছেন রায় রামানন্দ। বাহ্যজ্ঞান লাভ করে তিনি যখন তাদের দেখতে পেলেন, তখন তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রলাপ বলতে থাকলেও, তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি না।

শ্লোক ৪০

শুন মোর প্রাণের বান্ধব ।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু; তাই আমি তোমাদের বলছি যে, কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্পদ আমার নেই। তাই আমার জীবন অত্যন্ত দারিদ্রগ্রস্ত। আমার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ সকলই অর্থহীন।"

শ্লোক ৪১

পুনঃ কহে,—হায় হায়, শুন, স্বরূপ-রামরায়,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয় ।
শুনি, করহ বিচার, হয়, নয়—কহ সার,
এত বলি' শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

পুনরায় তিনি শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়কে সম্বোধন করে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বললেন, "হায়! তোমরা নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ের কথা জান। আমার হৃদয় জেনে তোমরা বিচার কর আমি ভ্রান্ত না অভ্রান্ত। তোমরা যথাযথভাবে আমাকে তা বল।" এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর একটি শ্লোক বলতে শুরু করেন।

শ্লোক ৪২

কই অবরহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ ।
জই হোই কস্‌স বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৪২ ॥

কই-অবরহি-অম্—কৈতব রহিত অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি ছল-ধর্মশূন্য; পেম্মম্—ভগবৎ-প্রেম; ণ—কখনই না; হি—অবশ্যই; হোই—হয়; মাণুসে—মানব-সমাজে; লোএ—এই জগতে; জ-ই—যদি; হোই—হয়; কস্‌স—কার; বিরহে—বিচ্ছেদে; হোন্তম্মি—হয়; কো—কে; জিঅ-ই—জীবিত থাকে।

অনুবাদ

" 'ভগবৎ-প্রেম সব রকম কৈতব রহিত এবং তা এই জড় জগতে কখনই প্রকাশিত হয় না। যদি প্রকাশিত হয়ও, কিন্তু বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয়, তবে জীবন থাকে না।'

তাৎপর্য

এই প্রাকৃত শ্লোকটির সঠিক সংস্কৃত পরিণতি হচ্ছে—*কৈতবরহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষে লোকে / যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি ন কো জীবতি।*

শ্লোক ৪৩

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ঠিক জাম্বুনদের সোনার মতো এবং সেই প্রেম নৃলোকে অনুপস্থিত। যদি তা দেখা যায়ও, তবে কখনও বিচ্ছেদ হয় না। যদি বিচ্ছেদ হয়, তবে জীবন থাকে না।"

শ্লোক ৪৪

এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুঁহে এক-মন হঞা ।
আপন-হৃদয়-কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বলে, শচীসুত আর একটি অদ্ভুত শ্লোক পাঠ করলেন এবং রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদর একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমার হৃদয়ের এই কার্যকলাপ ব্যক্ত করতে আমি লজ্জা অনুভব করছি। তবুও, লজ্জার মাথা খেয়ে আমি তা বলছি।"

শ্লোক ৪৫

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৪৫ ॥

ন—কখনই না; প্রেম-গন্ধঃ—ভগবৎ-প্রেমের নাম-গন্ধ; অস্তি—আছে; দরা-অপি—অল্প একটুও; মে—আমার; হরৌ—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; ক্রন্দামি—আমি কাঁদি; সৌভাগ্য-ভরম্—আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য; প্রকাশিতুম্—প্রকাশ করতে; বংশী-বিলাসী—বংশী-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের; আনন—মুখে; লোকনম্—দর্শন করে; বিনা—ব্যতীত; বিভর্মি—আমি ধারণ করি; যৎ—যেহেতু; প্রাণ-পতঙ্গকান্—আমার প্রাণপতঙ্গ; বৃথা—বৃথা।

অনুবাদ

" 'হে সখী, আমার হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের নামগন্ধও নেই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করবার জন্য। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তা বৃথা।'

শ্লোক ৪৬

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ-পায় ।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের প্রতি আমার প্রেম বহু দূরে। আমি যা করি তা কেবল ছলনা মাত্র। তোমরা যে আমাকে ক্রন্দন করতে দেখ, তা কেবল আমার সৌভাগ্য প্রদর্শন করার জন্য। তা তোমরা নিশ্চিতভাবে যেন বিশ্বাস কর।

শ্লোক ৪৭

যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদ মুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন' ।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আমি বংশীবাদনে রত কৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারি না এবং যদিও তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তবুও আমি আমার দেহের প্রতি আসক্তি পোষণ করি। সেটি কেবল কামের রীতি। এভাবেই আমি আমার প্রাণকীটকে ধারণ করছি।

তাৎপর্য

এই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, সেবা বিষয় ও সেবক আশ্রয়, এই উভয় তত্ত্বের সম্মেলনকে *আলম্বন* বলে। আশ্রয়ের—শ্রবণ, বিষয়ের—বংশীধ্বনি; বিষয়ের চাঁদমুখ দর্শনে আগ্রহাভাব—আশ্রয়ের *আলম্বন* রাহিত্যের জ্ঞাপক। স্বীয় বহিরনুভূতির বশে কাম চরিতার্থতায় বৃথা প্রাণধারণ।

শ্লোক ৪৮

কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু ।
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মশীবিন্দু ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত নির্মল, ঠিক গঙ্গাজলের মতো। সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু। সেই নির্মল অনুরাগে অন্য কোন দাগ লুকোতে পারে না। সাদা কাপড়ে যেমন কালির দাগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, ঠিক তেমনই।

তাৎপর্য

নির্মল কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগ সাদা কাপড়ের মতো। অনুরাগের অভাব কালির দাগের মতো। সাদা কাপড়ে যেমন এক ফোঁটা কালির দাগ প্রবলভাবে চোখে পড়ে, ঠিক তেমনই বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে ভগবানের প্রতি অনুরাগের অভাব অত্যন্ত প্রবলভাবে ফুটে ওঠে।

শ্লোক ৪৯

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম আনন্দের সমুদ্রের মতো। তার এক বিন্দু সমস্ত জগৎকে ভাসিয়ে দিতে পারে। এই ধরনের ভগবৎ-প্রেমের কথা প্রকাশ করার যোগ্য নয়, তবু উন্মাদে তা বলে। আর সে বললেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না।"

শ্লোক ৫০

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত ।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই দিনের পর দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের কাছে তাঁর অন্তরের ভাব ব্যক্ত করতেন। সেই ভাব বাইরে বিষের জ্বালার মতো, কিন্তু অন্তরে পরম আনন্দের অনুভূতি। কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অদ্ভুত চরিত্র।

শ্লোক ৫১

এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমের স্বাদ তপ্ত ইক্ষু চর্বণ করার মতো। তপ্ত ইক্ষু চর্বণে মুখ জ্বলে, কিন্তু তবুও তা ত্যাগ করা যায় না। তেমনই, ভগবৎ-প্রেম যিনি আস্বাদন করেছেন, তিনি তার বিক্রম সম্বন্ধে অবগত। তা বিষ ও অমৃতের মিলনের মতো।

শ্লোক ৫২

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৫২ ॥

পীড়াভিঃ—যন্ত্রণার দ্বারা; নব—নতুন; কাল-কূট—কালকূটের; কটুতা—তীব্রতা; গর্বস্য—গর্বের; নির্বাসনঃ—নির্বাসন; নিঃস্যন্দেন—ক্ষরণের দ্বারা; মুদাম্—হর্ষ; সুধা—অমৃতের; মধুরিমা—মাধুর্যের; অহঙ্কার—অহঙ্কার; সঙ্কোচনঃ—খর্ব করে; প্রেমা—প্রেম; সুন্দরি—হে সুন্দরী; নন্দ-নন্দন-পরঃ—নন্দনন্দনে নিবদ্ধ; জাগর্তি—বিকশিত হয়; যস্য—যাঁর; অন্তরে—হৃদয়ে; জ্ঞায়ন্তে—অনুভূত হয়; স্ফুটম্—স্পষ্টভাবে; অস্য—তাঁর; বক্র—বঙ্কিম; মধুরাঃ—মাধুর্য সমন্বিত; তেন—তাঁর দ্বারা; এব—কেবলমাত্র; বিক্রান্তয়ঃ—প্রভাবসমূহ।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, " 'হে সুন্দরী, নন্দনন্দন সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁর হৃদয়ে জাগরিত হয়েছে, তাঁর বক্র ও মধুর ভাব-বিক্রমসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেই প্রেম দুভাবে কার্য করে, অর্থাৎ নতুন সর্পবিষের কটুতার গর্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্বাসিত করে। অর্থাৎ, চরম দুঃখের উদয় করায়, আবার আনন্দের বর্ষণ দ্বারা অমৃত-মাধুর্যের যে অহঙ্কার, তার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত *বিদগ্ধমাধব নাটকে* (২/৩০) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ৫৩

যে কালে দেখে জগন্নাথ- শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে—আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলরাম ও সুভদ্রাসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন, তখন তাঁর মনে হত, "আমি কুরুক্ষেত্রে এসেছি। পদ্মলোচন কৃষ্ণকে দেখে আমার জীবন এখন সফল হল এবং আমার দেহ, মন ও নেত্র জুড়িয়ে গেল।"

শ্লোক ৫৪

গরুড়ের সন্নিধানে, রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

গরুড়-স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন। সেই প্রেমের প্রভাবের কথা কি বলব? গরুড়-স্তম্ভের নীচে যে একটি খাল ছিল, তা তাঁর প্রেম-অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে যেত।

তাৎপর্য

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে জগমোহনের শেষপ্রান্তে একটি স্তম্ভের উপর গরুড়ের বিগ্রহ রয়েছে। তাকে বলা হয় গরুড়-স্তম্ভ। তার পশ্চাৎ-ভাগের তলভূমিতে নিম্নভাগে একটি খাল ছিল, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে যেত।

শ্লোক ৫৫

তাহাঁ হৈতে ঘরে আসি' মাটীর উপরে বসি',
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা-হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মন্দির থেকে ঘরে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাটির মেঝেতে বসে তাঁর নখ দিয়ে ভূমিলিখন করতেন। সেই সময়ে গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ক্রন্দন করতেন, "হায়, কোথায় সেই বৃন্দাবন? কোথায় গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ? কোথায় সেই বংশীবদন?"

শ্লোক ৫৬

কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন।
কাহাঁ সে রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্যগীত-হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিলাপ করতেন, "কোথায় সেই ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম কৃষ্ণ? কোথায় সেই বেণুগীত? কোথায় সেই যমুনা-পুলিন? কোথায় সেই রাসবিলাস? কোথায় সেই নৃত্য, গীত ও হাস্য? আর কোথায় বা আমার প্রভু শ্রীমদনমোহন?"

শ্লোক ৫৭

উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিবিধ ভাবের উদয় হত। তাতে মহাপ্রভুর মন উদ্বেগে পূর্ণ হত এবং তিনি এক পলকও নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করতে পারতেন না। এভাবেই প্রবল বিরহানলে তাঁর ধৈর্য বিচ্যুত হত এবং তিনি বিভিন্ন শ্লোক বলতেন।

শ্লোক ৫৮

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৫৮ ॥

অমূনি—এই সমস্ত; অধন্যানি—অশুভ; দিন-অন্তরাণি—দিবা-রাত্র; হরে—হে হরি; ত্বৎ—তোমার; আলোকনম্—দর্শন; অন্তরেণ—ব্যতীত; অনাথ-বন্ধো—হে অনাথের বন্ধু; করুণা-এক-সিন্ধো—হে করুণার একমাত্র সমুদ্র; হা হন্ত—হায়; হা হন্ত—হায়; কথম্—কিভাবে; নয়ামি—আমি যাপন করব।

অনুবাদ

" 'হে হরি! হে অনাথের বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অশুভ দিবা-রাত্রসকল আমি কিভাবে যাপন করব?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের *কৃষ্ণকর্ণামৃত* (৪১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫৯

তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ দরশন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার দর্শন বিনা আমার এই অশুভ দিবা-রাত্র সকল কাটছে না। আমি জানি না কিভাবে আমি সময় অতিবাহিত করব। কিন্তু তুমি হচ্ছ অনাথের বন্ধু এবং করুণার সিন্ধু। অতএব দয়া করে তুমি আমাকে তোমার দর্শন দান কর।"

শ্লোক ৬০

উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই, অপ্রাকৃত অনুভূতির উদয় হওয়ার ফলে মহাপ্রভুর মন চঞ্চল হল। এই ভাবের গতি বোঝা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর চিত্ত দগ্ধ হত। তিনি কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন যে, কিভাবে তিনি তাঁর দর্শন পাবেন।

শ্লোক ৬১

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

ত্বৎ—তোমার; শৈশবম্—শৈশব; ত্রি-ভুবন—ত্রিভুবনে; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; ইতি—এভাবে; অবেহি—জান; মৎ-চাপলম্—আমার চাপল্য; চ—এবং; তব—তোমার; বা—অথবা;

মম—আমার; বা—অথবা; অধিগম্যম্—বোধগম্য; তৎ—তা; কিম্—কি; করোমি—করব; বিরলম্—নির্জনে; মুরলী-বিলাসি—হে মুরলী-বিলাসী; মুগ্ধম্—মনোমুগ্ধকর; মুখ-অম্বুজম্—মুখপদ্ম; উদীক্ষিতুম্—যথেষ্টভাবে দর্শন করার জন্য; ঈক্ষণাভ্যাম্—নেত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

" 'হে বংশী-বিলাসী কৃষ্ণ, তোমার শৈশব-মাধুর্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমি জানি, আর কেউ জানে না। এই নয়ন দিয়ে নির্জনে তোমার সুন্দর মুখকমল দর্শন করার জন্য এখন আমি কি করব?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের *কৃষ্ণকর্ণামৃত* (৩২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬২

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই, তুমি আমি জানি ।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত' আপনি ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"হে কৃষ্ণ, কেবল তুমি আর আমি তোমার মাধুর্যের বিক্রম জানি। তার প্রভাবে আমার এই চপলতা। আমি জানি না এখন আমি কি করব, আর কোথায় বা যাব। কোথায় গেলে আমি তোমাকে পাব? তুমি দয়া করে আমাকে তা বলে দাও।"

শ্লোক ৬৩

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ ।
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ—সবার কারণ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

নানা প্রকার ভাবের প্রাবল্যের ফলে তাদের কারও মধ্যে সন্ধি হল আর কারও মধ্যে বিরোধ হল এবং তার ফলে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হল। ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষ, অমর্ষ আদি ছিল সেই যুদ্ধের সৈন্য, আর ভগবৎ-প্রেমের উন্মাদনা ছিল সেই যুদ্ধের কারণ।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভিন্ন ভিন্ন হেতু থেকে উৎপন্ন সমশ্রেণীর ভাবদ্বয়ের যখন মিলন হয়, তখন তাকে বলা হয় *স্বরূপ-সন্ধি*। এক বা ভিন্ন কারণ থেকে

যখন বিরুদ্ধ ভাবের মিলন হয়, তখন সেই মিলনকে বলা হয় *ভিন্নরূপ-সন্ধি*। সমান অথবা ভিন্ন ভিন্ন দুটি রসের মিলনকে বলা হয় *সন্ধি*। *শাবল্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভাবের লক্ষণের সমন্বয়, যেমন—গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ, ত্রাস, নির্বেদ, ধৈর্য ও ঔৎসুক্য, এদের মিলনের ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় *শাবল্য*। তেমনই, কোন কিছু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, অথবা ঈপ্সিত বস্তু দর্শনে বিলম্ব যখন অসহ্য হয়, তাকে বলা হয় *ঔৎসুক্য*। এই ধরনের ঔৎসুক্যের ফলে মুখ শুষ্ক হয় এবং চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তখন হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয় এবং জোরে জোরে নিঃশ্বাস ও স্থৈর্য দেখা দেয়। তেমনই, মনের গভীর আসক্তি ও উত্তেজনার ফলে হৃদয়ের লঘুতাকে বলা হয় *চাপল্য*। তার ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অক্ষমতা, বাক্য প্রয়োগে অক্ষমতা এবং কুণ্ঠাহীন জেদ দেখা যায়। তেমনই, কেউ যদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, তখন অশ্লীল ও অপমানজনক বাক্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং এই ক্রোধকে বলা হয় *রোষ*। অপমানিত অথবা তিরস্কৃত হওয়ার ফলে কেউ যখন অসহিষ্ণু হয়, মনের সেই অবস্থাকে বলা হয় *অমর্ষ*। তখন স্বেদ, মাথাব্যথা, বিবর্ণতা, উদ্বেগ ও প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধানের আকুলতা দৃষ্ট হয়। আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়ন এগুলি হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ লক্ষণ।

শ্লোক ৬৪

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ—ইক্ষুবন,
গজ-যুদ্ধে বনের দলন ।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর দেহরূপ ইক্ষুবনে মত্ত হস্তীরূপ ভাবগণ প্রবেশ করল। সেখানে মত্ত হস্তীদের মধ্যে যুদ্ধ হল এবং তার ফলে সেই ইক্ষুবন বিধ্বস্ত হল। তখন মহাপ্রভুর দেহে উন্মাদনা দেখা দিল এবং তিনি তাঁর মন ও দেহে অবসাদ অনুভব করলেন। এই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি বলতে লাগলেন—

শ্লোক ৬৫

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৬৫ ॥

হে দেব—হে ভগবান; হে দয়িতে—হে প্রিয়তম; হে ভুবন-এক-বন্ধো—হে জগতের একমাত্র বন্ধু; হে কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; হে চপল—হে চঞ্চল; হে করুণা-এক-সিন্ধো—হে করুণার সিন্ধু; হে নাথ—হে প্রভু; হে রমণ—হে রমণ; হে নয়ন-অভিরাম—হে নয়নাভিরাম; হা হা—হায়; কদা—কখন; নু—নিশ্চিতভাবে; ভবিতা অসি—তুমি হবে; পদম্—আশ্রয়স্থল; দৃশোঃ মে—আমার নয়নযুগলের।

অনুবাদ

"'হে দেব! হে প্রিয়তম! হে জগদ্বন্ধু! হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম! হায়, কবে তুমি আবার আমার নয়নপথে উদিত হবে?'"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* (৪০) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৬

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, নানা গর্ব, ব্যাজ-স্তুতি,
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণস্মৃতির ফলে এভাবে উন্মাদনার লক্ষণ দেখা দেয়। ভাবাবেশে প্রণয়, মান, সোল্লুণ্ঠ বচন, গর্ব ও ব্যাজ-স্তুতি আদি প্রকাশ হয়। এভাবেই মহাপ্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করছিলেন, আবার কখনও তাঁর সম্মান করছিলেন।

তাৎপর্য

উন্মাদের বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলা হয়েছে—অত্যন্ত আনন্দ, আপদ ও বিরহ আদি থেকে উদ্ভূত হৃদভ্রমকে *উন্মাদ* বলে। *উন্মাদে* অট্টহাস, নটন (নর্তন), সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হয়। *প্রণয়ের* বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—সম্ভ্রম আদির স্পষ্টরূপে প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকলেও সেখানে সম্ভ্রম গন্ধস্পর্শ করে না, সেই রতিকে *প্রণয়* বলা হয়। *মানের* বিশ্লেষণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে বলেছেন—যে চিত্তদ্রব উৎকর্ষ প্রাপ্তির দ্বারা নব নব মাধুর্য অনুভব করায় এবং নিজের ভাব গোপনের জন্য বাইরে কৌটিল্য ধারণ করে, তা হচ্ছে *মান*।

শ্লোক ৬৭

তুমি দেব—ক্রীড়া-রত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, তুমি তোমার লীলাবিলাসে রত, আর সারা জগতের সমস্ত নারীদের নিয়ে তুমি তোমার অভীষ্ট অনুসারে ক্রীড়া কর। তুমি আমার দয়িত। দয়া করে আমার প্রতি তোমার চিত্ত নিবদ্ধ কর, কেন না আমার বহু ভাগ্যের ফলে তুমি আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছ।

শ্লোক ৬৮

ভুবনের নারীগণ, সবা' কর আকর্ষণ,
তাহাঁ কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ—চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"জগতের সমস্ত নারীদের তুমি আকর্ষণ কর এবং তাঁদের তুমি যথাযথভাবে নিযুক্ত কর। কৃষ্ণ! তুমি চিত্তহারী, তোমার মতো লম্পটকে কে সম্মান করতে পারে?

শ্লোক ৬৯

তোমার চপল-মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তা'তে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ-বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে কৃষ্ণ! তোমার মতি অত্যন্ত চঞ্চল। তুমি এক জায়গায় থাকতে পার না, কিন্তু তাতে তোমার কোন দোষ নেই। তুমি করুণাসিন্ধু, তুমি যে আমার পরাণের বন্ধু। তাই, তোমার প্রতি আমি কখনও রুষ্ট হতে পারি না।

শ্লোক ৭০

তুমি নাথ—ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু! তুমি বৃন্দাবনের প্রাণস্বরূপ। দয়া করে তুমি বৃন্দাবনের পরিত্রাণ কর। আমাদের অনেক কাজে আমাদের কোন অবকাশ নেই। তুমি আমার রমণ। আমাকে আনন্দ দান করার জন্য তুমি এসেছ। এটি তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস।

তাৎপর্য

বৈদগ্ধ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে—পটুতা, পাণ্ডিত্য, রসিকতা, চতুরতা, শোভা বা ভঙ্গী।

শ্লোক ৭১

মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি' গেলা জানি,
শুন, মোর এ স্তুতি-বচন ।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মুখের কথাকে নিন্দাবাদ বলে মনে করে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি জানি যে, সে চলে গেছে, কিন্তু তবুও কৃপা করে আমার স্তুতিবচন শ্রবণ কর—'তুমি আমার নয়নের অভিরাম। তুমি আমার ধন-প্রাণ। হায়, তুমি আবার আমাকে দর্শন দাও।' "

শ্লোক ৭২

স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরে স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ আদি বিবিধ বিকার দেখা দিচ্ছিল। এভাবেই তাঁর সারা দেহ অপ্রাকৃত আনন্দে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তার ফলে কখনও তিনি হাসছিলেন, কখনও কাঁদছিলেন, কখনও নাচছিলেন এবং কখনও গান করছিলেন। কখনও তিনি উঠে এদিকে ওদিকে ধাবিত হচ্ছিলেন এবং কখনও বা মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। চিত্তের চিন্ময়ভাবে ভাবিত হওয়াকে বলা হয় *স্তম্ভ*। এই অবস্থায় শান্ত মন প্রাণবায়ুতে স্থিত হয় এবং তখন বিভিন্ন দৈহিক বিকার দেখা যায়। এই সমস্ত লক্ষণগুলি উচ্চমার্গের ভক্তের শরীরে দৃষ্ট হয়। প্রাণের ক্রিয়া যখন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়, তাকে বলা হয় *স্তম্ভ*। হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ থেকে *স্তম্ভের* উৎপত্তি হয়। এই অবস্থায় বাক্‌শক্তি লোপ পায় এবং শরীরের অঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, *স্তম্ভ* হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থা। প্রাথমিক স্তরে দেহে অন্যান্য বহু লক্ষণ দেখা যায়। সেই লক্ষণগুলি প্রথমে সূক্ষ্ম, কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশ পায়। কেউ যখন কথা বলতে

অক্ষম হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিশেষত ভয়, ক্রোধ ও আনন্দের ফলে দেহ যখন কাঁপতে থাকে, তাকে বলা হয় *বেপথু* বা কম্প। আনন্দ, ভয় ও ক্রোধের ফলে যখন শরীর ঘামতে থাকে, তাকে বলা হয় *স্বেদ*। দেহের বর্ণের পরিবর্তনকে বলা হয় *বৈবর্ণ্য*। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়ের সমন্বয়ের ফলে *বৈবর্ণ্য* দেখা যায়। এই আবেগগুলি অনুভূত হলে, দেহ ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং রোগা হয়ে যায়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আনন্দ, ক্রোধ ও বিষাদের ফলে আপনা থেকেই যখন চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে তাকে বা হয় *অশ্রু*। আনন্দের ফলে যখন চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয়, সেই অশ্রু শীতল, কিন্তু ক্রোধ আদির ফলে যে অশ্রু নির্গত হয় তা উষ্ণ। উভয় অবস্থাতেই চক্ষু চঞ্চল হয়, রক্তিম হয় এবং চুলকানির অনুভূতি হয়। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়ের ফলে যখন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, তাকে বলা হয় *গদ্গদ*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের নাম গ্রহণের ফলে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হওয়ার বর্ণনা করে বলেছেন, *বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা*। হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়ের ফলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়, তাকে বলা হয় *পুলক*।

শ্লোক ৭৩

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি' করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয় ।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি' করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

মূর্ছিত অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করলেন। এখন তিনি গাত্রোত্থান-পূর্বক হুঙ্কার করে ঘোষণা করলেন, "মহদাশয় কৃষ্ণ এখন এসেছে।" এভাবেই কৃষ্ণের মধুর গুণাবলীর প্রভাবে, মহাপ্রভুর মনে নানা ভ্রম হয়। তখন নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি নিশ্চয় করেন।

শ্লোক ৭৪

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু ।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৭৪ ॥

মারঃ—কন্দর্প; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নু**—যদি; **মধুর**—মধুর; **দ্যুতি**—রশ্মিচ্ছটার; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **নু**—কি না; **মাধুর্যম্**—মাধুর্য; **এব**—এমন কি; **নু**—অবশ্যই; **মনঃ-নয়ন-অমৃতম্**—মন ও নয়নের অমৃত; **নু**—কি না; **বেণী-মৃজঃ**—বেণীর উন্মোচন দ্বারা; **নু**—কি না; **মম**—আমার;

জীবিত-বল্লভঃ—প্রাণবল্লভ; নু—কি না; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; অয়ম্—এই; অভ্যুদয়তে—প্রকাশিত হয়; মম—আমার; লোচনায়—নয়ন-যুগলের।

অনুবাদ

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোপীদের বললেন—"'হে সখী! সাক্ষাৎ কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বের মাধুর্যস্বরূপ, মন ও নয়নের অমৃতস্বরূপ, গোপীদের বেণীর উন্মোচন দ্বারা আনন্দ প্রদানকারী-স্বরূপ, আমার প্রাণবল্লভ-স্বরূপ—এই যে সাক্ষাৎ নন্দনন্দন, তিনি কি আমার দর্শনপথে আবার উদিত হবেন?'"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থ (৬৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৫

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্তিমান,
কি মাধুর্য স্বয়ং মূর্তিমন্ত ।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এই কি সাক্ষাৎ কামদেব? না কি মূর্তিমান আলোকচ্ছটা? নাকি স্বয়ং মূর্তিমান মাধুর্য? এ যেন আমার মন ও নয়নের আনন্দোৎসব। এ যেন আমার প্রাণবল্লভ। আমার নয়নের আনন্দ প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ—তিনি কি সত্যি সত্যিই আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হবেন?"

শ্লোক ৭৬

গুরু—নানা ভাবগণ, শিষ্য—প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায় ।
নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য, মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

গুরুদেব যেমন শিষ্যকে শাসন করে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষাদান করেন, তেমনই নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য, ক্রোধ আদি ভাবসমূহ গুরুরূপে মহাপ্রভুর মন ও দেহরূপ শিষ্যকে নিরন্তর নাচায়। এই নীতিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাল অতিবাহিত হয়।

শ্লোক ৭৭

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত গান দিয়ে এবং জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দ শ্রবণ করে মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে পরম আনন্দে রাত্রি ও দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস ।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে পরমানন্দপুরীর বাৎসল্য রস মুখ্য, রামানন্দ রায়ের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দ আদির শুদ্ধ দাস্যরস এবং গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের মাধুর্য রস মুখ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই চতুর্বিধ রস আস্বাদন করেন এবং তার প্রভাবে তাঁর ভক্তের বশীভূত হন।

তাৎপর্য

পরমানন্দ পুরী হচ্ছেন ব্রজের উদ্ধব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর ভাব ছিল বাৎসল্য প্রধান। তার কারণ হচ্ছে পরমানন্দ পুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেবের গুরুভ্রাতা। তেমনই, রামানন্দ রায়, যিনি হচ্ছেন কৃষ্ণলীলার অর্জুন ও বিশাখা, তিনি শুদ্ধ সখ্যরসে মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। গোবিন্দ আদির শুদ্ধ দাস্যরস আস্বাদন করেছিলেন। গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর আদি অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারাণীর মধুররসের ভাব আস্বাদন করেছিলেন। এই চার ভাবে মহাপ্রভু তাঁদের কাছ থেকে ভজন-সঙ্গসুখ-সেবা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৯

লীলাশুক মর্ত্যজন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে—কি ইহা বিস্ময় ।
তাহে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্বভাবোদয় ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তবুও তাঁর অপ্রাকৃত ভাবের উদ্‌গম হয়েছিল। সুতরাং, সেই সমস্ত ভাব যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হয়, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে? মধুর রসে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাই, তাঁর শ্রীঅঙ্গে অন্য সমস্ত ভাব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

লীলাশুক হচ্ছেন শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর গোস্বামী। তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ এবং পূর্বে তাঁর নাম ছিল শিলহণ মিশ্র। গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি চিন্তামণি নামক জনৈক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হন এবং এক সময়ে তার উপদেশ অনুসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তিনি *শান্তি-শতক* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবদের কৃপায় এক মহান বৈষ্ণবে পরিণত হন। এভাবেই তিনি বিল্বমঙ্গল গোস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি *শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত* গ্রন্থ রচনা করেন, যা বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখে লোকে তাঁকে *লীলাশুক* বলতেন।

শ্লোক ৮০

পূর্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হৈল ।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তিনটি অভিলাষ করেছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তা আস্বাদন করতে পারেননি। তাই, তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে, সেই তিন বস্তু আস্বাদন করলেন।

শ্লোক ৮১

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী ।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বয়ং সেই ভগবৎ-প্রেম আস্বাদন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সেই পন্থা শিক্ষাদান করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবৎ-প্রেমরূপ চিন্তামণি-ধনে ধনী মহাবদান্য অবতার। যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাকে তাকে সেই সম্পদ দান করেছেন। তাই তিনি হচ্ছেন দাতা-শিরোমণি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পদ হচ্ছে চিন্তামণি-সদৃশ ভগবৎ-প্রেম, তাই সেই ধনে তিনি ধনী। প্রাকৃত চিন্তামণির মতো প্রেম-চিন্তামণি বহু বহু ভগবৎ-প্রেম উৎপন্ন করেও প্রভুর ভাণ্ডারে তা পূর্ণরূপে বিরাজমান। আবার ভক্তেরাও মহাপ্রভু প্রদত্ত প্রেম-চিন্তামণি থেকে অনন্ত ভগবৎ-প্রেম জগতে বিস্তার করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করার মাধ্যমে সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার চেষ্টা করছে।

শ্লোক ৮২

এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মা পর্যন্ত এই গুপ্ত ভাব-সমুদ্রের এক বিন্দুও আস্বাদন করতে পারেন না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই সম্পদ সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করেছেন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে দয়ালু অবতার আর নেই। এমন দাতাও নেই। তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনা কে করতে পারে?

শ্লোক ৮৩

কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

এটি সর্বসমক্ষে বলার মতো কথা নয়, কেন না তা বলা হলেও কেউ তা বুঝতে পারবে না। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর দাসানুদাসের সঙ্গ লাভ করেছেন, তিনি এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ এই রাধানুগত ভাবতত্ত্ব বুঝতে পারে না। অযোগ্য পাত্রের কাছে তা প্রকাশ করলে তা সহজিয়া, বাউল প্রভৃতির বিকৃতভাবের মতো রূপান্তর লাভ করে। পণ্ডিতাভিমানীও এই রসে প্রবেশ করার যোগ্য নন। যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করলেই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৮৪

চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহাঁ বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সমস্ত রত্নের সার। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর ভাণ্ডারে সেই রত্নরাজি ছিল। তিনি তা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অল্প যেটুকু আমি শ্রবণ করেছি, তা আমি এই গ্রন্থে বর্ণনা করে সমস্ত ভক্তদের কাছে উপহার-স্বরূপ নিবেদন করলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রেখেছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে কণ্ঠস্থ করিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর মাধ্যমে জগতে প্রচার করেছিলেন। সুতরাং, শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা পৃথক পুস্তক আকারে লিখিত হয়নি। এই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চার নির্যাস, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে উদ্ভূত গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ৮৫

যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

যদি কেউ বলে যে, এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ শ্লোকের আকারে রচিত হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারবে না। তার উত্তরে আমি বলি যে, আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছি এবং আমার পক্ষে সকলের সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এবং যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন, তাঁরা জনসাধারণের মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টা করেন না। তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের সন্তুষ্টি বিধান করা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করা। যিনি তা বুঝতে সমর্থ হন, তিনি এই মহান অপ্রাকৃত গ্রন্থটি হৃদয়ঙ্গম করে তা আস্বাদন করতে সমর্থ হবেন। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষদের জন্য এই গ্রন্থ নয়। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও পণ্ডিত মহলে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবিলাসের কাহিনী পাঠ করা হয় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। তা কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত ভক্তদের জন্য।

শ্লোক ৮৬

নাহি কাহাঁ সবিরোধ, নাহি কাহাঁ অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহাঁ হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে কোন বিরোধ সিদ্ধান্ত নেই এবং অন্য কারও মতামতও এই গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়নি। আমার গুরুবর্গের কাছ থেকে যে সহজ বিবরণ আমি শ্রবণ করেছি, তাই আমি এই গ্রন্থে লিখেছি। যদি আমি অন্যদের ভাল লাগা বা না লাগার দ্বারা প্রভাবিত হতাম, তা হলে এই সরল সত্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

তাৎপর্য

মানুষের পক্ষে সব চাইতে সহজ পথ হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। জড় ইন্দ্রিয়প্রসূত বিচারের পন্থা সহজ নয়। পূর্বতন আচার্যদের প্রতি আসক্তির প্রভাবে যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভগবদ্ভক্তির পন্থা। গ্রন্থকার বলেছেন যে, অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ পরায়ণ মানুষদের মতামত তিনি বিবেচনা করেননি, কেন না নিরপেক্ষভাবে এই গ্রন্থ রচনা করা তা হলে সম্ভব হত না। অর্থাৎ, গ্রন্থকার এখানে বলেছেন যে, তিনি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রদান করেননি। তিনি কেবল গুরুবর্গ থেকে প্রাপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধিরই বর্ণনা করেছেন। তিনি যদি অপরের ভাল লাগা বা না লাগার দ্বারা প্রভাবিত হতেন, তা হলে তিনি এত মধুর এই বিষয়টিকে এত সরলভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না। প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থ ভক্তের পক্ষেই কেবল হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। সেই সমস্ত ঘটনাগুলি যখন লিপিবদ্ধ করা হয়,

তার ফলে ভক্তদের প্রভূত লাভ হয়। কিন্তু যারা ভক্ত নয়, তারা সেই বিষয়টিকে মোটেই বুঝতে পারে না। উপলব্ধির বিষয় এমনই, জাগতিক পাণ্ডিত্য এবং তার আনুষঙ্গিক অনুরাগ ও বিদ্বেষ অন্তরের ভগবৎ-প্রেমকে বিকশিত করতে পারে না। এই প্রেম পাণ্ডিত্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ৮৭

যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে কেউ যদি তা বুঝতে নাও পারে, কিন্তু বারবার শোনার ফলে তার হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রভাব যে, ধীরে ধীরে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম তখন হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারবার এই গ্রন্থ শ্রবণ করার জন্য, যার প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

শ্লোক ৮৮

ভাগবত—শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহাঁ শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্বজন ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যদি সমালোচনা করে বলে যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এত সংস্কৃত শ্লোক থাকার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হবে না। তার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত শ্লোকময় এবং তার টীকাও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত বুঝতে পারে। তা হলে মানুষ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বুঝতে পারবে না কেন? এই গ্রন্থে তো কেবল কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাও আবার বাংলা ভাষায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা হলে সকলে তা বুঝতে পারবে না কেন?

শ্লোক ৮৯

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।

থাকে যদি আয়ুঃ-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা আমি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছি এবং তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার বাসনা আমার রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি, তা হলে আমি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৯০

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি'—এ বড় বিস্ময় ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি এখন অতি বৃদ্ধ ও জরাতুর। লিখবার সময় আমার হাত কাঁপে। আমি কিছু স্মরণ রাখতে পারি না, চোখে ভালমতো দেখতে পাই না আর কানেও ভালমতো শুনতে পাই না। তবুও আমি লিখি এবং তা হচ্ছে একটি মস্ত বড় বিস্ময়।

শ্লোক ৯১

এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি' কিছু করিলুঁ বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা আমি সূত্রের মধ্যে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। যদি তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার আগেই আমার মৃত্যু হয়, তা হলে ভক্তদের কাছে অন্তত এই সূত্রকৃত লীলার সম্পদটুকু থেকে যাবে।

শ্লোক ৯২

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিচার ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এই অধ্যায়ে আমি সংক্ষেপে সূত্রাকারে মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করেছি। যা আমি বর্ণনা করিনি তা পরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যদি আমি ততদিন বেঁচে থাকি, তা হলে আমার মনোবাসনা অনুসারে আমি সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা করব।

শ্লোক ৯৩

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ ।
স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি' নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি ছোট ও বড়, সমস্ত ভক্তদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। আমি তাঁদের সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, তাঁরা যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে আমি যা জেনেছি তারই বর্ণনা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করেছি, সুতরাং এই রচনায় কোন দোষ নেই। এখানে আমি কিছু যোগ করিনি অথবা কিছু বাদও দিইনি।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যথা—ভজনবিজ্ঞ, ভজনশীল ও কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কৃষ্ণনামকারী। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার এই ত্রিবিধ ছোট-বড় সমস্ত ভক্তেরই কৃপা ভিক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, তর্কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভক্ত নিজেকে সিদ্ধান্তহীন অথচ রসিক ভক্ত মনে করে আমার পক্ষে লীলার সঙ্গে সিদ্ধান্তসমূহ লেখাকে পাণ্ডিত্য, ভক্তিহীনতা ও কুতর্ক-নিষ্ঠার ফল মনে করে দোষী স্থির করে পাছে কৃপা না করেন, এই আশঙ্কায় বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, আমার নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নেই। আমি যাঁদের পাদপদ্মে বিক্রীত, সেই শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীদামোদর-স্বরূপের কাছ থেকে শ্রীগৌরলীলাতত্ত্ব যা জেনেছি, তাই আমি লিখলাম।

শ্লোক ৯৪

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ ।
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥ ৯৪ ॥
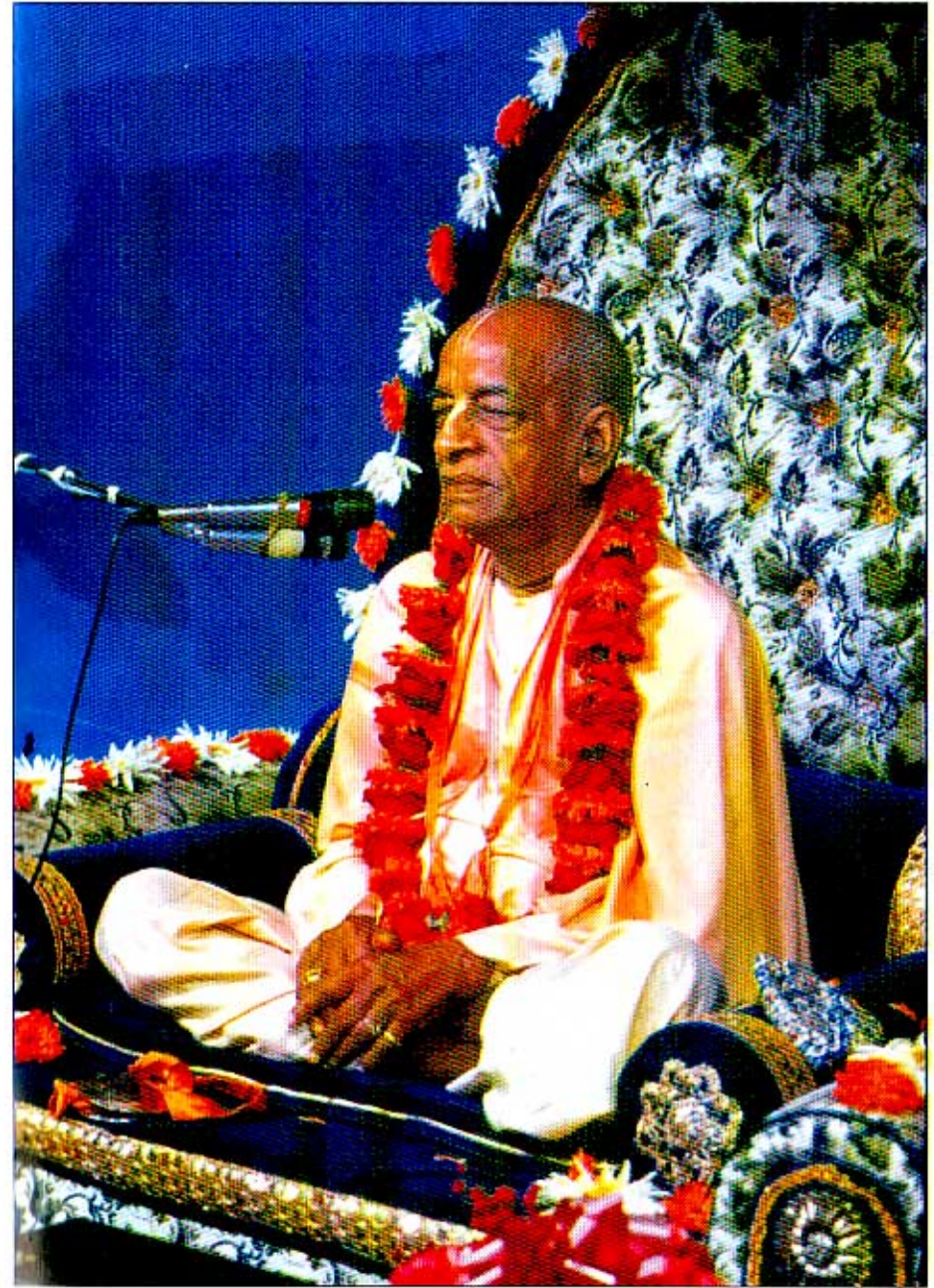
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
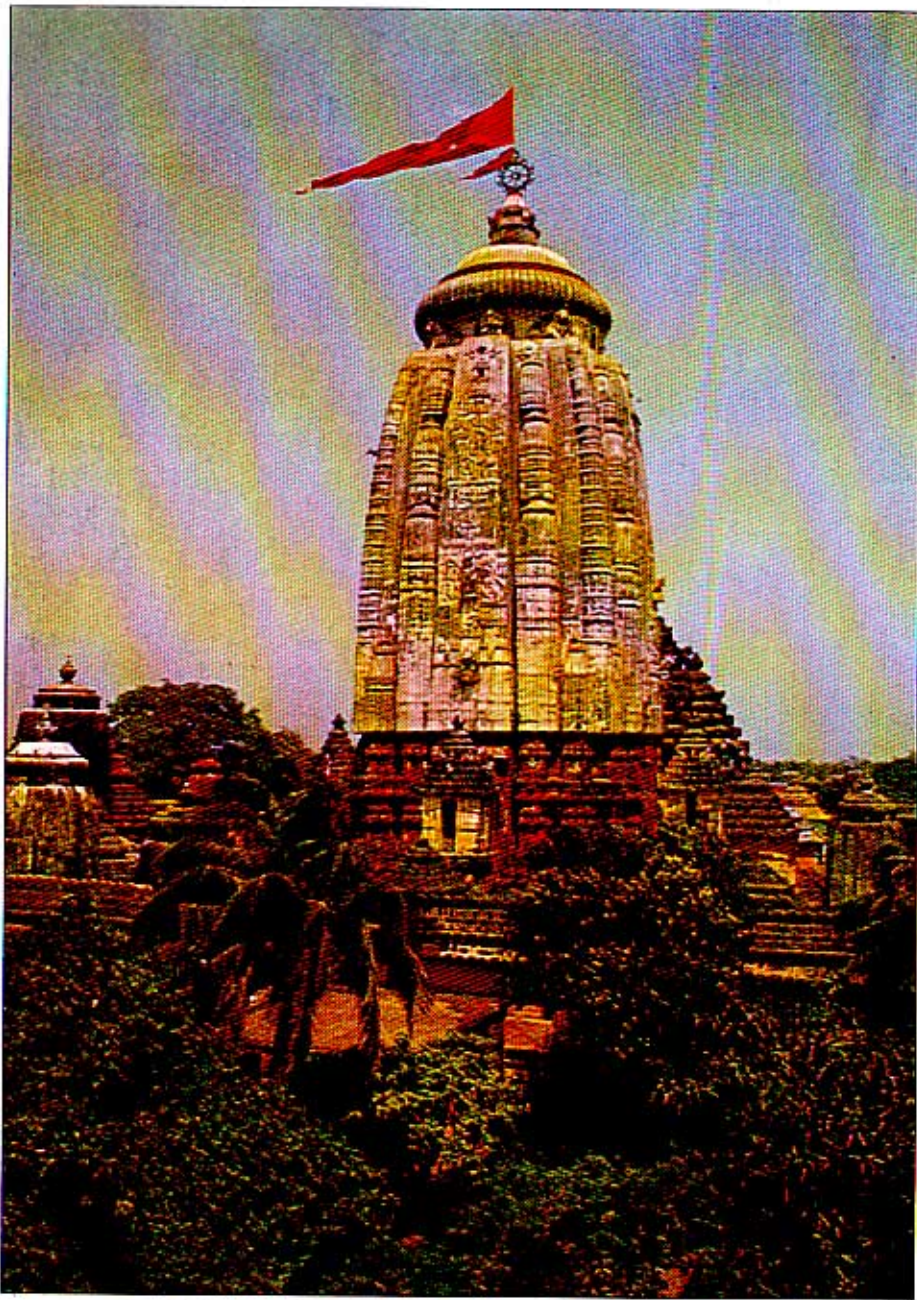
প্রসিদ্ধ শ্রীনীলাচলপুরীর জগন্নাথমন্দির, এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বহু দিব্যলীলাবিলাস প্রদর্শন করেছেন।
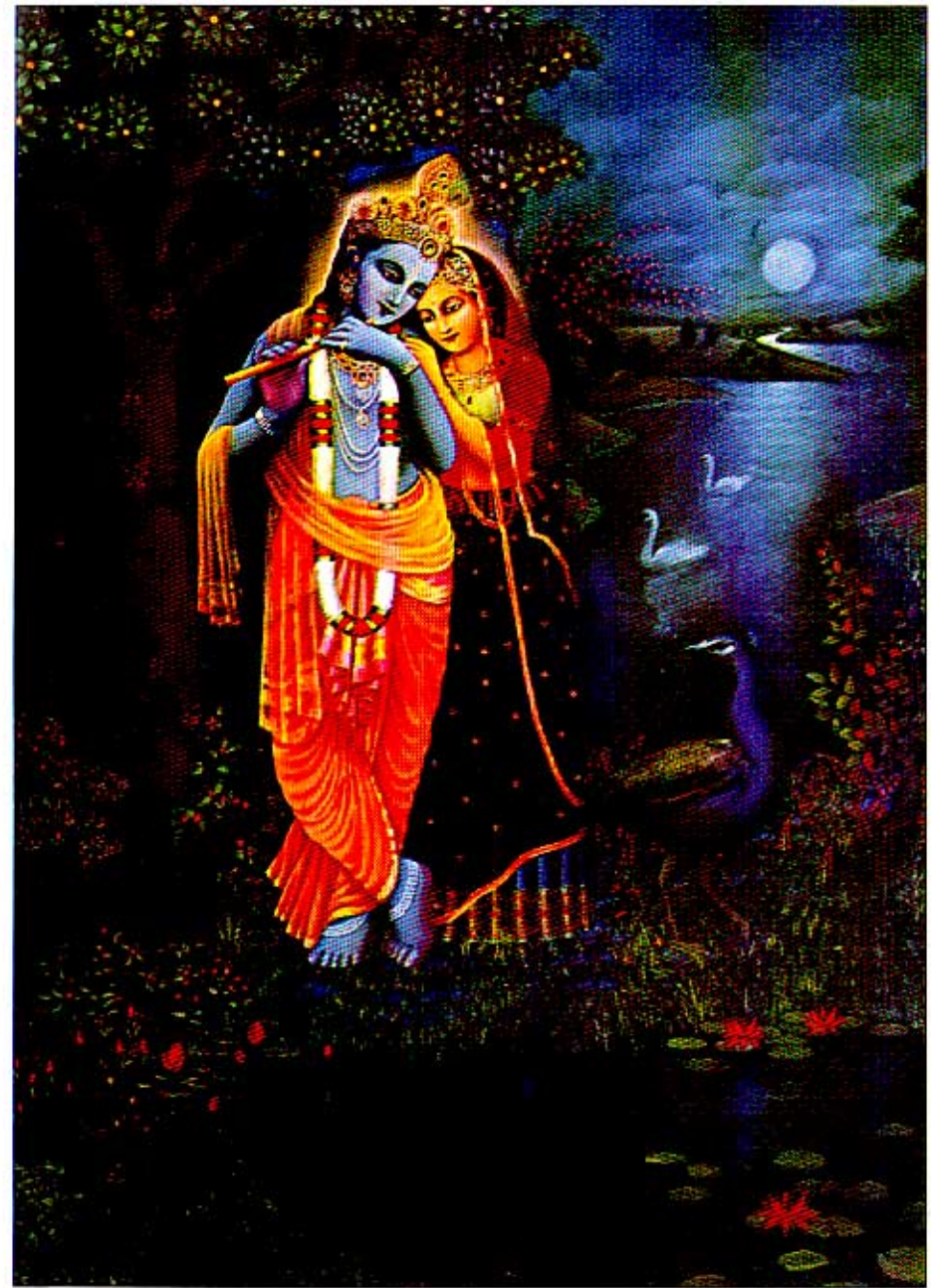
'আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের শ্রীপাদপদ্ম আমার সর্বস্ব ধন, সেই পরম কৃপালু শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হোন।'
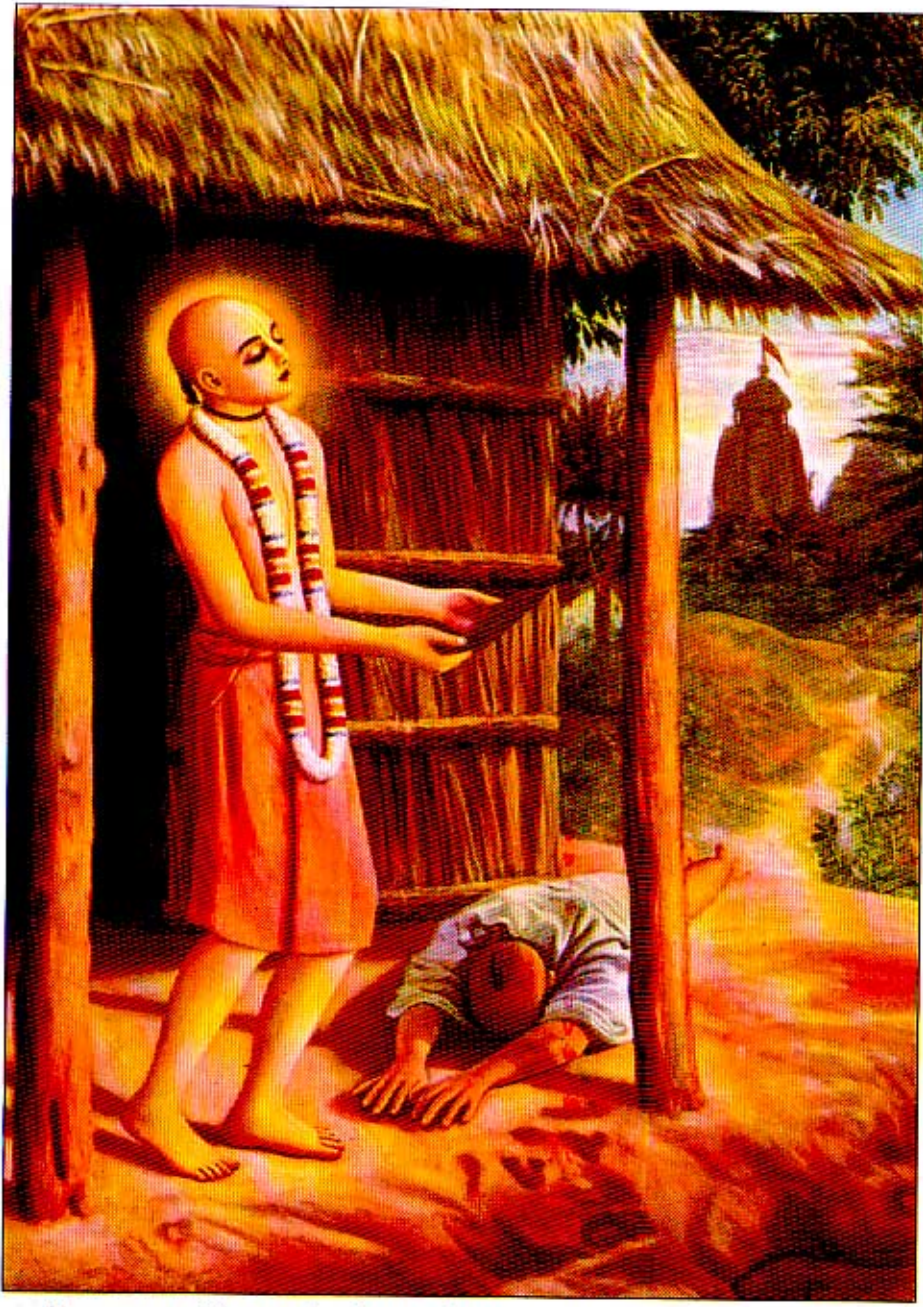
শ্রীল রূপ গোস্বামীর শ্লোকটি পাঠ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে সেখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী এসে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।
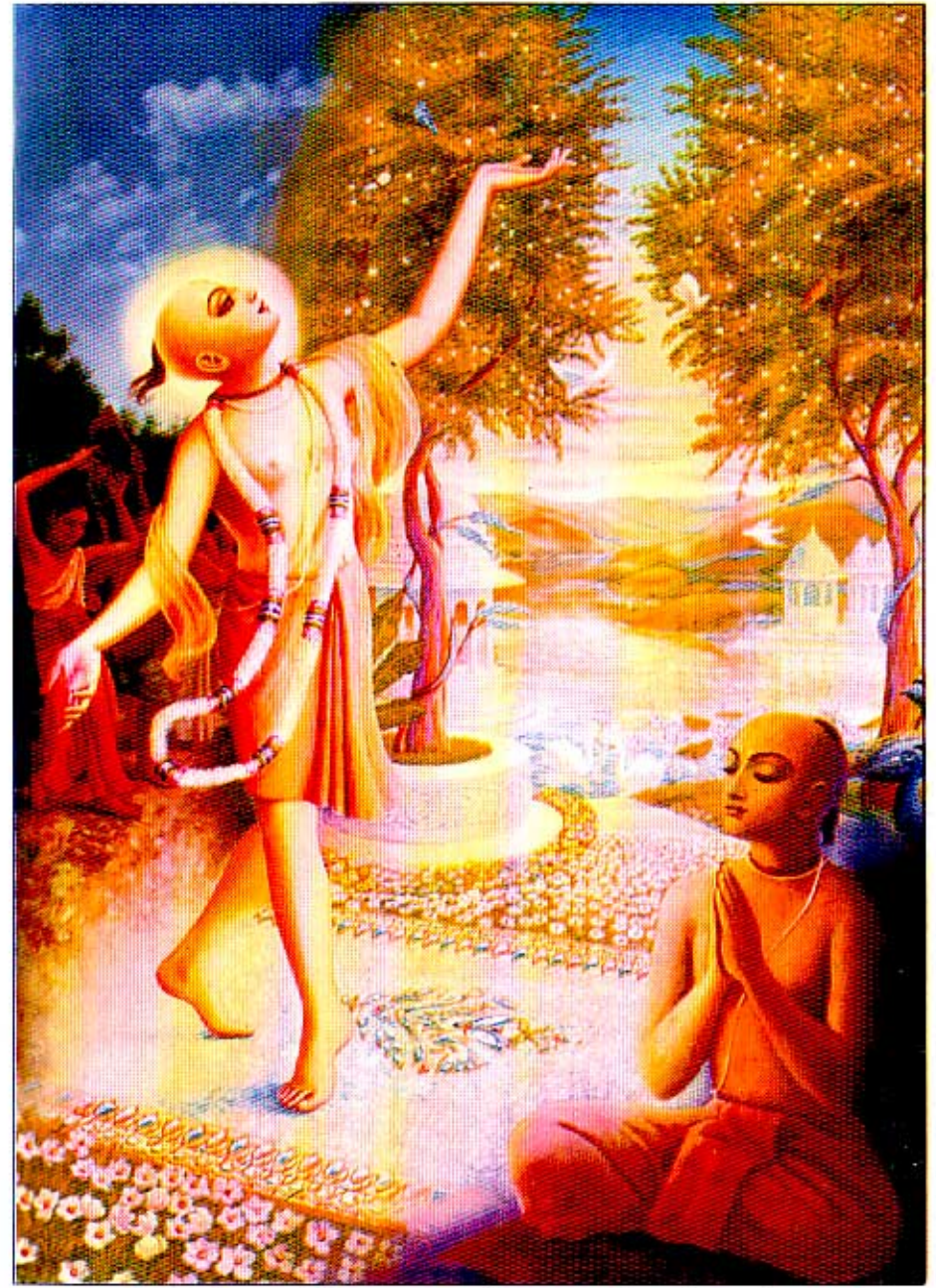
যখন শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শুনলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মানসে পথ সাজাতে শুরু করেছিলেন।
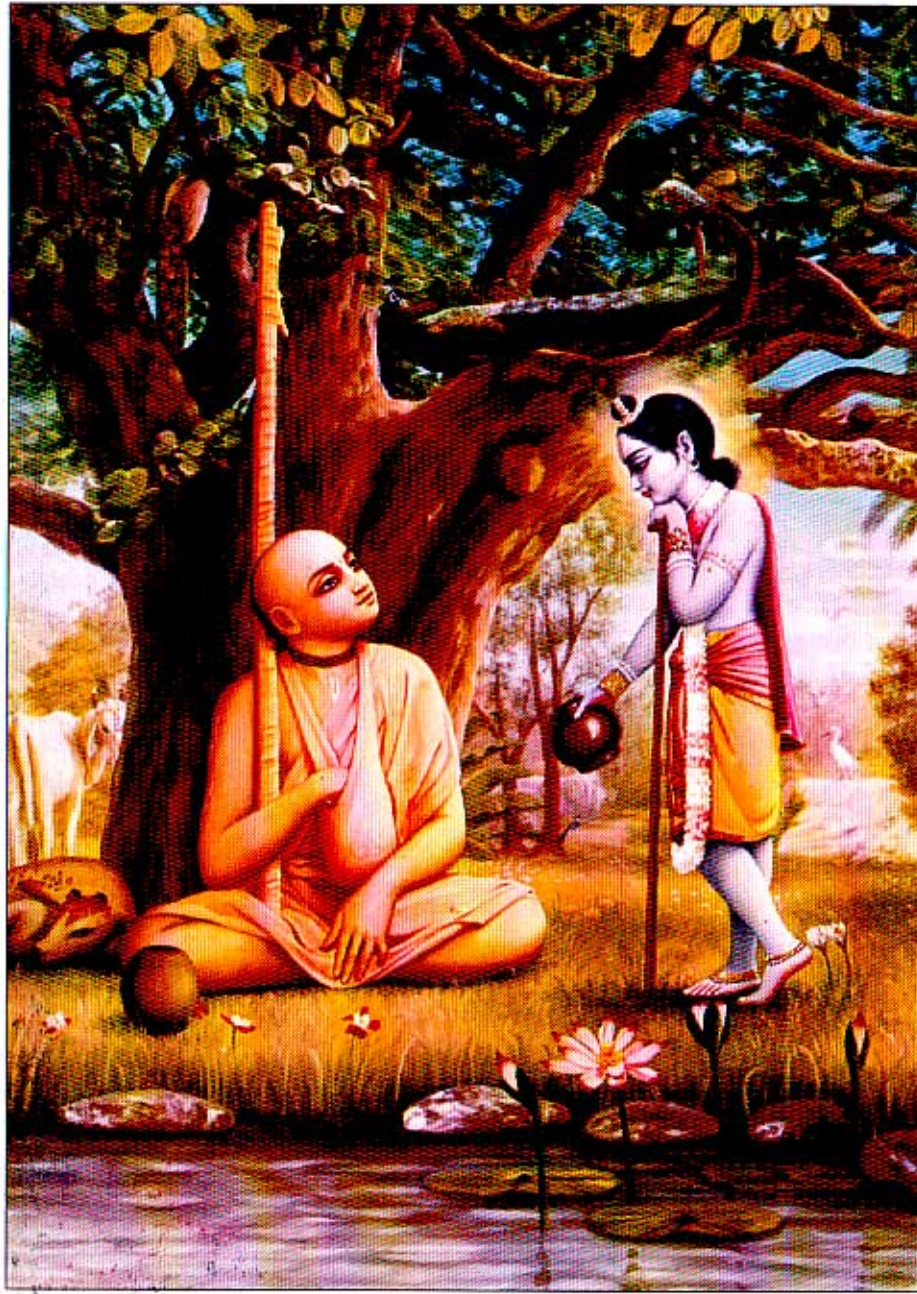
শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী যখন দেখলেন এক সুন্দর বালক এসে মধুর বাক্যে তাঁকে দুধ পান করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন বালকের রূপ ও হাসিমুখ দেখে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন।
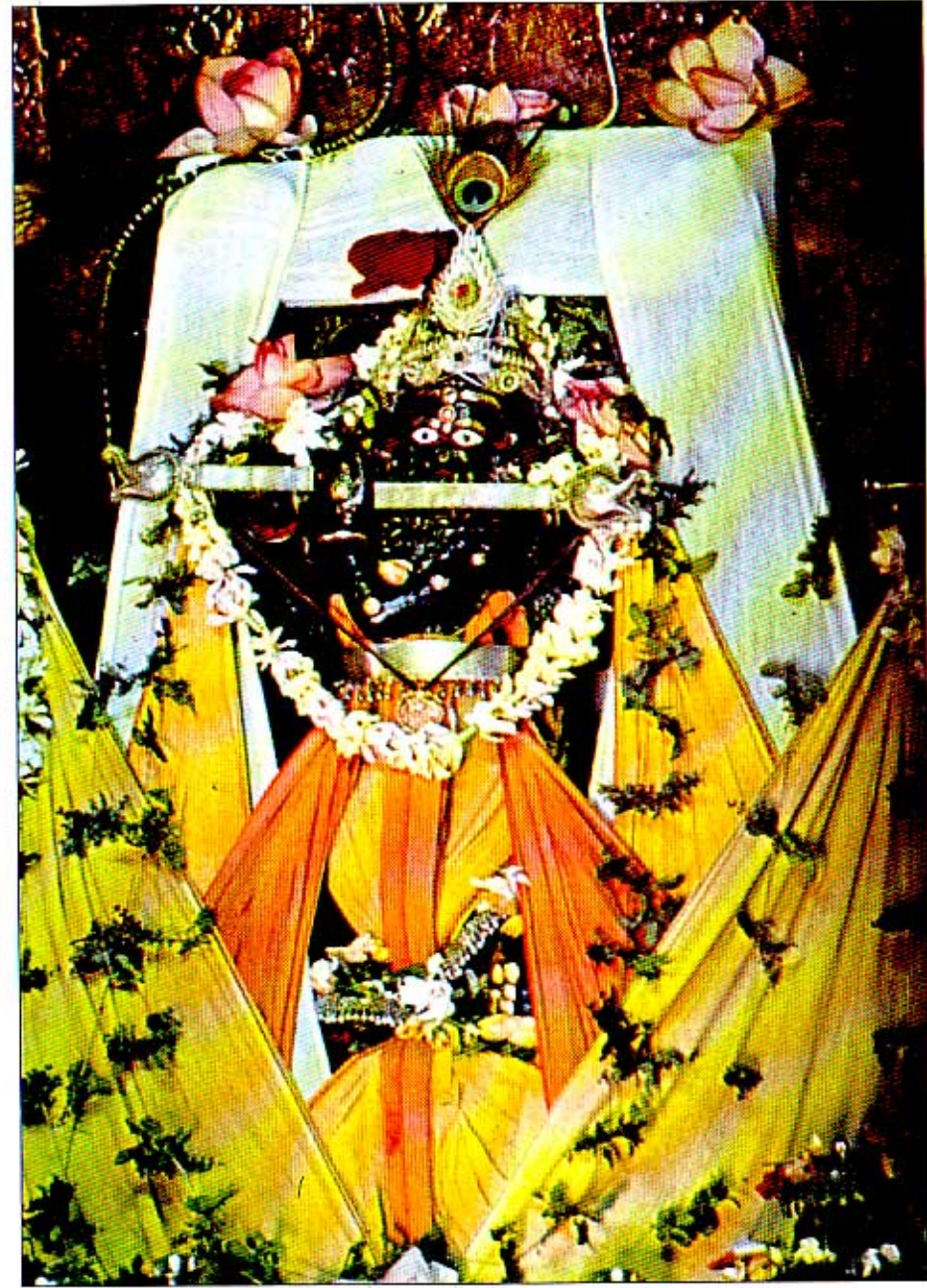
ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীকে দেওয়ার জন্য এক ভাঁড় ক্ষীর নিয়ে নিজ বসনের আঁচলে লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে বালেশ্বরে এই শ্রীবিগ্রহ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে বিখ্যাত হয়েছেন।
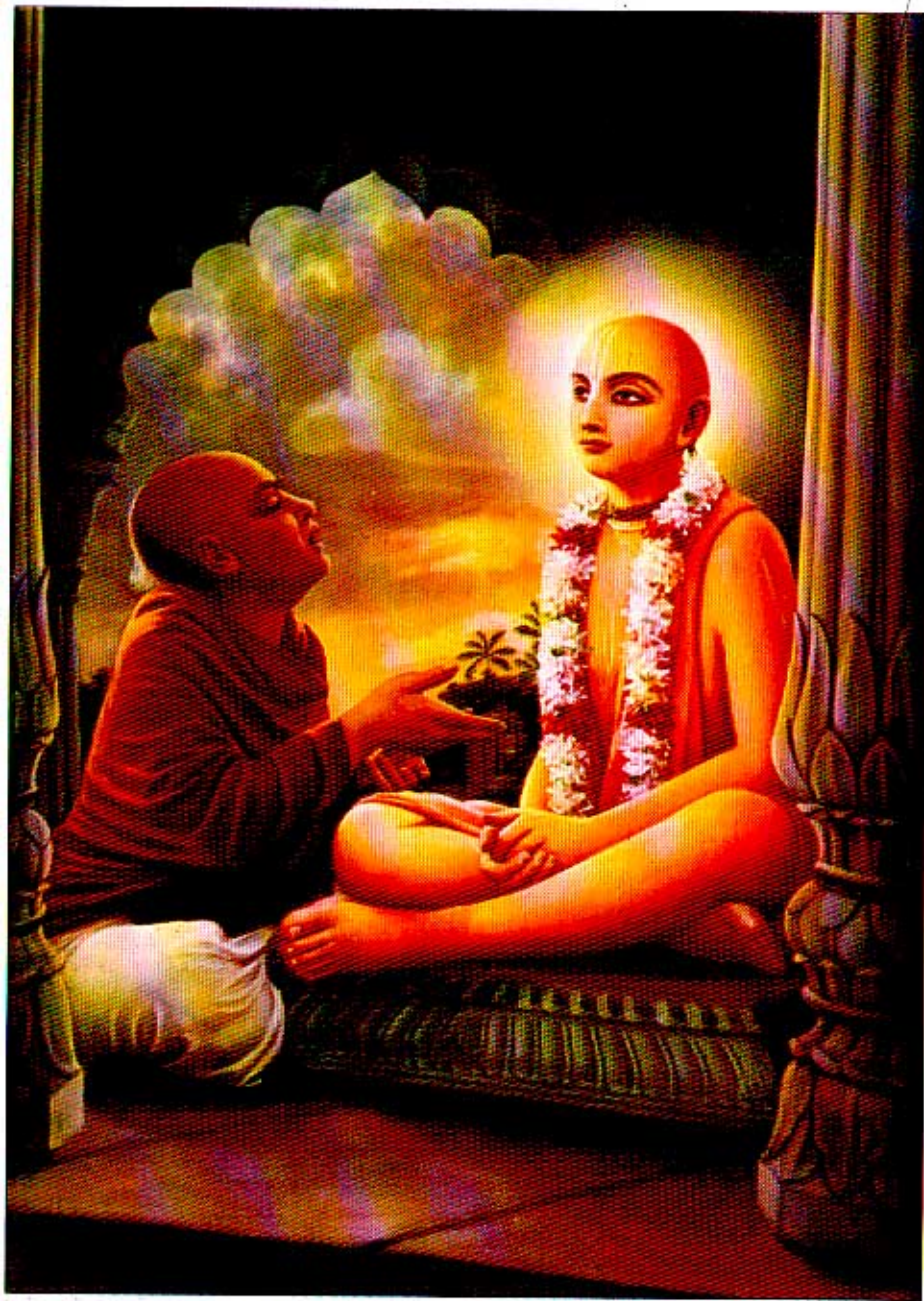
বেদান্ত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তুতি করে বলতে লাগলেন "তুমি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেছ এটি তোমার কাছে তেমন বড় কাজ নয়। কিন্তু তুমি যে আমাকে উদ্ধার করেছ এটি মস্তবড় আশ্চর্যের বিষয়। তর্কশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার ফলে ভক্তিবিমুখ হয়ে আমার চেতনা লৌহপিণ্ডের মতো কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তুমি আমাকে দ্রবীভূত করলে।"
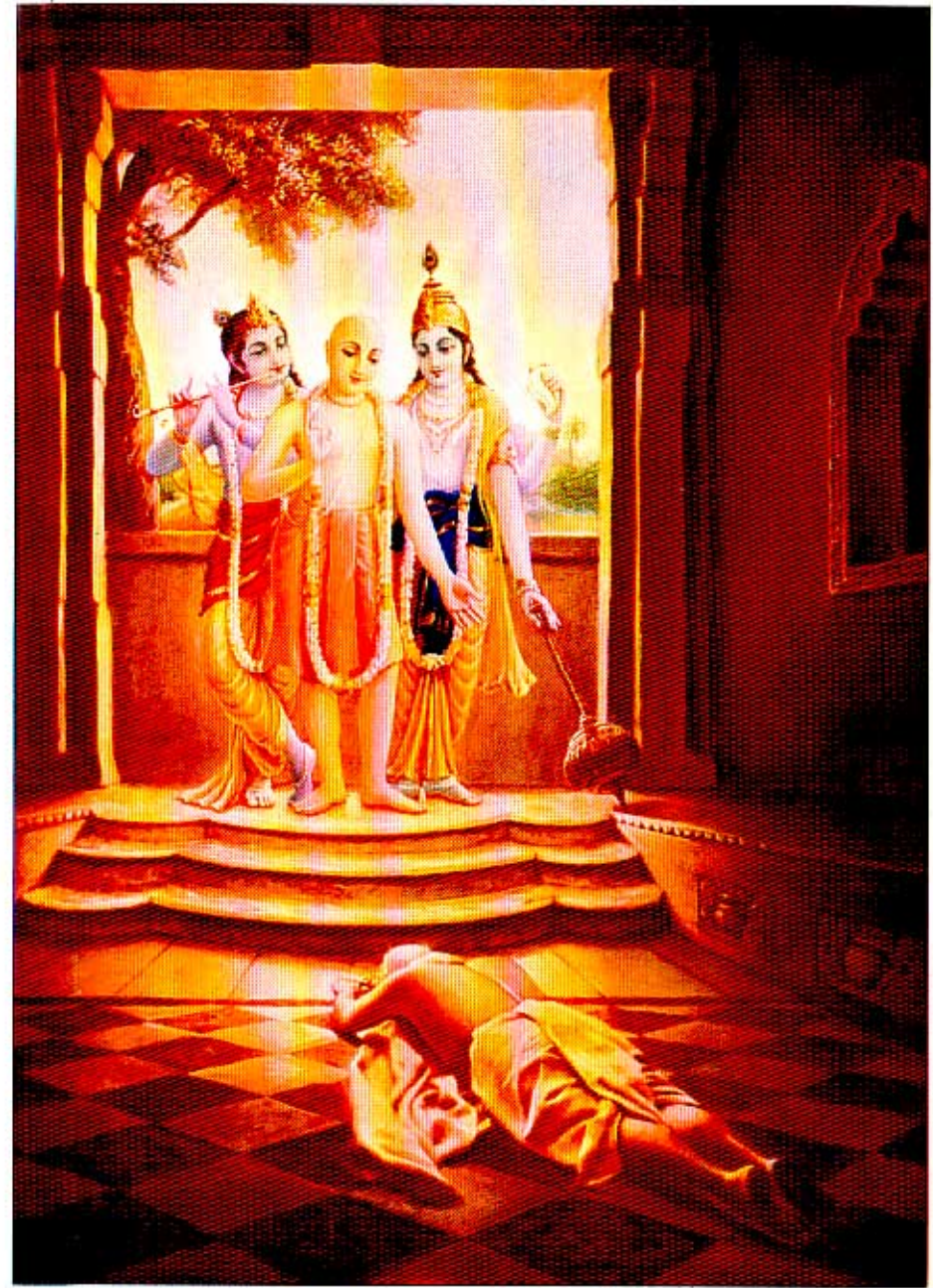
যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখালেন তিনিই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু, তখন মহাপ্রভুর সেই যুগপৎ রূপ দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হয়ে বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতে লাগলেন।

শ্রীরামানন্দ রায়কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দর্শন করালেন যে, তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ। তিনি রাধা-কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বৌদ্ধাচার্য অমেধ্য অন্ন খেতে দিলে এক বিশাল পাখী এসে অন্নসহ থালাটি নিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। তারপর থালাটি বৌদ্ধাচার্যের মাথায় পড়লে মাথা কেটে যায়।
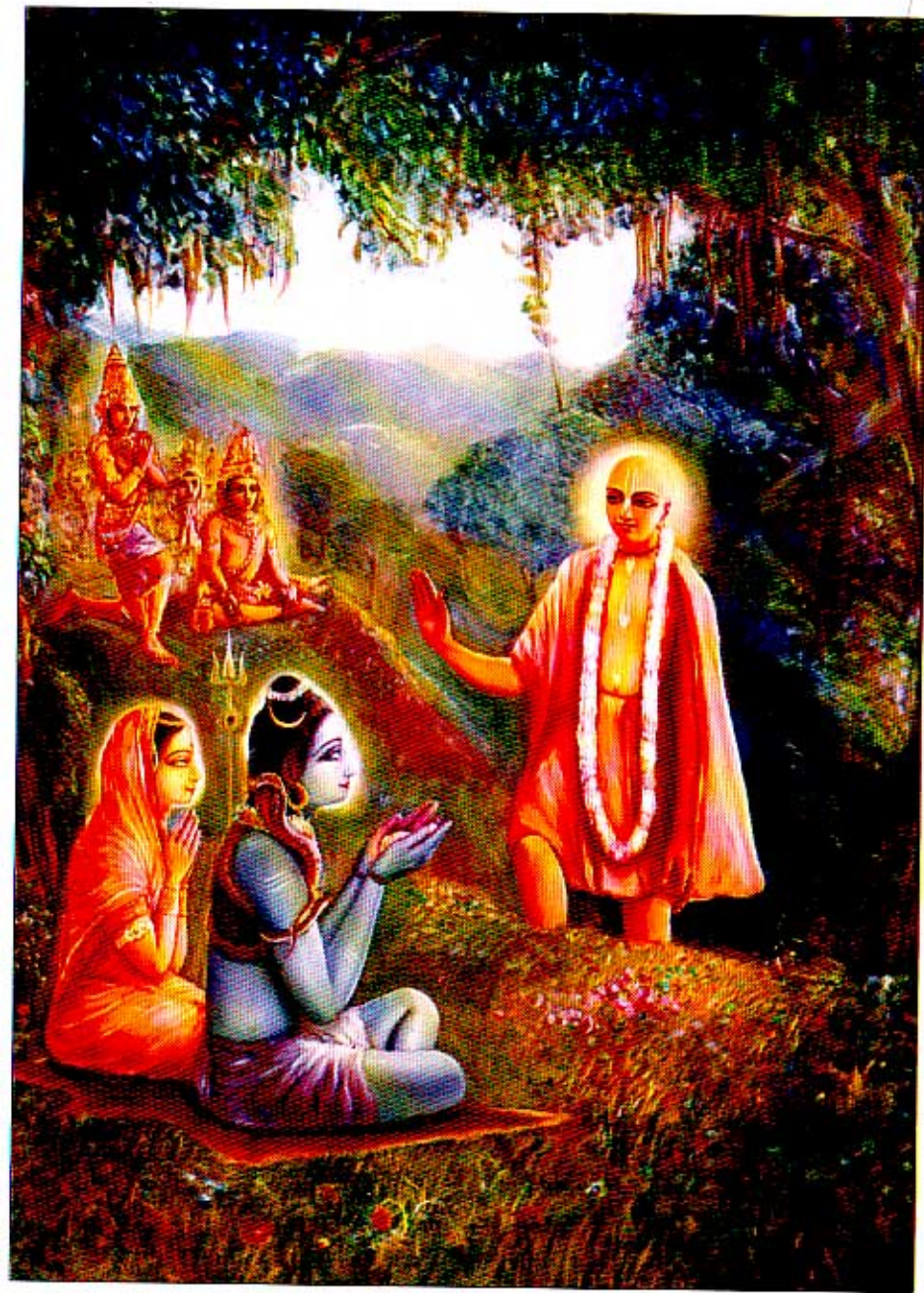
শ্রীশৈলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে শিব-দুর্গা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের গৃহে তিনদিন নিমন্ত্রণ করে ভিক্ষা দিয়েছিলেন এবং গূঢ় কথা আলোচনা করেছিলেন।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য (খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী) তাঁর অগাধ-পাণ্ডিত্য ও ভগবৎ সেবার জন্য ভারতের সর্বত্র পরিচিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁরই সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করতে মনোনীত করেন।
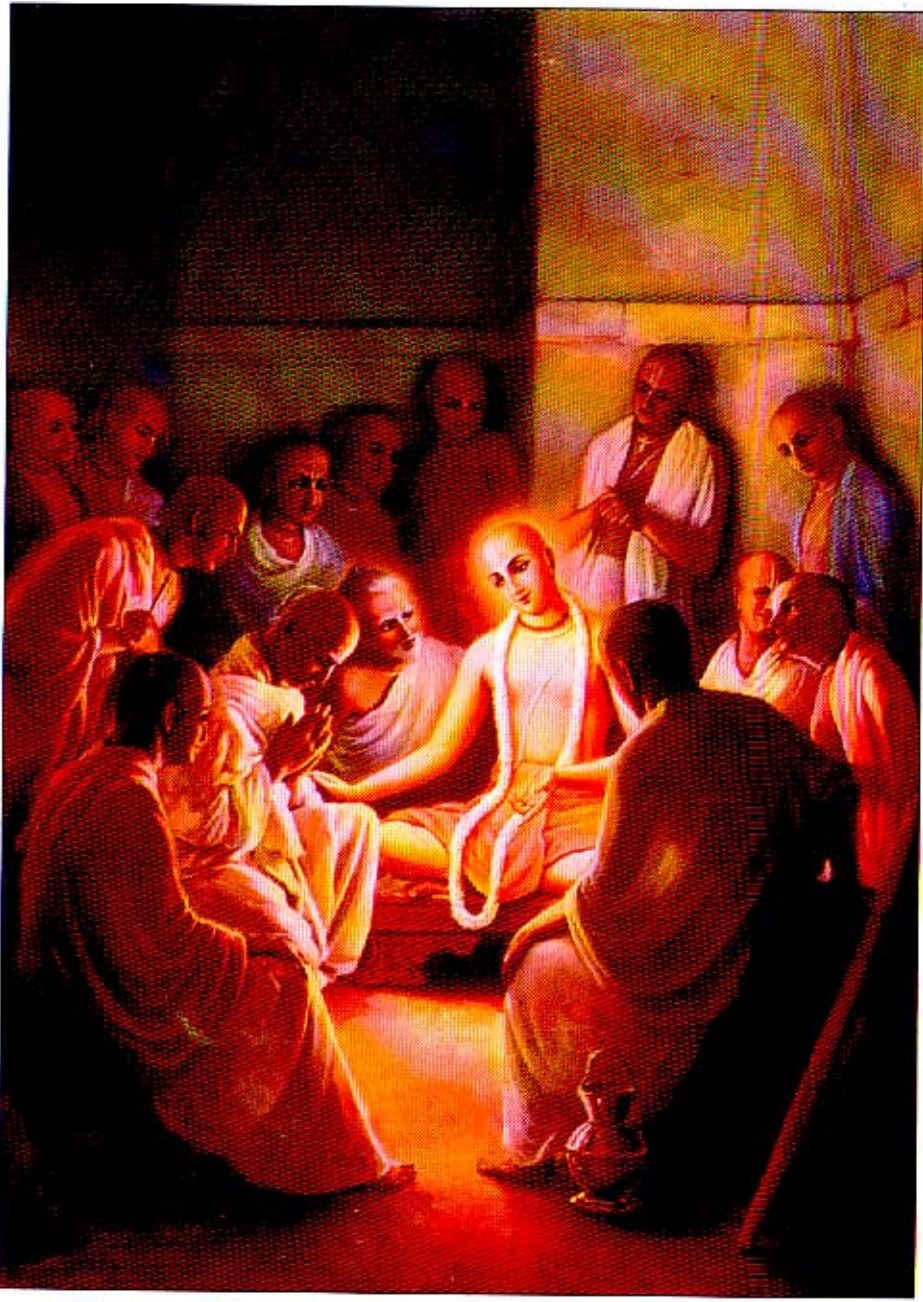
কাশীমিশ্রের অল্পপরিসর গৃহে অসংখ্য ভক্ত এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মবন্দনা করলেন এবং তাঁদের সবাইকে মহাপ্রভু প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করে আলাপ করতে লাগলেন।
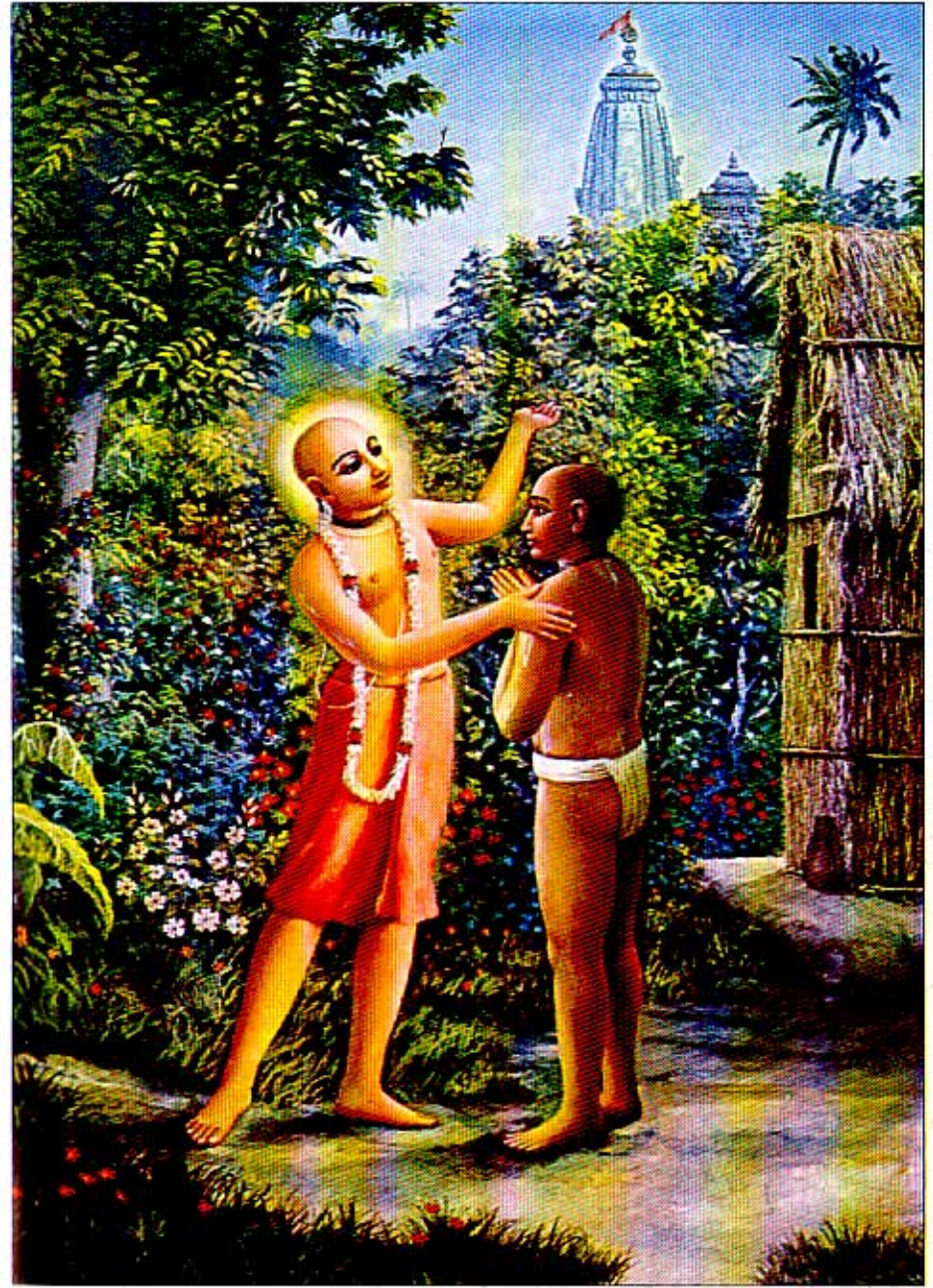
হরিদাস ঠাকুরকে ফুলতোটাতে নিভৃতে বাসা দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "এখানে থেকে তুমি হরিনাম কর। প্রতিদিন এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। রোজ জগন্নাথদেবের মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম কর এবং তোমার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দেব।"
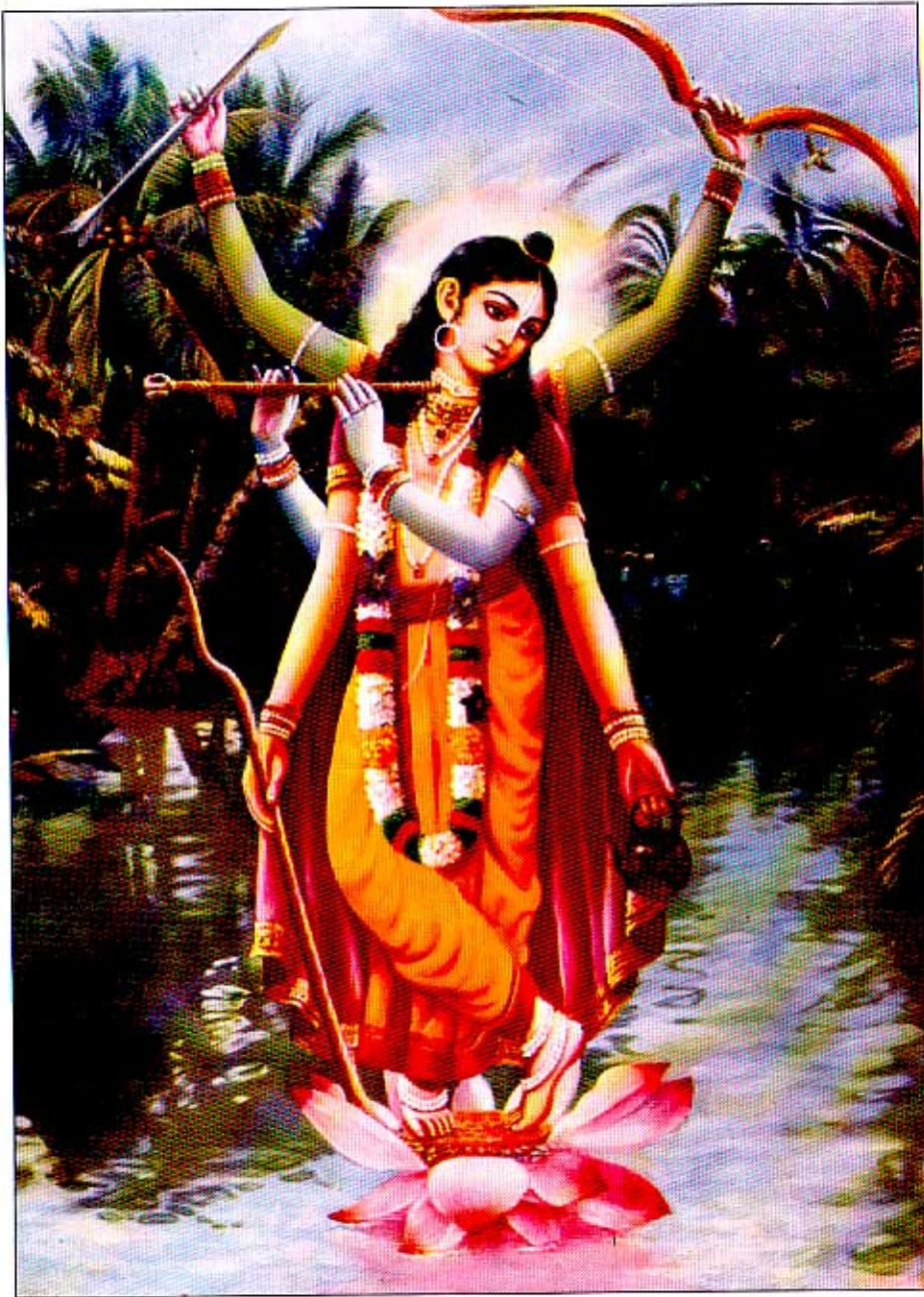
শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ষড়্ভুজরূপে দর্শন করেন। তীর-ধনুক হাতে রামচন্দ্র, বংশী হাতে কৃষ্ণ এবং দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে গৌরহরি।

শ্লোকার্থ

পরম্পরার ধারায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর, অদ্বৈত আচার্য প্রভুর এবং স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা ধারণ করার বাসনা করি। এভাবেই আমি তাঁদের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করার বাসনা করি।

শ্লোক ৯৫

পাঞা যাঁর আজ্ঞা-ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দজীর পূজারী হরিদাস প্রমুখ বৃন্দাবনের সমস্ত বৈষ্ণবদের আজ্ঞারূপ ধন প্রাপ্ত হয়ে, আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস-রূপ সমুদ্র-তরঙ্গের এক বিন্দুর এক কণা মাত্র বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ প্রলাপ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈতগৃহে প্রসাদসেবন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* তৃতীয় পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান করেছেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতে করতে নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে শান্তিপুরের পশ্চিম পারে আগমন করলেন। গঙ্গাকে যমুনার ভ্রমে স্তব করলে পর, অদ্বৈত প্রভু নৌকা নিয়ে মহাপ্রভুকে স্নান করিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে যান। সেখানে নবদ্বীপ ধামবাসীদের সঙ্গে ও শচীমাতার সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হয়। তাঁদের সঙ্গে মিলনান্তে শচীমাতা রন্ধন আদি করলে প্রভুদ্বয়ের ভোজনকালে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে অদ্বৈত প্রভুর নানাবিধ কৌতুক হয়। অপরাহ্নে সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন হতে থাকে। এভাবেই সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত হলে, ভক্তরা শচীমাতার সঙ্গে পরামর্শ করে মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তা অঙ্গীকার করে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুরের ভক্তদের ও শচীমাতাকে বিদায় জানিয়ে ছত্রভোগ-পথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করেন।

শ্লোক ১

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

ন্যাসম্—সন্ন্যাস-আশ্রম; **বিধায়**—বিধিপূর্বক গ্রহণ করে; **উৎপ্রণয়ঃ**—প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের উদ্‌গম; **অথ**—এভাবে; **গৌরঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবনে; **গন্তু-মনাঃ**—যাচ্ছেন বলে মনে করে; **ভ্রমাৎ**—আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমপূর্বক; **যঃ**—যিনি; **রাঢ়ে**—রাঢ়দেশে; **ভ্রমন্**—বিচরণ করতে করতে; **শান্তিপুরীম্**—শান্তিপুরে; **অয়িত্বা**—গিয়ে; **ললাস**—উপভোগ করেছিলেন; **ভক্তৈঃ**—ভক্তদের সঙ্গে; **ইহ**—এখানে; **তম্**—তাঁকে; **নতঃ অস্মি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গভীর কৃষ্ণানুরাগ-বশত বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমবশত তিনি রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতে থাকেন। তারপর যিনি শান্তিপুরে পৌঁছে তাঁর ভক্তদের সঙ্গ উপভোগ করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জয়! এবং শ্রীবাসাদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

চব্বিশ বৎসর-শেষ যেই মাঘ-মাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

চব্বিশ বৎসর বয়সের শেষে যে মাঘ মাস, তার শুক্লপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন ।
রাঢ়-দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর, গভীর কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমবশত তিনি উন্মত্তের মতো তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

রাঢ়-দেশ শব্দটি আসছে 'রাষ্ট্র' কথাটি থেকে। *রাঢ়* শব্দটি রাষ্ট্রের অপভ্রংশ। গঙ্গার পশ্চিম পারে গৌড়ভূমিকে *রাঢ়-দেশ* বলা হয়। তার আর এক নাম 'পৌণ্ড্রদেশ'। *পৌণ্ড্র* শব্দের অপভ্রংশ 'পেঁড়ো'। সেখানে রাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল।

শ্লোক ৫

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে ।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়-দেশে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করতে করতে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রাঢ়দেশে ভ্রমণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই দেশকে পবিত্র করেছিলেন।

শ্লোক ৬

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৬ ॥

এতাম্—এই; সঃ—এমন; আস্থায়—অবলম্বন করে; পর-আত্মনিষ্ঠাম্—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি; অধ্যাসিতাম্—উপাসিত; পূর্বতমৈঃ—পূর্বতন; মহদ্ভিঃ—আচার্য; অহম্—আমি; তরিষ্যামি—পার হব; দুরন্ত-পারম্—দুস্তর; তমঃ—অজ্ঞান অন্ধকার; মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি—মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের; নিষেবয়া—সেবার দ্বারা; এব—অবশ্যই।

অনুবাদ

"[অবন্তীদেশীয় ব্রাহ্মণ বললেন—] 'প্রাচীন মহাজনদের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা করে, আমি এই দুস্তর সংসাররূপ অজ্ঞান-অন্ধকার অতিক্রম করব।' "

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/২৩/৫৭) এই শ্লোকটি সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের চৌষট্টিটি অঙ্গের মধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন একটি। যাঁরা এই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁদেরই মুকুন্দের সেবার ফলে সংসার থেকে উদ্ধার হয়। কেউ যদি তাঁর কায়, মন ও বাক্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করেন, তা হলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। এটি কেবল পোশাক পরিবর্তন নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে, *অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ / স সন্ন্যাসী চ যোগী চ*—"যিনি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করেন, তিনিই হচ্ছেন সন্ন্যাসী।" পোশাকে নয়, কৃষ্ণসেবায় ঐকান্তিক ভাবটি হচ্ছে সন্ন্যাস।

পরাত্মনিষ্ঠা মানে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। *পরাত্মা* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।* যাঁরা সেবার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রচলিত রীতি অনুসারে ভক্তরা পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসীর বেশকে *পরাত্মনিষ্ঠা* বলে জ্ঞাপন করে মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্তন করেন। তাই, ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ত্রিদণ্ডের সঙ্গে চতুর্থ 'জীবদণ্ড'-ও সংযোগ করেছেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য না বুঝে একদণ্ড গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিবস্বামীরা পরবর্তীকালে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করে শঙ্করাচার্যের একদণ্ড-সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন করে সেবা-সেবকভাব বা মুকুন্দসেবা ছেড়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় প্রবর্তিত অষ্টোত্তরশতনামের সন্ন্যাসীদের পরিবর্তে দশনামীর ব্যবস্থাই

কেবলা-দ্বৈতবাদীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তৎকালীন প্রথানুসারে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তবুও সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ড-চতুষ্টয় একীভূতই ছিল, তা প্রচার করার জন্য তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত অবন্তীপুরে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর গীত গান করেছিলেন। *পরাত্মনিষ্ঠার* অভাবে যে একদণ্ড, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেননি। ত্রিদণ্ডিরা তিনটি দণ্ডের সঙ্গে জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিক ভক্তির বিধান করে থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিবিহীন একদণ্ডিরা নির্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁরা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হয়ে নির্বিশিষ্ট হওয়াকেই মুক্তি বলে মনে করেন। মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী বলে অবগত না হওয়ায় তাঁদের বাহ্যজ্ঞানে বিবর্ত উপস্থিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একদণ্ডি-সন্ন্যাসীর কোন কথাই বলা হয়নি; ত্রিদণ্ড ধারণকে সন্ন্যাস-আশ্রমের একমাত্র বেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সেই বাণীকেই বহু মানন করেছেন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত মায়াবাদীরা তা বুঝতে পারে না।

আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিখা-সূত্রযুক্ত সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করেন। একদণ্ডি মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শিখা-সূত্র বর্জন করেন। তাই তাঁরা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না এবং মুকুন্দ-সেবায় তাঁদের প্রবৃত্তি নেই। জড়-জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তাঁরা কেবল ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান। দৈব-বর্ণাশ্রম প্রবর্তনকারী আচার্যেরা আসুর-বর্ণাশ্রমের বোধ, চিন্তা আদি কিছুই গ্রহণ করেন না। জন্ম অনুসারে বর্ণ-বিভাগের নাম আসুর-বর্ণাশ্রম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করেছেন এবং মাধব উপাধ্যায়কে ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। এই মাধবাচার্য থেকে পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্মৃত্যাচার্য নামে পরিচিত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী পরবর্তীকালে ত্রিদণ্ডিপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবুও শ্রীল রূপ গোস্বামী *উপদেশামৃত* গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে ছয় বেগ দমন করে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"যিনি বাচোবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি গোস্বামী এবং তিনি সারা পৃথিবীকে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা কখনও মায়াবাদ-সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি এবং সেই জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীকে স্বীকার করেছিলেন, যিনি ছিলেন

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী। কিন্তু শ্রীধর স্বামীকে না জেনে, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও মনে করেন যে, শ্রীধর স্বামী ছিলেন মায়াবাদী একদণ্ডি-সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়।

শ্লোক ৭

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুর বচন ।
মুকুন্দ সেবন-ব্রত কৈল নির্ধারণ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—এই ভিক্ষুভক্তের বাণী অনুসারে মুকুন্দসেবাই হচ্ছে পরম ব্রত। এভাবেই তিনি এই শ্লোকটির স্বীকৃতি দান করেছিলেন।

শ্লোক ৮

পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মুকুন্দসেবায় আত্মনিবেদন করা। মুকুন্দসেবার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

এই সূত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, সন্ন্যাসবেশ গ্রহণপূর্বক মহাপ্রভু বলেছেন—এই ভিক্ষুক-বচনটি সাধু, কেন না এতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবারূপ ব্রত নির্ধারিত হয়েছে। এতে যে সন্যাসবেশ আছে, জড়াত্মনিষ্ঠা নিষেধপূর্বক পরাত্মনিষ্ঠাই এর তাৎপর্য হয়েছে। সন্যাসবেশ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচারনিষ্ঠার অনুকূলে একটি আকর্ষণ-স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকার আচার-আচরণ পছন্দ করতেন না, কিন্তু তিনি মুকুন্দ-সেবাকেই এর তাৎপর্য বলে উল্লেখ করেছেন। যে-কোন অবস্থায় দৃঢ় সংকল্পই হচ্ছে *পরাত্মনিষ্ঠা*। সেটিই প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ন্যাস-আশ্রম নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে মুকুন্দসেবার প্রতি দৃঢ় সংকল্পের ওপর।

শ্লোক ৯

সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া ।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস-আশ্রমের বেশ গ্রহণ করার পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনস্থ করেছিলেন যে, বৃন্দাবনে গিয়ে নিভৃত স্থানে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।

শ্লোক ১০

এত বলি' চলে প্রভু, প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্-জ্ঞান নাহি, কিবা রাত্রি-দিন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের পথে চলেছিলেন, তখন তাঁর শ্রীঅঙ্গে সমস্ত প্রেমোন্মাদনার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তখন তাঁর দিক-বিদিক জ্ঞান ছিল না, দিন-রাত্রির জ্ঞান ছিল না।

শ্লোক ১১

নিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন, মুকুন্দ,—তিন জন।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ, এই তিনজন তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রাঢ়দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন যিনি তাঁর প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দর্শন করছিলেন, তিনিই 'হরি' 'হরি' বলছিলেন। এভাবেই হরিনাম কীর্তন করার ফলে তাদের সমস্ত দুঃখ-শোক দূর হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে গোপ-বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি দিচ্ছিল।

শ্লোক ১৪

শুনি' তা-সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বল' 'বল' বলে সবারে শিরে হস্ত ধরি' ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

গোপ-বালকদের মুখে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাদের কাছে গিয়ে, তাদের মাথায় হাত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বল' 'বল'।

শ্লোক ১৫

তা'-সবার স্তুতি করে,—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলের স্তুতি করে বলেছিলেন, "তোমরা ভাগ্যবান। তোমরা হরিনাম শুনিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলে।"

শ্লোক ১৬

গুপ্তে তা-সবাকে আনি' ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোপনে সেই সমস্ত গোপ-বালকদের ডেকে এনে এবং প্রবন্ধ বলে, নিত্যানন্দ প্রভু তাদের শেখালেন—

শ্লোক ১৭

বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তোমাদের বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, তখন তাঁকে তোমরা গঙ্গার তীরের পথটি দেখিয়ে দিও।"

শ্লোক ১৮-১৯

তবে প্রভু পুছিলেন,—'শুন, শিশুগণ।
কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন' ॥ ১৮ ॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন গোপবালকদের জিজ্ঞাসা করলেন—"শুন, শিশুগণ! বল দেখি কোন্ পথে আমি বৃন্দাবনে যাব?" তখন শিশুরা সকলে তাঁকে গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল। প্রেমাবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু সেই পথে গমন করলেন।

শ্লোক ২০

আচার্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্যের ঠাঞি ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যখন গঙ্গাতীরপথে চললেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আচার্যরত্নকে (চন্দ্রশেখর আচার্যকে) বললেন, "তুমি এক্ষুণি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে যাও।"

শ্লোক ২১

প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে ।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বললেন, "আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গঙ্গাতীরের পথে শান্তিপুরে নিয়ে যাব এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু যেন সেখানে নৌকা নিয়ে সাবধানে অপেক্ষা করেন।"

শ্লোক ২২

তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন ।
শচী-সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"তারপর তুমি নবদ্বীপে গিয়ে শচীমাতা এবং অন্যান্য সমস্ত ভক্তদের নিয়ে ফিরে এস।"

শ্লোক ২৩

তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় ।
মহাপ্রভুর আগে আসি' দিল পরিচয় ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্যরত্নকে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে পাঠিয়ে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তাঁর আগমন বার্তা জানালেন।

শ্লোক ২৪

প্রভু কহে,—শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন ।
শ্রীপাদ কহে, তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন প্রেমাবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু কোথায় যাচ্ছেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবেন।

শ্লোক ২৫

প্রভু কহে,—কত দূরে আছে বৃন্দাবন ।
তেঁহো কহেন,—কর এই যমুনা দরশন ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বৃন্দাবন আর কত দূরে?" নিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিলেন—"এই দেখ! এই তো যমুনা নদী।"

শ্লোক ২৬

এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে ।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গারে যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গঙ্গার সন্নিকটে নিয়ে এলেন এবং মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গঙ্গানদীকে যমুনা বলে মনে করলেন।

শ্লোক ২৭

অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইলুঁ দরশন ।
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আহা, আমার কি সৌভাগ্য! আমি যমুনার দর্শন পেলাম।" এভাবেই গঙ্গাকে যমুনা মনে করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যমুনার স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৮

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী ।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ২৮ ॥

চিৎ-আনন্দ-ভানোঃ—চিৎ-শক্তি ও আনন্দের মূর্ত প্রকাশ; সদা—সর্বদা; নন্দ-সূনোঃ—নন্দ মহারাজের পুত্রের; পর-প্রেম-পাত্রী—পরম প্রীতি প্রদাত্রী; দ্রব-ব্রহ্ম-গাত্রী—চিৎ-সলিল স্বরূপা; অঘানাম্—সমস্ত পাপ ও অপরাধের; লবিত্রী—বিনাশকারিণী; জগৎ-ক্ষেম-ধাত্রী—জগতের সমস্ত মঙ্গল বিধানকারিণী; পবিত্রী-ক্রিয়াৎ—কৃপা করে পবিত্র কর; নঃ—আমাদের; বপুঃ—অস্তিত্ব; মিত্র-পুত্রী—হে সূর্যকন্যা।

অনুবাদ

"হে যমুনা! তুমি চিদানন্দের মূর্ত প্রকাশ। তুমি নন্দ মহারাজের পুত্রের প্রতি প্রেম প্রদান কর। তুমি চিৎ-সলিল স্বরূপা, কেন না তুমি সমস্ত পাপ ও অপরাধ বিনাশ কর। তুমি জগতের সমস্ত মঙ্গল প্রদায়িনী। হে সূর্যকন্যা, কৃপা করে তুমি আমাদের পবিত্র কর।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীকবিকর্ণপুরের *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে* (৫/১৩) লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ২৯

এত বলি' নমস্করি' কৈল গঙ্গাস্নান ।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রণতি নিবেদন করে গঙ্গাস্নান করলেন। তখন তাঁর কেবল একটি মাত্র কৌপীন ছিল, আর দ্বিতীয় কোন পরিধেয় বস্ত্র ছিল না।

শ্লোক ৩০

হেন কালে আচার্য-গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা ।
আইল নূতন কৌপীন-বহির্বাস লঞা ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু নতুন কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে, নৌকায় করে সেখানে এলেন।

শ্লোক ৩১

আগে আচার্য আসি' রহিলা নমস্কার করি' ।
আচার্য দেখি' বলে প্রভু মনে সংশয় করি' ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে কিছু সংশয় হল।

শ্লোক ৩২

তুমি ত' আচার্য-গোসাঞি, এথা কেনে আইলা ।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে কেন এলে? তুমি কিভাবে জানলে যে, আমি বৃন্দাবনে এসেছি?"

শ্লোক ৩৩

আচার্য কহে,—তুমি যাহাঁ, সেই বৃন্দাবন ।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন বললেন, "যেখানে তুমি, সেখানেই তো বৃন্দাবন! আমার এটি পরম সৌভাগ্য যে, তুমি এই গঙ্গাতীরে এসেছ।"

শ্লোক ৩৪

প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা ।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করেছে। সে আমাকে গঙ্গার তীরে নিয়ে এসে—বলেছে যে সেটি যমুনা।"

শ্লোক ৩৫

আচার্য কহে, মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন ।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে অভিযোগ করতে শুনে, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "নিত্যানন্দ প্রভু তোমাকে যা বলেছেন তা মিথ্যা নয়। বস্তুতই তুমি এখন যমুনায় স্নান করলে।"

শ্লোক ৩৬

গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার ।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করলেন যে, সেই স্থানে গঙ্গা ও যমুনার উভয় ধারাই প্রবাহিত হচ্ছে। পশ্চিমে যমুনা বইছে আর পূর্বদিকে গঙ্গা।

তাৎপর্য

এলাহাবাদে (প্রয়াগে) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে যমুনা এবং পূর্বদিক থেকে গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু পশ্চিম পাড়ে স্নান করেছিলেন, তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে যমুনাতেই স্নান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাহাঁ কৈলে স্নান ।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "তুমি পশ্চিমধারে যমুনায় স্নান করেছ এবং তার ফলে তোমার কৌপীন ভিজে গেছে। এখন এই ভিজা কৌপীন ছেড়ে শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর।"

শ্লোক ৩৮

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে তুমি গত তিন দিন ধরে উপবাসী। এখন আমার ঘরে চল এবং দয়া করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ কর।

শ্লোক ৩৯

একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক ।
শুখারুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গৃহে আমি এক মুঠো অন্ন রান্না করেছি, আর অতি সাধারণ কিছু ব্যঞ্জন, সূপ আর শাক রান্না করেছি।"

শ্লোক ৪০

এত বলি, নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘর ।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নৌকায় করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন করে অন্তরে খুবই আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৪১

প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্যাণী ।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য আপনি ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর স্ত্রী সব কিছু রান্না করেছিলেন এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু স্বয়ং সে সমস্ত ভোগ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে আদর্শ গৃহস্থের জীবন। পতি পরিশ্রম করে ভগবানের পূজার জন্য সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেন এবং পত্নী ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করার জন্য বিবিধ ভোগ রন্ধন করেন। তারপর পতি তা ভগবানকে নিবেদন করেন। তারপর আরতি অনুষ্ঠান হয় এবং অতিথি ও পরিবারের সমস্ত সদস্যদের মধ্যে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহস্থের গৃহে অন্তত একজন অতিথি অবশ্যই থাকে। আমার শৈশবে আমি দেখেছি যে, আমার পিতৃদেব প্রতিদিন অন্তত চার জন অতিথি সৎকার করতেন, যদিও তাঁর আয় খুব একটা বেশি ছিল না। তবুও প্রতিদিন অন্তত চারজন অতিথিকে খাওয়াতে তাঁর খুব একটা অসুবিধে হত না। বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহস্থ মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে গৃহের বাহিরে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতেন যে, কেউ যদি অভুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি যেন তাঁর গৃহে এসে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এভাবেই তিনি ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতে মানুষকে আহ্বান করতেন। কেউ যদি আসতেন, তা হলে গৃহস্থ তাঁকে প্রসাদ দিতেন এবং যথেষ্ট প্রসাদ না থাকলে তিনি নিজের ভাগটি তাঁদের দিতেন। তাঁর ডাকে যদি কেউ সাড়া না দিতেন, তা হলে গৃহস্থ মধ্যাহ্নভোজনে বসতেন। এভাবেই গৃহস্থের জীবনও হচ্ছে তপশ্চর্যার জীবন। সেই জন্যই গৃহস্থের জীবনকে বলা হয় গৃহস্থ-আশ্রম। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কৃষ্ণভক্তের গৃহস্থজীবনে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে হয়। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সংসার-জীবনকে বলা হয় গৃহমেধীর জীবন।' প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ জীবনই কেবল গৃহস্থজীবন—অর্থাৎ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আশ্রমে বাস করার জীবন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ছিলেন একজন আদর্শ গৃহস্থ এবং তাঁর গৃহ ছিল আদর্শ গৃহস্থ-আশ্রম।

শ্লোক ৪২

তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি' ।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত খাবার তিনটি সমান ভাগে ভাগ করলেন। তার একটি ভাগ শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ধাতুপাত্রে রাখা হল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *বাড়াইল* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সাধু শব্দটি বাংলার গৃহস্থের গৃহে ব্যবহৃত হয়। রান্নাকরা খাবারের একটি অংশ যখন নিয়ে নেওয়া হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা কমে যায়। কিন্তু *বাড়াইল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে বর্ধিত হওয়া। খাদ্যদ্রব্য যদি শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং ভগবানকে ও বৈষ্ণবদের নিবেদন করা হয়, তা হলে তা বর্ধিত হয়, কমে যায় না।

শ্লোক ৪৩

বত্রিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিন ভাগের একভাগ বাড়া হল ধাতুপাত্রে এবং অন্য দুভাগ বাড়া হল কলাপাতায়। সেগুলি ছিল বত্রিশা-আঠিয়া কলার পাতা এবং সেগুলি মাঝখান থেকে না চিরে আস্তই রাখা হয়েছিল।

শ্লোক ৪৪

মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শালী ধানের চাল খুব ভাল করে রান্না করে স্তূপাকারে রাখা হয়েছিল এবং তার মাঝখানে একটি গর্ত করে তাতে ঘি ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই অন্নের স্তূপের চারপাশে ছিল কলাপাতার ডোঙ্গায় নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মুগ ডাল।

শ্লোক ৪৫

সার্দ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার ।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

বিবিধ ব্যঞ্জনের মধ্যে ছিল পটোল, কুমড়ো, মানকচু, আদা কুচি দিয়ে তৈরি স্যালাড এবং বিবিধ প্রকারের শাক।

শ্লোক ৪৬

চই-মরিচ-সুখ্ত দিয়া সব ফল-মূলে ।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

চই-মরিচ দিয়ে পাঁচ প্রকার তিতো ও ঝালের সুখ্ত রান্না করা হয়েছিল, যার স্বাদ অমৃতের স্বাদকেও হার মানায়।

শ্লোক ৪৭

কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকী ।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

কচি নিমপাতা দিয়ে বেগুনভাজা হয়েছিল। ফুলবড়ি দিয়ে পটোল ভাজা হয়েছিল এবং কুমড়ো ও মানকচু ভাজা হয়েছিল।

তাৎপর্য

অভিজ্ঞ গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত এই সমস্ত উৎকৃষ্ট রান্নার পদগুলি আমাদের রান্নার বইয়ে যুক্ত করার জন্য আমাদের সম্পাদককে আমরা অনুরোধ করি।

শ্লোক ৪৮

নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর ।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

নারিকেলের শাঁস, ছানা ও শর্করা দিয়ে এক মধুর উপাদেয় খাবার তৈরি করা হয়েছিল। আর ছিল মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড—এই সবই প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয় ।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

মধুরাম্লবড়া এবং পাঁচ-ছয় প্রকার টক রান্না করা হয়েছিল। সব কিছুই অপর্যাপ্ত পরিমাণে রান্না করা হয়েছিল, যাতে সকলেই প্রসাদ পেতে পারে।

শ্লোক ৫০

মুদ্গবড়া, কলাবড়া, মাষবড়া, মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

মুগ ডালের বড়া, কলার বড়া, মাষবড়া রান্না করা হয়েছিল। আর ছিল বিবিধ প্রকারের মিষ্টি, ক্ষীরপুলি, নারিকেল ও বিবিধ প্রকারের পিঠা।

শ্লোক ৫১

বত্রিশা-আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড় ।
চলে হালে নাহি,—ডোঙ্গা অতি বড় দড় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

বত্রিশা-আঠিয়া কলার পাতা দিয়ে তৈরি ডোঙ্গায় সেই সমস্ত ব্যঞ্জন আদি বাড়া হয়েছিল। সেই কলাপাতার ডোঙ্গাগুলি এত বড় ও শক্ত ছিল যে, সেগুলি নড়বড় করছিল না বা কাত হয়েও পড়ছিল না।

শ্লোক ৫২

পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিঞা ।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনটি ভোগের চার পাশে একশোটি ডোঙ্গা বিবিধ ব্যঞ্জনে ভরে রাখা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৩

সঘৃত-পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা ।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত-দুগ্ধ রাখেত ধরিঞা ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ছিল ঘৃত মিশ্রিত মিষ্টান্ন। সেগুলি নতুন মাটির পাত্রে রাখা হয়েছিল। আর তিনটি পাত্রে খুব ঘন করে জাল দেওয়া দুধ রাখা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৪

দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্লকী ।
যতেক করিল' তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল দুধ মেশানো চিড়া-কলা এবং লাউ-দুধ। যত অন্ন-ব্যঞ্জন রান্না হয়েছিল, তা সমস্ত বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৫

দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

চাঁপাকলা, দই, সন্দেশ আদি বিবিধ প্রকারের মিষ্টান্ন, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, সেই সমস্ত মাটির পাত্রে ভরে দুপাশে রাখা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৬

অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী ।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি' ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

অন্ন-ব্যঞ্জনের উপরে তুলসীর মঞ্জরী দেওয়া হয়েছিল এবং তিনটি জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৭

তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন ।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

নরম সাদা কাপড় দিয়ে তিনটি আসন পাতা হয়েছিল। এভাবেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করানো হল।

শ্লোক ৫৮

আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল ।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই ভোগ নিবেদন করার পর ভোগ-আরতির সময় অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে পাঠালেন এবং দুই প্রভুর সঙ্গে সকলে এসে আরতি দেখলেন।

শ্লোক ৫৯

আরতি করিয়া কৃষ্ণে করা'ল শয়ন ।
আচার্য আসি' প্রভুরে তবে কৈলা নিবেদন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

আরতির পর শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন দেওয়া হল। তারপর অদ্বৈত আচার্য প্রভু এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—

শ্লোক ৬০

গৃহের ভিতরে প্রভু করুন গমন ।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু, অনুগ্রহ করে গৃহের ভিতরে আসুন।" তখন দুই ভাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রসাদসেবা করতে এলেন।

শ্লোক ৬১

মুকুন্দ, হরিদাস—দুই প্রভু বোলাইল ।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু তখন মুকুন্দ ও হরিদাসকে তাঁদের সঙ্গে আসতে বললেন। কিন্তু মুকুন্দ ও হরিদাস উভয়েই করজোড়ে তাঁদের বললেন।

শ্লোক ৬২

মুকুন্দ কহে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে ।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ বললেন, "হে প্রভু, আমার এখনও কিছু কৃত্য বাকি রয়েছে। আমি পরে প্রসাদ গ্রহণ করব, এখন আপনারা ঘরে যান।"

শ্লোক ৬৩

হরিদাস কহে—মুঞি পাপিষ্ঠ অধম ।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর বললেন, "আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ও অধম। আমি পরে বাইরে দাঁড়িয়ে এক মুঠো প্রসাদ গ্রহণ করব।"

তাৎপর্য

হিন্দু এবং মুসলমানেরা যদিও বন্ধুর মতো একত্রে বাস করতেন, কিন্তু তবুও তাঁদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাতন্ত্র্য ছিল। মুসলমানদের যবন বলে মনে করা হত এবং তাদের খেতে ডাকা হলে খাবার দেওয়া হত বাড়ির বাইরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু যদিও হরিদাস ঠাকুরকে তাঁদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি বাড়ির বাইরে এক মুঠো প্রসাদ পাব।" যদিও হরিদাস ঠাকুর ছিলেন একজন অতি উত্তম বৈষ্ণব, যাঁকে অদ্বৈত আচার্য প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকৃতি দান করেছিলেন, তবুও সমাজের শান্তি ব্যাহত না করার জন্য তিনি মুসলমানরূপে নিজেকে হিন্দুসমাজ থেকে দূরে রেখেছিলেন। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, তিনি বাড়ির বাইরে প্রসাদ পাবেন। যদিও তিনি ছিলেন অন্য সমস্ত মহান বৈষ্ণবদের সমপর্যায়ভুক্ত মহাত্মা, তবুও তিনি নিজেকে পাপিষ্ঠ ও অধম বলে বিবেচনা করেছিলেন। পারমার্থিক মার্গে অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত দীন ও বিনীত ভাব প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৬৪

দুই প্রভু লঞা আচার্য গেলা ভিতর ঘরে ।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে অদ্বৈত আচার্য প্রভু ঘরের ভিতরে গেলেন। প্রসাদের আয়োজন দেখে দুই প্রভু, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হয়েছিলেন, কেন না অনেক রকমের খাদ্যদ্রব্য খুব সুন্দরভাবে রান্না করে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সব রকমের ভোগ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই রান্না করা হয়, মানুষদের জন্য নয়। কিন্তু ভক্তরা মহানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত সেই সকল দ্রব্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৬৫

ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি তখন বলেছিলেন, "এই ধরনের অন্ন যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করান, জন্ম-জন্মান্তরে আমি তাঁর চরণ আমার মস্তকে ধারণ করি।"

শ্লোক ৬৬

প্রভু জানে তিনভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য ।
আচার্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরে ঢুকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনটি ভোগ দর্শন করে মনে করেছিলেন যে, সেই সবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য। কিন্তু, তিনি অদ্বৈত আচার্যের অভিপ্রায় বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সম্বন্ধে বলেছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু যে তিনটি ভোগ সমান করে বেড়েছিলেন, তার মধ্যে ধাতু-পাত্রটির উপর কৃষ্ণের ভোগ ছিল, অপর দুটি কলাপাতায় দুটি ভোগ ছিল। ধাতু-পাত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ, যা শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বৈত আচার্য প্রভু স্বয়ং নিবেদন করেছিলেন। কলাপাতার ভোগ-দুটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য অনিবেদিত অবস্থায় ছিল। তা অদ্বৈত আচার্য প্রভু মনে মনে রেখেছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর কাছে ওই কথা বলেননি। সুতরাং, মহাপ্রভু তিনটি ভোগই কৃষ্ণের নৈবেদ্য বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৬৭

প্রভু বলে—বৈস তিনে করিয়ে ভোজন ।
আচার্য-কহে—আমি করিব পরিবেশন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এস আমরা তিনজন একসঙ্গে বসে প্রসাদসেবা করি।" কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "আমি প্রসাদ পরিবেশন করব।"

শ্লোক ৬৮

কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত ।
অল্প করি' আনি' তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে করেছিলেন যে, সেই তিনটি পাতই বিতরণ করার জন্য; তাই তিনি বলেছিলেন, "আরও দুটি কলাপাতা নিয়ে এস এবং তাতে অল্প করে কিছু অন্ন ও ব্যঞ্জন দাও।"

শ্লোক ৬৯

আচার্য কহে—বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে ।
এত বলি' হাতে ধরি' বসাইল দুঁহারে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "তোমরা দুজন এই পিঁড়ি দুটির উপর বস।" এই বলে তাঁদের হাত ধরে তিনি তাঁদের বসালেন।

শ্লোক ৭০

প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এত সমস্ত উপাদেয় উপকরণ ভোজন করা সন্ন্যাসীর উচিত নয়। এই সমস্ত খেলে কিভাবে সে তার ইন্দ্রিয় দমন করবে?"

তাৎপর্য

উপকরণ বলতে ডাল, তরকারি প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে অন্ন ভোজন করা যায়। সেই রকম মুখরোচক দ্রব্যে সন্ন্যাসীর অধিকার নেই। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু সেবনে ভোগপ্রবৃত্তি প্রবল হয়। সেই জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, কেন না বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদর্শ হচ্ছে *বৈরাগ্যবিদ্যা*। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছিলেন—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।" এভাবেই তিনি সন্ন্যাসীদের আদর্শ নির্ধারণ করে গেছেন। ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। অর্থবান গৃহস্থেরা অত্যন্ত মুখরোচক উত্তম উত্তম দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিয়ে থাকেন। ফুলমালা, পালঙ্ক, অলঙ্কার, উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, পান-তাম্বুল আদি কৃষ্ণবিলাস সামগ্রী হলেও, অকিঞ্চন বৈষ্ণব তাঁর দেহকে প্রাকৃত ও বিভৎস-জ্ঞানে সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তিনি মনে করেন যে, সেগুলি স্বীকার করলে ভগবানের চরণে অপরাধ হবে। বৈষ্ণব অভিমানী অবৈষ্ণব সহজিয়ারা বুঝতে পারে না, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে অন্য দুটি পাতায় অল্প একটু অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে বলেছিলেন।

শ্লোক ৭১

আচার্য কহে—ছাড় তুমি আপনার চুরি ।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর জন্য পরিবেশিত অন্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "তুমি, তোমার লুকোচুরি ছাড়। আমি তোমার সব কথা জানি, আর তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের গোপন কারণটিও আমি জানি।"

শ্লোক ৭২

ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী ।
প্রভু কহে—এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বাক্‌চাতুরী ছেড়ে ভোজন করতে বললেন। মহাপ্রভু তখন উত্তর দিলেন, "এত অন্ন আমি খেতে পারব না।"

শ্লোক ৭৩

আচার্য বলে—অকপটে করহ আহার ।
যদি খাইতে না পার পাতে রহিবেক আর ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন যতটুকু পারেন ততটুকুই অকপটে আহার করেন। যদি তিনি সব খেতে না পারেন, তা হলে সেগুলি তাঁর পাতেই পড়ে থাক।

শ্লোক ৭৪

প্রভু বলে—এত অন্ন নারিব খাইতে ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি এত অন্ন খেতে পারব না, আর উচ্ছিষ্ট রাখাও সন্ন্যাসীর পক্ষে উচিত নয়।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৮/১৯) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্ ॥

"গৃহস্থের গৃহ থেকে সন্ন্যাসী যে খাদ্য পাবেন, তা নিয়ে বাইরে কোন জলাশয়ের কাছে গিয়ে তিন ভাগে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সূর্যদেবকে নিবেদন করে, কোন উচ্ছিষ্ট না রেখে পুরোটাই গ্রহণ করবেন।"

শ্লোক ৭৫

আচার্য বলে—নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার ।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথদেব থেকে অভিন্ন জেনে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "নীলাচলে তুমি চুয়ান্নবার খাও এবং প্রতিবারে শত শত ভাণ্ডপূর্ণ নৈবেদ্য তুমি আহার কর।"

শ্লোক ৭৬

তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার এক গ্রাস ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "তিন জনার ভক্ষ্য তোমার এক গ্রাসও নয়। সেই তুলনায় এই অন্ন তোমার পাঁচটি গ্রাসও হবে না।"

শ্লোক ৭৭

মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন ।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে তুমি আমার গৃহে এসেছ। দয়া করে এখন ছলচাতুরী ছাড় এবং ভোজন কর।"

শ্লোক ৭৮

এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে ।
হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা বলে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু দুই প্রভুর হাত ধোয়ার জন্য জল দিলেন। তারপর তাঁরা দুজন হাসতে হাসতে প্রসাদসেবা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৯

নিত্যানন্দ কহে—কৈলুঁ তিন উপবাস ।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "এক নাগারে আমি তিন দিন ধরে উপবাস করেছি। আশা করেছিলাম যে, আজ পারণ (উপবাস ভঙ্গ) করব।"

শ্লোক ৮০

আজি উপবাস হৈল আচার্য-নিমন্ত্রণে ।
অর্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে করেছিলেন যে, খাবারের পরিমাণ ছিল প্রচুর, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু বললেন যে, সেই অন্ন তাঁর কাছে এক গ্রাসও নয়। তিনি তিন দিন ধরে উপবাস করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, সেই দিন পারণ করবেন। কিন্তু তিনি বললেন, "যদিও অদ্বৈত আচার্য প্রভু আমাকে তাঁর বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু আজও দেখছি আমাকে উপবাস করতে হবে। কারণ এত অল্প অন্নে আমার অর্ধেক পেটও ভরবে না।"

শ্লোক ৮১

আচার্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী ।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু উত্তর দিলেন, "তুমি হচ্ছ তৈর্থিক সন্ন্যাসী। কখনও কখনও তুমি ফল-মূল খাও, আবার কখনও উপবাসী থাক।

শ্লোক ৮২

দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্ট্যেক অন্ন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং তুমি আমার গৃহে এসেছ। সুতরাং তোমার লোভী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে, যেটুকু অন্ন পেয়েছ তাতেই সন্তুষ্ট থাক।"

শ্লোক ৮৩

নিত্যানন্দ বলে—যবে কৈলে নিমন্ত্রণ ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিলেন, "আমি যা-ই হই না কেন, তুমি আমাকে তোমার গৃহে নিমন্ত্রণ করেছ। সুতরাং আমি যত ভোজন করতে চাই, তোমাকে ততই দিতে হবে।"

শ্লোক ৮৪

শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত ।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর কথা শুনে অদ্বৈত আচার্য প্রভু সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্গে পরিহাস করে বললেন—

শ্লোক ৮৫

ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে ।
সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি হচ্ছ ভ্রষ্ট পরমহংস এবং তুমি তোমার উদর ভরণের জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছ। আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার কাজই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের জ্বালাতন করা।"

তাৎপর্য

স্মার্ত-ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-গোস্বামীদের মতের মধ্যে চিরকাল একটা পার্থক্য রয়েছে। এমন কি জ্যোতিষ গণনায়ও স্মার্ত মত এবং বৈষ্ণব-গোস্বামীর মত রয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভুকে *ভ্রষ্ট অবধূত* বলে সম্বোধন করে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রকৃতপক্ষে নিত্যানন্দ প্রভুকে একজন প্রকৃত পরমহংস বলেই স্বীকার করেছেন। কারণ তিনি এভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রাকৃত স্মার্ত-সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত হয়েছেন। এভাবেই নিন্দাচ্ছলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর স্তুতি করলেন। *অবধূত* বা পরমহংস স্তর হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের চরম অবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে অবধূত বা পরমহংসের আচরণ ইন্দ্রিয় পরায়ণ বিষয়ীর মতো বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এই স্তরে কখনও কখনও সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করা হয় এবং কখনও হয় না। কখনও কখনও তিনি গৃহস্থের বেশ ধারণ করেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে এই যে বাক্য বিনিময়, তা কেবল পরিহাস মাত্র। তা নিন্দাবাদ নয়।

খড়দহে ত্রিপুরা সুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দর সহ অধিষ্ঠিত দেখে, কেউ কেউ নিত্যানন্দ প্রভুর অবধূত আচরণকে শাক্ত-সম্প্রদায়ের কৌলাবধূত-আচার বলে ভ্রম করেন। তারা মনে করেন যে, নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন হচ্ছে, *অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ*—"অন্তরে বিষয়ী, বাইরে শৈব আর সভায় বৈষ্ণবের মতো।" প্রকৃতপক্ষে নিত্যানন্দ প্রভু সেই রকম অপসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি সর্বদাই ছিলেন একজন বৈদিক সন্ন্যাসীর স্বরূপ-ব্রহ্মচারী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন পরমহংস। আবার কেউ কেউ বলেন, লক্ষ্মীপতি তীর্থ তাঁর আচার্য। তা হলেও তিনি শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক নন।

শ্লোক ৮৬

তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন ।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "তুমি দশ-বিশ মান অন্ন খেতে পার। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমি কোথা থেকে তা পাব?"

তাৎপর্য

এক *মান* হচ্ছে প্রায় চার কিলোগ্রাম।

শ্লোক ৮৭

যে পাঞাছ মুষ্টেক অন্ন, তাহা খাঞা উঠ ।
পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুঠ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এক মুঠো খানেক অন্ন হলেও, যা পেয়েছ তা-ই তুমি খেয়ে ওঠ। পাগলামি করো না এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়িও না।"

শ্লোক ৮৮

এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন ।
অর্ধ-অর্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই হাস্য-পরিহাস করতে করতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করতে লাগলেন। এক একটি ব্যঞ্জনের অর্ধেক অর্ধেক খেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেগুলি রেখে দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৯

সেই ব্যঞ্জন আচার্য পুনঃ করেন পূরণ ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

পাত্রে অর্ধেক ব্যঞ্জন শেষ হওয়া মাত্রই অদ্বৈত আচার্য প্রভু পুনরায় তা পূর্ণ করতে লাগলেন। এভাবেই পুনঃপুনঃ অদ্বৈত আচার্য প্রভু ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯০

দোনা ব্যঞ্জনে ভরি' করেন প্রার্থন ।
প্রভু বলেন—আর কত করিব ভোজন ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

পাত্র ব্যঞ্জনে পূর্ণ করে অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেগুলি গ্রহণ করতে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "আমি আর কত ভোজন করব?"

শ্লোক ৯১

আচার্য কহে—যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা ।
এখন যে দিয়ে, তার অর্ধেক খাইবা ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "আমি যা দিয়েছি তা দয়া করে ফেলো না। আর এখন যা আমি দিলাম তার অর্ধেক অন্তত খাও।"

শ্লোক ৯২

নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইল ভোজন ।
আচার্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিনীতভাবে অনুরোধ করে অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে খাওয়ালেন। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করলেন।

শ্লোক ৯৩

নিত্যানন্দ কহে—আমার পেট না ভরিল ।
লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবার পরিহাস করে বললেন, "আমার পেট ভরল না। এই অন্ন নিয়ে যাও। আমি তোমার দেওয়া অন্ন কিছুই খেলাম না।"

শ্লোক ৯৪

এত বলি' একগ্রাস ভাত হাতে লঞা ।
উবালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক মুঠো ভাত নিয়ে তাঁর সামনে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন, যেন তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

শ্লোক ৯৫

ভাত দুই-চারি লাগে আচার্যের অঙ্গে ।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য নাচে বহুরঙ্গে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার ফলে দু-চারটি ভাত অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গায়ে লাগল এবং তিনি তখন সেই ভাত অঙ্গে নিয়ে বহু রঙ্গে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৬

অবধূতের ঝুঠা লাগিল মোর অঙ্গে ।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "আমার গায়ে অবধূতের উচ্ছিষ্ট লাগল, এভাবেই সে আমাকে পরম পবিত্র করল।"

তাৎপর্য

যিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে তিনিই হচ্ছেন *অবধূত*। কখনও কখনও সন্ন্যাসীর বিধি-নিষেধ অনুশীলন না করে, নিত্যানন্দ প্রভু উন্মাদ *অবধূতের* মতো আচরণ করতেন। তিনি তাঁর উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এবং তা অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গায়ে লেগেছিল। অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাতে মহা আনন্দিত হয়েছিলেন, কেন না নিজেকে স্মার্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করে তিনি মনে করেছিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভুর উচ্ছিষ্টের প্রভাবে তিনি সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টকে বলা হয় মহা মহাপ্রসাদ। তা সম্পূর্ণ চিন্ময় এবং বিষ্ণুসদৃশ। তা কোন সাধারণ বস্তু নয়। শ্রীগুরুদেব বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুদেব এবং পরমহংস অর্থাৎ বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ও সেবন করার ফলে বদ্ধ জীবের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূরীভূত হয় এবং তাকে অপ্রাকৃত পরমহংস দাস্যরূপ শুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। যে সমস্ত বদ্ধ জীব সদ্‌গুরু ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের বোঝাবার জন্য অদ্বৈত আচার্য প্রভু এভাবেই আচরণ করেছিলেন এবং এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৯৭

তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল ।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

পরিহাস করে অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "নিত্যানন্দ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করে আমি উপযুক্ত ফল পেয়েছি। তোমার কোন জাত নেই, কুল নেই। তুমি একটি পাগল।

তাৎপর্য

সহজে পাগল কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্বক্ষণ রাধা-কৃষ্ণের সেবায় মগ্ন থাকার ফলে তাঁর আচরণ উন্মাদের মতো মনে হত। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য এই অর্থে এই কথাটি বলেছিলেন।

শ্লোক ৯৮

আপনার সম মোরে করিবার তরে ।
ঝুঁঠা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে তোমার মতো উন্মত্ত করার জন্য তুমি আমার গায়ে তোমার উচ্ছিষ্ট ছুঁড়েছ। ব্রাহ্মণের গায়ে উচ্ছিষ্ট ছুঁড়লে অপরাধ হবে, সেই ভয় তুমি করনি।"

তাৎপর্য

আপনার সম বলতে বোঝানো হয়েছে যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু নিজেকে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত বৈষ্ণব বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে পরমহংস বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত করানোর জন্য তাঁকে তাঁর উচ্ছিষ্ট দান করেছিলেন। এই উক্তির মাধ্যমে অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমহংস বৈষ্ণব অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। শুদ্ধ বৈষ্ণব সকল প্রকার বিধি-নিষেধের অতীত। তাই অদ্বৈত আচার্য প্রভু বলেছিলেন, *"আপনার সম মোরে করিবার তরে।"* শুদ্ধ বৈষ্ণব বা পরমহংসগণ মহাপ্রসাদকে চিন্ময় বলে অনুভব করেন। মহাপ্রসাদকে তাঁরা প্রকৃতিজাত জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভাত-ডাল বলে মনে করেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণব দূরে থাকুক, চণ্ডালের মুখভ্রষ্ট প্রসাদও অপবিত্র হয় না। পক্ষান্তরে, তার চিন্ময়ত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকে। তাই মহাপ্রসাদ সেবন বা স্পর্শনের ফলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের কিছু মাত্র অশুদ্ধি স্পর্শ করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই মহাপ্রসাদ সেবনের ফলে জীব সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। শাস্ত্রে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৯৯

নিত্যানন্দ বলে,—এই কৃষ্ণের প্রসাদ ।
ইহাকে 'ঝুঁঠা' কহিলে, তুমি কৈলে অপরাধ ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিলেন, "এই কৃষ্ণপ্রসাদ তুমি উচ্ছিষ্ট বললে? তার ফলে তোমার অপরাধ হল।"

তাৎপর্য

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকং চ যৎ ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ ॥
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ।
বিকারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ ॥

কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥

"কেউ যদি মহাপ্রসাদকে সাধারণ ভাত-ডাল বলে মনে করে, তা হলে তার মহা অপরাধ হয়। সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে শুচি-অশুচি বিচার থাকে, কিন্তু মহাপ্রসাদে সেই রকম কোন বিচার নেই। মহাপ্রসাদ চিন্ময় এবং তার কোন রকম বিকার বা অশুচিতার প্রশ্নই ওঠে না, ঠিক যেমন শ্রীবিষ্ণুর দেহে কোন রকম বিকার বা অপবিত্রতার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব কোন ব্রাহ্মণও যদি প্রসাদে শুচি-অশুচি বিচার করে, তা হলে তার কুষ্ঠ রোগ হয় এবং সমস্ত আত্মীয়স্বজন হারা হয়। এই ধরনের অপরাধে সে নিরয়গামী হয় এবং কখনও আর ফিরে আসে না।"

শ্লোক ১০০

শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "তুমি যদি অন্তত্তপক্ষে একশো সন্ন্যাসীকে ভোজন করিয়ে তৃপ্ত কর, তা হলে তোমার এই অপরাধ খণ্ডন হবে।"

শ্লোক ১০১

আচার্য কহে—না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু উত্তর দিলেন, "আমি আর কখনও সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করব না, কেন না একজন সন্ন্যাসী আমার ব্রাহ্মণোচিত স্মৃতিধর্ম নষ্ট করেছে।"

শ্লোক ১০২

এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন ।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে আচমন করালেন এবং তারপর উত্তম শয্যাতে তাঁদের শয়ন করালেন।

শ্লোক ১০৩

লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম রসবাস ।
তুলসী-মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু দুই ভাইকে মুখবাসরূপে লবঙ্গ-এলাচির বীজ ও তুলসী-মঞ্জরী দিলেন, যা খেয়ে তাঁদের মুখে সুগন্ধ হল।

শ্লোক ১০৪

সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর ।
সুগন্ধি 'পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁদের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করলেন এবং তাঁদের বুকে সুগন্ধি পুষ্পমালা দিলেন।

শ্লোক ১০৫

আচার্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন ।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শয্যায় শয়ন করলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর পা টিপে দিতে চাইলেন, কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে বললেন—

শ্লোক ১০৬

বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান ।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"অদ্বৈত আচার্য, তুমি আমাকে বহুভাবে নাচালে। এখন সেই নাচানো ছেড়ে মুকুন্দ ও হরিদাসের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ কর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে বললেন যে, উত্তম শয্যায় শয়ন, এলাচি, লবঙ্গ চর্বণ এবং অঙ্গে সুগন্ধ লেপন আদি করা সন্ন্যাসীর পক্ষে উচিত নয়। এমন কি সুগন্ধি পুষ্পমালা গ্রহণ করা এবং একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পাদসম্বাহন করতে দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাকে নানাভাবে নাচালে, এখন দয়া করে এই নাচানো বন্ধ কর। যাও, মুকুন্দ ও হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ ভোজন কর।"

শ্লোক ১০৭

তবে ত' আচার্য সঙ্গে লঞা দুই জনে ।
করিল ইচ্ছায় ভোজন, যে আছিল মনে ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু মুকুন্দ ও হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ সেবা করতে গেলেন এবং মনের আনন্দে ভোজন করলেন।

শ্লোক ১০৮

শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন ।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শান্তিপুরের লোকেরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ পেলেন, তখন তাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে এলেন।

শ্লোক ১০৯

'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা ।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য দেখিঞা ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁরা সকলে 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সৌন্দর্য দর্শন করে চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১১০

গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল ।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দেখলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের উজ্জ্বল কান্তি যেন সূর্যের উজ্জ্বলতাকেও নিষ্প্রভ করেছে এবং তাঁর গৈরিক বসন তাঁর শ্রীঅঙ্গে ঝলমল করছে।

শ্লোক ১১১

আইসে যায় লোক হর্ষে, নাহি সমাধান ।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বহু বহু লোক আসা-যাওয়া করছিল এবং তার কোন হিসেব ছিল না।

শ্লোক ১১২

সন্ধ্যাতে আচার্য আরম্ভিল সঙ্কীর্তন ।
আচার্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ধ্যাবেলায় অদ্বৈত আচার্য প্রভু সংকীর্তন শুরু করলেন। তারপর তিনি নাচতে শুরু করলেন এবং মহাপ্রভু তা দর্শন করলেন।

শ্লোক ১১৩

নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য ধরিঞা ।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন নাচতে শুরু করলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর পিছনে পিছনে নাচতে লাগলেন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হরিদাস ঠাকুরও তাঁর পিছনে নাচতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১১৪

কি কহিব রে সখি আজুক আনন্দ ওর ।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু গাইলেন, "হে সখি, আমি কি বলব? আজ আমি সব চাইতে গভীর অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করলাম। বহুদিন পর কৃষ্ণ আজ আমার ঘরে এসেছে।"

তাৎপর্য

এটি বিদ্যাপতির রচিত একটি গান। কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত কেউ কেউ মনে করে যে, *মাধব* বলতে এখানে মাধবেন্দ্র পুরীকে বোঝানো হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য প্রভু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং তাই কিছু লোক মনে করে যে, *মাধব* বলতে এখানে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ধারণাটি ভুল। মাথুর-বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর মনোভাব ব্যক্ত করে বিদ্যাপতি এই গানটি রচনা করেছেন—

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর ।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল ।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই ।
তব্ হাম্ পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা' ।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না' ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বরনারি ।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥

শ্লোক ১১৫

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্তন ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জন ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই পদ গাইতে গাইতে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নাচতে লাগলেন। তখন তাঁর শ্রীঅঙ্গে স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু আদি সাত্ত্বিক বিকারগুলি দেখা দিল এবং কখনও কখনও ভাবোন্মত্ত হয়ে তিনি হুঙ্কার-গর্জন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৬

ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

নাচতে নাচতে কখনও কখনও অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরতে লাগলেন এবং মহাপ্রভুর চরণ ধরে তিনি বলতে লাগলেন—

শ্লোক ১১৭

অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া ।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বহুদিন তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছ। এখন আমি তোমাকে ঘরে পেয়েছি, এবার আমি তোমাকে বেঁধে রাখব।"

শ্লোক ১১৮

এত বলি' আচার্য আনন্দে করেন নর্তন ।
প্রহরেক-রাত্রি আচার্য কৈল সংকীর্তন ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেই রাত্রে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সংকীর্তন করলেন এবং সারাক্ষণ আনন্দে উদ্বেল হয়ে নৃত্য করলেন।

শ্লোক ১১৯

প্রেমের উৎকণ্ঠা—প্রভুর নাহি কৃষ্ণ-সঙ্গ ।
বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন এভাবে নাচলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হলেন এবং কৃষ্ণবিরহে তাঁর প্রেমজ্বালার তরঙ্গ বর্ধিত হল।

শ্লোক ১২০

ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা ।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য নৃত্য সম্বরিলা ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন এবং তা দেখে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর নৃত্য বন্ধ করলেন।

শ্লোক ১২১

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে ।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব ভালমতে জানতেন, তাই তিনি মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব অনুযায়ী পদ গাইতে লাগলেন।

শ্লোক ১২২

আচার্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্তন ।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্য করার জন্য অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরে উঠালেন, কিন্তু মুকুন্দের সেই পদ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না।

শ্লোক ১২৩

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্‌গদ বচন ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল, সারা অঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল, সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল, স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ছিল এবং তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কখনও তিনি উঠছিলেন, আবার কখনও তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন এবং কখনও তিনি ক্রন্দন করছিলেন।

শ্লোক ১২৪

হা হা প্রাণপ্রিয়সখি, কি না হৈল মোরে ।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ ১২৪ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ গাইছিলেন, "'হে সখী! আমার কি না হয়েছে! কৃষ্ণপ্রেম-বিষের প্রভাবে আমার দেহ ও মন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

মুকুন্দ যখন দেখলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিরহ-বেদনায় অধীর হয়েছেন এবং কৃষ্ণবিরহে তাঁর শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণগুলি দেখা দিচ্ছে, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের গীত গাইতে লাগলেন। অদ্বৈত আচার্য প্রভুও তখন নৃত্য বন্ধ করলেন।

শ্লোক ১২৫

রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ ।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ, তাহাঁ উড়ি' যাঙ ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'দিন-রাত আমার মন দগ্ধ হচ্ছে এবং আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। যেখানে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, সেখানে আমার উড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' "

শ্লোক ১২৬

এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তরে বিদরে ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত মধুর স্বরে মুকুন্দ এই পদ গাইছিলেন, কিন্তু তা শোনা মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর বিদীর্ণ হল।

শ্লোক ১২৭

নির্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল্য, গর্ব, দৈন্য ।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

নির্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল্য, গর্ব, দৈন্য আদি সব রকম অপ্রাকৃত ভাবগুলি সৈন্যের মতো মহাপ্রভুর অন্তরে যুদ্ধ করতে লাগল।

তাৎপর্য

হর্ষ কথাটির বর্ণনা করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অভীষ্ট দর্শন লাভ হলে চিত্তে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, তাকে বলা হয় *হর্ষ*। *হর্ষ* হলে রোমাঞ্চ, ঘর্ম, অশ্রু,

মুখস্ফীততা, আবেগ, উন্মাদ, জাড্য ও মোহ আদি হয়ে থাকে। ইষ্টবস্তু লাভে নিজের সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম-আশ্রয় আদি অবলম্বনে অপরকে যে অবহেলা, তাই হচ্ছে গর্ব। এতে স্তুতিবাক্য, উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ-দর্শন, নিজের অভিপ্রায় আদি গোপন এবং অন্যের কথা না শোনা প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান।

শ্লোক ১২৮

জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে ।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই ভাবের প্রহারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ জর-জর হল। তার ফলে তিনি ভূমিতে পড়লেন এবং তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রায়ই বন্ধ হয়ে গেল।

শ্লোক ১২৯

দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থা দেখে সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হলেন। তখন হঠাৎ মহাপ্রভু গর্জন করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন।

শ্লোক ১৩০

'বল্' 'বল্' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল ।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

উঠে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "বল! বল!" এভাবেই তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে নাচতে লাগলেন। এই প্রবল ভাবতরঙ্গ যে কিভাবে মহাপ্রভুর অন্তরকে উদ্বেলিত করছে, তা কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ১৩১

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা ।
আচার্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরে রইলেন যাতে তিনি পড়ে না যান এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তাঁদের পিছনে পিছনে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩২

এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কখনও হর্ষ কখনও বিষাদের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে মহাপ্রভু প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে নৃত্য করলেন।

শ্লোক ১৩৩

তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন ।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিন দিন উপবাস করার পর ভোজন করে, এভাবেই উদ্দণ্ড নৃত্য করার ফলে তাঁর একটু পরিশ্রম হল।

শ্লোক ১৩৪

তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু প্রেমাবিষ্ট থাকার ফলে তিনি তাঁর পরিশ্রমের কথা জানতে পারলেন না। তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে ধরে রেখে তাঁর নৃত্য বন্ধ করালেন।

শ্লোক ১৩৫

আচার্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্তন ।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন কীর্তন বন্ধ করলেন এবং মহাপ্রভুকে নানা রকম সেবা করে তাঁকে শয়ন করালেন।

শ্লোক ১৩৬

এইমত দশদিন ভোজন-কীর্তন ।
একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে দশ দিন ধরে ভোজন এবং সন্ধ্যায় কীর্তন হল। তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু একভাবেই মহাপ্রভুর সেবা করলেন।

শ্লোক ১৩৭

প্রভাতে আচার্যরত্ন দোলায় চড়াঞা ।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সকালবেলায় চন্দ্রশেখর আচার্য পালকিতে চড়িয়ে শচীমাতাকে নিয়ে এলেন এবং সেই সময় নবদ্বীপ থেকে বহু ভক্ত তাঁদের সঙ্গে এলেন।

শ্লোক ১৩৮

নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ ।
সর্ব লোক আইলা, হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই নদীয়া নগরের স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ—সকলেই সেখানে এলেন। ফলে সেখানে বহু লোকের সমাগম হল।

শ্লোক ১৩৯

প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সংকীর্তন ।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাম-সংকীর্তন করছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর আচার্য শচীমাতাকে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে আনলেন।

শ্লোক ১৪০

শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইঞা ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা আসা মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। শচীমাতা তখন মহাপ্রভুকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪১

দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করে তাঁরা দুজনই বিহ্বল হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুণ্ডিত মস্তক দর্শন করে শচীমাতার হৃদয় বিদীর্ণ হল।

শ্লোক ১৪২

অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায়,—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর আঁচল দিয়ে মহাপ্রভুর অঙ্গ মুছে দিয়ে, মুখ চুম্বন করে তিনি তাঁকে দেখতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ থাকার ফলে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ১৪৩

কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাঞি ।
বিশ্বরূপ-সম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

কাঁদতে কাঁদতে শচীমাতা বললেন, "বাছারে নিমাই, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের মতো তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না।"

শ্লোক ১৪৪

সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন ।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বলতে লাগলেন, "সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর বিশ্বরূপ আর এসে আমাকে দেখা দেয়নি। তুমি যদি সেই রকম কর, তা হলে অবশ্যই আমি মরে যাব।"

শ্লোক ১৪৫

কান্দিয়া বলেন প্রভু—শুন, মোর আই ।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

কাঁদতে কাঁদতে মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "মা, এই শরীরটি তোমার। এতে আমার কোন অধিকার নেই।

শ্লোক ১৪৬

তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দেহটি তুমি পালন করেছ এবং তোমার থেকেই এই দেহের জন্ম হয়েছে। তোমার কাছে আমার এই ঋণ কোটি জন্মেও আমি শোধ করতে পারব না।

শ্লোক ১৪৭

জানি' বা না জানি' কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"জেনে বা না জেনে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি, কিন্তু তবুও আমি কখনও তোমার প্রতি উদাসীন হব না।

শ্লোক ১৪৮

তুমি যাহাঁ কহ, আমি তাহাঁই রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই ত' করিব ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"মা, তুমি আমাকে যেখানে থাকতে বলবে আমি সেখানেই থাকব, আর তুমি আমাকে যে আজ্ঞা করবে সেই আজ্ঞাই আমি পালন করব।"

শ্লোক ১৪৯

এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা বলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করলেন এবং তুষ্ট হয়ে শচীমাতা বারবার তাঁকে কোলে নিলেন।

শ্লোক ১৫০

তবে আই লঞা আচার্য গেলা অভ্যন্তর ।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শচীমাতাকে নিয়ে অদ্বৈত আচার্য প্রভু গৃহাভ্যন্তরে গেলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন।

শ্লোক ১৫১

একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণ ।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

একে একে মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং সকলের মুখ দর্শন করে তিনি তাঁদের দৃঢ় আলিঙ্গন দান করলেন।

শ্লোক ১৫২

কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ ।
সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুণ্ডিত মস্তক দর্শন করে যদিও ভক্তরা অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করে তাঁরা মহাসুখ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৩-১৫৫

শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর ।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ॥ ১৫৩ ॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয় ।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥ ১৫৪ ॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী ।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি' ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর, বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়, বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় আদি অগণিত নবদ্বীপবাসী ভক্তরা সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁদের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে এবং মৃদু হেসে তাঁদের সঙ্গে মহাপ্রভু মিলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫৬

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' 'হরি' 'হরি' ।
আচার্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে 'হরি' 'হরি' বলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। এভাবেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহ শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হল।

শ্লোক ১৫৭-১৫৮

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে ।
নানা-গ্রাম হৈতে, আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৭ ॥
সবাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য, অন্নপান ।
বহুদিন আচার্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

নবদ্বীপ এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রাম থেকে যত লোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন, তাঁদের সকলকে অদ্বৈত আচার্য প্রভু থাকবার জায়গা করে দিলেন এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আর বহুদিন ধরে অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁদের সমস্ত প্রয়োজন মেটালেন।

শ্লোক ১৫৯

আচার্য-গোসাঞির ভাণ্ডার—অক্ষয়, অব্যয় ।
যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয় ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ভাণ্ডার ছিল অক্ষয় ও অব্যয়। তা থেকে যত দ্রব্য ব্যয় করা হচ্ছিল, ততই তা পূর্ণ হয়ে উঠছিল।

শ্লোক ১৬০

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে শচীমাতা যেই দিন এলেন, সেই দিন থেকেই তিনি রন্ধন করেছিলেন এবং সমস্ত ভক্তদের নিয়ে মহাপ্রভু ভোজন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬১

দিনে আচার্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন ।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্তন-কীর্তন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

দিনের বেলায় সমস্ত লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসতেন এবং তাঁরা তাঁর প্রতি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর প্রীতিপূর্ণ আচরণ দেখতেন, আর রাত্রিবেলায় তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তন শুনতেন এবং নৃত্য দর্শন করতেন।

শ্লোক ১৬২

কীর্তন করিতে প্রভুর সর্বভাবোদয় ।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্‌গদ, প্রলয় ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তম্ভ, কম্প, পুলক, অশ্রু, গদ্‌গদ, প্রলয় আদি সমস্ত ভাবের উদয় হত।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে *প্রলয়*-এর বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এই সময় সুখ ও দুঃখ উভয় চেষ্টা থেকে জ্ঞান নিরস্ত হয়। এই প্রকার প্রলয়ে ভূমিতে পতন আদি অনুভাবসমূহ দেখা যায়। হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদ আদি থেকে বিনা প্রযত্নে চোখে যে জল পড়ে, তাই *পুলকাশ্রু*। আনন্দের ফলে অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধের ফলে উষ্ণত্ব এবং উভয় প্রকার পুলকে নয়নক্ষোভ ও রাগসম্মার্জন আদি ঘটে।

শ্লোক ১৬৩

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাঞা ।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভু আছাড় খেয়ে পড়ছিলেন এবং তা দেখে শচীমাতা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৬৪-১৬৬

চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি-কলেবর ।
হাহা করি' বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥ ১৬৪ ॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন ।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ॥ ১৬৫ ॥
যে কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী-উপরে ।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি-শরীরে ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার (শচীমাতার) মনে হচ্ছে যেন এভাবেই আছাড় খেয়ে পড়ার ফলে নিমাই-এর শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে"। তিনি তখন ক্রন্দন করতে করতে শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন, "হে ভগবান (নারায়ণ, বিষ্ণু)। শিশুকাল থেকে আমি তোমার সেবা করেছি। তার বিনিময়ে আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, নিমাই যখন মাটির উপরে পড়ে, তখন যেন তার শরীরে কোন ব্যথা না লাগে।"

শ্লোক ১৬৭

এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল ।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি বাৎসল্য রসে বিহ্বল হয়ে শচীমাতা হর্ষ, ভয় ও দৈন্য আদি ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বিকল হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক কয়টি থেকে জানতে পারা যায় যে, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবী শিশুকাল থেকেই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতেন। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪১) বলা হয়েছে—

> *প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।*
> *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥*

"বহুকাল স্বর্গলোকে নানা রকম সুখভোগ করার পর, ভ্রষ্ট যোগীরা ধর্মপরায়ণ পবিত্র পরিবারে, অথবা ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।" শচীমাতা ছিলেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি ছিলেন মা যশোদার অবতার। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীবিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেন এবং তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে তাঁর সেবা করেন। এটিই হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের স্থিতি। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে।* প্রতিটি ভক্তেরই জানা উচিত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদেরা—তাঁর পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য সমস্ত পার্ষদেরা সকলেই নিত্যসিদ্ধ। কোন নিত্যসিদ্ধ জীব কখনই ভগবানের সেবা বিস্মৃত হন না। তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, এমন কি তাঁর শিশুকাল থেকেই।

শ্লোক ১৬৮

শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র ভক্তগণ ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যত ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলেরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোজন করাতে ইচ্ছে হল।

তাৎপর্য

সমস্ত গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁদের গ্রামে বা লোকালয়ে কোন সন্ন্যাসী এলে তাঁকে ভোজন করানো। ভারতবর্ষে এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। কোন সন্ন্যাসী গ্রামে এলে, সমস্ত গৃহস্থেরা একে একে তাঁদের গৃহে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। যতদিন সন্ন্যাসী সেই গ্রামে থাকেন, ততদিন তিনি সেই গ্রামের অধিবাসীদের পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ, সন্ন্যাসী যদিও সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর থাকা-খাওয়া কখনই কোন অসুবিধে হয় না। অদ্বৈত আচার্য প্রভু যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদের সমস্ত আয়োজন করেছিলেন, তবুও নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরের অন্যান্য ভক্তরা তাঁকে ভিক্ষা করাবার বাসনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৯

শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি ।
নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের সেই প্রস্তাব শুনে শচীমাতা বললেন, "আর কতদিনে আমি নিমাই-এর দর্শন পাব?"

শ্লোক ১৭০

তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন ।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বললেন, "তোমাদের সকলের সঙ্গে নিমাই-এর অন্যত্র মিলন হবে। কিন্তু অভাগিনী আমার সঙ্গে তার কি আর কখনও সাক্ষাৎ হবে? এই একবার মাত্র আমি তার দর্শন পেলাম।"

শ্লোক ১৭১

যাবৎ আচার্যগৃহে নিমাঞির অবস্থান ।
মুঞি ভিক্ষা দিমু, সবাকারে মাগোঁ দান ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা সমস্ত ভক্তের কাছে আবেদন করলেন—"আপনাদের সকলের কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ, নিমাই যতদিন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে থাকবে, ততদিন যেন আমি তার জন্য রন্ধন করতে পারি।"

শ্লোক ১৭২

শুনি' ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার ।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতার এই আবেদন শুনে, সমস্ত ভক্তরা তাঁকে নমস্কার করে বললেন, "মা, তোমার এই ইচ্ছায় আমাদের পূর্ণ সম্মতি আছে।"

শ্লোক ১৭৩

মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন ।
ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

মায়ের ব্যগ্রতা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনও বিচলিত হল। তাই তিনি ভক্তদের একত্র করে বললেন—

শ্লোক ১৭৪

তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন ।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্তন ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমাদের আজ্ঞা না নিয়ে আমি বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় আমি যেতে পারলাম না। তাই আমাকে ফিরে আসতে হল।

শ্লোক ১৭৫

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যদিও সহসা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি, কিন্তু তবুও আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন থাকব না।

শ্লোক ১৭৬

তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব' ।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যতদিন আমি এ পৃথিবীতে থাকব, ততদিন আমি কখনও তোমাদের ছাড়ব না এবং আমার মাকেও ছাড়তে পারব না।

শ্লোক ১৭৭

সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া ।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর, নিজের আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে জন্মস্থানে বাস করা সন্ন্যাসীর উচিত নয়।

শ্লোক ১৭৮

কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন ।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এমন একটা ব্যবস্থা কর যাতে তোমাদের না ছাড়তে হয়, আর সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে থাকার জন্য লোকেরাও নিন্দা না করে।"

শ্লোক ১৭৯

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন ।
শচীপাশ আচার্যাদি করিল গমন ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মধুর বাণী শুনে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রমুখ সমস্ত ভক্ত শচীমাতার কাছে গেলেন।

শ্লোক ১৮০

প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল ।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আবেদনের কথা যখন তাঁরা শচীমাতাকে গিয়ে বললেন, তখন জগৎ-জননী শচীমাতা বলতে লাগলেন—

শ্লোক ১৮১

তেঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ ।
তাঁ'র নিন্দা হয় যদি, সেহ মোর দুঃখ ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"নিমাই যদি এখানে থাকে, তা হলে আমার অনেক আনন্দ হবে। কিন্তু কেউ যদি আবার তার নিন্দা করে, তা হলে আমার অত্যন্ত দুঃখ হবে।"

তাৎপর্য

পুত্র যদি কৃষ্ণ অন্বেষণে গৃহত্যাগ না করে মায়ের কাছে থাকে, তা হলে মায়ের খুব সুখ হয়। কিন্তু, পুত্র যদি কৃষ্ণ অন্বেষণ না করে কেবল গৃহেই অবস্থান করে, তা হলে মহাজনেরা অবশ্যই তা নিন্দা করেন। এই ধরনের নিন্দা মায়ের দুঃখের কারণ হয়। আদর্শ মাতা যদি চান যে, তাঁর পুত্র পারমার্থিক পথে উন্নতি লাভ করুক, তা হলে তাঁর পক্ষে পুত্রকে কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে দেওয়াই শ্রেয়। মা স্বাভাবিক ভাবেই পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন। মা যদি পুত্রকে কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে অনুমতি না দেন, তা হলে তাঁকে বলা হবে *মা*, অর্থাৎ *মায়া*। পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে দিয়ে, শচীমাতা জগতের সমস্ত মায়েদের এক পরম আদর্শের শিক্ষা দান করেছেন। তিনি দেখিয়ে

গেছেন যে, প্রতিটি পুত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে জননীর স্নেহপাশে গৃহে আবদ্ধ না থেকে আদর্শ কৃষ্ণভক্ত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

"সেই গুরু গুরু নন, সেই স্বজন স্বজন নন, সেই পিতা পিতা নন, সেই মাতা মাতা নন, সেই উপাস্য দেবতা দেবতা নন, অথবা সেই পতি পতি নন—যদি না তিনি তাঁর আশ্রিত জনকে আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে পারেন।" কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণ করছে। তাই বৈদিক সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির মায়াপাশ থেকে জীবদের মুক্ত করা। তার অর্থ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনকে চিরতরে স্তব্ধ করা। তা সম্ভব হয় কেবল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার মাধ্যমে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, কেউ যখন যথাযথভাবে জানতে পারে যে, আমার জন্ম ও কর্ম হচ্ছে দিব্য, তাকে তার দেহত্যাগের পর আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না—সে আমার নিত্যধামে ফিরে আসে।"

জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে হলে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনকে স্তব্ধ করা যায়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করার ফলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। পিতা, মাতা, গুরু, পতি, অথবা আত্মীয়স্বজন সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে জীবকে সাহায্য করা। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। তাই সেই কথা বিবেচনা করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মা শচীদেবী তাঁর পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি একটি আয়োজন করেছিলেন যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত খবরাখবর তিনি পেতে পারেন।

শ্লোক ১৮২

তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয় ।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য হয় ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বললেন, "আমার মনে হয় নিমাই যদি জগন্নাথপুরীতে থাকে, তা হলে এই দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

শ্লোক ১৮৩

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর ।
লোক-গতাগতি-বার্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথপুরী আর নবদ্বীপ হচ্ছে যেন একেবারে দুটি ঘর। সব সময় কেউ না কেউ নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে যাচ্ছে এবং নীলাচল থেকে কেউ না কেউ নবদ্বীপে আসছে। তার ফলে আমি সব সময় তার খবরাখবর পাব।

শ্লোক ১৮৪

তুমি সব করিতে পার গমনাগমন ।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা সকলেই সেখানে যাতায়াত করতে পার এবং সেও কখনও কখনও গঙ্গাস্নান করার জন্য আসতে পারে।

শ্লোক ১৮৫

আপনার দুঃখ-সুখ তাহাঁ নাহি গণি ।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি আমার নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবি না, তার সুখই আমার সুখ।"

শ্লোক ১৮৬

শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন ।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতার এই কথা শুনে, সমস্ত ভক্তরা তাঁর স্তুতি করলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, বৈদিক আদেশের মতোই তাঁর এই আদেশ পালন করা হবে।

শ্লোক ১৮৭

ভক্তগণ প্রভু-আগে আসিয়া কহিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতার এই সিদ্ধান্তের কথা ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গিয়ে জানালেন। সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১৮৮

নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ ।
সবারে সম্মান করি' বলিলা বচন ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

নবদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থানের সমস্ত ভক্তদের সম্মান প্রদর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—

শ্লোক ১৮৯

তুমি-সব লোক—মোর পরম বান্ধব ।
এই ভিক্ষা মাগোঁ,—মোরে দেহ তুমি সব ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা সকলে আমার পরম বন্ধু। তোমাদের কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই। তোমরা দয়া করে তা আমাকে দাও।

শ্লোক ১৯০

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্তন ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ আরাধন ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা সকলে ঘরে ফিরে গিয়ে সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন কর, সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা আলোচনা কর এবং শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'হরে কৃষ্ণ আন্দোলন' মহাপ্রভু নিজেই অত্যন্ত প্রামাণিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এমন নয় যে সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। মহাপ্রভু এখানে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ অনুসারে সকলেই গৃহে থেকে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। সকলেই সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারেন। যে কেউ *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারেন এবং গৃহে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অথবা শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সাবধানে তাঁদের আরাধনা করতে পারেন। এমন নয় যে সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে চান, তা হলে তিনি তাঁর গৃহেও ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন

এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী আলোচনা করে নিয়মিতভাবে ভগবানের পূজো করতে পারেন। আমরা মানুষকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছি। কেউ যদি মনে করেন যে, মন্দিরের কঠোর বিধি-নিষেধগুলি পালন করে আশ্রমবাসী হওয়ার জন্য এখনও তিনি প্রস্তুত হননি, বিশেষ করে স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত গৃহস্থেরা—তাঁরা গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সকাল-সন্ধ্যায় ভগবানের আরাধনা করতে পারেন এবং ভগবানের সামনে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী আলোচনা করে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করতে পারেন। সকলের পক্ষে গৃহে থেকেও তা করা সম্ভব এবং সেখানে সমবেত ভক্তদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯১

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন ।
মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সমস্ত ভক্তদের নির্দেশ দিয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে যাওয়ার জন্য তাঁদের আজ্ঞা প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি সেখানে আসবেন এবং তাঁদের দর্শন দান করবেন।

শ্লোক ১৯২

এত বলি' সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা ।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সমস্ত ভক্তদের সম্মান প্রদর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে তাঁদের বিদায় দিলেন।

শ্লোক ১৯৩

সবা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন ।
হরিদাস কান্দি' কহে করুণ বচন ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের বিদায় দিয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে যেতে মনস্থ করলেন। তখন হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করতে করতে তাঁকে বললেন—

শ্লোক ১৯৪

নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি ।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু! তুমি যদি নীলাচলে যাও তা হলে আমার কি গতি হবে? কারণ আমার তো নীলাচলে যাওয়ার শক্তি নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যদিও মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁকে যথাথই দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করার সমস্ত অধিকার ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী) ব্যতীত অন্যদের মন্দিরে প্রবেশ করতে নিষেধ থাকার ফলে, হরিদাস ঠাকুর সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করতে চাননি। তাই তিনি বলেছিলেন যে, মন্দিরে প্রবেশ করার শক্তি তাঁর নেই এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি মন্দিরের অভ্যন্তরে বাস করেন, তা হলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পক্ষে তাঁর দর্শন পাওয়া কোন মতেই সম্ভব হবে না। পরে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন জগন্নাথপুরীতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মন্দির থেকে দূরে সিদ্ধবকুল নামক স্থানে বাস করতেন। সেখানে এখন একটি সিদ্ধবকুল মঠ নির্মিত হয়েছে। জগন্নাথপুরীর দর্শনার্থীরা প্রায় সকলেই সিদ্ধবকুল এবং সমুদ্র উপকূলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির দর্শন করতে যান।

শ্লোক ১৯৫

মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন ।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু আমি অত্যন্ত অধম, তাই আমি তোমার দর্শন পাব না। তা হলে এই পাপিষ্ঠ জীবন আমি কিভাবে ধারণ করব?"

শ্লোক ১৯৬

প্রভু কহে,—কর তুমি দৈন্য সম্বরণ ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন হরিদাস ঠাকুরকে বললেন, "দয়া করে তুমি দৈন্য সংবরণ কর। তোমার এই দৈন্য দর্শন করে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৯৭

তোমা লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন ।
তোমা-লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার জন্য আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কাছে নিবেদন করব এবং তোমাকে আমি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র জগন্নাথপুরীতে নিয়ে যাব।"

শ্লোক ১৯৮

তবে ত' আচার্য কহে বিনয় করিঞা ।
দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিঞা ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁকে অনুরোধ করলেন, আরও দুই-চারদিন যেন তিনি কৃপা করে সেখানে থাকেন।

শ্লোক ১৯৯

আচার্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন ।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে, না কৈল গমন ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুরোধ লঙ্ঘন করতেন না; তাই তিনি তৎক্ষণাৎ জগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা না করে আরও কয়েকদিন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে অবস্থান করলেন।

শ্লোক ২০০

আনন্দিত হৈল আচার্য, শচী, ভক্ত, সব ।
প্রতিদিন করে আচার্য মহা-মহোৎসব ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে অদ্বৈত আচার্য প্রভু, শচীমাতা ও সমস্ত ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রতিদিন মহা-মহোৎসবের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ২০১

দিনে কৃষ্ণ-কথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে ।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিনের বেলায় ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রস আস্বাদন করতেন এবং রাত্রে সংকীর্তন করে মহা-মহোৎসব করতেন।

শ্লোক ২০২

আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন ।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

মহা আনন্দে শচীমাতা রন্ধন করতেন এবং ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা ভোজন করতেন।

শ্লোক ২০৩

আচার্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহ-সম্পদ-ধনে ।
সকল সফল হৈল প্রভুর আরাধনে ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর সমস্ত ধন—তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি, গৃহ, সম্পদ আদি সব কিছু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনায় সফল হল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তদের গৃহে গ্রহণ করে এবং প্রতিদিন মহা-মহোৎসবের আয়োজন করে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু সমস্ত গৃহস্থ-ভক্তদের কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছেন। কারও যদি ধন-সম্পদ ও উপযুক্ত অবস্থা থাকে, তা হলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচাররত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের মাঝে মাঝে গৃহে নিমন্ত্রণ করে, দিনের বেলায় কৃষ্ণকথা আলোচনা করে ও প্রসাদ বিতরণ করে এবং সন্ধ্যাবেলায় অন্তত তিন ঘণ্টার জন্য সংকীর্তন করে মহোৎসব করা। কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিটি কেন্দ্রে এই পন্থা প্রবর্তন করা উচিত। ফলে তারা প্রতিদিন সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) এই কলিযুগে প্রতিদিন সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ)।* প্রসাদ বিতরণ করে এবং হরিনাম সংকীর্তন করে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করা উচিত। এই যজ্ঞ কলিযুগের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এই যুগে অন্য কোন রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই যজ্ঞটি অনায়াসে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতে পারে।

শ্লোক ২০৪

শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

পুত্রের মুখ দর্শন করে শচীমাতার আনন্দ বর্ধিত হল এবং তাঁকে ভোজন করিয়ে তিনি মহাসুখ পেলেন।

শ্লোক ২০৫

এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে ।
বঞ্চিলা কতকদিন মহা-কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে সমস্ত ভক্তরা মিলিত হলেন এবং মহা আনন্দে কয়েকটি দিন অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২০৬

আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে ।
নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের তাঁদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ২০৭

ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীর্তন ।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে বললেন এবং তিনি তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে, অচিরেই তাঁদের সঙ্গে তাঁর পুনরায় মিলন হবে।

শ্লোক ২০৮

কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি গমন ।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বললেন, "কখনও কখনও তোমরা নীলাচলে যাবে, আবার কখনও কখনও আমি গঙ্গাস্নান করতে আসব।"

শ্লোক ২০৯-২১০

নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৯ ॥
এই চারিজন আচার্য দিল প্রভু সনে ।
জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত—এই চার জনকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যেতে দিলেন। জননী শ্রীশচীমাতাকে প্রবোধ দান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন।

শ্লোক ২১১

তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন ।
এথা আচার্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তাঁর মাতাকে প্রদক্ষিণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে তখন ক্রন্দনের রোল উঠল।

শ্লোক ২১২

নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা ।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য পশ্চাৎ চলিলা ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

অবিচলিতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্রুত গতিতে চলতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর পিছনে পিছনে চললেন।

তাৎপর্য

নিরপেক্ষ শব্দটি বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, জড় বা জড়ীয় অপেক্ষা রহিত, অর্থাৎ স্বরূপ বা ভগবৎ-দাস্যে অবস্থিত। পাছে স্বীয় কৃষ্ণ অন্বেষণ কার্যে বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন শুনে মহাপ্রভু নিরীশ্বর নীতিবাদীদের চক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুর বলে পরিচিত হলেও, জীবের পক্ষে যে তার সর্বোত্তম পরম ধর্ম কৃষ্ণসেবার প্রচেষ্টাই একমাত্র প্রয়োজনীয় কৃত্য, তা তিনি জগদ্‌গুরুরূপে শিক্ষা দিলেন। বহির্দর্শন হেতু অচিৎ-ভোগফলে অচিতেই আসক্তি বা মায়া, তাতে বদ্ধ হলে কৃষ্ণসেবা হয় না। সুতরাং জগতের চক্ষে বহুমান প্রাপ্ত সুনীতিও কৃষ্ণসেবার বিরোধী হলে তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থার বিরোধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই দেখিয়ে গেছেন যে, নিরপেক্ষ না হলে যথাযথভাবে কৃষ্ণসেবা করা যায় না।

শ্লোক ২১৩

কত দূর গিয়া প্রভু করি' যোড় হাত ।
আচার্যে প্রবোধি' কহে কিছু মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুদূর যাওয়ার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাত জোড় করে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে প্রবোধ দিয়ে মধুরভাবে কিছু কথা বললেন।

শ্লোক ২১৪

জননী প্রবোধি' কর ভক্ত সমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "দয়া করে সমস্ত ভক্তদের এবং আমার মাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। আপনি যদি এভাবে ব্যাকুল হন, তা হলে তো কারও পক্ষে প্রাণ ধারণ করা সম্ভব হবে না।"

শ্লোক ২১৫

এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
নিবৃত্তি করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে অনুগমন করা থেকে নিরস্ত করলেন। তারপর তিনি স্বচ্ছন্দে জগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২১৬

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

চারজন সঙ্গীসহ গঙ্গার পথ ধরে ছত্রভোগ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের দিকে চললেন।

তাৎপর্য

চব্বিশ-পরগণা জেলার পূর্ব-রেলের দক্ষিণ বিভাগে মগরাহাট নামক একটি স্টেশন রয়েছে। এই স্টেশনের দক্ষিণ-পূর্বে চোদ্দ মাইল দূরে জয়নগর বলে একটি স্থান আছে। জয়নগর স্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে ছত্রভোগ নামক গ্রাম। এই গ্রামটিকে কখনও কখনও 'খাদি' বলা হয়। এই গ্রামে বৈজুর্কানাথ নামক মহাদেবের একটি বিগ্রহ রয়েছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এখানে নন্দা-মেলা নামক একটি মেলা হয়। বর্তমানে গঙ্গা সেখান দিয়ে প্রবাহিতা হয় না। ওই রেল লাইনে বারুইপুর নামক আর একটি স্টেশন রয়েছে এবং তার নিকটে আটিসারা নামক স্থান। পূর্বে এই গ্রামটি গঙ্গার তটে অবস্থিত ছিল। সেই গ্রাম হয়ে পাণিহাটি এবং বরাহনগর দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীর দিকে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গা কলকাতার দক্ষিণে কালীঘাট দিয়ে প্রবাহিত হত, তাকে এখনও আদিগঙ্গা বলা হয়। বারুইপুর থেকে গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয়ে মথুরাপুর থানার ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্রে পতিত হয়। সেই পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১৭

'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি-গমন ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত) নামক গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশের আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ-ছত্রভোগ, উৎকলের প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, জাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধ-ঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দুসরোবর), কমলপুর, আঠারনালা হয়ে শ্রীনীলাচলে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২১৮

অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যদি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম-ধন লাভ করেন।

শ্লোক ২১৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—*'মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈতগৃহে প্রসাদসেবন'* বর্ণনা করে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর ভগবদ্ভক্তি

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথাসারে বলেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগের পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বরের মধ্য দিয়ে উৎকল রাজ্যের এক সীমায় প্রবেশ করেন। পথে নানা প্রকার আনন্দ-কীর্তন ও ভিক্ষা আদি করতে করতে রেমুণা গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করলেন এবং পরম আনন্দে স্বীয় ভক্তদের শ্রীঈশ্বরপুরী কথিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বিষয়ে বর্ণনা করলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পূর্বে বৃন্দাবনের গোবর্ধনে গিয়ে রাত্রিকালে বনের মধ্যে গোপাল আছেন—এই স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্ন দেখে পরদিন সকালবেলায় গোবর্ধনবাসীদের নিয়ে বন থেকে শ্রীগোপালমূর্তি উদ্ধার করে পর্বতের উপর স্থাপন করেন। মহা সমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব হল। সেই খবর ক্রমশ প্রচারিত হলে গ্রামসমূহ থেকে বহু লোক এসে গোপালের মহোৎসব করতে লাগলেন। গোপাল একদিন রাত্রে স্বপ্নে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে নির্দেশ দিলেন যে, "তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গিয়ে মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করে আমাকে মাখিয়ে আমার তাপ দূর কর।" সেই আজ্ঞা পেয়ে পুরী গোস্বামী গৌড় হয়ে উৎকল দেশের রেমুণা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীগোপীনাথ প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়ে শ্রীপুরুষোত্তম গমন করলেন। মাধবেন্দ্র পুরীকে গোপীনাথ চুরি করে ক্ষীর প্রদান করেছিলেন বলে তাঁর নাম 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' হয়েছে। নীলাচলে পৌঁছে শ্রীজগন্নাথের সেবকদের দ্বারা রাজপাত্রদের নিকট থেকে এক মণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করে দুজন লোক দিয়ে সেই চন্দন ও কর্পূর রেমুণা পর্যন্ত আনলে, গোবর্ধনধারী গোপাল তাঁকে পুনরায় স্বপ্নে আজ্ঞা করলেন যে, এই চন্দন ও কর্পূর গোপীনাথের অঙ্গে মাখালে তাঁর তাপ দূর হবে। মাধবেন্দ্র পুরী সেই আজ্ঞা পালন করে পুনরায় নীলাচলে গমন করলেন।

মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি ভক্তদের শুনিয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অনেক প্রশংসা করলেন। মাধবেন্দ্র পুরী রচিত শ্লোক পাঠ করে মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদনা উপস্থিত হল। লোকের সমাগম দেখে মহাপ্রভু তাঁর ভাব সংবরণ করলেন এবং ক্ষীরপ্রসাদ পেলেন। এভাবেই রাত্রি অতিবাহিত করে, তার পরের দিন সকালবেলায় তিনি জগন্নাথপুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যস্মৈ—যাঁকে; দাতুম্—প্রদান করার জন্য; চোরয়ন্—চুরি করে; ক্ষীর-ভাণ্ডম্—ক্ষীরভাণ্ড; গোপীনাথঃ—গোপীনাথ; ক্ষীর-চোরা—ক্ষীরচোরা; অভিধঃ—প্রসিদ্ধ; অভূৎ—হয়েছিলেন; শ্রীগোপালঃ—শ্রীগোপাল বিগ্রহ; প্রাদুরাসীৎ—প্রকাশিত হয়েছিলেন; বশঃ—বশীভূত; সন্—হয়ে; যৎ-প্রেম্ণা—যাঁর প্রেমের দ্বারা; তম্—তাঁকে; মাধবেন্দ্রম্—মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্র পুরীকে; নতঃ অস্মি—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যাঁকে ক্ষীর অর্পণ করার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করে শ্রীগোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা' নাম হয়েছিল এবং যাঁর ভক্তিতে বশীভূত হয়ে শ্রীগোপালদেব প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেই মাধবেন্দ্র পুরীকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এই গোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপালদেবকে পুনরাবিষ্কার করেন এবং গোবর্ধনের চূড়ায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গোপাল-বিগ্রহ এখনও নাথদ্বারে বিরাজমান আছেন এবং বল্লভাচার্যের অনুগামীদের দ্বারা সেবিত হচ্ছেন। মহা সমারোহে এই বিগ্রহ পূজিত হন এবং সেখানে স্বল্পমূল্যে বহু প্রকার প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় হোক! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয় হোক!

শ্লোক ৩-৪

নীলাদ্রিগমন, জগন্নাথ-দরশন ।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য-প্রভুর মিলন ॥ ৩ ॥
এসব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন ।
বিস্তারি' করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে যান এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে এই সমস্ত লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৫

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার ।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত বিচিত্র ও মধুর, আর তা যখন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করলেন, তখন তা অমৃতের ধারার মতো মাধুর্যমণ্ডিত হল।

শ্লোক ৬

অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি ।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি যদি তা বর্ণনা করার চেষ্টা করি, তা হলে তা পুনরুক্তি হবে। সুতরাং দম্ভ করে তা' বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই।

শ্লোক ৭

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন ।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত) গ্রন্থে যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি আমি সূত্ররূপে উল্লেখ করছি।

শ্লোক ৮

তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন ।
যথাকথঞ্চিত করি' সে লীলা কথন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত লীলা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সূত্ররূপে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি, সেই সমস্ত লীলা আমি এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

শ্লোক ৯

অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার ।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক্ আমার ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

অতএব আমি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাতে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার কোন অপরাধ না হয়।

শ্লোক ১০

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে ।
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তন-কুতূহলে ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর চারজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন এবং তিনি তখন তীব্র আকুলতা সহকারে কৃষ্ণনাম কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

ভিক্ষা লাগি' একদিন এক গ্রাম গিয়া ।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একদিন এক গ্রামে গিয়ে স্বয়ং ভিক্ষা করে, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করার জন্য বহু অন্ন নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১২

পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে ।
তা' সবারে কৃপা করি' আইলা রেমুণারে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

পথে বহু নদী ছিল এবং সে সকল নদীর পাড়েই দানী (শুল্ক আদায়কারী) ছিল। তারা মহাপ্রভুকে কোন রকম বাধা প্রদান করেনি। মহাপ্রভু তাদের সকলকে কৃপা করেছিলেন ও অবশেষে তিনি রেমুণা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

বালেশ্বর স্টেশনের পাঁচ মাইল পশ্চিমে রেমুণা গ্রাম অবস্থিত। সেই গ্রামে এখনও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির রয়েছে এবং মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীল শ্যামানন্দ গোসাঞির প্রধান শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাধি মন্দির আছে।

শ্লোক ১৩

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন ।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

রেমুণার মন্দিরে গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত সুন্দর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই মন্দিরে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে গোপীনাথজীকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে ।
তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীগোপীনাথজীকে প্রণাম নিবেদন করছিলেন, তখন গোপীনাথজীর পুষ্পচূড়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাথায় পতিত হল।

শ্লোক ১৫

চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন ।
বহু নৃত্যগীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই পুষ্পচূড়া পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর ভক্তদের নিয়ে তিনি বহু নৃত্য-গীত করলেন।

শ্লোক ১৬

প্রভুর প্রভাব দেখি' প্রেম-রূপ-গুণ ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গভীর কৃষ্ণপ্রেম, তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ এবং অপ্রাকৃত গুণাবলী দর্শন করে, গোপীনাথের সেবকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৭

নানারূপে প্রীত্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
সেই রাত্রি তাহাঁ প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতিবশত তাঁরা নানাভাবে তাঁর সেবা করলেন এবং সেই রাত্রে মহাপ্রভু গোপীনাথ মন্দিরে অবস্থান করলেন।

শ্লোক ১৮

মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা ।
পূর্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপীনাথজীর মহাপ্রসাদ ক্ষীরের লোভে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে থাকলেন। পূর্বে তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর পুরীর কাছে গোপীনাথজীর মহাপ্রসাদ-ক্ষীর মহিমা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম ।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই বিগ্রহ 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা তাঁর ভক্তদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ২০

পূর্বে মাধবপুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি' ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে গোপীনাথজীর এই শ্রীবিগ্রহ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন; তাই তাঁর নাম হয়েছিল ক্ষীরচোরা হরি।

শ্লোক ২১

পূর্বে শ্রীমাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্ধন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ভ্রমণ করতে করতে তিনি গোবর্ধন পর্বতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন, তাই তাঁর রাত্রি-দিন জ্ঞান ছিল না। কখনও তিনি উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন এবং কখনও তিনি ভূপতিত হচ্ছিলেন, কেন না গভীর ভগবৎ-প্রেম হেতু তাঁর স্থানাস্থান জ্ঞান ছিল না।

শ্লোক ২৩

শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি' ।
স্নান করি' বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি' ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোবিন্দকুণ্ডে এসে স্নান করেন এবং তারপর সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটি গাছের নীচে বসেছিলেন।

শ্লোক ২৪

গোপাল-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লঞা ।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন একটি গাছের নীচে বসেছিলেন, তখন এক গোপবালক এক ভাণ্ড দুধ নিয়ে এসে, মাধবেন্দ্র পুরীর সামনে সেটি রেখে দিয়ে মৃদু হেসে তাঁকে বললেন—

শ্লোক ২৫

পুরী, এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান ।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"দয়া করে এই দুধটুকু গ্রহণ কর। তুমি ক্ষুধার্ত হলেও কেন কারও কাছে খাবার চাও না? তুমি সব সময় কার ধ্যান কর?"

শ্লোক ২৬

বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সন্তোষ ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বালকের সৌন্দর্য দর্শন করে মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত প্রীত হলেন। তার মধুর বাক্য শ্রবণ করে তিনি তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন।

শ্লোক ২৭

পুরী কহে,—কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস ।
কেমতে জানিলে, আমি করি উপবাস ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? তুমি কোথায় থাক? আর তুমি কিভাবে জানলে যে আমি উপবাস করি?"

শ্লোক ২৮

বালক কহে,—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি ।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

বালকটি তখন উত্তর দিল, "আমি গোপবালক, এই গ্রামেই আমার বাস। আমাদের এই গ্রামে কেউ উপবাসী থাকে না।

শ্লোক ২৯

কেহ অন্ন মাগি' খায়, কেহ দুগ্ধাহার ।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত' আহার ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ অন্ন ভিক্ষা করে খায়, কেউ আবার শুধুমাত্র দুগ্ধ আহার করে; আর কেউ যদি অন্ন আদি ভিক্ষাও না করে এবং না খায়, তা হলে আমি তাদের আহার্যবস্তু সরবরাহ করি।

শ্লোক ৩০

জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি' গেল ।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"জল নিতে যে সকল স্ত্রীলোকেরা এসেছিলেন, তাঁরা তোমাকে দেখে গিয়েছেন এবং তাঁরাই আমাকে তোমার জন্য এই দুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

শ্লোক ৩১

গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব ।
আরবার আসি আমি এই ভাণ্ড লইব ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বালকটি আরও বলল, "শীঘ্রই আমাকে গোদোহন করতে যেতে হবে, তবে আমি আবার ফিরে এসে এই ভাণ্ডটি নিয়ে যাব।"

শ্লোক ৩২

এত বলি' গেলা বালক না দেখিয়ে আর ।
মাধব-পুরীর চিত্তে হইল চমৎকার ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই বালকটি সেখান থেকে চলে গেল। তাকে আর দেখা গেল না এবং মাধবেন্দ্র পুরীর চিত্ত এক অপূর্ব অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

শ্লোক ৩৩

দুগ্ধ পান করি' ভাণ্ড ধুঞা রাখিল ।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দুধটুকু পান করে মাধবেন্দ্র পুরী ভাণ্ডটি ধুয়ে রাখলেন এবং সেই বালকটির ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই বালকটি আর ফিরে এল না।

শ্লোক ৩৪

বসি' নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয় ।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল,—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী ঘুমোতে পারলেন না। তিনি বসে বসে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে লাগলেন। শেষ রাত্রে তাঁর একটু তন্দ্রা এল এবং তখন তাঁর বাহ্য চেতনা লোপ পেল।

শ্লোক ৩৫

স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা ।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিঞা ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দেখলেন যে, সেই বালকটি তাঁর সামনে এসে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে একটি কুঞ্জে নিয়ে গেল।

শ্লোক ৩৬

কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—আমি এই কুঞ্জে রই ।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরীকে সেই কুঞ্জটি দেখিয়ে বালকটি বলল, "আমি এই কুঞ্জে থাকি এবং সেই জন্য প্রচণ্ড শীত, বৃষ্টি, ঝড় ও তাপে আমি বড্ড কষ্ট পাই।

শ্লোক ৩৭

গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে ।
পর্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"গ্রামের লোকদের নিয়ে এসে, তাদের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ থেকে নিয়ে যাও। তারপর আমাকে ভালভাবে পর্বতের উপরে রাখ।

শ্লোক ৩৮

এক মঠ করি' তাহাঁ করহ স্থাপন ।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পর্বতের উপর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর এবং সেখানে আমাকে স্থাপন কর। তারপর, প্রচুর পরিমাণে শীতল জল দিয়ে আমার শ্রীঅঙ্গ মার্জন কর।

শ্লোক ৩৯

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বহুদিন ধরে আমি তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'কবে মাধবেন্দ্র পুরী এখানে আসবে এবং আমার সেবা করবে।'"

শ্লোক ৪০

তোমার প্রেমবশে করি' সেবা অঙ্গীকার ।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার প্রতি তোমার ঐকান্তিক প্রেমের প্রভাবে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করেছি। তাই আমি এভাবেই প্রকাশিত হব এবং আমার দর্শন দান করে জগতের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করব।

শ্লোক ৪১

'শ্রীগোপাল' নাম মোর,—গোবর্ধনধারী ।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহাঁ অধিকারী ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার নাম শ্রীগোপাল। আমি গিরি-গোবর্ধনধারী। বজ্র আমার এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আমি এই স্থানের অধিকারী।

শ্লোক ৪২

শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা ।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"মুসলমানেরা যখন এই স্থান আক্রমণ করে, তখন আমার সেবা করছিল যে পূজারী, সে আমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে কুঞ্জে লুকিয়ে রাখে। তারপর মুসলমানদের ভয়ে ভীত হয়ে সে এখান থেকে পালিয়ে যায়।

শ্লোক ৪৩

সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে ।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই থেকে আমি এই কুঞ্জে থাকি। এটি খুবই ভাল হল যে, তুমি এখন এখানে এসেছ। এখন সাবধানতা সহকারে আমাকে নিয়ে যাও।"

শ্লোক ৪৪

এত বলি' সে-বালক অন্তর্ধান কৈল ।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই বালকটি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তখন ঘুম থেকে জেগে উঠে, মাধবেন্দ্র পুরী সেই স্বপ্নের কথা বিচার করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে ।
এত বলি' প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী আক্ষেপ করে বললেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখলাম, অথচ তাঁকে চিনতে পারলাম না।" এই বলে প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি ভূপতিত হলেন।

শ্লোক ৪৬

ক্ষণেক রোদন করি, কৈল ধীর ।
আজ্ঞা-পালন লাগি' হইলা সুস্থির ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ ধরে মাধবেন্দ্র পুরী ক্রন্দন করলেন। তারপর গোপালের আদেশ পালন করার জন্য তিনি নিজেকে সংযত করে স্থির হলেন।

শ্লোক ৪৭

প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রামমধ্যে গেলা ।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রাতঃস্নান সমাপন করে মাধবেন্দ্র পুরী গ্রামের মধ্যে গেলেন এবং সকলকে একত্র করে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ৪৮

গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্ধনধারী ।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমাদের এই গ্রামের ঈশ্বর গোবর্ধনধারী ঐ কুঞ্জে অবস্থান করছেন। চল সেখান থেকে আমরা তাঁকে বার করে নিয়ে আসি।

শ্লোক ৪৯

অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ,—নারি প্রবেশিতে ।
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কুঞ্জ অত্যন্ত নিবিড় এবং আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারব না। তাই পথ পরিষ্কার করার জন্য কুঠার, কোদাল আদি নিয়ে চল।

শ্লোক ৫০

শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে, মহা আনন্দে সমস্ত লোক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে চললেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা বৃক্ষ-লতা ছেদন করে কুঞ্জে প্রবেশ করার পথ প্রস্তুত করলেন।

শ্লোক ৫১

ঠাকুর দেখিল মাটী-তৃণে আচ্ছাদিত ।
দেখি' সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা যখন দেখলেন যে শ্রীবিগ্রহ মাটি ও তৃণে আচ্ছাদিত, তখন তাঁরা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হলেন।

শ্লোক ৫২

আবরণ দূর করি' করিল বিদিতে ।
মহা-ভারী ঠাকুর—কেহ নারে চালাইতে ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

আবরণ দূর করার পর তাঁরা দেখলেন যে, সেই বিগ্রহটি অত্যন্ত ভারী এবং কেউ তাঁকে নাড়াতে পারছে না।

শ্লোক ৫৩

মহা-মহা-বলিষ্ঠ লোক একত্র করিঞা ।
পর্বত-উপরি গেল পুরী ঠাকুর লঞা ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন মহা মহা বলিষ্ঠ মানুষেরা একত্রিত হয়ে শ্রীবিগ্রহ পর্বতের উপর নিয়ে গেল। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

শ্লোক ৫৪

পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল ।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

একটি পাথরের সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ বসানো হল এবং একটি বড় পাথর অবলম্বন রূপে সেই বিগ্রহের পিছনে দেওয়া হল।

শ্লোক ৫৫

গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা ।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে নতুন নতুন ঘটে করে গোবিন্দকুণ্ডের জল ছেঁকে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ৫৬

নব শতঘট জল কৈল উপনীত ।
নানা বাদ্য-ভেরী বাজে, স্ত্রীগণ গায় গীত ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

নতুন একশোটি ঘটে করে গোবিন্দকুণ্ডের জল আনা হল। তখন নানা রকম বাদ্য-ভেরী বাজছিল এবং স্ত্রীলোকেরা মধুর স্বরে গীত করছিলেন।

শ্লোক ৫৭

কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল ।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

অভিষেকের সময় কেহ গীত করছিলেন, কেহ নাচছিলেন। এভাবেই তখন এক মহা-মহোৎসব হল। গ্রামে যত দই, দুধ ও ঘি ছিল তা সবই নিয়ে আসা হয়েছিল।

শ্লোক ৫৮

ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত ।
নানা উপহার, তাহা কহিতে পারি কত ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সন্দেশ আদি নানা রকম ভোগসামগ্রী নিয়ে আসা হল। কিন্তু এত রকম উপহার নিয়ে আসা হল যে, তা আমি বর্ণনা করতেও অক্ষম।

শ্লোক ৫৯

তুলসী আদি, পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক ।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে তুলসী, পুষ্প ও বস্ত্র নিয়ে এলেন। তখন মাধবেন্দ্র পুরী নিজেই সেই বিগ্রহের অভিষেক করলেন।

তাৎপর্য

হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে (ষষ্ঠ বিলাস, ত্রিংশ শ্লোক) উল্লেখ করা হয়েছে যে, শঙ্খ, ঘণ্টা ও

বাদ্য সহকারে *'ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ'* এবং *'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্'* আদি *ব্রহ্মসংহিতার* শ্লোক সহকারে পঞ্চামৃত (দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি) দিয়ে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করতে হবে।

শ্লোক ৬০

অমঙ্গলা দূর করি' করাইল স্নান ।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি সমস্ত অমঙ্গল দূর করলেন এবং তারপর সেই শ্রীবিগ্রহ স্নান করাতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি প্রচুর পরিমাণে তেল দিয়ে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ মর্দন করলেন এবং তার ফলে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত উজ্জ্বল হল।

শ্লোক ৬১

পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতে স্নান করাঞা ।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিঞা ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাবার পর, তিনি একশো ঘট জল দিয়ে মহাস্নান করালেন।

তাৎপর্য

পঞ্চগব্য হচ্ছে—দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র ও গোময়। এই সব কয়টি দ্রব্যই আসছে গাভী থেকে, তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, গাভী কত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না শ্রীবিগ্রহের স্নান করাবার জন্য গোমূত্র ও গোময় প্রয়োজন হয়। পঞ্চামৃত হচ্ছে—দই, দুধ, ঘি, মধু ও চিনি। এই পঞ্চামৃতের অধিকাংশ উপাদানও আসছে গাভী থেকে। তা আরও সুস্বাদু করার জন্য চিনি এবং মধু মেশানো হয়।

শ্লোক ৬২

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাস্নানের পর, পুনরায় তেল দিয়ে শ্রীঅঙ্গ চকচকে করা হল। তারপর শঙ্খে রাখা সুগন্ধপূর্ণ জল দিয়ে স্নান করানো হল।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর তাৎপর্যে *হরিভক্তিবিলাস* থেকে উদ্ধৃতি

দিয়েছেন। যবচূর্ণ, গমচূর্ণ, লোধ্রচূর্ণ, কুমকুমচূর্ণ, মাষচূর্ণ দ্বারা সম্মার্জন। কলায় ও পিষ্টচূর্ণের আবাটা দিয়ে এবং উষীর (বেনার মূল) আদির তৈরি কুঁচি (তুলি), গো-পুচ্ছলোমের তৈরি কুঁচি (তুলি) প্রভৃতি দিয়ে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গময়লা দূর করা হয়। শ্রীঅঙ্গে যে তেল লেপন করা হয় তা সুগন্ধিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাস্নানের সময় অন্ততপক্ষে আড়াই মন জল দিয়ে শ্রীবিগ্রহ স্নান করানো হয়।

শ্লোক ৬৩

শ্রীঅঙ্গ মার্জন করি' বস্ত্র পরাইল ।
চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅঙ্গ মার্জন করে তিনি বস্ত্র পরালেন। তারপর চন্দন, তুলসী, পুষ্পমালা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে পরিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৬৪

ধূপ, দীপ, করি' নানা ভোগ লাগাইল ।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

অভিষেকের পর ধূপ ও দীপ জ্বালানো হল এবং শ্রীবিগ্রহকে নানা প্রকার ভোগ নিবেদন করা হল। দই, দুধ, সন্দেশ আদি যা কিছু এসেছিল তা সবই নিবেদন করা হল।

শ্লোক ৬৫

সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল ।
আচমন দিয়া সে তাম্বূল নিবেদিল ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবিগ্রহকে প্রথমে নানা প্রকার ভোগ নিবেদন করা হল, তারপর নতুন পাত্রে সুবাসিত জল নিবেদন করা হল এবং তারপর মুখ ধোয়ার জন্য জল দেওয়া হল। অবশেষে বিবিধ মসলাসহ তাম্বূল নিবেদন করা হল।

শ্লোক ৬৬

আরত্রিক করি, কৈল বহুত স্তবন ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল আত্ম-সমর্পণ ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর ভগবানের আরতি করা হল, আরতির পরে সকলে বহুবিধ স্তব করলেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে আত্মসমর্পণ করলেন।

শ্লোক ৬৭

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ ।
সকল আনিয়া দিল পর্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামের লোকেরা যখন বুঝতে পারলেন যে, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে, তখন তাঁদের ঘরে যত চাল, ডাল ও আটা ছিল তা সবই তাঁরা নিয়ে এলেন। এত পরিমাণে তাঁরা এই সব নিয়ে এসেছিলেন যে, তাতেই পর্বতের উপরিভাগ পূর্ণ হয়ে গেল।

শ্লোক ৬৮

কুম্ভকার ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন ।
সব আনাইল প্রাতে, চড়িল রন্ধন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামের লোকেরা চাল, ডাল ও আটা নিয়ে এলে, গ্রামের কুম্ভকারেরা তাদের ঘরে যত মৃৎপাত্র ছিল তা সবই নিয়ে এল এবং ভোরবেলা থেকে রান্না শুরু হল।

শ্লোক ৬৯

দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

দশজন বিপ্র অন্ন রান্না করলেন, আর পাঁচজন বিপ্র নানা প্রকার ব্যঞ্জন আদি রান্না করলেন।

শ্লোক ৭০

বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
কেহ বড়া-বড়ি-কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

বন থেকে সংগ্রহ করে আনা বিভিন্ন রকমের শাকসবজি, ফল ও মূল দিয়ে নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না করা হল এবং কেউ কেউ বড়া-বড়ি ও কড়ি আদি রান্না করলেন। এভাবেই ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার ভোগের উপকরণ তৈরি করলেন।

শ্লোক ৭১

জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি-রাশি ।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি' ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

পাঁচ থেকে সাতজন লোক রাশি-রাশি রুটি তৈরি করলেন, যেগুলি ঘিতে চুবানো হয়েছিল এবং তখন অন্ন, ব্যঞ্জন ও ডালে এত ঘি দেওয়া হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন সেগুলি ঘিতে ভাসছে।

শ্লোক ৭২

নববস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি' রান্ধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

নতুন কাপড়ের উপর পলাশ পাতা পেতে, তার উপর স্তূপাকারে অন্ন রাখা হল।

শ্লোক ৭৩

তার পাশে রুটি-রাশির পর্বত হইল।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

অন্নের স্তূপের পাশে পর্বতের আকারে রাশি রাশি রুটি রাখা হল এবং তার চারপাশে বিভিন্ন পাত্রে সূপ আদি ব্যঞ্জন রাখা হল।

শ্লোক ৭৪

তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনী, সর পাশে ধরি আনি' ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার পাশে দই, দুধ, মাঠা, শিখরিণী, পায়স, মথনী, সর আদি পাত্র পূর্ণ করে রাখা হল।

তাৎপর্য

এই ধরনের অন্নকূট মহোৎসবের সময়ে স্তূপাকারে পর্বতের মতো করে অন্ন-ব্যঞ্জন আদি সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং পরে তা প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয়।

শ্লোক ৭৫

হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই অন্নকূট সাজানো হল এবং মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী সবকিছু গোপালকে নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৭৬

অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

পান করার জন্য অনেকগুলি ঘট পূর্ণ করে সুবাসিত জল দেওয়া হয়েছিল এবং শ্রীগোপাল বহুদিন ধরে ক্ষুধার্ত থাকার ফলে সব কিছুই খেয়ে নিল।

শ্লোক ৭৭

যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীগোপাল তাঁকে নিবেদিত ভোগ-সামগ্রীর সব কিছুই খেয়ে নিল, তবুও তাঁর হস্তস্পর্শে পুনরায় সব কিছু যেমনটি ছিল তেমনই রয়ে গেল।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না কিভাবে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের নিবেদিত ভোগসামগ্রী গ্রহণ করতে পারেন। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"ভক্তি ও প্রীতি সহকারে কেউ যদি আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল ও একটু জল দেয়, তা হলে আমি তা গ্রহণ করি।" ভগবান পূর্ণ এবং তাই তিনি ভক্তের নিবেদিত সমস্ত ভোগসামগ্রী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর চিন্ময় হস্তস্পর্শে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যেমনটি দেওয়া হয় তেমনটিই রয়ে যায়। কেবল গুণগতভাবে তার পরিবর্তন হয় মাত্র। নিবেদন করার পূর্বে যা থাকে জড় খাদ্য, নিবেদন করার পর তা চিন্ময় প্রসাদে রূপান্তরিত হয়। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাই ভোগসামগ্রী গ্রহণের পরেও তা তেমনই থেকে যায়। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।* শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট গুণগতভাবে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অব্যয়, শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টও শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে তা অব্যয়। আর তা ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে কোন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে আহার করতে পারেন। তিনি চোখ দিয়ে দেখে অথবা কেবল হাত দিয়ে স্পর্শ করার মাধ্যমেও আহার করতে পারেন। তা বলে মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের আহার করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষের মতো ক্ষুধার্ত হন না, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষুধার্ত হওয়ার মতো লীলা করেন এবং তাই তিনি যে কোন পরিমাণে আহার করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন করার ব্যাপারে যে দর্শন রয়েছে, তা আমরা আমাদের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব

করতে পারি। নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও বৈশিষ্ট্য আদি সব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেউই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হলে ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/২৩৪) ভক্তরা উপলব্ধির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। ভক্তিবিহীন জড়বাদী পণ্ডিতেরা কখনও তাদের গবেষণার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৭৮

ইঁহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি ।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপাল যে কিভাবে সব কিছু আহার করলেন এবং আহার করা সত্ত্বেও কিভাবে সব কিছুই যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়ে গেল, তা একমাত্র শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীই অনুভব করলেন; তাঁর মতো ভক্তের কাছে গোপালের লুকানো কিছুই নেই।

শ্লোক ৭৯

একদিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল ।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিনের উদ্‌যোগে শ্রীগোপালের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সেই অপূর্ব মহোৎসব হয়েছিল এবং তা গোপালেরই প্রভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ এই কথা বুঝতে পারল না।

তাৎপর্য

অতি অল্প সময়ের মধ্যে (কেবলমাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে) কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়েছে এবং তা দেখে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা বুঝতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সবই সম্ভব। পাঁচ বছর কেন? কেবলমাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর নামের মহিমা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই রকম অলৌকিক কার্য সম্ভব। আমরা কেবল তাঁর

হাতের হাতিয়ার বিশেষ। মাত্র আঠারো দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের ভয়ংকর যুদ্ধে অর্জুনের জয় হয়েছিল, কেন না শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করেছিলেন।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুন রয়েছেন, সেখানেই শ্রী, ঐশ্বর্য, বিজয়, অসাধারণ শক্তি ও নীতি বিরাজ করছে। এটিই হচ্ছে আমার মত।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৭৮)

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকেরা যদি ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাদের সঙ্গে থাকবেন। কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ ও অনুকূল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের জয় হয়েছিল, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনেরও বিজয় তেমনই অবশ্যম্ভাবী, যদি আমরা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হই এবং আমাদের পূর্বতন আচার্যবর্গের (ষড়্‌গোস্বামী এবং ভগবানের অন্যান্য ভক্তদের) নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা করি। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস। জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ।* কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের আদর্শ কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গ করা। *ভক্তসনে বাস*—তারা কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা আন্দোলনের বাইরে কোথাও যেতে পারেন না। সংঘের মধ্যে থেকে আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে এবং তাঁর নাম ও যশ বিস্তার করে পূর্বতন আচার্যবর্গের সেবা করা উচিত। ভক্তদের সাথে আমরা যদি ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করি, তা হলে তা সফল হবেই। কিভাবে যে তা সম্ভব হবে সেই জন্য আমাদের জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় নিঃসন্দেহে তা হবেই।

শ্লোক ৮০

আচমন দিয়া দিল বিড়ক-সঞ্চয় ।
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপালকে মুখ ধোয়ার জল দিলেন এবং তাঁকে তাম্বুল নিবেদন করলেন। তারপর, আরতি করার সময় সমস্ত লোক 'জয়, জয়!' ধ্বনি দিয়েছিল।

শ্লোক ৮১

শয্যা করাইল, নূতন খাট আনাঞা ।
নব বস্ত্র আনি' তার উপরে পাতিয়া ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

নতুন খাট এনে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপালের শয্যা রচনা করলেন এবং নতুন বস্ত্র এনে তিনি তার উপরে পেতে দিলেন।

শ্লোক ৮২

তৃণ-টাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল ।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

চাটাই (ঘাসের তৈরি বেড়া বিশেষ) দিয়ে চারপাশ ঘিরে একটি অস্থায়ী মন্দির তৈরি করা হল এবং তার উপরিভাগও একটি চাটাই দিয়ে আচ্ছাদিত করা হল।

শ্লোক ৮৩

পুরী-গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে ।
আ-বাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানকে শয্যায় শয়ন দেওয়ার পর, মাধবেন্দ্র পুরী সমস্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, "এখন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতাদের এই মহাপ্রসাদ ভোজন করাও।"

শ্লোক ৮৪

সবে বসি' ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে বসে ক্রমে ক্রমে ভোজন করলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের সবার আগে খাওয়ানো হল।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্রাহ্মণদের সবার আগে সম্মান জানানো হয়। তাই সেই উৎসবে ব্রাহ্মণ এবং তাদের পত্নীদের প্রথমে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর অন্যান্যদের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের) মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রথা চিরকাল চলে আসছে এবং জাতি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণোচিত গুণে গুণান্বিত না হলেও, ভারতবর্ষে এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। তার কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষে এখনও বর্ণাশ্রম-প্রথা অনুসরণ করা হয়।

শ্লোক ৮৫

অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

কেবলমাত্র গোবর্ধন-গ্রামের লোকেরাই প্রসাদ পেলেন না, অন্যান্য গ্রামের যত লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই গোপাল-বিগ্রহ দর্শন করে প্রসাদ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮৬

দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার ।
পূর্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাব দেখে, সেখানে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হলেন। কৃষ্ণলীলায় যে অন্নকূট মহোৎসব হয়েছিল, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রভুর কৃপায় তাঁরা যেন সাক্ষাৎ সেই অন্নকূট মহোৎসবই দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে দ্বাপর যুগের শেষে, সমস্ত ব্রজবাসীরা যখন ইন্দ্রপূজার আয়োজন করেছিলেন, তখন কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে গাভী, ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পর্বতের পূজা করেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি হচ্ছি গিরিগোবর্ধন।" এভাবেই তিনি গোবর্ধন পর্বতকে নিবেদিত সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২৪/২৬, ৩১-৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে—

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ ।
সংযাবাপূপশঙ্কুল্যঃ সর্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥
কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পং জিঘাংসতা ।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ ॥
তথা চ ব্যদধুঃ সর্বং যথাহ মধুসূদনঃ ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥
উপহৃত্য বলীন্ সর্বানাদৃতা যবসং গবাম্ ।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥

" 'মুগ ডাল থেকে শুরু করে পায়েস পর্যন্ত এবং গোধূমজাত পিঠে, শঙ্কুলি প্রভৃতি পাক করা হোক এবং সমস্ত ব্রজবাসীদের দোহন কৃত দুধ, দই প্রভৃতি এখানে আনয়ন করা হোক।' "

"কালরূপী ভগবান ইন্দ্রের গর্বনাশের জন্য এরূপ বললে, তা শুনে নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা সম্যকভাবে তা গ্রহণ করলেন এবং তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করা হল। স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ দিয়ে তাঁরা গিরি-গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণদের পূজা করে সাদরে গাভীদের তৃণ প্রদানপূর্বক সম্মুখে রেখে গিরি-গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন।"

শ্লোক ৮৭

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের মাধবেন্দ্র পুরী দীক্ষা দান করে বৈষ্ণবে পরিণত করলেন, এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন সেবায় নিয়োজিত করলেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।* যোগ্য ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিমূলক কার্যে দক্ষ হতে হবে। উক্ত শ্লোকে ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *পঠন* মানে হচ্ছে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে। *পাঠন*, অর্থাৎ অন্যদের বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দিতে সমর্থ হতে হবে। *যজন*, অর্থাৎ ভগবানের বিভিন্ন বিগ্রহ আরাধনায় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে (যজ্ঞ সম্পাদনে) দক্ষ হতে হবে। এই যজ্ঞের জন্য সমাজের মাথাস্বরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য সমস্ত বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন। এটিকে বলা হয় *যাজন*, অর্থাৎ অন্যদের ধর্ম-অনুষ্ঠানে সহায়তা করা। বাকি দুটি কর্তব্য হচ্ছে *দান* ও *পরিগ্রহ*। ব্রাহ্মণ তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কাছ থেকে নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সমস্ত টাকা রেখে দেন না। যতটুকু দরকার ততটুকুই কেবল তিনি রাখেন এবং তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু তা সবই তিনি দান করে দেন।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চন করতে হলে, এই ধরনের যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হবে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বৈষ্ণবের স্থান ব্রাহ্মণের থেকেও উচ্চে। মাধবেন্দ্র পুরীর দেওয়া এই দৃষ্টান্তটি প্রতিপন্ন করে যে, যোগ্যতা-সম্পন্ন সুদক্ষ ব্রাহ্মণও বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে, বিষ্ণু-বিগ্রহের সেবক হতে পারেন না বা তাঁর পূজা-অর্চনা করতে পারেন না। শ্রীগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সমস্ত ব্রাহ্মণদের বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন সেবা দান করেছিলেন। ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত (মঙ্গল আরতি থেকে শয়ন আরতি পর্যন্ত) অন্ততপক্ষে পাঁচ-ছয়জন ব্রাহ্মণকে শ্রীবিগ্রহের তত্ত্বাবধান করতে হয়। মন্দিরে ছয়বার আরতি করা হয় এবং বহুবার ভোগ নিবেদন করা হয়। তা ছাড়া প্রসাদও বিতরণ করতে হয়। পূর্বতন আচার্যেরা এভাবেই শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করার পদ্ধতি প্রদান করে গেছেন। আমাদের সম্প্রদায় মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মাধবেন্দ্র পুরীর ধারায় অবস্থিত। আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, যিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমাদের সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলা হয়। সেই জন্য আমাদের নিষ্ঠা সহকারে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য এবং মাধবেন্দ্র পুরী কিভাবে গোবর্ধন পর্বতের উপরে গোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একদিনের মধ্যে অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তা সবই নিষ্ঠা সহকারে পালন করা উচিত। আমেরিকা, ইউরোপ আদি ঐশ্বর্যশালী দেশগুলিতে যখন শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন

যেন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নির্দেশ অনুসারে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীবিগ্রহের সেবকেরা যেন অবশ্যই সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়, বৈষ্ণবোচিত আচরণ পরায়ণ হয়, বিশেষ করে মন্দিরে কোন ভক্ত বিগ্রহ দর্শন করতে এলে তাঁদের যেন যথাসম্ভব প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্লোক ৮৮

পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইল করাইল জলপান ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

দুপুরবেলা একটু শয়ন করার পর শ্রীবিগ্রহ বিকেলে জেগে ওঠেন, তখন তাঁকে কিছু ভোগ ও পানের জন্য জল নিবেদন করা হয়।

তাৎপর্য

এই নিবেদনটিকে বলা হয় বৈকালিক-ভোগ।

শ্লোক ৮৯

গোপাল প্রকট হৈল,—দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপালদেবের প্রকট হওয়ার সংবাদ যখন সর্বত্র প্রচারিত হল, তখন চারিদিকের সমস্ত গ্রাম থেকে লোকেরা সেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে এল।

শ্লোক ৯০

একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিঞা।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

এক-এক গ্রামের লোকেরা এক-এক দিন অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠানের সমস্ত আয়োজন করার জন্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে অনুমতি ভিক্ষা করল। এভাবেই তারা দিনের পর দিন মহা আনন্দে অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠান করতে লাগল।

শ্লোক ৯১

রাত্রিকালে ঠাকুরেরে করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সারাদিন কিছু খেলেন না, কেবল রাত্রি বেলায় শ্রীবিগ্রহকে শয়ন দেওয়ার পর একটু গব্য (দুগ্ধজাত দ্রব্য) গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৯২

প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকালবেলায় আবার তিনি সেভাবেই শ্রীবিগ্রহের সেবা করলেন, এবং বিবিধ ভোগ-সামগ্রী নিয়ে এক গ্রামের লোকেরা এল।

শ্লোক ৯৩

অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ,—গ্রামে যত ছিল ।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের গ্রামে যত অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ছিল, তা সব নিয়ে এসে তারা গোপালের সামনে রাখল।

তাৎপর্য

অন্ন, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ হচ্ছে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল উপাদান। ফল-মূল ও শাকসবজি হচ্ছে সম্পূরক। অন্ন সবজি ঘি, দুধ ও দই থেকে শত শত রকমের আহার্য প্রস্তুত করা যায়। অন্নকূট মহোৎসবে গোপালকে নিবেদিত ভোগে কেবল এই পাঁচ প্রকার উপাদানই ছিল। আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেরা কেবল অন্য সমস্ত খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেগুলির কথা এই সম্পর্কে উল্লেখ পর্যন্ত আমরা করব না। আমাদের কেবল বোঝা উচিত যে, পুষ্টিকর আহার্য তৈরি করতে কেবল অন্ন, দুধ, দই, ঘি, শাকসবজি ও ফল-মূল প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া অন্য কিছু শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করা যায় না। শ্রীবিগ্রহকে যা নিবেদিত করা হয় না তা বৈষ্ণব বা সদাচারী মানুষ গ্রহণ করেন না। সরকারের খাদ্যনীতির বিষয়ে মানুষ নিরাশ হচ্ছে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যদি যথেষ্ট গাভী ও অন্ন থাকে, তা হলে সমস্ত খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়। *ভগবদ্গীতায়* তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বৈশ্যরা কৃষি ও গোরক্ষা করবেন। গাভী হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পশু, কেন না সে সুষম খাদ্য দুধ উৎপাদন করে, যা থেকে আমরা ঘি ও দই আদি তৈরি করতে পারি।

মানব-সভ্যতার পূর্ণতা নির্ভর করে কৃষ্ণভাবনামৃতের উপর, যা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করার নির্দেশ দেয়। দুধ, দই, ঘি, অন্ন ও শাকসবজি থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে ভগবানকে নিবেদন করা হয় এবং তারপর তা বিতরণ করা হয়। এখানে আমরা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পার্থক্য দেখতে পাই। যারা গোপালের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে এসেছিলেন, তাঁরা গোপালকে নিবেদন করার জন্য সব রকমের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ভাণ্ডারে যত খাদ্যদ্রব্য ছিল তা সব নিয়ে এসে তাঁরা শ্রীবিগ্রহকে

নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁরা সব কিছু এনেছিলেন কেবল নিজেরা প্রসাদ গ্রহণ করবেন বলে নয়, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করার জন্যও। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করার পন্থা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে অনুমোদন করে। পাপপূর্ণ আহারের অভ্যাস এবং অন্যান্য আসুরিক আচরণ বন্ধ করার জন্য এই পন্থাটির প্রচার সারা পৃথিবী জুড়ে হওয়া উচিত। আসুরিক সভ্যতা কখনও এই জগতে শান্তি আনতে পারে না। যেহেতু আহার হচ্ছে মানব-সমাজের প্রধান প্রয়োজন, তাই যাঁরা ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ বিতরণ করার মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্যা সমাধান করতে তৎপর হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে মাধবেন্দ্র পুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন করা। মানুষ যখন কেবল ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করবে, তখন তারা তাদের সমস্ত আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবে পরিণত হবে। মানুষ যখন কৃষ্ণভাবনায় পর্যবসিত হবে, তখন সরকারও স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠবে। কৃষ্ণভাবনাময় বৈষ্ণব সর্বদাই উদার মনোভাবাপন্ন ও সর্বজীবের হিতৈষী। এই ধরনের মানুষ যখন দেশের নেতৃত্ব করেন, তখন দেশের জনসাধারণ অবশ্যই পুণ্যবান হয়ে ওঠে। তখন আর তারা সমাজের উৎপাত-স্বরূপ অসুরে পরিণত হয় না। তখনই কেবল সমাজের যথার্থ শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে।

শ্লোক ৯৪

পূর্বদিন-প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন ।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রায় আগের দিনের মতো পরের দিনও ব্রাহ্মণেরা রান্না করলেন এবং সেভাবেই অন্নকূট মহোৎসব করা হল। পূর্বদিনের মতোই সেদিনও গোপাল তাঁকে নিবেদিত সমস্ত ভোগ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৯৫

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি ।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার আদর্শ স্থান হচ্ছে ব্রজভূমি বৃন্দাবন, যেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পরায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণও ব্রজবাসীদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রীতি পরায়ণ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) বলা হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে এক প্রতিবেদনশীল সহযোগিতার

ভাব রয়েছে। ভক্ত যতই ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, শ্রীকৃষ্ণও ততই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই ভাব বিনিময় এতই প্রবল হয় যে, মহান ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে পারেন। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা প্রীতি সহকারে সর্বদা আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।" মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং তার প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া। তাই যাঁরা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ গ্রহণ করতে পারেন, যার ফলে তাঁরা অচিরেই তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারেন। আজকাল বহু পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের পক্ষসমর্থন করেন এবং ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের কিছু ধারণাও রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা-বিহীন ধর্ম কোন ধর্মই নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই ধরনের ধর্ম-আচরণকে কৈতব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্ম মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করা। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলার এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন না করে থাকে, তা হলে সে কিভাবে ধর্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবে? তাই কৃষ্ণভাবনামৃত ছাড়া যে ধর্ম আলোচনা বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৯৬

মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু লোক শ্রীগোপালের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে এল এবং তারা সকলে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ সেবন করল। যখন তারা গোপালের অপূর্ব সুন্দর রূপ দর্শন করল, তখন তাদের সমস্ত দুঃখ ও শোকের নিবৃত্তি হল।

শ্লোক ৯৭

আশ-পাশ ব্রজভূমের যত গ্রাম সব ।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজভূমির আশে-পাশে সমস্ত গ্রামগুলি গোপালের আবির্ভাবের কথা জানতে পারল এবং

সেই সমস্ত গ্রামের সমস্ত মানুষেরা তাঁকে দেখতে এল। দিনের পর দিন তাঁরা অন্নকূট মহোৎসব করতে লাগল।

শ্লোক ৯৮

গোপাল-প্রকট শুনি' নানা দেশ হৈতে ।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

কেবল আশে-পাশের গ্রামগুলি থেকেই নয়, শ্রীগোপালদেবের আবির্ভাবের কথা শুনে, নানা দেশ থেকে নানা রকম উপহার সহ লোকেরা আসতে লাগল।

শ্লোক ৯৯

মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি' ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরার সমস্ত ধনী লোকেরাও নানা রকম উপহার নিয়ে এসে, ভক্তিসহকারে সেগুলি ভগবানকে নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১০০

স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য-উপহার ।
অসংখ্য আইসে, নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবে অপর্যাপ্ত পরিমাণে সোনা, রূপা, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য এবং ভক্ষ্য উপহার-সামগ্রী আসতে লাগল। তার ফলে গোপালের ভাণ্ডার প্রতিদিন বাড়তে লাগল।

শ্লোক ১০১

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির ।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

একজন মহান ধনী ক্ষত্রিয় একটি মন্দির তৈরি করে দিলেন, আর একজন পাকশালা তৈরি করে দিলেন এবং অপর আর একজন প্রাচীর তৈরি করে দিলেন।

শ্লোক ১০২

এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল ।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

এক একজন ব্রজবাসী এক একটি করে গাভী দিলেন। এভাবেই গোপালের হাজার হাজার গাভী হল।

তাৎপর্য

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার এটিই হচ্ছে পন্থা—মন্দির তৈরি করা এবং মন্দিরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। ভগবানের মন্দির তৈরির জন্য এবং প্রসাদ বিতরণের জন্য সকলেরই উৎসাহ সহকারে দান করা উচিত। ভক্তের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করা এবং তার ফলে মানুষকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা। ধনী ব্যক্তিরাও এই কার্যকলাপে অংশগ্রহণে আকৃষ্ট হতে পারেন। এভাবে সকলেই পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী হবেন এবং সমগ্র সমাজ কৃষ্ণভাবনায় পরিণত হবে। জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা তখন আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তখন ইন্দ্রিয়গুলি এতই পবিত্র হবে যে, সেগুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে সক্ষম হবে। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* ভগবানের সেবা করার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে পবিত্র হয়। সেই পবিত্র ইন্দ্রিয়গুলি ভগবান হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করার নাম হচ্ছে ভক্তি। ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা যখন জাগরিত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।* (ভঃ গীঃ ১৮/৫৫) মানুষকে তাদের হৃদয়ের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে সুযোগ দেওয়ার এটিই হচ্ছে পন্থা। এভাবেই মানুষ তাদের জীবন সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে।

শ্লোক ১০৩

গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ।
পুরী-গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

কালক্রমে গৌড়বঙ্গ থেকে দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মাধবেন্দ্র পুরী বহু যত্ন করে তাঁদের বৃন্দাবনে রাখলেন।

শ্লোক ১০৪

সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল ।
রাজ-সেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী তাঁদের দীক্ষা দান করে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন এবং তাঁদের হস্তে ভগবানের দৈনন্দিন সেবার ভার অর্পণ করেছিলেন। এভাবে মহা আড়ম্বরে ভগবানের সেবা হতে লাগল এবং তার ফলে মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

গোস্বামীগণ বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেমন—শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির, শ্রীগোপীনাথের মন্দির, শ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্রীরাধা-দামোদর মন্দির এবং শ্রীরাধা-গোকুলানন্দজীর মন্দির। গোস্বামীগণ তাঁদের শিষ্যদের উপর সেই সমস্ত মন্দিরের সেবাপূজার ভার অর্পণ করেছিলেন। এমন নয় যে, সেই সমস্ত শিষ্যরা ছিলেন গোস্বামীদের পরিবারবর্গ। অধিকাংশ গোস্বামী ছিলেন সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বী, বিশেষ করে জীব গোস্বামী তাঁর সমগ্র জীবনে ছিলেন ব্রহ্মচারী। বর্তমানে সেবাইতরা বিগ্রহসেবায় যুক্ত আছেন বলে গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেছেন। এখন সেবাইতরা বংশানুক্রমে মন্দিরের মালিকানা দখল করে বসে আছেন। কিন্তু এই মন্দিরগুলি প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সেবাইতদের সম্পত্তি নয়।

শ্লোক ১০৫

এইমত বৎসর দুই করিল সেবন ।
একদিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই দুই বছর ধরে মহা আড়ম্বরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবিগ্রহের সেবা করলেন। তারপর একদিন মাধবেন্দ্র পুরী একটি স্বপ্ন দেখলেন।

শ্লোক ১০৬

গোপাল কহে, পুরী আমার তাপ নাহি যায় ।
মলয়জ-চন্দন লেপ', তবে সে জুড়ায় ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দেখলেন যে, গোপাল তাঁকে বলছেন, "আমার শরীরের তাপ জুড়াচ্ছে না। মলয়-প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে এসো এবং তা ঘষে আমার অঙ্গে লেপন কর, তা হলে আমার তাপ জুড়াবে।

তাৎপর্য

গোপাল বিগ্রহ বহু বছর জঙ্গলে মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল এবং তাঁকে অভিষেক করার সময় হাজার হাজার ঘড়ার (বড় কলসির) জল দিয়ে স্নান করানো হলেও তিনি তখনও তাপ অনুভব করছিলেন। তাই তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে বলেছিলেন, মলয়-প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে আসার জন্য। মলয়দেশ বা মালাবার-দেশ 'পশ্চিম ঘাট' গিরিকুঞ্জের দক্ষিণ ভাগ। 'নীলগিরি'কেও কেউ কেউ মলয়-পর্বত বলেন। *মলয়জ* শব্দে মলয়দেশে উৎপন্ন চন্দন বোঝান হয়েছে। কখনও কখনও মালয়েশিয়া দেশকেও মলয়-দেশ বলে বর্ণনা করা হয়। পূর্বে এই দেশে চন্দন উৎপাদন হত, কিন্তু এখন তারা রাবার উৎপাদনকে আরও বেশি লাভজনক বলে মনে করে। যদিও বৈদিক সংস্কৃতি এক সময় মালয়েশিয়ায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে। মালয়েশিয়া, জাভা ও ইন্দোনেশিয়ায় এখন বৈদিক সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে।

শ্লোক ১০৭

মলয়জ আন, যাঞা নীলাচল হৈতে ।
অন্যে হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথপুরী থেকে মলয়জ চন্দন নিয়ে এসো। সত্বর সেখানে যাও। যেহেতু অন্য কারও দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়, তাই তোমাকেই যেতে হবে।"

শ্লোক ১০৮

স্বপ্ন দেখি' পুরী-গোসাঞির হৈল প্রেমাবেশ ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্বদেশ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্বপ্ন দেখে মাধবেন্দ্র পুরী ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হলেন এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করার জন্য পূর্ব ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১০৯

সেবার নির্বন্ধ—লোক করিল স্থাপন ।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

যাত্রা করার পূর্বে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভগবানের নিয়মিত সেবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন এবং তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তারপর শ্রীগোপালের আদেশ নিয়ে, তিনি পূর্ব ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১১০

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্যের ঘরে ।
পুরীর প্রেম দেখি' আচার্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে এলেন, তখন তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর ভগবৎ-প্রেম দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১১১

তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যতন করিঞা ।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন এবং তাঁকে দীক্ষা দান করে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন যে, শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু যতিরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অদ্বৈত আচার্য প্রভু দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

একজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, শূদ্র অথবা যাই হোক না কেন, তিনি যদি কৃষ্ণবিজ্ঞানের তত্ত্ববেত্তা হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৮/১২৮) শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এই বর্ণনা সমর্থন করেছেন। *পঞ্চরাত্র* মতে, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষা দানে কারও অধিকার নেই। যেহেতু দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা লাভ করলে দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন; সুতরাং অব্রাহ্মণের অপরকে ব্রহ্মণ্য সঞ্চার করবার ক্ষমতা না থাকায়, ব্রাহ্মণত্ব স্বতই দীক্ষাদাতার প্রয়োজনীয় গুণ-বিশেষ ও আচার্যত্বে অনুস্যূত। বর্ণাশ্রমস্থিত গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় অর্জিত শুক্লবিত্তের দ্বারা নানা উপচার সংগ্রহ করে মন্ত্র দ্বারা ভগবৎ-অর্চনে সমর্থ। তাদৃশ অভিজ্ঞ গৃহস্থ-গুরুর নিকট প্রাকৃত চেষ্টাপর শিষ্য ভগবৎ-সেবাই বর্ণাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য—জেনে নিজে গৃহবাসনা হতে মুক্ত হবার জন্য মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা করেন, তজ্জন্যই গুরুর প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসী-গুরুর অর্চনপরতায় নানা অসুবিধা। পারমার্থিক গুরুকরণে সাধারণ বিধি উপেক্ষিত প্রায় হলেও বাস্তবিকপক্ষে উপেক্ষিত হয় না। শৌক্র-বিপ্রত্ব বা শৌক্র-শূদ্রত্ব কিছু গুরু-বিষয়ে ব্রাহ্মণতার লক্ষীভূত যোগ্যতা নয়, সাবিত্র ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণত্বই উদ্দেশ্য, কেন না শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব-হৃদয়ের ও সমাজের দুর্বলতা লক্ষ্য করে শৌক্র-জন্মেই একমাত্র জনসাধারণের জাতি-বিষয়ক অশুদ্ধ ধারণা পর্যবসিত জেনে 'কিবা বিপ্র' পদ্যে ওই প্রকার উক্তি করলেন। তিনি শাস্ত্রীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন মাত্র; যেহেতু, কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা যে সাবিত্র বা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। *দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।* 'গৃহিগুরু' বললে গৃহব্রত ইন্দ্রিয়দাসগণকে বুঝায় না; আবার 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী' বললে বর্ণাশ্রমাভিমানপর ব্যক্তিকেও বুঝায় না।

শ্লোক ১১২

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন ।
তাঁর রূপ দেখিঞা হৈল বিহ্বল-মন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী রেমুণাতে শ্রীগোপীনাথদেবকে দর্শন করলেন। তাঁর রূপ দর্শন করে তিনি বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ১১৩

নৃত্যগীত করি' জগমোহনে বসিলা ।
'ক্যা ক্যা ভোগ লাগে?' ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্যগীত করে মাধবেন্দ্র পুরী জগমোহন বা নাট-মন্দিরে গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি একজন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীবিগ্রহকে তাঁরা কি কি ভোগ নিবেদন করেন।

শ্লোক ১১৪

সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে ।
উত্তম ভোগ লাগে—এথা বুঝি অনুমানে ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেবার সৌষ্ঠব দেখে অত্যন্ত আনন্দিত মনে মাধবেন্দ্র পুরী উপলব্ধি করলেন যে, সেখানে ভগবানকে অতি উত্তম উত্তম ভোগ নিবেদন করা হয়।

শ্লোক ১১৫

যৈছে ইহা ভোগ লাগে, সকলই পুছিব ।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাইব ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী ভাবলেন, "পূজারীর কাছে আমি জিজ্ঞাসা করব, এখানে গোপীনাথজীকে কি কি ভোগ দেওয়া হয়, যাতে আমাদের পাকশালায় সেই রকম ভোগ তৈরি করে আমি গোপালকে নিবেদন করতে পারি।"

শ্লোক ১১৬

এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে ।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন সেই কথা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে বিস্তারিতভাবে শ্রীগোপীনাথজীর ভোগের বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১১৭

সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি'-নাম ।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রাহ্মণ পূজারীটি বললেন, "সন্ধ্যাবেলা শ্রীবিগ্রহকে বারোটি মৃৎপাত্রে ক্ষীর নিবেদন করা হয়। যেহেতু এই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের মতো, তাই তার নাম 'অমৃতকেলি'।

শ্লোক ১১৮

'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার ।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীনাথের ক্ষীর নামে তা প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে আর কোথাও এই রকম ভোগ নিবেদন করা হয় না।"

শ্লোক ১১৯

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল ।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী যখন সেই ব্রাহ্মণ পূজারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন এই ক্ষীরভোগ নিবেদন করা হল। তা শুনে মাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে ভাবলেন—

শ্লোক ১২০

অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই ।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"অযাচিতভাবে আমি যদি অল্প ক্ষীরপ্রসাদ পাই, তা হলে তার স্বাদ জেনে, আমি সেই রকম ক্ষীর প্রস্তুত করে গোপালকে নিবেদন করতে পারি।"

শ্লোক ১২১

এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল ।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মনে এই ইচ্ছা উদয় হওয়ায় মাধবেন্দ্র পুরী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং

তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করতে লাগলেন। সেই সময় ভোগ নিবেদন সম্পন্ন হল এবং আরতি শুরু হল।

শ্লোক ১২২

আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার ।
বাহিরে আইলা, কারে কিছু না কহিল আর ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

আরতি দেখে মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, তারপর তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আর কাউকে কিছু বললেন না।

শ্লোক ১২৩

অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস ।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী ভিক্ষাও করতেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত এবং জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অযাচিতভাবে কিছু পেলে তিনি খেতেন, আর না পেলে উপবাস করতেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর—পরমহংস স্তর। আহার্য সংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু 'অযাচিত-বৃত্তি' বা আজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন যে পরমহংস, তিনি কারও কাছে আহার্য দ্রব্য পর্যন্ত ভিক্ষা করতেন না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় তাঁকে কিছু খাবার দেন, তা হলে তিনি তা খান, তা না হলে তিনি উপবাস থাকেন। *অযাচিত-বৃত্তি* মানে ভিক্ষাবৃত্তি থেকেও বিরত থাকা, আর *আজগর-বৃত্তি* মানে অজগর সাপের বৃত্তি। বিশালকায় সর্প আহার সংগ্রহের কোন চেষ্টা করে না, আপনা থেকেই তার মুখের মধ্যে যা আসে, তাই তিনি গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে আহার ও নিদ্রায় কালক্ষয় না করে পরমহংস কেবল সর্বতোভাবে ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকেন। সেই কথা ষড়্‌গোস্বামীদের সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে—*নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ*। পরমহংস স্তরে নিদ্রা, আহার ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা জয় করতে হয়। দীন-হীন ভিক্ষুকরূপে তিনি দিবা-রাত্র ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী এই পরমহংস স্তর লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১২৪

প্রেমামৃতে তৃপ্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে ।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরীর মতো পরমহংস সর্বদাই ভগবানের প্রেমরূপ অমৃত পানে তৃপ্ত। জড় ক্ষুধা তৃষ্ণা তাঁর সেবাকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। যখন তাঁর একটু ক্ষীরপ্রসাদ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন সেটিকে তিনি অপরাধ বলে বিবেচনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভোগ যখন রন্ধনশালা থেকে ভোগমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তা ঢেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে নিয়ে যাবার কারণ হচ্ছে তা যেন কেউ দেখতে না পায়। যারা ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তারা ওই ভোগ খাওয়ার বাসনা করতে পারে এবং তার ফলে অপরাধ হয়। তাই কাউকে তা দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। কিন্তু যখন তা শ্রীবিগ্রহের সামনে আনা হয়, তখন সেই ঢাকনা অবশ্যই খুলে ফেলতে হয়। ভগবানকে নিবেদিত সেই ক্ষীরের কথা শুনে, মাধবেন্দ্র পুরী তার অল্প একটু আস্বাদনের ইচ্ছা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর গোপালের জন্য তেমনই ক্ষীর তৈরি করতে পারেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী এতই নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি সেটিকেও অপরাধ বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই কাউকে কিছু না বলে তিনি সেই মন্দির থেকে চলে গিয়েছিলেন। এই কারণে পরমহংসগণকে বলা হয় *বিজিতষড়্‌গুণ*। তিনি অবশ্যই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করেছেন।

শ্লোক ১২৫

গ্রামের শূন্যহাটে বসি' করেন কীর্তন ।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাধবেন্দ্র পুরী গ্রামের এক শূন্যহাটে কীর্তন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে, পূজারী গোপীনাথজীকে শয়ন দিলেন।

তাৎপর্য

মাধবেন্দ্র পুরীর যদিও আহার ও নিদ্রায় স্পৃহা ছিল না, কিন্তু মহামন্ত্র কীর্তনে তাঁর উৎসাহ ছিল সাধক-ভক্তের মতো। মহামন্ত্র কীর্তনে তাঁর পরমহংসোচিত উদাসীনতা ছিল না। এর থেকে বোঝা যায় যে, পরমহংস স্তরের ভগবদ্ভক্ত কীর্তন ত্যাগ করেন না। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং গোস্বামীরাও সংখ্যাপূর্বক হরিনাম কীর্তন করতেন; তাই জপমালায় নাম জপ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি পরমহংস স্তরেও। মন্দির অভ্যন্তরে অথবা বাইরে, যে কোন জায়গায় হরিনাম করা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শূন্যহাটে বসে কীর্তন করছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টকে লিখেছেন—*নাম-গান-নতিভিঃ*। পরমহংস ভক্ত সর্বদাই হরিনাম কীর্তন এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা অভিন্ন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/২৩)

বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার নয়টি পন্থা রয়েছে—*শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।* যদিও এই পন্থাগুলি পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন দেখা যায় সেগুলি অভিন্ন। যেমন, শ্রবণ ও কীর্তন অভিন্ন এবং কীর্তন অথবা শ্রবণ থেকে স্মরণ অভিন্ন। তেমনই, বিগ্রহের অর্চনও কীর্তন, শ্রবণ অথবা স্মরণ থেকে অভিন্ন। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে এই নয়টি পন্থা অবলম্বন করা, কিন্তু তার একটিও যদি অনুশীলন করা হয়, তা হলে পরমহংস স্তর লাভ করে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ১২৬

নিজ কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন ।
স্বপনে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তার কৃত্য সমাপন করে পূজারী শয়ন করলেন। তখন স্বপ্নে শ্রীগোপীনাথদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন—

শ্লোক ১২৭

উঠহ, পূজারী, কর দ্বার বিমোচন ।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পূজারী, ওঠ, মন্দিরের দ্বার খোল। আমি মাধবেন্দ্র পুরী নামক এক সন্ন্যাসীর জন্য একপাত্র ক্ষীর রেখে দিয়েছি।

শ্লোক ১২৮

ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয় ।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার বসনাঞ্চলের আড়ালে আমি একপাত্র ক্ষীর রেখে দিয়েছি। আমার মায়ার প্রভাবে তোমরা তা দেখতে পাওনি।

শ্লোক ১২৯

মাধব-পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মাধবেন্দ্র পুরী নামক এক সন্ন্যাসী শূন্যহাটে বসে আছেন। তুমি তাড়াতাড়ি এই ক্ষীর তাঁকে দিয়ে এসো।"

শ্লোক ১৩০

স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি' করিলা বিচার ।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে পূজারী তৎক্ষণাৎ সেই সম্বন্ধে বিচার করলেন এবং স্নান করে কপাট খুলে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ১৩১

ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর ।
স্থান লেপি' ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথজীর কথা মতো পূজারী মন্দিরে গিয়ে দেখলেন যে, গোপীনাথের বসনাঞ্চলের আড়ালে একপাত্র ক্ষীর রয়েছে। তখন ক্ষীর অপসারণ করে, সেই স্থানটি গোময় দিয়ে লেপন করে পূজারী মন্দির থেকে বার হলেন।

শ্লোক ১৩২

দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা ।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দিরের দরজা বন্ধ করে তিনি সেই ক্ষীরপাত্রটি সঙ্গে নিয়ে হাটে গিয়ে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর অন্বেষণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৩

ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী' ।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

ক্ষীরপূর্ণ পাত্রটি নিয়ে পূজারী উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, "যাঁর নাম মাধবেন্দ্র পুরী, তিনি দয়া করে এই ক্ষীর গ্রহণ করুন। আপনার জন্য গোপীনাথ এই ক্ষীর চুরি করেছেন!"

তাৎপর্য

পরম সত্য ও আপেক্ষিক সত্যের পার্থক্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে গোপীনাথজী খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন একটি চোর। তিনি একপাত্র ক্ষীর চুরি করেছেন এবং তা গোপন রাখা হয়নি, কেন না তাঁর এই চুরি এক

মহান অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস। জড় জগতে চুরি করা একটি মস্ত বড় অপরাধ, কিন্তু চিৎ-জগতে ভগবানের এই যে চুরি তা এক অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস। মূর্খ জড়বাদীরা, যারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সমালোচনা করে, কিন্তু তারা জানে না যে, তাঁর আপাত নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপ যা গোপন রাখা হয়নি, তা ভক্তকে আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত করে। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত না হওয়ার ফলে, এই সমস্ত মূর্খেরা তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে এবং তার ফলে দুষ্কৃতিকারীর পর্যায়ভুক্ত হয়। এই দুষ্কৃতকারী চার প্রকার—'মূঢ়', 'নরাধম', 'আসুরিক ভাবাশ্রিত' ও 'মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান'। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বর্ণনা করেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা, যারা মূঢ়, নরাধম, মায়া দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাব আশ্রয় করেছে, তারা আমার শরণাগত হয় না।"

জড়বাদী মূর্খেরা বুঝতে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পরম ঈশ্বর ভগবান, তাই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ পরম মঙ্গলময়। ভগবানের এই গুণটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩৩/২৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ কেউ জাগতিক বিচারে পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ নীতি-বিগর্হিত বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। যেমন, সূর্য কেবল সমুদ্র থেকে জল শোষণ করে না, পৃথিবীর উপরিভাগ থেকেও জল শোষণ করে। সূর্য নালা, নর্দমা এবং মল-মূত্রপূর্ণ স্থান থেকেও জল শোষণ করে। কিন্তু তার ফলে সূর্য অপবিত্র হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্য নোংরা জায়গাকে পবিত্র করে দেয়। কোন এক ভক্ত যদি কোন অসৎ অথবা অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তা হলেও তিনি পবিত্র হন; তার অপবিত্রতা ভগবানকে স্পর্শ করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২৯/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাম, ক্রোধ অথবা ভয়ের (*কামং ক্রোধং ভয়ম্*) দ্বারা পরিচালিত হয়ে, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হন, তা হলেও তিনি পবিত্র হন। ব্রজ-গোপিকারা যুবতী রমণী এবং নব যৌবনসম্পন্ন সুন্দর কৃষ্ণের প্রতি তাঁরা আকৃষ্টা হয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তারা যেন কামার্ত হয়েই ভগবানের প্রতি আকৃষ্টা হয়েছিলেন এবং ভগবান গভীর নিশীথে তাদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। জড় দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই সমস্ত কার্যকলাপ অতীব বিগর্হিত বলে মনে হতে পারে, কেন না বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা যুবতী রমণী কোন যুবকের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে নৃত্য করার জন্য গৃহত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু জড়-জাগতিক বিচারে তা নীতি-বিগর্হিত হলেও ব্রজ-গোপিকাদের এই কার্যকলাপ সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ, কামার্তা হয়ে গভীর নিশীথে তাঁরা যাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অভক্তেরা কিন্তু এই তত্ত্ব বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্যই তত্ত্বত জানতে হবে। সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে বিবেচনা করা উচিত যে, যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম উচ্চারণ করার প্রভাবে পবিত্র হওয়া যায়, তা হলে সেই কৃষ্ণ কিভাবে চরিত্রহীন হতে পারে? দুর্ভাগ্যবশত, কতকগুলি জড়বাদী মূর্খকে শিক্ষাবিদের আসনে বসানো হয়েছে এবং তারা সেই অতি উচ্চ আসনে বসে জনসাধারণকে অধর্মের নীতি শিক্ষা দিচ্ছে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ*—"এক অন্ধ অন্য সমস্ত অন্ধদের পথ প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে।" এই সমস্ত মূর্খদের অপরিণত জ্ঞানের দরুন ব্রজ-গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস আলোচনা করা উচিত নয়। তাঁর ভক্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীর চুরির কথাও অভক্তদের আলোচনা করা উচিত নয়। অতএব সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, এই সমস্ত বিষয়ে এমন কি চিন্তা পর্যন্ত করাও উচিত নয়। কৃষ্ণ যদিও পবিত্র থেকেও পবিত্রতম, তবুও জড়বাদীরা যদি শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অতি বিগর্হিত বলে মনে করে, তা হলে তারা নিজেরাই কলুষিত হয়ে পড়ে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও ব্রজ-গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ জন সমক্ষে আলোচনা করেননি। সেই বিষয়ে তিনি কেবল তাঁর অতি অন্তরঙ্গ তিনজন পার্ষদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের মতো তিনি কখনও জন সমক্ষে রাসলীলা আলোচনা করেননি, যদিও পেশাদারী পাঠকেরা কৃষ্ণকে অথবা শ্রোতাদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জনসাধারণকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমবেতভাবে সংকীর্তন করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৪

ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে ।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

পূজারী বললেন, "এই ক্ষীর গ্রহণ করে তুমি মহা আনন্দে ভক্ষণ কর। তোমার মতো ভাগ্যবান ত্রিভুবনে আর কেউ নেই।"

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের নীতি-বিগর্হিত মঙ্গলময় কার্যকলাপের একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে। যে ভক্তের জন্য গোপীনাথ চুরি করেন, সেই ভক্ত ত্রিভুবনে সব চাইতে ভাগ্যবান ব্যক্তিতে পরিণত হন। ভগবানের অপরাধমূলক কার্যকলাপ তাঁর ভক্তকে ত্রিভুবনে সব চাইতে ভাগ্যবান ব্যক্তিতে পরিণত করে। জড়বাদী মূর্খেরা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করবে এবং তাঁর কার্যকলাপের নৈতিকতা বা অনৈতিকতা বিচার করবে? শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর কার্যকলাপের জড়-জাগতিক নৈতিকতা বা অনৈতিকতার পার্থক্য থাকে না। তিনি যা করেন তা সবই মঙ্গলময়। 'ভগবান মঙ্গলময়' কথাটির এটিই হচ্ছে প্রকৃত অর্থ। তিনি সর্ব অবস্থাতেই মঙ্গলময়, কেন না তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের অতীত

অপ্রাকৃত তত্ত্ব। তাই, যাঁরা ইতিমধ্যেই চিন্ময় জগতে বসবাস করছেন তাঁরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"পূর্ণভক্তি সহকারে যে আমার সেবায় যুক্ত, যার কোন অবস্থাতেই পতন হয় না, সে তৎক্ষণাৎ জড়-জাগতিক গুণসমূহ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়।"

যিনি অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি ইতিমধ্যেই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন (*ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। সর্ব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর কার্যকলাপ ও আচরণ অপ্রাকৃত এবং তাই তা জড় নীতি-বাগীশদের বোধগম্য নয়। তাই সেই সমস্ত বিষয়ে জড়বাদীদের সঙ্গে আলোচনা না করাই উচিত। তাদের কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করাই শ্রেয়, যাতে তারা ধীরে ধীরে পবিত্র হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ১৩৫

এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল ।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আহ্বান শুনে মাধবেন্দ্র পুরী সেই পূজারীর কাছে এসে তাঁর পরিচয় প্রদান করলেন। পূজারী তখন তাঁকে সেই ক্ষীরভাণ্ডটি দিলেন এবং দণ্ডবৎ হয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

কাউকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়, কেন না ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন কোন ভক্তকে দেখেন, তখন তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেন। এই ব্রাহ্মণ পূজারী মাধবেন্দ্র পুরীকে জিজ্ঞাসা করেননি তিনি ব্রাহ্মণ কি না, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, মাধবেন্দ্র পুরী হচ্ছেন এমনই এক মহান ভক্ত যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাঁর জন্য ক্ষীর চুরি করেছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মহাত্মার অতি উন্নত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮/১২৮)* সেই ব্রাহ্মণ পূজারীটি যদি একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ হতেন, তা হলে শ্রীগোপীনাথ স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন না। যেহেতু গোপীনাথজী মাধবেন্দ্র পুরী ও ব্রাহ্মণ উভয়ের সঙ্গে স্বপ্নে কথা বলেছিলেন, সেই সূত্রে বোঝা যায় যে, তাঁরা দুজনই সমপর্যায়ভুক্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী যেহেতু ছিলেন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী—একজন পরমহংস, তাই সেই পূজারী তৎক্ষণাৎ দণ্ডবৎ হয়ে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৬

ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈল শ্রীমাধবপুরী ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

পূজারী যখন সেই ক্ষীরচুরির বৃত্তান্ত মাধবেন্দ্র পুরীকে শোনালেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ১৩৭

প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ।
কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ,—হয় যথোচিত ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্রপুরীর কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করে পূজারী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি তখন বুঝতে পারলেন, কৃষ্ণ কেন তাঁর প্রতি বশীভূত হয়েছেন এবং তিনি দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা করা যথার্থই হয়েছে।

তাৎপর্য

ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে বশীভূত করতে পারেন। সে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৩) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *অজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্*—"শ্রীকৃষ্ণকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না, কিন্তু ভক্তির দ্বারা ভক্ত তাঁকে জয় করতে পারেন।" *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বর্ণিত হয়েছে—*বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ।* কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। যদিও বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, তবুও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকভক্ত না হলে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। তাই বৈদিক শাস্ত্র (স্বাধ্যায়) পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রীবিগ্রহের আরাধনাও (অর্চন-বিধি) অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে ভক্তের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত অনুভূতি বিকশিত হয়। *শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় (চৈঃ চঃ মঃ ২২/১০৭)।* ভগবৎ-প্রেম সকলের হৃদয়েই সুপ্তভাবে রয়েছে এবং কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করে, তা হলে সেই ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হয়। কিন্তু জড়বাদী মূর্খেরা যারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কাহিনী পাঠ করে, ভগবৎ-তত্ত্ব যথাযথ না জানার ফলে তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত কার্যকলাপ নীতি-বিগর্হিত অথবা অপরাধমূলক।

শ্লোক ১৩৮

এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই পূজারী মাধবেন্দ্র পুরীকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে মন্দিরে ফিরে গেলেন। তখন ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া সেই ক্ষীর প্রসাদ সেবন করলেন।

শ্লোক ১৩৯

পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল ।
বহির্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারি রাখিল ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর মাধবেন্দ্র পুরী সেই পাত্রটি ধুয়ে সেটি খণ্ড খণ্ড করে, তা সযত্নে তাঁর বহির্বাসে বেঁধে রাখলেন।

শ্লোক ১৪০

প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত কথন ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন মাধবেন্দ্র পুরী সেই পাত্রের একটি করে টুকরো ভক্ষণ করতেন এবং তা খেয়ে ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হতেন। এই সমস্ত কাহিনী অত্যন্ত অদ্ভুত।

শ্লোক ১৪১

'ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল—লোক সব শুনি' ।
দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি' ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

মাটির পাত্রটি ভেঙ্গে তার টুকরোগুলি বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে মাধবেন্দ্র পুরী ভাবলেন, "কাল সকালে লোকে যখন জানতে পারবে যে, ভগবান আমাকে এক পাত্র ক্ষীর দিয়েছেন, তখন বহুলোক এসে ভিড় করবে।"

শ্লোক ১৪২

সেই ভয়ে রাত্রি-শেষে চলিলা শ্রীপুরী ।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি' ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা ভেবে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপীনাথজীকে সেখানে প্রণতি নিবেদন করে, ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৪৩

চলি' চলি' আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

চলতে চলতে, অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীজগন্নাথপুরীতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হলেন।

শ্লোক ১৪৪

প্রেমাবেশে উঠে, পড়ে, হাসে, নাচে, গায় ।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র পুরী কখনও উঠে দাঁড়ালেন, কখনও মাটিতে পড়ে গেলেন, কখনও তিনি হাসলেন, নৃত্য করলেন এবং গান গাইলেন। এভাবেই জগন্নাথদেবকে দর্শন করে তিনি মহা আনন্দে মগ্ন হলেন।

শ্লোক ১৪৫

'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইল',—লোকে হৈল খ্যাতি ।
সব লোক আসি' তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নীলাচলে এসেছেন এবং তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাই বহুলোক তখন তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের সকল প্রকার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগল।

শ্লোক ১৪৬

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত ।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্মিত ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এটিই হচ্ছে প্রতিষ্ঠার স্বভাব—বিধাতা যাঁকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান, তিনি না চাইলেও তাঁর খ্যাতি সারা জগৎ জুড়ে প্রচারিত হয়।

শ্লোক ১৪৭

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা ।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিষ্ঠার ভয়ে মাধবেন্দ্র পুরী রেমুণা থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ভগবৎ-প্রেম জনিত প্রতিষ্ঠার এমনই মহিমা যে, তা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

তাৎপর্য

জড় জগতে প্রায় প্রতিটি জীবই ঈর্ষাপরায়ণ। যিনি আপনা থেকেই কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে এটি স্বাভাবিক। তাই, কোন ভক্ত যখন জগৎ জুড়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তখন বহু মানুষ তাঁকে ঈর্ষা করে। সেটি খুবই স্বাভাবিক। বিনয়বশত কেউ যখন কোন প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেন না, তখন মানুষ বৈষ্ণবোচিত বিনয় সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে সব রকম সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব কখনও যশ অথবা প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করেন না।. বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি সব সময় নিজেকে জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। মহান ভগবদ্ভক্তরূপে তাঁর পরিচিতি তিনি সব সময় গোপন রাখতে চাইতেন, কিন্তু তাঁকে ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল দর্শন করে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর যশ কীর্তন করত। প্রকৃতপক্ষে উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবের সম্মানে মাধবেন্দ্র পুরী ভূষিত, কেন না তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভক্ত। কখনও কখনও সহজিয়ারা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় কপট বৈরাগ্য এবং বিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু এই ধরনের মানুষেরা কখনই বৈষ্ণবতার অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

শ্লোক ১৪৮

যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে সকলে তাঁকে একজন মহান ভগবদ্ভক্তরূপে সম্মান প্রদর্শন করেছিল বলে, যদিও মাধবেন্দ্র পুরী সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও গোপীনাথজীর চন্দন সংগ্রহে তাঁর বিঘ্ন সৃষ্টি হবে মনে করে, মাধবেন্দ্র পুরী সেখান থেকে চলে যেতে পারলেন না।

শ্লোক ১৪৯

জগন্নাথের সেবক যত, যতেক মহান্ত ।
সবাকে কহিল পুরী গোপাল বৃত্তান্ত ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী জগন্নাথদেবের সমস্ত সেবক এবং সেখানকার সমস্ত মহান ভক্তদের শ্রীগোপালদেবের আবির্ভাবের কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫০

গোপাল চন্দন মাগে,—শুনি' ভক্তগণ ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপাল চন্দন চেয়েছেন শুনে, জগন্নাথপুরীর সমস্ত ভক্তরা মহা আনন্দে চন্দন সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হলেন।

শ্লোক ১৫১

রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয় ।
তারে মাগি' কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে যাঁদের যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কর্পূর ও চন্দন সংগ্রহ করলেন।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, মলয়জ চন্দন ও কর্পূর জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হত। কর্পূর ব্যবহার করা হত তাঁর আরতিতে এবং চন্দন ব্যবহার করা হত তাঁর শ্রীঅঙ্গে লেপন করার জন্য। কিন্তু এই দুটি বস্তুই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল; তাই ভক্তদের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। তাঁদের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, তাঁরা শ্রীজগন্নাথপুরী থেকে অন্যত্র চন্দন ও কর্পূর নিয়ে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫২

এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে ।
পুরী-গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দন বহন করার জন্য মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন সেবক দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে প্রয়োজনীয় পথখরচও দেওয়া হয়েছিল।

শ্লোক ১৫৩

ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে ।
রাজলেখা করি' দিল পুরী-গোসাঞির করে ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

পথে শুল্ক-সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য রাজকর্মচারীরা রাজার অনুমতি-পত্র পুরী গোসাঞির হাতে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫৪

চলিল মাধবপুরী চন্দন লঞা ।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবে মাধবেন্দ্র পুরী চন্দন নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন এবং কয়েকদিন পরে তিনি রেমুণা-গ্রামে গোপীনাথ-মন্দিরে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ১৫৫

গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার ।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ-মন্দিরে পৌঁছে মাধবেন্দ্র পুরী গোপীনাথজীর শ্রীপাদপদ্মে বহুবার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে তিনি বহুক্ষণ নৃত্য-গীত করলেন।

শ্লোক ১৫৬

পুরী দেখি' সেবক সব সম্মান করিল ।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

পুনরায় মাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন করে গোপীনাথজীর সমস্ত সেবকগণ তাঁকে বহু সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে গোপীনাথজীর ক্ষীর প্রসাদ ভোজন করালেন।

শ্লোক ১৫৭

সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন ।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে মাধবেন্দ্র পুরী মন্দিরে শয়ন করলেন এবং শেষরাত্রে তিনি আর একটি স্বপ্ন দেখলেন।

শ্লোক ১৫৮

গোপাল আসিয়া কহে,—শুন হে মাধব ।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দেখলেন যে, গোপাল তাঁর কাছে এসে বলছেন, "হে মাধবেন্দ্র পুরী, আমি ইতিমধ্যেই সমস্ত চন্দন ও কর্পূর গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ১৫৯

কর্পূর-সহিত ঘষি' এসব চন্দন ।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন কর্পূরসহ ওই চন্দন ঘষে প্রতিদিন শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে তা লেপন কর।

শ্লোক ১৬০

গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয় ।
ইঁহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ-ক্ষয় ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীনাথ এবং আমার অঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লেপন করা হলে, আমার অঙ্গ শীতল হবে। তার ফলে আমার দেহের উত্তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

গোপাল ছিলেন রেমুণা থেকে অনেক দূরে, বৃন্দাবনে। তখনকার দিনে বৃন্দাবনে যেতে হলে মুসলমান অধিকৃত রাজ্যের মধ্য দিয়ে যেতে হত এবং সেই সমস্ত রাজ্যের মুসলমানেরা তখন পথিকদের নানা রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাই ভক্তের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে, ভক্তবৎসল শ্রীগোপাল মাধবেন্দ্র পুরীকে এই চন্দন তাঁরই অভিন্ন বিগ্রহ গোপীনাথদেবের শ্রীঅঙ্গে লেপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবে ভগবান মাধবেন্দ্র পুরীকে সব রকম অসুবিধা ও বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬১

দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে ।
বিশ্বাস করি' চন্দন দেহ আমার বচনে ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে দ্বিধা করো না। আমার কথায় বিশ্বাস করে গোপীনাথজীর শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন কর।"

শ্লোক ১৬২

এত বলি' গোপাল গেল, গোসাঞি জাগিলা ।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

এই নির্দেশ দিয়ে গোপালদেব সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন, আর মাধবেন্দ্র পুরী তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে গোপীনাথের সেবকদের ডেকে আনলেন।

শ্লোক ১৬৩

প্রভুর আজ্ঞা হৈল,—এই কর্পূর-চন্দন ।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী বললেন, "এই কর্পূর ও চন্দন প্রতিদিন শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে লেপন করার জন্য প্রভু আদেশ করেছেন।

শ্লোক ১৬৪

ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবে শীতল ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চন্দন যদি গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা হয়, তা হলে গোপালদেবের অঙ্গ শীতল হবে। পরমেশ্বর ভগবান স্বরাট্ পুরুষ এবং তাই তাঁর আদেশ সর্বশক্তি সমন্বিত।"

শ্লোক ১৬৫

গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন ।
শুনি' আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমে গোপীনাথজীর শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করা হবে বলে গোপীনাথজীর সেবকেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১৬৬

পুরী কহে,—এই দুই ঘষিবে চন্দন ।
আর জনা-দুই দেহ, দিব যে বেতন ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী বললেন, "এই দুজন সহকারী নিয়মিত চন্দন ঘষবে, এবং তাদের সাহায্য করার জন্য আরও দুজন লোক দিন। আমি তাদের পারিশ্রমিক বেতন দেব।"

শ্লোক ১৬৭

এই মত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া ।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবে প্রতিদিন তাঁরা চন্দন ঘষতে লাগলেন, আর সেবকেরা মহা আনন্দে সেই চন্দন গোপীনাথজীর শ্রীঅঙ্গে লেপন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬৮

প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত ।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্যন্ত ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সেই চন্দন শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সেই চন্দন গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করা হত। যে কয়দিন চন্দন লেপন করা হল, সেই কয়দিন মাধবেন্দ্র পুরী সেখানে ছিলেন।

শ্লোক ১৬৯

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা ।
নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রীষ্মকাল শেষ হলে মাধবেন্দ্র পুরী আবার জগন্নাথপুরীতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে তিনি বর্ষার চার মাস মহা আনন্দে থাকলেন।

তাৎপর্য

আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাসের শুক্লপক্ষে শয়ন একাদশী থেকে শুরু করে কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসের শুক্লপক্ষে উত্থান একাদশী পর্যন্ত এই চারমাসকে বলা হয় চাতুর্মাস্য। কোন কোন বৈষ্ণব আষাঢ়ের পূর্ণিমা থেকে কার্তিকের পূর্ণিমা পর্যন্ত চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করেন। এই চন্দ্রমাসের গণনা ব্যতীত, কেউ কেউ সৌর মাসের গণনা অনুসারে শ্রাবণ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্তও চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করেন। সৌর অথবা চান্দ্র উভয় গণনাতেই এই সময়টি বর্ষাকাল। কেউ গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, চাতুর্মাস্য-ব্রত সকলের পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এই ব্রতটি সকল আশ্রমেরই করা বাধ্যতামূলক। এই ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চার মাস কাল ভোগবাসনা সংকুচিত করা। সেটি খুব একটা কঠিন নয়। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দই, আশ্বিন মাসে দুধ ও কার্তিক মাসে সকল প্রকার আমিষ আহার পরিত্যাগ করতে হয়। আমিষ আহার মানে হচ্ছে মাছ-মাংস আহার। তেমনই, মসুর ডাল ও কলাইয়ের ডালকেও আমিষ বলে গণনা করা হয়। এই দুটি ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং অধিক প্রোটিন যুক্ত খাদ্যকে আমিষ বলে বিবেচনা করা হয়। মূল কথা হচ্ছে, বর্ষার এই চার মাসে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর আহারাদি পরিত্যাগ করার অনুশীলন করতে হয়।

শ্লোক ১৭০

শ্রীমুখে মাধব-পুরীর অমৃত-চরিত ।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরীর অমৃতময় চরিত্রের প্রশংসা করেছিলেন এবং ভক্তদের সেই বর্ণনা শুনিয়ে তিনি স্বয়ং তা আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭১

প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ, করহ বিচার ।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বলেছিলেন, "নিত্যানন্দ, বিচার করে দেখ, জগতে মাধবেন্দ্র পুরীর মতো ভাগ্যবান আর কি কেউ আছে?

শ্লোক ১৭২

দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল ।
তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"দুগ্ধ দান করার ছলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনবার স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন দিয়ে তিনি আদেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭৩

যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা ।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিলা ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমে বশীভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সেবা অঙ্গীকার করে, তিনি সমগ্র জগৎ উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ১৭৪

যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি' ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। তাই তিনি ক্ষীরচোরা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭৫

কর্পূর-চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল ।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মাধবেন্দ্র পুরী গোপীনাথের অঙ্গে কর্পূর ও চন্দন লেপন করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবৎ-প্রেমানন্দে তিনি উদ্বেল হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১৭৬-১৭৭

ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল ।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥ ১৭৬ ॥
মহা-দয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল ।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কর্পূর ও চন্দন নিয়ে মুসলমান শাসিত অঞ্চল দিয়ে যেতে মাধবেন্দ্র পুরীর অনেক অসুবিধে হবে জেনে, পরম দয়াময় ভক্তবৎসল গোপাল সেই কর্পূর ও চন্দন গোপীনাথদেবের শ্রীঅঙ্গে লেপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবে ভক্তের দেওয়া চন্দন পরে তিনি (ভগবান গোপালদেব) তাঁর (ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর) শ্রম সফল করেছিলেন।"

শ্লোক ১৭৮

পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার ।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর তীব্র ভগবৎ-প্রেম বিচার করার জন্য প্রভুকে বলেছিলেন। তিনি তখন এও বলেছিলেন যে, "মাধবেন্দ্র পুরীর এই ভগবদ্প্রেম অলৌকিক, যা শ্রবণ করলে চিত্ত চমৎকৃত হয়।"

তাৎপর্য

জীব যখন কৃষ্ণবিরহ অনুভব করে, তখন সে তার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। জড় বিরহজনিত নির্বেদ জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু কৃষ্ণ বিরহজনিত নির্বেদ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাধবেন্দ্র পুরীর অপূর্ব কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা কৃষ্ণসেবার্থে জীবের একমাত্র ও বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়, তা-ই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা পরে আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন।

শ্লোক ১৭৯

পরম বিরক্ত, মৌনী, সর্বত্র উদাসীন ।
গ্রাম্যবার্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন পরম বিরক্ত, তিনি সর্বদা মৌনী থাকতেন এবং তিনি ছিলেন সমস্ত জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন। তা ছাড়া জড় বিষয়ের আলোচনার ভয়ে তিনি দ্বিতীয় কারও সঙ্গে সঙ্গ করতেন না।

শ্লোক ১৮০

হেন-জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা ।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিঞা ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপালের আজ্ঞামৃত লাভ করে, এই মহাপুরুষ হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, চন্দন-কাঠ ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮১

ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিঞা না খায় ।
হেন-জন-চন্দন-ভার বহি' লঞা যায় ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"ক্ষুধার্ত হলেও মাধবেন্দ্র পুরী ভিক্ষা করে খেতেন না। অথচ এই রকম ব্যক্তি গোপালের জন্য চন্দনের বোঝা বহন করে নিয়ে চললেন।

শ্লোক ১৮২

'মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর ।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা না করে, মাধবেন্দ্র পুরী প্রায় একমণ চন্দন-কাঠ এবং বিশ তোলা কর্পূর বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা গোপালের শ্রীঅঙ্গে লেপন করবেন—এই কথা মনে করে পরম আনন্দে মগ্ন হয়ে তিনি পথ চলছিলেন।

শ্লোক ১৮৩

উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিঞা ।
তাহাঁ এড়াইল রাজপত্র দেখাঞা ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"উৎকল প্রদেশ থেকে অন্যত্র চন্দন নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল বলে, দানী সেই চন্দনের বোঝা বাজেয়াপ্ত করেছিল, কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী তাকে রাজপত্র দেখিয়ে সেই বিপদ এড়ালেন।

শ্লোক ১৮৪

ম্লেচ্ছদেশ দূর পথ, জগাতি অপার ।
কেমতে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবন অনেক দূরের পথ, মুসলমান অধিকৃত অঞ্চল দিয়ে যেতে হবে এবং পথে অনেক প্রহরী রয়েছে, এই সমস্ত অসুবিধে মাধবেন্দ্র পুরীকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি।

শ্লোক ১৮৫

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে ।
তথাপি উৎসাহ বড় চন্দন লঞা যাইতে ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"পথে শুল্ক আদায়কারীদের দেওয়ার জন্য এক পয়সাও মাধবেন্দ্র পুরীর ছিল না, তবুও বৃন্দাবনে গোপালের জন্য চন্দন নিয়ে যেতে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

শ্লোক ১৮৬

প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব-আচার ।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের স্বাভাবিক আচরণই এই রকম যে, ভক্ত তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ অথবা বাধাবিঘ্নের বিচার করেন না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর ঐকান্তিক প্রেমের উদয় হয়েছে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই নিজের দুঃখ ও বাধাবিঘ্নের বিচার করেন না। এই প্রকার ভক্তরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমন কি চরম বিপদেও, তাঁরা অবিচলিত ভাবে পরম নিষ্ঠা সহকারে তাদের সেবাকার্য করে যান। এভাবেই সেবকের প্রগাঢ় প্রেমভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ*—যাঁরা ঐকান্তিকভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে প্রীতিপরায়ণ, তাঁরাই

ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি প্রগাঢ়ভাবে প্রেমপরায়ণ, তিনি কোন রকম জাগতিক অসুবিধে, অভাব, বিঘ্ন ও দুঃখ আদির দ্বারা প্রভাবিত হন না। বলা হয়েছে যে—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥

শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, *আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্‌*। যথার্থই যিনি কৃষ্ণপ্রেমিক, নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি কখনও তাঁর সেবা থেকে বিচ্যুত হন না।

শ্লোক ১৮৭

এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে ।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম যে কত গভীর তা দেখাবার জন্য, শ্রীগোপাল তাঁকে নীলাচল থেকে চন্দন নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮৮

বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল ।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু পরিশ্রম করে মাধবেন্দ্র পুরী চন্দনের বোঝাটি রেমুণায় নিয়ে এলেন। তাতে তাঁর পরম আনন্দ হল; কিন্তু তা আনতে তাঁর যে কষ্ট হয়েছিল, তা তাঁর মনে রেখাপাত পর্যন্ত করল না।

শ্লোক ১৮৯

পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান ।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্‌ ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মাধবেন্দ্র পুরীর গভীর প্রেম পরীক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোপালদেব নীলাচল থেকে চন্দন নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই পরীক্ষায় মাধবেন্দ্র পুরী যখন উত্তীর্ণ হলেন, তখন ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশ হলেন।

শ্লোক ১৯০

এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার ।
বুঝিতেও আমা-সবার নাহি অধিকার ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্ত এবং ভক্তের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এমনই অপ্রাকৃত যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের তা বোঝার কোন ক্ষমতা নেই।"

শ্লোক ১৯১

এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক ।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ কর্যাছে আলোক ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর রচিত একটি শ্লোক পাঠ করেন। এই শ্লোকটি ঠিক চন্দ্রের মতো এবং তা সারা জগৎকে আলোকিত করেছে।

শ্লোক ১৯২

ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার ।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

ঘষতে ঘষতে যেমন মলয়জ চন্দনের সৌরভ বর্ধিত হয়, তেমনই এই শ্লোকটি যতই বিচার করা যায়, ততই তার ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

শ্লোক ১৯৩

রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি ।
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত রত্নের মধ্যে যেমন কৌস্তুভমণি সব চাইতে মূল্যবান, তেমনই সমস্ত রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোকটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১৯৪

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী ।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকটি বলেছেন শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং এবং তাঁরই কৃপায় এই শ্লোকটি মাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়ে শব্দের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯৫

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন ।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কেবল এই শ্লোকটি আস্বাদন করেছেন। চতুর্থ কোন ব্যক্তি তা আস্বাদন করতে সমর্থ নন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী, মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কেবল উপরোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।

শ্লোক ১৯৬

শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে ।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

মাধবেন্দ্র পুরী তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে, এই শ্লোকটি পাঠ করতে করতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯৭

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ ১৯৭ ॥

অয়ি—হে প্রভু; দীন—দীনের প্রতি; দয়া-আর্দ্র—দয়া পরবশ; নাথ—হে নাথ; হে মথুরা-নাথ—হে মথুরানাথ; কদা—কখন; অবলোক্যসে—আমি তোমাকে দর্শন করব; হৃদয়ম্—আমার হৃদয়; ত্বৎ—তোমার; অলোক—দর্শনে বঞ্চিত হয়ে; কাতরম্—অত্যন্ত কাতর; দয়িত—হে প্রিয়তম; ভ্রাম্যতি—অস্থির হয়েছে; কিম্—কি; করোমি—করব; অহম্—আমি।

অনুবাদ

"হে দীনদয়ার্দ্র নাথ! হে মথুরানাথ! কবে আমি তোমাকে দর্শন করব? তোমার দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। হে প্রিয়তম, এখন আমি কি করব?"

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তিবাদী *বেদান্ত-দর্শনে* নিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণবেরা চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্যের সম্প্রদায় স্বীকার করে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মধ্বাচার্য থেকে মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত ওই সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁদের যে প্রকার ভক্তি ছিল, তা মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে যে বিচার হয়, তা থেকে জানতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই অপূর্ব শ্লোক রচনা করে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। এই শ্লোকের ভাব এই যে, মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী রাধারাণীর মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হয়েছিল, সেই

ভাবের অনুগত হয়ে যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তা-ই সর্বোত্তম। এই রসের ভক্ত নিজেকে অত্যন্ত দীন জ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এভাবেই ডাকবেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।

যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় রাজা হলেন, তখন তাঁর অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয়ে তাঁর দর্শন-লালসায় বলছেন—"হে কান্ত, তোমার দর্শনে বঞ্চিতা আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করলে তোমার দর্শন পাব? আমাকে দীনজন জেনে তুমি দয়ার্দ্রচিত্ত হও।" শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর এই ভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাব ও বৈচিত্রের বর্ণন হয়েছে, তার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই মহাজনেরা বলেছেন যে, শৃঙ্গার রসতরুর মূল—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী—তার প্ররোহ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—তার মূল স্কন্ধ, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তরা—তার শাখা-প্রশাখা।

শ্লোক ১৯৮

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে ।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িল ভূমিতে ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকটি বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হলেন এবং প্রেমেতে বিবশ হয়ে তিনি ভূমিতে পতিত হলেন।

শ্লোক ১৯৯

আস্তে-ব্যস্তে কোলে করি' নিল নিত্যানন্দ ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমেতে বিবশ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় ভূমিতে পতিত হলেন, সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। তখন ক্রন্দন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠে বসলেন।

শ্লোক ২০০

প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি, ইতি-উতি ধায় ।
হুঙ্কার করয়ে, হাসে, কান্দে, নাচে, গায় ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হুঙ্কার করতে করতে, হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে এবং ক্রন্দন করতে করতে আবার কখনও কখনও গান গাইতে গাইতে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন।

শ্লোক ২০১

'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন' বলে বারবার ।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরো শ্লোকটি উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। তিনি কেবল বারবার 'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন' বলতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বাণী নিঃসৃত হচ্ছিল না এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল।

শ্লোক ২০২

কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ।
নির্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

কম্প, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, নির্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব, হর্ষ ও দৈন্য— এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকারগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে জাড্য-এর বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—প্রিয়জনের বিরহ জনিত আঘাতের ফলে স্মৃতি লোপ পাওয়া। মনের এই অবস্থায় লাভ-ক্ষতি, দর্শন, শ্রবণ আদির কোন বোধ থাকে না। এটিই মোহের পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থা।

শ্লোক ২০৩

এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট ।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোক প্রেমের কপাট মুক্ত করল এবং গোপীনাথের সমস্ত সেবকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমোন্মত্ত নৃত্য দর্শন করলেন।

শ্লোক ২০৪

লোকের সংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ।
ঠাকুরের ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে অনেক লোকের সমাবেশ হল, তখন মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরে এল। ইতিমধ্যে শ্রীগোপীনাথদেবের ভোগ সমাপ্ত হল এবং আরতির বাজনা বেজে উঠল।

শ্লোক ২০৫

ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হৈল বাহির ।
প্রভুর আগে আনি' দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপীনাথজীকে শয়ন দিয়ে পূজারী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ক্ষীরের বারোটি পাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এনে দিলেন।

শ্লোক ২০৬

ক্ষীর দেখি' মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল ।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ক্ষীর দেখে মহাপ্রভুর আনন্দ বর্ধিত হল এবং ভক্তদের খাওয়ানোর জন্য তিনি কেবল পাঁচটি পাত্র ক্ষীর নিলেন।

শ্লোক ২০৭

সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল ।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

ক্ষীরের আর সাতটি পাত্র তিনি পূজারীকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি পাঁচটি ক্ষীরের পাত্র পাঁচজন ভক্তের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন এবং তাঁরা মহা আনন্দে সেই ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ২০৮

গোপীনাথ-রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন ।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ইতিমধ্যে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করেছিলেন, তবু ভগবদ্ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য তিনি পুনরায় ভক্তরূপে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করলেন।

শ্লোক ২০৯

নাম-সংকীর্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা ।
মঙ্গল-আরতি দেখি' প্রভাতে চলিলা ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

নাম-সংকীর্তন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই রাত্রি সেই মন্দিরেই অতিবাহিত করলেন এবং পরদিন প্রভাতে মঙ্গল-আরতি দর্শন করে, তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২১০

গোপাল-গোপীনাথ-পুরীগোসাঞির গুণ ।
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে গোপাল, গোপীনাথ ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রাকৃত মহিমা আস্বাদন করলেন।

শ্লোক ২১১

এই ত' আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা ।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেম-সীমা ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তপ্রেম-সীমা, এই দুয়ের মহিমা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২১২

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যিনি এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রেমধন লাভ করবেন।

শ্লোক ২১৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর ভগবদ্ভক্তি' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাক্ষিগোপালের কাহিনী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাজপুর হয়ে কটক নগরে পৌঁছলেন এবং সেখানে সাক্ষিগোপাল মন্দির দর্শন করতে গেলেন। তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখে সাক্ষিগোপালের কাহিনী শ্রবণ করেন।

বিদ্যানগর নিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয় (একজন বৃদ্ধ ও অপরজন যুবক) বহু তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি যুবক ব্রাহ্মণের সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর কন্যাদান করতে অঙ্গীকার করেন। যুবক-বিপ্র বৃদ্ধ-বিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে সেই বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়ে গোপালকে সাক্ষী রাখলেন। এভাবেই গোপাল বিগ্রহ সাক্ষী হলেন। সেই ব্রাহ্মণ দুইজন যখন বিদ্যানগরে ফিরে এলেন, তখন যুবা ব্রাহ্মণটি বিবাহের প্রস্তাব করলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি তাঁর স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে বললেন যে, তাঁর সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ নেই। তখন যুবা বিপ্র বৃন্দাবনে ফিরে যান এবং গোপালকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেন। তখন সেই যুবা বিপ্রের ভক্তিতে বাধ্য হয়ে গোপালজী তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে যাত্রা করেন। গোপাল যুবা বিপ্রের পিছন পিছন নূপুরের ধ্বনি করে বিদ্যানগরের নিকট পর্যন্ত এসে সেখানে স্থিত হলেন।. যুবা বিপ্র বিদ্যানগরের সমস্ত সম্মানিত ভদ্রলোকদের এবং বৃদ্ধ বিপ্র ও তাঁর পুত্রকে সেখানে উপস্থিত করিয়ে গোপালের সাক্ষ্য দেওয়ালে, তাঁরা চমৎকৃত হয়ে বৃদ্ধ বিপ্রের কন্যার সঙ্গে যুবা বিপ্রের বিবাহকার্য নির্বাহ করান। সেখানকার রাজা গোপালের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়ে মন্দির আদি নির্মাণ করেছিলেন।

বহুদিন পর উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলে তাচ্ছিল্য করে তার কন্যাটিকে বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। তখন পুরুষোত্তমদেব জগন্নাথদেবের সহায়তায় সেই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকে বৈষ্ণবরাজ পুরুষোত্তমদেবের ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গোপাল কটক নগরে আনীত হন।

এই কাহিনী শ্রবণ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাপ্রেমে গোপাল দর্শন করলেন। কটক থেকে তিনি ভুবনেশ্বরে শিব দর্শন করতে যান। তারপর কমলপুরে ভার্গীনদীর তীরে 'কপোতেশ্বর শিব' দর্শন করতে যাওয়ার সময় নিত্যানন্দ প্রভুর হাতে মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাস-দণ্ডটি রেখে যান। নিত্যানন্দ প্রভু আঠারনালা নামক স্থানে সেই দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করে ভেঙে ভার্গীনদীতে ভাসিয়ে দেন। দণ্ড না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু এবং অন্যান্য সঙ্গীদের ফেলে রেখে একলা জগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য যাত্রা করেন।

শ্লোক ১

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্ ।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

পদ্ভ্যাম্—পদযুগল দ্বারা; চলন্—চলে; যঃ—যিনি; প্রতিমা-স্বরূপঃ—অর্চাবিগ্রহ-স্বরূপ; ব্রহ্মণ্য-দেবঃ—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম আরাধ্যদেব; হি—অবশ্যই; শত-আহ—একশো দিনে; গম্যম্—গমনযোগ্য; দেশম্—মথুরামণ্ডল থেকে বিদ্যানগর পর্যন্ত দেশসমূহ; যযৌ—গিয়েছিলেন; বিপ্র-কৃতে—ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য; অদ্ভুত—অপূর্ব; ইহম্—এই কার্যকলাপ; তম্—তাঁকে; সাক্ষি-গোপালম্—সাক্ষিগোপাল নামক শ্রীগোপালদেবকে; অহম্—আমি; নতঃ অস্মি—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমা-স্বরূপ হয়েও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য একশো দিন চললে যে দেশ পাওয়া যায়, সেখানে (অর্থাৎ, মথুরামণ্ডল থেকে বিদ্যানগর পর্যন্ত) পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, সেই অদ্ভুত লীলাবিলাস পরায়ণ সাক্ষিগোপালকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম ।
বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর সঙ্গীরা বৈতরণী নদীর তীরে যাজপুর নামক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা বরাহদেবের মন্দির দর্শন করলেন এবং তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৪

নৃত্যগীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন ।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

বরাহদেবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমে অধীর হয়ে বহু নৃত্য-গীত করলেন এবং স্তব করলেন। এভাবেই তিনি যাজপুরে সেই রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৫

কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে ।
গোপাল-সৌন্দর্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষিগোপাল দর্শন করতে কটকে গেলেন এবং সাক্ষিগোপালের সৌন্দর্য দর্শন করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৬

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল স্তবন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে বহুক্ষণ তিনি সেখানে নৃত্যগীত করলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে গোপালের স্তব করলেন।

শ্লোক ৭

সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে ।
গোপালের পূর্বকথা শুনে বহু রঙ্গে ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের সঙ্গে সেখানে রইলেন এবং মহা আনন্দে গোপালের পূর্বের কাহিনী শ্রবণ করলেন।

শ্লোক ৮

নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা ।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু যখন ভারতবর্ষের তীর্থসকল ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন করতে এসেছিলেন।

শ্লোক ৯

সাক্ষিগোপালের কথা শুনি' লোকমুখে ।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু লোকমুখে সাক্ষিগোপালের কথা শুনেছিলেন। এখন তিনি সেই সকল কথা বলতে লাগলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাসুখে তা শুনতে লাগলেন।

তাৎপর্য

সাক্ষিগোপাল মন্দির খুরদা রোড রেলওয়ে জংশন স্টেশন এবং জগন্নাথপুরী স্টেশনের মাঝখানে অবস্থিত। নিত্যানন্দ প্রভু যখন তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন, তখন সাক্ষিগোপাল বিগ্রহ কটকে ছিলেন, কিন্তু এখন আর তিনি সেখানে নেই। কটক-শহর উড়িষ্যার মহানদীর তীরে অবস্থিত। সাক্ষিগোপালকে যখন দক্ষিণ-ভারতের বিদ্যানগর থেকে উড়িষ্যায় নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি কিছুদিন কটকে ছিলেন। তারপর তিনি কিছুদিন জগন্নাথপুরীর মন্দিরে ছিলেন। মনে হয় জগন্নাথ মন্দিরে অবস্থানকালে সাক্ষিগোপালের সঙ্গে জগন্নাথদেবের প্রেমকলহ হয়। সেই প্রেমকলহ মীমাংসা করার জন্য উড়িষ্যার অধিপতি জগন্নাথপুরী থেকে ছয় মাইল দূরে সত্যবাদী নামে একটি গ্রাম স্থাপন করে সেখানে গোপালকে রাখেন। তারপর একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়। এখন সেখানে সাক্ষিগোপাল নামক একটি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে এবং মানুষ গোপালদেবকে দর্শন করার জন্য সেখানে যান।

শ্লোক ১০

পূর্বে বিদ্যানগরের দুই ত' ব্রাহ্মণ ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের বিদ্যানগরের দুজন ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্যটনে বার হন।

শ্লোক ১১

গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ—সকল করিয়া ।
মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হঞা ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ আদি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে, অবশেষে তাঁরা আনন্দ সহকারে মথুরাতে এলেন।

শ্লোক ১২

বনযাত্রায় বন দেখি' দেখে গোবর্ধন ।
দ্বাদশ-বন দেখি' শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরায় এসে, তাঁরা বৃন্দাবনের বিভিন্ন বন দর্শন করে গিরিরাজ গোবর্ধন দর্শন করলেন এবং দ্বাদশ-বন দর্শন করে তাঁরা বৃন্দাবনে এলেন।

তাৎপর্য

যমুনার পূর্ব তীরবর্তী পাঁচটি বন হচ্ছে—ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন। যমুনার পশ্চিম তীরবর্তী সাতটি বন হচ্ছে—মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন। এই সমস্ত বন ভ্রমণ করে, সেই তীর্থযাত্রীরা পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন নামক একটি স্থানে গিয়েছিলেন। বারোটি বনের মধ্যে যে বৃন্দাবন, তা এই বৃন্দাবন থেকে আরম্ভ করে নন্দগ্রাম, বর্ষাণা পর্যন্ত ষোলক্রোশ ব্যাপৃত; তার মধ্যে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন' নামক গ্রাম অবস্থিত।

শ্লোক ১৩

বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয় ।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনের যে স্থানে গোবিন্দ মন্দির অবস্থিত, পূর্বে সেখানে এক বিশাল মন্দির ছিল এবং সেখানে গোপালের মহাসেবা হত।

শ্লোক ১৪

কেশীতীর্থ, কালীয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান ।
শ্রীগোপাল দেখি' তাহাঁ করিলা বিশ্রাম ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

কেশীতীর্থ, কালীয়হ্রদ আদি পবিত্র তীর্থস্থানে স্নান করে, তাঁরা গোপালদেবকে দর্শন করতে গেলেন এবং তারপর সেই মন্দিরেই বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ১৫

গোপাল-সৌন্দর্য দুঁহার মন নিল হরি' ।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই-চারি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালদেবের সৌন্দর্য তাঁদের মন হরণ করে নিল এবং মহা আনন্দে তাঁরা সেখানে দুই-চার দিন থাকলেন।

শ্লোক ১৬

দুইবিপ্র-মধ্যে এক বিপ্র—বৃদ্ধপ্রায় ।
আর বিপ্র—যুবা, তাঁর করেন সহায় ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দুইজন ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ছিলেন বৃদ্ধ এবং অপরজন যুবা। যুবা বিপ্রটি বৃদ্ধ বিপ্রের সহায়তা করতেন।

শ্লোক ১৭

ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন ।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র সর্বদা বৃদ্ধ বিপ্রটির সেবা করতেন এবং তাঁর সেবায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

বিপ্র বলে,—তুমি মোর বহু সেবা কৈলা ।
সহায় হঞা মোরে তীর্থ করাইলা ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বৃদ্ধ বিপ্র যুবা বিপ্রকে বললেন, "তুমি আমার বহু সেবা করেছ এবং এই সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণে তুমি আমাকে সাহায্য করেছ।

শ্লোক ১৯

পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন ।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পুত্রও এভাবে পিতার সেবা করে না। তোমার সেবার জন্য এই তীর্থভ্রমণে আমি কোন রকম শ্রম অনুভব করিনি।

শ্লোক ২০

কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান ।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যদি তোমাকে সম্মান প্রদর্শন না করি, তা হলে আমি কৃতঘ্ন হব। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি তোমাকে আমার কন্যা দান করব।"

শ্লোক ২১

ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, বিপ্র-মহাশয় ।
অসম্ভব কহ কেনে, যেই নাহি হয় ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র উত্তর দিল, "মহাশয়, দয়া করে আমার কথা শুনুন। আপনি কেন এমন অসম্ভব কথা বলছেন, যা কখনই হবার নয়।

শ্লোক ২২

মহাকুলীন তুমি—বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ ।
আমি অকুলীন, আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি মহাকুলীন, অত্যন্ত বিদ্বান এবং অত্যন্ত ধনবান। আর আমি অকুলীন, তার উপর আমার ধন ও বিদ্যা কোনটিই নেই।

তাৎপর্য

পুণ্যের প্রভাবে মানুষ চার প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে পারে—সে কুলীন পরিবারে জন্ম লাভ করতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হতে পারে, অত্যন্ত রূপবান হতে পারে, অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে ধন-সম্পদ পেতে পারে। এগুলি হচ্ছে পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মের ফল। ভারতবর্ষে এখনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে সাধারণ পরিবারের বিবাহ হয় না। বর্ণ এক হলেও, সম্ভ্রান্ততা বজায় রাখার জন্য এই ধরনের বিবাহ হয় না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করতে সাহস করে না। তাই, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন যুবক ব্রাহ্মণটিকে তাঁর কন্যা দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন, তখন যুবক ব্রাহ্মণটি বিশ্বাস করেননি যে, তা সম্ভব হবে। তাই তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, কেন তিনি এই ধরনের অসম্ভব প্রস্তাব করছেন। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনই ধনহীন, বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে কন্যাদান করেন না।

শ্লোক ২৩

কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার ।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাশয়, আমি আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র নই। আমি যে আপনার সেবা করেছি, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য।

তাৎপর্য

উভয় ব্রাহ্মণই ছিলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব। যুবক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলেন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৯/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—"আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা থেকে বড়।" এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' অনুসারে, ভগবানের সেবকের সেবা করা শ্রেয়। কারোই সরাসরিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস জেনে কৃষ্ণসেবকের সেবা করেন। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা।* শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা না করে, সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের সেবকের সেবা করা অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ২৪

ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয় ।
তাঁহার সন্তোষ ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য়" ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রাহ্মণের সেবা করা হলে শ্রীকৃষ্ণ খুব প্রীত হন এবং ভগবান প্রীত হলে, ভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পদ বর্ধিত হয়।"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ছোট বিপ্র ভগবদ্ভক্ত বড় বিপ্রের সেবা করেছিলেন। এটি কোন সাধারণ জাগতিক ব্যাপার ছিল না। বৈষ্ণবের সেবা করলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন। ছোট বিপ্র যেহেতু বড় বিপ্রের সেবা করেছিলেন, তাই গোপাল উভয় ভক্তের মান রক্ষার জন্য সেই বিবাহের সাক্ষী হয়েছিলেন। এটি যদি বৈষ্ণবের ভগবদ্ভক্তিমূলক কার্যকলাপ না হয়ে কেবল বিবাহ-সম্বন্ধীয় কার্যকলাপ হত, তা হলে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা শুনতেন না। বিবাহ-বিধি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। কিন্তু বৈষ্ণবেরা কর্মকাণ্ডে আগ্রহী নন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড।* বৈষ্ণবদের কাছে *বেদের* কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষভাণ্ড বলে মনে করেন। আমরা কখনও কখনও আমাদের শিষ্যদের বিবাহে অংশগ্রহণ করি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা কর্মকাণ্ডে আগ্রহী। *বৈষ্ণব-দর্শন* সম্বন্ধে অজ্ঞ কিছু লোক কখনও কখনও আমাদের সমালোচনা করে বলে, সন্ন্যাসীদের যুবক ও যুবতীর বিবাহে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু এটি কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াকলাপ নয়, কেন না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করা। আমরা জনসাধারণকে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার সমস্ত সুযোগ দিচ্ছি এবং কোন কোন ভক্তকে ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, এই ধরনের বিবাহিত দম্পতিরা প্রকৃতপক্ষে প্রচারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা সম্পাদন করেন। তাই কোন সন্ন্যাসীকে বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখে ভুল বোঝা উচিত নয়। বড় বিপ্রের কন্যার সঙ্গে ছোট

বিপ্রের বিবাহের কাহিনী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রবণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা মহাসুখ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

বড়বিপ্র কহে,—"তুমি না কর সংশয় ।
তোমাকে কন্যা দিব আমি, করিল নিশ্চয়" ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

বড় বিপ্র উত্তর দিলেন, "এই সম্বন্ধে তুমি মনে কোন সংশয় রেখো না। আমি নিশ্চিতভাবে ঠিক করেছি যে, তোমাকে আমি আমার কন্যাদান করব।"

শ্লোক ২৬-২৭

ছোটবিপ্র বলে,—"তোমার স্ত্রীপুত্র সব ।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥ ২৬ ॥
তা'-সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান ।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র বললেন, "আপনার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে, বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী রয়েছে এবং বহু বন্ধু-বান্ধবও রয়েছে। তাঁদের সম্মতি বিনা আপনার পক্ষে আমায় কন্যাদান করা সম্ভব হবে না। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের কথা একবার বিবেচনা করে দেখুন।

শ্লোক ২৮

ভীষ্মকের ইচ্ছা,—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে ।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥" ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"মহারাজ ভীষ্মক তাঁর কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী তাঁকে বাধা দেয়। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কন্যাদান করতে পারেননি।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৫২/২৫) বর্ণিত হয়েছে—

> *বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ ।*
> *ততো নিবার্য কৃষ্ণদ্বিড় রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥*

"বিদর্ভ রাজ ভীষ্মক তাঁর কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী তাতে বাধা দেয়। তাই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল

করেন এবং রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই চেদিরাজ শিশুপালকে দান করতে মনস্থ করেন।" কিন্তু রুক্মিণী একটি কৌশল আঁটলেন, তিনি গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে চিঠি লেখেন যাতে তিনি এসে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যান। তাঁর মহান ভক্ত রুক্মিণীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁকে হরণ করেন। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর ভাই রুক্মীর নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে এক প্রবল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রুক্মী পরাজিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করার ফলে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করতে উদ্যত হন; কিন্তু রুক্মিণীর অনুরোধে তার প্রাণ ভিক্ষা দিলেও তিনি তাঁর অসির দ্বারা রুক্মীর চুল ও দাড়ি কেটে দেন। শ্রীবলরামের তা ভাল লাগেনি এবং তাই রুক্মিণীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

বড়বিপ্র কহে,—"কন্যা মোর নিজ-ধন।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

বড় বিপ্র বললেন, "আমার কন্যা আমার সম্পত্তি। আমি যদি আমার সম্পত্তি কাউকে দিতে চাই, তা হলে তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কার আছে?

শ্লোক ৩০

তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি' তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার ॥" ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তোমাকে কন্যাদান করব এবং যারা বাধা দিতে আসবে তাদের তিরস্কার করব। অতএব কোন সংশয় না করে, তুমি আমার এই দান স্বীকার কর।"

শ্লোক ৩১

ছোটবিপ্র কহে—"যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন ॥" ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র উত্তর দিল, "আপনি যদি আমাকে কন্যাদান করতে মনস্থ করে থাকেন, তা হলে গোপালদেবের শ্রীবিগ্রহের সামনে আপনি সেই কথা সত্য করে বলুন।"

শ্লোক ৩২

গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
"তুমি জান, নিজ-কন্যা ইহারে আমি দিল ॥" ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালের সামনে এসে বড় বিপ্র বললেন, "হে প্রভু, তোমাকে সাক্ষী রেখে আমি এই ব্রাহ্মণটিকে আমার কন্যাদান করলাম।"

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে বাক্‌দান করার মাধ্যমে কন্যা সমর্পণ করার প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ, কন্যার পিতা, ভ্রাতা অথবা অভিভাবক কথা দেন যে, কোন বিশেষ পুরুষের সঙ্গে তার বিবাহ হবে। তার ফলে কন্যাটির অন্য আর কারও সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। পিতা অথবা অভিভাবকের কথা দেওয়ার ফলে সে সংরক্ষিতা থাকে। এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে কন্যার পিতা-মাতা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কথা দিয়েছেন যে, তাঁদের কন্যার বিবাহ হবে তাঁর পুত্রের সঙ্গে। তখন পুত্র ও কন্যা বড় হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষ অপেক্ষা করেন এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ হয়। প্রাচীন ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই প্রথা অনুসারে, বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে তার কন্যাদান করেছিলেন এবং গোপাল বিগ্রহের সামনে তিনি সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই ধরনের প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করা যায় না। ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে, যখন দুই পক্ষে ঝগড়া-বিবাদ হয়, তখন তাঁরা মন্দিরে গিয়ে সেই বিবাদের মীমাংসা করেন। শ্রীবিগ্রহের সামনে যা বলা হয় তা সত্য বলে গ্রহণ করা হয়, কেন না ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যাকথা বলতে কেহ সাহস করেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও এই প্রথা অনুসরণ করা হয়েছিল। তাই *ভগবদ্গীতায়* প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে—*ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে*। ভগবৎ-উন্মুখী না হয়ে মানব-সমাজ আজ পশুজীবনের সর্বনিম্ন স্তরে এসে উপনীত হয়েছে। জনসাধারণের ভগবৎ-চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যদি ভগবৎ-উন্মুখী হয়, তা হলে বিচারালয়ের বাইরেই সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা হবে, ঠিক যেভাবে সাক্ষিগোপাল এই দুই ব্রাহ্মণের বিবাদ মীমাংসা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ছোটবিপ্র বলে,—"ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি ॥" ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন ছোট বিপ্র গোপাল বিগ্রহকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ঠাকুর, তুমি আমার সাক্ষী রইলে। পরে যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে ডাকব।"

শ্লোক ৩৪

এত বলি' দুইজনে চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট-বিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, সেই দুই ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। আগের মতোই, ছোট বিপ্র গুরুবুদ্ধিতে বড় বিপ্রের বহু সেবা করে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৫

দেশে আসি' দুইজনে গেলা নিজ-ঘরে ।
কত দিনে বড়-বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

বিদ্যানগরে এসে এই দুই ব্রাহ্মণ নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর বড় বিপ্র মনে মনে চিন্তিত হলেন।

শ্লোক ৩৬

তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলুঁ,—কেমতে সত্য হয় ।
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি ভাবতে লাগলেন, "তীর্থস্থানে আমি ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছি এবং সেই কথা নিশ্চয়ই সত্য হবে। আমার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে এখন অবশ্যই আমাকে সেই কথা খুলে বলতে হবে।"

শ্লোক ৩৭

একদিন নিজ-লোক একত্র করিল ।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ডেকে সমস্ত কথা খুলে বললেন।

শ্লোক ৩৮

শুনি' সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার ।
'ঐছে বাত্ মুখে তুমি না আনিবে আর ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা হাহাকার করে উঠলেন। তাঁরা সকলে তাঁকে বললেন, এই ধরনের কথা যেন তিনি আর কখনও মুখে না আনেন।

শ্লোক ৩৯

নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥' ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে আরও বললেন, "তুমি যদি নীচ পরিবারে তোমার কন্যাকে দান কর, তা হলে কৌলিন্য নষ্ট হয়ে যাবে। লোকে যখন সেই কথা শুনবে, তখন তারা হাসাহাসি করবে।"

শ্লোক ৪০

বিপ্র বলে,—"তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন ।
যে হউক্, সে হউক্ আমি দিব কন্যাদান ॥" ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, "পুণ্যতীর্থে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি, কিভাবে আমি তা অন্যথা করব? তার ফল যাই হোক না কেন, আমি অবশ্যই সেই ব্রাহ্মণকে আমার কন্যাদান করব।"

শ্লোক ৪১

জ্ঞাতি লোক কহে,—'মোরা তোমাকে ছাড়িব' ।
স্ত্রী-পুত্র কহে,—'বিষ খাইয়া মরিব' ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আত্মীয়েরা তখন বললেন, "তুমি যদি ওকে কন্যাদান কর তা হলে আমরা তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করব।" আর তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বললেন, "তুমি যদি তাকে কন্যাদান কর, তা হলে আমরা বিষ খেয়ে মরব।"

শ্লোক ৪২

বিপ্র বলে,—"সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায় ।
জিতি' কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম হয় ॥" ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি যদি তাকে কন্যাদান না করি, তা হলে সে শ্রীগোপালজীকে সাক্ষীরূপে ডাকবে। এভাবে সে জোর করে আমার কন্যা জিতে নেবে, তখন আমার ধর্ম ব্যর্থ হবে।"

শ্লোক ৪৩

পুত্র বলে,—"প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে ।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তাঁর পুত্র বলল, "একেতো সাক্ষী হচ্ছে প্রতিমা, তার উপর তা-ও আবার রয়েছে বহু দূর দেশে। কিভাবে তা এখানে এসে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? তুমি কেন এই জন্য দুশ্চিন্তা করছ?

শ্লোক ৪৪

নাহি কহি—না কহিও এ মিথ্যা-বচন ।
সবে কহিবে—'মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥' ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যে এই রকম একটি অঙ্গীকার করেছ, তা তোমাকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করতে হবে না। তুমি শুধু বলবে যে, তোমার কিছুই মনে নেই।

শ্লোক ৪৫

তুমি যদি কহ,—'আমি কিছুই না জানি' ।
তবে আমি ন্যায় করি' ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥" ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যদি কেবল বল, 'আমার কিছু মনে নেই', তা হলে আমি যুক্তিতর্কের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে পরাজিত করব।"

তাৎপর্য

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রটি ছিল নাস্তিক এবং রঘুনাথের *স্মৃতিশাস্ত্রের* অনুগামী। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুব দক্ষ ছিল, কিন্তু আসলে সে ছিল একটি মহা মূর্খ। তাই সে শ্রীবিগ্রহের চিন্ময়ত্বে বিশ্বাস করেনি, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তায়ও তার বিশ্বাস ছিল না। তাই একজন আদর্শ মূর্তি-পূজকরূপে সে মনে করেছিল যে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কাঠ অথবা পাথর দিয়ে তৈরি। সেই জন্যই সে তার পিতাকে বলেছিল যে, সাক্ষী তো কেবল একটি পাথরের প্রতিমা এবং তা কথা বলতে সমর্থ হবে না। তা ছাড়া সে তার পিতাকে আরও বলেছিল যে, সেই প্রতিমা রয়েছে বহু দূর দেশে, অতএব সাক্ষ্য দিতে তা এখানে আসতে পারবে না। মূলত সে বলেছিল, "কোন চিন্তা করো না। তোমাকে সরাসরিভাবে মিথ্যাকথা বলতে হবে না, তোমাকে কেবল একটু কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, ঠিক যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ দ্রোণাচার্যকে বলেছিলেন—*অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ*। এই নীতি অনুসারে কেবল বলবে যে, তোমার কিছু মনে নেই এবং সেই যুবক

ব্রাহ্মণটি যা বলছে সেই সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। তুমি যদি এই রকম পরিবেশ তৈরি করতে পার, তা হলে কথার মারপ্যাঁচে কিভাবে তাকে হারাতে হয়, তা আমার ভালভাবে জানা আছে। এভাবেই তার হস্তে তোমার কন্যাদান করা থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব। এভাবে আমাদের সম্ভ্রান্ততা বজায় থাকবে। সুতরাং তোমাকে সেই নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না।"

শ্লোক ৪৬

এত শুনি' বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন ।
একান্ত-ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুনে, সেই বৃদ্ধ বিপ্রের মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হল। অসহায় হয়ে তিনি একান্তভাবে গোপালের চরণকমল চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৭

'মোর ধর্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন ।
দুই রক্ষা কর, গোপাল, লইনু শরণ ॥' ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বিপ্র প্রার্থনা করলেন, "হে গোপাল, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। অতএব কৃপা করে আমার ধর্ম রক্ষা কর এবং নিজ জনেরা যাতে না মরে তারও ব্যবস্থা কর।"

শ্লোক ৪৮

এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল ।
আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন যখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সেই যুবক ব্রাহ্মণটি তাঁর ঘরে এলেন।

শ্লোক ৪৯

আসিঞা পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি' ।
বিনয় করিঞা কহে কর দুই যুড়ি' ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্রটি তাঁর কাছে এসে, পরম ভক্তিভাবে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন। তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে দুই হাত জুড়ে তিনি বললেন—

শ্লোক ৫০

'তুমি মোরে কন্যা দিতে কর্যাছ অঙ্গীকার ।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার বিচার ॥' ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি আমাকে আপনার কন্যাদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এখন আপনি সেই সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না। এই বিষয়ে আপনি কি স্থির করেছেন?"

শ্লোক ৫১

এত শুনি' সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি' ।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি' ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে বড় বিপ্র চুপ করে রইলেন। আর তাঁর পুত্র হাতে একটি লাঠি নিয়ে ছোট বিপ্রকে মারতে এল।

শ্লোক ৫২

'আরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহ ত' ধরিতে ॥' ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পুত্রটি বলল, "ওরে অধম! তুই আমার বোনকে বিয়ে করতে চাস, বামন হয়ে তুই চাঁদে হাত দিতে চাস।"

শ্লোক ৫৩

ঠেঞা দেখি' সেই বিপ্র পলাঞা গেল ।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

লাঠি দেখে সেই যুবক ব্রাহ্মণটি সেখান থেকে পালিয়ে গেল, কিন্তু তার পরের দিন সে গ্রামের সমস্ত লোককে একত্রিত করল।

শ্লোক ৫৪

সব লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল ।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামের লোকেরা তখন বড় বিপ্রকে সেই সভায় ডেকে আনল এবং ছোট বিপ্র তখন সেই সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল—

শ্লোক ৫৫

'ইহঁ মোরে কন্যা দিতে কর্যাছে অঙ্গীকার ।
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার ॥' ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি আমাকে তাঁর কন্যাদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন না। দয়া করে আপনারা তাঁকে তাঁর আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করুন।"

শ্লোক ৫৬

তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্বজন ।
'কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ॥' ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে সমবেত সমস্ত মানুষ তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যদি ইহাকে কন্যাদান করবেন বলে কথা দিয়ে থাকেন, তা হলে কেন একে কন্যাদান করছেন না?"

শ্লোক ৫৭

বিপ্র কহে,—'শুন, লোক, মোর নিবেদন ।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ ॥' ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৃদ্ধ তখন বললেন, "বন্ধুগণ, কবে যে আমি কি বলেছি তা আমার মনে নেই।"

শ্লোক ৫৮

এত শুনি' তাঁর পুত্র বাক্য-চ্ছল পাঞা ।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তাঁর পুত্র সুযোগ পেয়ে, অত্যন্ত প্রগল্‌ভ হয়ে সভার সামনে এসে বলতে লাগল—

শ্লোক ৫৯

'তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন ।
ধন দেখি এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তীর্থযাত্রার সময় আমার পিতার কাছে অনেক ধন ছিল। সেই ধন দেখে এই দুষ্ট লোকটি তা হরণ করতে মনস্থ করেছিল।

শ্লোক ৬০

আর কেহ সঙ্গে নাহি, এই সঙ্গে একল ।
ধুতুরা খাওয়াঞা বাপে করিল পাগল ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার পিতার সঙ্গে তখন এ ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই লোকটি ধুতুরা খাইয়ে আমার পিতাকে পাগল করে দিয়েছিল।

শ্লোক ৬১

সব ধন লঞা কহে—'চোরে লইল ধন ।'
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে'—উঠাইল বচন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার পিতার সমস্ত ধন হরণ করে এই দুর্বৃত্তটি বলল যে, চোরে সেই ধন চুরি করে নিয়েছে। এখন সে দাবি করছে যে, আমার পিতা তাকে কন্যাদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

শ্লোক ৬২

তোমরা সকল লোক করহ বিচারে ।
'মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥' ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"এখানে সমবেত সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে আপনারা একটু বিচার করে দেখুন, এই লোকটি কি আমার পিতার কন্যাদানের যোগ্য?"

শ্লোক ৬৩

এত শুনি' লোকের মনে হইল সংশয় ।
'সম্ভবে,—ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্মভয় ॥' ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকল লোকের মনে সংশয় হল যে, হলেও হতে পারে, কারণ ধনলোভে লোকে অনেক সময় ধর্মেরও ভয় করে না।

শ্লোক ৬৪

তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, মহাজন ।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন ছোট বিপ্রটি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, যুক্তিতর্কের বিচারে আমাকে পরাস্ত করার জন্য এই লোকটি মিথ্যাকথা বলছেন।

শ্লোক ৬৫

এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা ।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার সেবায় তুষ্ট হয়ে এই ব্রাহ্মণ নিজেই বলেছিলেন, 'আমি অঙ্গীকার করছি যে, তোমাকে আমি আমার কন্যাদান করব।'

শ্লোক ৬৬

তবে মুঞি-নিষেধিনু,—শুন, দ্বিজবর ।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি হাত জোড় করে তাঁকে বলেছিলাম, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র নই।

শ্লোক ৬৭

কাহাঁ তুমি পণ্ডিত, ধনী, পরম কুলীন ।
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ, কুলহীন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"'কোথায় আপনি একজন মহাপণ্ডিত, ধনী ও পরম কুলীন আর আমি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ ও কুলহীন।'

শ্লোক ৬৮

তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার ।
তোরে কন্যা দিলুঁ, তুমি করহ স্বীকার ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু তবুও এই ব্রাহ্মণটি জোর করতে লাগলেন। বার বার তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, 'তোমাকে আমি আমার কন্যাদান করলাম, তুমি তাকে গ্রহণ কর।'

শ্লোক ৬৯

তবে আমি কহিলাঙ—শুন, মহামতি ।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি বলেছিলাম, 'হে মহাশয়, আপনার স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন এই প্রস্তাবে সম্মত হবেন না।'

শ্লোক ৭০

কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য-বচন ।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"'আপনি আপনার কন্যাদান করতে পারবেন না এবং আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবেন না।' কিন্তু তবুও, তিনি জোর দিয়ে বললেন—

শ্লোক ৭১

কন্যা তোরে দিলুঁ, দ্বিধা না করিহ চিতে ।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"'আমি তোমাকে কন্যাদান করলাম। সেই বিষয়ে কোন দ্বিধা করো না। সে আমার কন্যা এবং আমি তাকে তোমাকে দিলাম। কে তাতে বাধা দিতে পারে?"

শ্লোক ৭২

তবে আমি কহিলাঙ দৃঢ় করি' মন ।
গোপালের আগে কহ এ-সত্য বচন ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি দৃঢ় চিত্ত হয়ে এই ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেছিলাম, তা হলে শ্রীগোপাল বিগ্রহের সামনে আপনি এই সত্য অঙ্গীকার করুন।

শ্লোক ৭৩

তবে ইঁহো গোপালের আগেতে কহিল ।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন ইনি শ্রীগোপালের সম্মুখে বলেছিলেন, 'হে প্রভু, তোমাকে সাক্ষী রেখে আমি এই ব্রাহ্মণটিকে আমার কন্যাদান করলাম।'

শ্লোক ৭৪

তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিঞা ।
কহিলাঙ তাঁর পদে মিনতি করিঞা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন আমি গোপালকে সাক্ষী রেখে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মিনতি করে বলেছিলাম—

শ্লোক ৭৫

যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান ।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায়, হইও সাবধান ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"'এই ব্রাহ্মণ যদি আমাকে তাঁর কন্যাদান করতে অস্বীকার করেন, তা হলে কিন্তু আমি তোমাকে সাক্ষী ডাকব। দয়া করে সেই বিষয়ে সাবধান থেকো।'

শ্লোক ৭৬

এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন ।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥" ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ব্যাপারে আমার এমন একজন সাক্ষী রয়েছে, যাঁর কথা সারা জগৎ সত্য বলে মানে।"

তাৎপর্য

ছোট বিপ্র যদিও নিজেকে মূর্খ, নীচ ও কুলহীন বলে বর্ণনা করেছিলেন, তবু তাঁর একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বময় কর্তা, শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তাঁর সরল বিশ্বাস ছিল এবং ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। ভগবানের আর এক মহান ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের বর্ণনা অনুসারে, ভগবানের এই রকম ঐকান্তিক ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে জানতে হবে—*তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৪) ভগবানের বাণীতে সুদৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তকে এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সব চাইতে সম্ভ্রান্ত এবং সব চাইতে ধনী ব্যক্তি বলে জানতে হবে। এই ধরনের ভক্তের মধ্যে সমস্ত দিব্য গুণাবলী আপনা থেকেই বিরাজ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার সময়, পরমেশ্বর ভগবানের দাসের অনুদাসের অনুদাসরূপে আমরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর দাসদের, অর্থাৎ গুরু-পরম্পরার ধারায় পূর্বতন আচার্যদের বাণী বিশ্বাস করি। এভাবেই আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করছি। যদিও আমরা ধনবান নই, পণ্ডিত নই এবং সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত নই, তবুও এই আন্দোলন সর্বত্রই সমাদৃত হচ্ছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে অতি সহজেই প্রচারিত হচ্ছে। যদিও আমরা দরিদ্র এবং আমাদের অর্থ উপার্জনের কোন বাঁধাধরা উপায় নেই, তবুও যখন আমাদের প্রয়োজন হয় তখনই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের টাকা পাঠিয়ে দেন। যখনই আমাদের লোকবলের দরকার হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাদের পাঠিয়ে দেন। তাই *ভগবদ্গীতায়*

(৬/২২) বলা হয়েছে—*যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।* প্রকৃতপক্ষে, আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি, তা হলে আমাদের আর অন্য কিছু দরকার হয় না। বিশেষ করে সেই সমস্ত জিনিষের দরকার আমাদের নেই, যেগুলি বিষয়ী লোকেরা তাদের জড় সম্পদ বলে মনে করে।

শ্লোক ৭৭-৭৮

তবে বড়বিপ্র কহে,—"এই সত্য কথা!
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনে আসি' এথা ॥ ৭৭ ॥
তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয় ।"
তাঁর পুত্র কহে,—'এই ভাল বাত হয় ॥' ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন বড় বিপ্র বললেন, "সেটি খুব ভাল কথা, গোপাল যদি নিজে এসে সাক্ষ্য দেন, তা হলে অবশ্যই আমি এই ব্রাহ্মণটিকে আমার কন্যাদান করব।" তখন তাঁর পুত্রও বললেন, "হ্যাঁ, এটি খুব ভাল কথা।"

তাৎপর্য

সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ সকলের বাসনা, অনুরোধ ও প্রার্থনা সম্বন্ধে অবগত। সেগুলি পরস্পর-বিরোধী হলেও, ভগবানকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হয় যার ফলে সকলে সন্তুষ্ট হয়। এটি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও এক যুবক ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহজনিত আলোচনার একটি ঘটনা। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি অবশ্যই তাঁর কন্যাকে সেই যুবক ব্রাহ্মণটিকে দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর ইচ্ছায় বাদ সেধেছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি বিবেচনা করেছিলেন কিভাবে তিনি এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে মুক্ত হবেন এবং তাঁর কন্যাকে সেই যুবক ব্রাহ্মণটিকে দান করবেন। তাঁর পুত্রটি ছিল নাস্তিক ও ধূর্ত, সে ফন্দি এঁটেছিল যাতে সেই বিবাহ যেন না হয়। পিতা ও পুত্রের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যাতে উভয়েই সম্মত হয়েছিলেন। তারা উভয়েই রাজি হয়েছিলেন যে, গোপাল যদি সেখানে এসে সাক্ষ্য দেন, তা হলে সেই যুবক ব্রাহ্মণটিকে কন্যাদান করা হবে।

শ্লোক ৭৯

বড়বিপ্রের মনে,—'কৃষ্ণ বড় দয়াবান্ ।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥' ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

বড় বিপ্র ভাবলেন, "শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দয়াবান, তিনি অবশ্যই এসে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবেন।"

শ্লোক ৮০

পুত্রের মনে,—'প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে' ।
এই বুদ্ধ্যে দুইজন হইলা সম্মতে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

নাস্তিক পুত্রটি ভাবল, "গোপালের বিগ্রহের পক্ষে এখানে এসে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নয়।" এভাবে বিবেচনা করে, পিতা ও পুত্র উভয়েই সম্মত হলেন।

শ্লোক ৮১

ছোটবিপ্র বলে,—'পত্র করহ লিখন ।
পুনঃ যেন্ নাহি চলে এসব বচন ॥' ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র তখন বললেন—"দয়া করে আপনি তা একটি কাগজে লিখে দিন, যাতে আপনি পুনরায় আপনার কথার পরিবর্তন না করেন।"

শ্লোক ৮২

তবে সব লোক মেলি' পত্র ত' লিখিল ।
দুঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সমবেত সমস্ত লোকেরা এই বিবৃতি একটি কাগজে লিখলেন এবং তাঁরা দুজনেই তাঁদের সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর দিলেন এবং গ্রামের সমস্ত লোকেরা মধ্যস্থ রইলেন।

শ্লোক ৮৩

তবে ছোটবিপ্র কহে,—শুন, সর্বজন ।
এই বিপ্র—সত্য-বাক্য, ধর্মপরায়ণ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন ছোট বিপ্র বললেন, "সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, এই ব্রাহ্মণ অবশ্যই অত্যন্ত সত্যবাদী এবং ধর্মপরায়ণ।

শ্লোক ৮৪

স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন ।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে অসত্য-বচন ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চান না। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন আত্মহত্যা করতে পারে, এই ভয়ে তিনি সত্য কথা বলছেন না।

শ্লোক ৮৫

'ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব ।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ব্রাহ্মণের পুণ্যফলের প্রভাবে, আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে আসব। এইভাবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।"

শ্লোক ৮৬

এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে ।
কেহ বলে, ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেই পারে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্রের কথা শুনে, নাস্তিকেরা উপহাস করতে লাগল। আর অন্য কেউ কেউ বললেন, "ভগবান অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি ইচ্ছা করলে আসতেও পারেন।"

শ্লোক ৮৭

তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে সব বিবরণ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সেই ছোট বিপ্র বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে পৌঁছে তিনি গোপালকে তাঁর সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন এবং তারপর তাঁকে সমস্ত ঘটনা শোনালেন।

শ্লোক ৮৮

"ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময় ।
দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হঞা সদয় ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বললেন, "হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষক এবং আপনি অত্যন্ত দয়াময়। তাই দয়া করে আপনি আমাদের দুজনেরই ধর্ম রক্ষা করুন।

শ্লোক ৮৯

কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুঃখ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, কন্যা লাভের আশায় যে আমি সুখ অনুভব করছি তা নয়। ব্রাহ্মণের যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হচ্ছে এই জন্যই আমার দুঃখ।"

তাৎপর্য

বড় বিপ্রের কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করে দাম্পত্য সুখ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষ ছোট বিপ্রের ছিল না। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ছোট বিপ্র ভগবানকে সাক্ষ্যদান করার অনুরোধ করতে বৃন্দাবনে যাননি। বড় বিপ্র যে প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং গোপাল সাক্ষ্য না দিলে যে বড় বিপ্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, সেই কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাই ছোট বিপ্র গোপালের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ছোট বিপ্র ছিলেন এমনই এক শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের কোন রকম বাসনা তাঁর ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরমেশ্বর ভগবান এবং ভগবদ্ভক্ত-বৈষ্ণব—সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবা করা।

শ্লোক ৯০

এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র বললেন, "হে প্রভু, আপনি অত্যন্ত দয়াময় এবং আপনি সব কিছুই জানেন। তাই, দয়া করে আপনি সাক্ষ্য দান করুন। যদি কোন ব্যক্তি জেনে-শুনেও সাক্ষ্য না দেয়, তা হলে তার পাপ হয়।"

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে ভক্তের আচরণ অত্যন্ত সরল। ছোট বিপ্র ভগবানকে বললেন, "তুমি তো সব কিছুই জান, কিন্তু তুমি যদি সাক্ষ্য না দাও, তা হলে তোমার পাপ হবে।" ভগবানের পাপ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে সব কিছু জানা সত্ত্বেও এভাবেই ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, যেন তিনি হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ। যদিও ভগবানের সঙ্গে ভক্তের আচরণ সর্বদাই অত্যন্ত সরল এবং উদার, তবুও সেই আচরণে লৌকিকতা থাকে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের গভীর সম্পর্কের ফলেই এটি হয়।

শ্লোক ৯১

কৃষ্ণ কহে,—বিপ্র, তুমি যাহ স্ব-ভবনে ।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও এবং সকলকে একটি সভায় আহ্বান করে তুমি আমাকে স্মরণ কর।

শ্লোক ৯২

আবির্ভাব হঞা আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব ।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি অবশ্যই সেখানে আবির্ভূত হব এবং সাক্ষ্যদান করে তোমাদের দুজনের সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।"

শ্লোক ৯৩

বিপ্র বলে,—"যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্তি ।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট বিপ্র উত্তর দিলেন, "হে প্রভু, যদি আপনি আপনার চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি নিয়েও প্রকাশিত হন, তবুও আপনার বাক্যে তাদের বিশ্বাস হবে না।

শ্লোক ৯৪

এই মূর্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে ।
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্বলোক শুনে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

আপনি যদি আপনার এই গোপালরূপ নিয়ে সেখানে যান এবং আপনার এই শ্রীবদনে সাক্ষ্যদান করেন, তা হলে সকলে তা বিশ্বাস করবে।"

শ্লোক ৯৫

কৃষ্ণ কহে,—"প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি ।"
বিপ্র বলে,—"প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "প্রতিমা যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলতে পারে এই কথা কোথাও শোনা যায়নি।" ব্রাহ্মণ তখন উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ তা ঠিক, কিন্তু প্রতিমা হয়ে আপনি কেন কথা বলছেন?

শ্লোক ৯৬

প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য-করণ ॥" ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আপনি প্রতিমা নন; আপনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। এখন, দয়া করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য এমন কিছু করুন, যা আপনি পূর্বে কখনও করেননি।"

শ্লোক ৯৭

হাসিঞা গোপাল কহে,—"শুনহ, ব্রাহ্মণ ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপাল তখন হেসে বললেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার পেছনে পেছনে আমি যাব।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণের কথায় প্রমাণিত হয় যে, ভগবানের অর্চামূর্তি বা জড় পদার্থ থেকে তৈরি রূপ জড় নয়, কেন না সেই সমস্ত উপাদানগুলি যদিও ভগবান থেকে ভিন্ন, তবুও সেগুলি ভগবানেরই শক্তির অংশ। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। জড় উপাদানগুলি যেহেতু ভগবানের শক্তি এবং যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, তাই তিনি যে কোন উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারেন। সূর্য যেমন তার কিরণের মাধ্যমে তাপ ও আলোক বিতরণ করতে পারেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে কাঠ, পাথর, ধাতু, মণি আদি জড় পদার্থের মাধ্যমে তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপ প্রকাশ করতে পারেন। কারণ সমস্ত জড় উপাদানগুলি হচ্ছে তাঁর শক্তি। তাই শাস্ত্রে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, *অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী.....নারকী সঃ।* মন্দিরের অর্চাবিগ্রহকে কখনই শিলা, কাঠ অথবা কোন জড় উপাদান বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির প্রভাবে ছোট বিপ্র জানতেন যে, গোপাল বিগ্রহ যদিও আপাতদৃষ্টিতে পাথর বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি পাথর নন। তিনি হচ্ছেন নন্দ মহারাজের পুত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং। প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে যেভাবে আচরণ করেন, শ্রীবিগ্রহও ঠিক সেভাবেই আচরণ করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ ছোট বিপ্রের অর্চাবিগ্রহ সম্বন্ধে জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য এভাবে কথা বলছিলেন। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ আদি কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, পক্ষান্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু শ্রীবিগ্রহ পাথর, কাঠ বা কোন কোন উপাদান বলে প্রতিভাত হয়। যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন তাঁরা জানেন যে, সমস্ত জড় উপাদানগুলি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই কোন কিছু প্রকৃতপক্ষে জড় নয়। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার ফলে, শ্রীকৃষ্ণ যে কোনরূপে তাঁর ভক্তের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত পূর্ণরূপে ভগবানের আচরণ সম্বন্ধে অবগত। বাস্তবিকপক্ষে, তিনি ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে পারেন।

শ্লোক ৯৮

উলটিয়া আমা তুমি না করিহ দরশনে ।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান বললেন, "তুমি পিছন ফিরে আমাকে দেখার চেষ্টা করো না। আমাকে দেখলে আমি সেখানেই রয়ে যাব।

শ্লোক ৯৯

নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা ।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যে তোমার পিছন পিছন যাচ্ছি তা তুমি বুঝতে পারবে আমার নূপুরের শব্দ শুনে।

শ্লোক ১০০

একসের অন্ন রান্ধি' করিহ সমর্পণ ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥" ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতিদিন একসের অন্ন রান্না করে আমাকে নিবেদন করবে। তা খেয়ে আমি তোমার পিছনে পিছনে যাব।"

শ্লোক ১০১

আর দিন আজ্ঞা মাগি' চলিলা ব্রাহ্মণ ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিলা গমন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর দিন গোপালের অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। আর গোপাল তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

শ্লোক ১০২

নূপুরের ধ্বনি শুনি' আনন্দিত মন ।
উত্তমান্ন পাক করি' করায় ভোজন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপাল যখন তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন, তখন নূপুরের ধ্বনি শুনে ব্রাহ্মণের

মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। আর প্রতিদিনি তিনি অতি উত্তম অন্ন পাক করে গোপালের ভোগ দিতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৩

এইমতে চলি' বিপ্র নিজে-দেশে আইলা ।
গ্রামের নিকট আসি' মনেতে চিন্তিলা ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চলতে চলতে ছোট বিপ্র অবশেষে তার দেশে ফিরে এলেন। গ্রামের নিকটে এসে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

শ্লোক ১০৪

'এবে মুঞি গ্রামে আইনু, যাইমু ভবন ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আমি আমার গ্রামে এসে পৌঁছেছি এবং আমি আমার বাড়ি যাব এবং সকলকে গিয়ে বলব যে, সাক্ষী এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

শ্লোক ১০৫

সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ।
ইহাঁ যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয় ॥' ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "সাক্ষাতে গোপালদেবকে দর্শন না করলে আমার মন স্থির হচ্ছে না, অথচ গোপালদেব যদি এখানেও থাকেন, অর্থাৎ তিনি যদি আমার পিছন পিছন আর না-ও যান, তা হলেও কোন ভয় নেই।"

শ্লোক ১০৬

এত ভাবি' সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিঞা গোপাল-দেব তথায় রহিল ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই ভেবে, সেই ব্রাহ্মণ ফিরে চাইলেন এবং অমনি সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হেসে গোপালদেব সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ১০৭

ব্রাহ্মণেরে কহে,—"তুমি যাহ নিজ-ঘর ।
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥" ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালদেব ব্রাহ্মণকে বললেন, "এখন তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আমি আর তোমার পিছন পিছন যাব না, আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।"

শ্লোক ১০৮

তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ তখন নগরে গিয়ে সমস্ত লোকদের গোপালের আগমনের সংবাদ জানালেন। সেই কথা শুনে সকলে চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১০৯

আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত লোকেরা সাক্ষী গোপালকে দেখতে এলেন এবং গোপালকে দেখে তাঁরা দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১১০

গোপাল-সৌন্দর্য দেখি' লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলিঞা আইলা,—শুনিঞা বিস্মিত ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালের সৌন্দর্য দর্শন করে সকলে আনন্দের সাগরে মগ্ন হলেন এবং তাঁরা যখন শুনলেন যে, প্রকৃতপক্ষে গোপাল হাঁটতে হাঁটতে সেখানে এসেছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১১১

তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই বড় বিপ্র মহা আনন্দে গোপালের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১১২

সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সমস্ত লোকের সামনে গোপাল সাক্ষ্য দিলেন যে, বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে কন্যাদান করেছেন।

শ্লোক ১১৩

তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর।
"তুমি-দুই—জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর গোপাল সেই দুই বিপ্রকে বললেন, "তোমরা দুজন জন্ম-জন্মান্তরে আমার সেবক।"

তাৎপর্য

বিদ্যানগরের এই দুজন ব্রাহ্মণের মতো বহু ভক্ত রয়েছেন যাঁরা ভগবানের নিত্যসেবক। তাঁদের বলা হয় *নিত্যসিদ্ধ*। নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত এই জড় জগতে এলেও এবং তাঁদের দেখতে একজন সাধারণ মানুষের মতো হলেও, তাঁরা কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যান না। সেটিই হচ্ছে নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ।

দুই রকমের জীব রয়েছে—*নিত্যসিদ্ধ* ও *নিত্যবদ্ধ*। নিত্যসিদ্ধগণ কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা ভুলে যান না, কিন্তু নিত্যবদ্ধগণ সর্বদাই বদ্ধ, এমন কি সৃষ্টির পূর্বেও। তারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। এখানে ভগবান সেই দুজন ব্রাহ্মণকে বললেন যে, তাঁরা জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর সেবক। জন্ম-জন্মান্তরে কথাটি জড় জগতের বেলায় প্রযোজ্য, কেন না চিৎ-জগতে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নেই। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে নিত্যসিদ্ধগণ একজন সাধারণ মানুষের মতো এই জড় জগতে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করা। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে দুজন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবাহ বিষয়ক ঘটনা বলে মনে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই দুজন ব্রাহ্মণকে তাঁর নিত্যকিঙ্কর বলে স্বীকার করেছিলেন। উভয় ব্রাহ্মণই সাধারণ মানুষের মতো এই ব্যাপারে অনেক অসুবিধা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভগবানের নিত্য সেবকরূপেই সব কিছু করেছিলেন। এই জড় জগতে নিত্যসিদ্ধদের সাধারণ মানুষের মতো কার্য করছেন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁরা কখনও ভুলে যান না যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্যসেবক।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—বড় বিপ্র ছিলেন সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান ও ধনী। আর ছোট বিপ্র ছিলেন ধনহীন, অবিদ্বান ও অকুলীন। কিন্তু এই সমস্ত জড় মর্যাদার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ নিত্যসিদ্ধদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, নিত্যসিদ্ধরা নিত্যবদ্ধ সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করেছেন—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস ॥

যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গীদের নিত্যসিদ্ধ বলে জানেন, তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভ করেন। যিনি জানেন যে, গৌড়মণ্ডল-ভূমি, অর্থাৎ বঙ্গভূমির যে সমস্ত স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিরাজ করেছিলেন, সেই স্থানসকল চিন্তামণির দ্বারা রচিত—তিনি গোলোক বৃন্দাবনে বাস করার মহা সৌভাগ্য অর্জন করেন। বৃন্দাবনবাসী এবং গৌড়মণ্ডল-ভূমিবাসী বা শ্রীধাম মায়াপুরবাসীদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১১৪

দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাঙ, দুঁহে মাগ' বর ।"
দুইবিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান বললেন, "তোমাদের দুজনের সত্যবাদিতায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা এখন আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" তখন সেই দুজন ব্রাহ্মণ অন্তরে আনন্দিত হয়ে বর প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ১১৫

"যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে ।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্বলোকে জানে ॥" ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রাহ্মণেরা বললেন, "আপনি যদি আমাদের বর দিতে চান, তা হলে আমরা এই বর প্রার্থনা করব যে, আপনি এখানেই থাকুন যাতে সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে যে, আপনার সেবকের প্রতি আপনার কত দয়া।"

শ্লোক ১১৬

গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন ।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক-জন ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালদেব সেখানে রইলেন এবং তখন সেই দুজন ব্রাহ্মণ তাঁর সেবা করতে লাগলেন। এই ঘটনার কথা শুনে, বিভিন্ন দেশের লোকেরা শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করার জন্য সেখানে আসতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৭

সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য শুনিঞা ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিঞা ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে, সেই দেশের রাজা গোপালকে দর্শন করতে এলেন এবং গোপালকে দর্শন করে পরম আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১১৮

মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
'সাক্ষিগোপাল' বলি' তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালের জন্য রাজা একটি খুব সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে দিলেন এবং গোপালের নিয়মিত সেবার ব্যবস্থা করলেন। সেই থেকে গোপালদেব 'সাক্ষিগোপাল' নামে বিখ্যাত হলেন।

শ্লোক ১১৯

এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করি' আছেন চিরকাল ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বহুকাল ধরে সাক্ষিগোপাল বিদ্যানগরে সেবা গ্রহণ করে বিরাজ করছেন।

তাৎপর্য

দক্ষিণ-ভারতের ত্রৈলঙ্গদেশের গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগর অবস্থিত। গোদাবরী যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে, সেই স্থানকে বলা হয় 'কোটদেশ'। এই কোটদেশ উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই প্রদেশের রাজধানী ছিল 'বিদ্যানগর'। পূর্বে এই শহরটি গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেব সেই দেশ নিজাধিকারে আনয়ন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তার দ্বারা রাজ্যশাসন করতেন। বর্তমানে গোদাবরীর উত্তর তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী থেকে বিদ্যানগর কুড়ি-পঁচিশ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পারে অবস্থিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময়, শ্রীরামানন্দ রায় সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। ভিজিয়ানগর, ভজিয়ানা-গ্রাম বা বিজয়নগর—বিদ্যানগর নয়।

শ্লোক ১২০

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব নাম ।
সেই দেশ জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেব যুদ্ধে এই দেশ জয় করে নেন।

শ্লোক ১২১

সেই রাজা জিনি' নিল তাঁর সিংহাসন ।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ পুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগরের রাজাকে পরাজিত করে তাঁর সিংহাসন জয় করে নিলেন। সেই সিংহাসনের নাম ছিল 'মাণিক্য-সিংহাসন' এবং তা বহু মণি-মাণিক্যে ভূষিত ছিল।

শ্লোক ১২২

পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্ত আর্য ।
গোপাল-চরণে মাগে,—'চল মোর রাজ্য ॥' ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ পুরুষোত্তমদেব ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত এবং আর্য সভ্যতার কর্ণধার। তিনি গোপালের চরণে প্রার্থনা করে বললেন, "দয়া করে তুমি আমার রাজ্যে চল।"

শ্লোক ১২৩

তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ভক্তিতে বশীভূত হয়ে, গোপালদেব তাঁর সেই প্রার্থনায় রাজি হলেন। মহারাজ পুরুষোত্তমদেব তখন তাঁকে কটকে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১২৪

জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন ।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ পুরুষোত্তমদেব সেই 'মাণিক্য-সিংহাসনটি' নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবকে উপহার দিয়েছিলেন। আর কটকে গোপালদেবকে স্থাপন করে তাঁর নিয়মিত সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্লোক ১২৫

তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে ।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

কটকে শ্রীগোপালদেবকে প্রতিষ্ঠা করা হলে, মহারাজ পুরুষোত্তমদেবের মহিষী তখন তাঁকে দর্শন করতে আসেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁকে বহু অলঙ্কার সমর্পণ করেন।

শ্লোক ১২৬

তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয় ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহিষীর নাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান মুক্তা ছিল এবং তিনি সেই মুক্তাটি গোপালকে দিতে ইচ্ছা করে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

শ্লোক ১২৭

ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীবিগ্রহের নাকে যদি ছিদ্র থাকত, তা হলে তাঁর এই দাসী তাঁর নাকে এই মুক্তাটি পরাতে পারত।"

শ্লোক ১২৮

এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে ।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা চিন্তা করে, গোপালকে প্রণতি নিবেদন করে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। সেই রাত্রে গোপাল তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—

শ্লোক ১২৯

"বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি' ।
মুক্তা পরাঞাছিল বহু যত্ন করি' ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বাল্যকালে আমার মা আমার নাকে ছিদ্র করে বহু যত্নে মুক্তা পরিয়েছিল।

শ্লোক ১৩০

সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে ।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥" ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ছিদ্র এখনও আমার নাকে রয়েছে, সুতরাং যে মুক্তা তুমি আমাকে পরাতে বাসনা করেছ, তা তুমি আমার নাকে পরাতে পার।"

শ্লোক ১৩১

স্বপ্নে দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল ।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বপ্ন দেখে রানী রাজাকে গিয়ে সেই কথা বললেন। তারপরে রাজা ও রানী উভয়েই মুক্তা নিয়ে মন্দিরে গেলেন।

শ্লোক ১৩২

পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা ।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবিগ্রহের নাকে ছিদ্র দেখে তাঁরা সেই মুক্তা পরালেন এবং মহা আনন্দে এক মহা মহোৎসবের আয়োজন করলেন।

শ্লোক ১৩৩

সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ।
এই লাগি 'সাক্ষিগোপাল', নাম হৈল খ্যাতি ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই থেকে গোপাল কটকে রইলেন এবং 'সাক্ষিগোপাল' নামে বিখ্যাত হলেন।

শ্লোক ১৩৪

নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত ।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীগোপালদেবের লীলাকথা শুনলেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গী-ভক্তবৃন্দ উভয়ে খুবই আনন্দ লাভ করলেন।

শ্লোক ১৩৫

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ।
ভক্তগণে দেখে—যেন দুঁহে একমূর্তি ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীগোপাল-বিগ্রহের সম্মুখে বসেছিলেন, তখন সমস্ত ভক্তরা তাঁদের দুজনের একই মূর্তি দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৩৬

দুঁহে—এক বর্ণ, দুঁহে—প্রকাণ্ড-শরীর ।
দুঁহে—রক্তাম্বর, দুঁহার স্বভাব—গম্ভীর ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের দুজনেরই গায়ের রং এক, শরীর প্রকাণ্ড, পরিধানে গৈরিক বসন এবং দুজনেরই স্বভাব অত্যন্ত গম্ভীর।

শ্লোক ১৩৭

মহা-তেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন ।
দুঁহার ভাবাবেশ, দুঁহে—চন্দ্রবদন ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তেরা দেখলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও গোপালদেব উভয়েই মহা তেজোময়, উভয়েরই নয়ন কমলের মতো, উভয়েই ভাবাবিষ্ট এবং উভয়ের শ্রীমুখই পূর্ণচন্দ্রের মতো।

শ্লোক ১৩৮

দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে ।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীগোপাল-বিগ্রহ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এভাবেই দেখলেন, তখন তিনি ভক্তদের সঙ্গে তা নিয়ে ঠারাঠারি করতে লাগলেন এবং সমস্ত ভক্তেরা তখন হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৯

এই মত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া ।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই মহারঙ্গে সেখানে সেই রাত্রিটি কাটিয়ে, সকালবেলা মঙ্গল-আরতি দর্শন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তেরা যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৪০

ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

ভুবনেশ্বর যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-যে স্থান দর্শন করেছিলেন, তা বিস্তারিতভাবে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে) বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কটক থেকে রাজপথে বের হয়ে বালিহন্তা বা বালকাটিচটি হয়ে ভুবনেশ্বর যাওয়ার বর্ণনা করেছেন। তিনি ভুবনেশ্বরে শিবমন্দির দর্শন করেন। বালকাটিচটি থেকে ভুবনেশ্বরের মন্দির পাঁচ-ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। *স্কন্দ পুরাণে* শিবের একাম্রকানন লাভের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। কাশীরাজ নামে একজন রাজা পূজা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কাশীরাজের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করতে সম্মত হন। শিবের আর এক নাম আশুতোষ, অর্থাৎ তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তকে বরদান করেন। তাই শিবপূজার প্রতি মানুষ এত আসক্ত। কিন্তু শিবের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও, সেই যুদ্ধে কাশীরাজ কেবল পরাজিতই হননি, তিনি নিহতও হন। এভাবেই শিবের পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ হয় এবং কৃষ্ণ কাশী দগ্ধ করেন। পরে কাশীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধ অবগত হয়ে, শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন তিনি আশীর্বাদ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এই একাম্রকানন নামক একটি স্থান প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে, এখানে কেশরী-বংশীয় রাজারা রাজধানী স্থাপন করে কয়েক শতাব্দী উৎকলদেশে রাজত্ব করেন।

শ্লোক ১৪১

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল ।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কমলপুরে এসে ভার্গীনদীতে স্নান করলেন এবং তখন তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর হাতে তাঁর সন্ন্যাস-দণ্ডটি অর্পণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরে গুপ্তকাশী নামক শিবমন্দির দর্শন করেন। এখানে শিব সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু করে এনে 'বিন্দুসরোবর' নামক সরোবর সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সরোবরে স্নান করে দেবাদিদেব মহাদেবকে ধন্য করেছিলেন। মানুষ এখনও পুণ্য অর্জনের জন্য এই সরোবরে স্নান করতে যায়। প্রকৃতপক্ষে, জাগতিক বিচারেও এই সরোবরে স্নান করা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এই সরোবরে স্নান এবং এই সরোবরের জল পান করলে যে কোন পেটের রোগ সেরে যায়। নিয়মিতভাবে এই সরোবরে স্নান করলে অবশ্যই অজীর্ণ রোগ সেরে যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ভার্গীনদীর জলে স্নান করলেন। এর বর্তমান নাম হয় 'দণ্ডভাঙ্গা নদী'। এই নদীটি জগন্নাথপুরীর ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নদীটির এই নাম হওয়ার কারণ নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৪২-১৪৩

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে ।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড-ভঙ্গে ॥ ১৪২ ॥
তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা ।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর সন্ন্যাস-দণ্ড দিয়ে কপোতেশ্বরে শিবমন্দিরে যান, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর দণ্ডটি তিন খণ্ড করে ভার্গীনদীর জলে ভাসিয়ে দেন। তাই পরবর্তীকালে এই নদীটির নাম হয় 'দণ্ডভাঙ্গা নদী'।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-দণ্ডের রহস্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই সন্ন্যাস-দণ্ড তিন খণ্ড করে ভেঙ্গে ভার্গীনদীতে ফেলে দেন এবং পরবর্তীকালে নদীটি দণ্ডভাঙ্গা নদী নামে পরিচিত হয়। সন্ন্যাস-আশ্রমে চারটি অবস্থা রয়েছে—কুটীচক, বহুদক, হংস এবং পরমহংস। কুটীচক এবং বহুদক অবস্থাতেই সন্ন্যাস-দণ্ড বহন করতে হয়। কিন্তু পরিভ্রমণ ও ভগবদ্ভক্তি প্রচারের পর হংস ও পরমহংস স্তরে দণ্ড ত্যাগ করা বিধেয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাই বলা হয়েছে, *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য।* অতএব নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষা করেননি। তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, পরমেশ্বর

ভগবান স্বাভাবিকভাবেই পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত; তাই তাঁর দণ্ড বহন করার কোন প্রয়োজন নেই। এভাবেই বিবেচনা করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-দণ্ড তিন খণ্ড করে ভেঙ্গে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪৪

জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা ।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন। মন্দিরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে, তিনি ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে নাচতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেউল শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মন্দির। জগন্নাথপুরীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন মহারাজ অনঙ্গভীম। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল কম করে দুহাজার বছর আগে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় মন্দিরকে বেষ্টন করে রয়েছে যে উপলভোগের মন্দির, ভোগরন্ধন-খণ্ড এবং বাইরের উচ্চ চত্বর, সেই সমস্ত তখনও নির্মিত হয়নি।

শ্লোক ১৪৫

ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা, সবে নাচে গায় ।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভক্তেরাও তখন নাচ-গান করতে লাগলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজপথ দিয়ে চলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪৬

হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জন ।
তিনক্রোশ পথ হৈল—সহস্র যোজন ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও হাসছিলেন, কখনও কাঁদছিলেন, কখনও নাচছিলেন এবং কখনও হুঙ্কার-গর্জন করছিলেন। যদিও মন্দিরের দূরত্ব ছিল কেবল ছয় মাইল, কিন্তু তাঁর কাছে তা যেন সহস্র যোজন বলে মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভাবাবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁর কাছে এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছিল। দূর থেকে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-

প্রেমে এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর কাছে তখন ছয় মাইল পথ হাজার হাজার যোজন বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ১৪৭

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা' ।
তাহাঁ আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'আঠারনালা' নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি একটু বাহ্য চেতনা প্রকাশ করলেন।

তাৎপর্য

পুরী নগরে প্রবেশ করার যে সেতু আছে, তার নাম 'আঠারনালা'। তাতে আঠারটি খিলান আছে।

শ্লোক ১৪৮

নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—দেহ মোর দণ্ড ।
নিত্যানন্দ বলে,—দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

বাহ্য চেতনা লাভ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, "দয়া করে এখন আমার দণ্ডটি ফিরিয়ে দাও।" নিত্যানন্দ প্রভু তখন উত্তর দিলেন, "সেই দণ্ডটি তিন খণ্ডে পরিণত হয়েছে।"

শ্লোক ১৪৯

প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু ।
তোমা-সহ সেই দণ্ড-উপরে পড়িনু ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু তখন বললেন, "প্রেমাবেশে তুমি যখন পড়ে যাচ্ছিলে তখন আমি তোমাকে ধরেছিলাম এবং আমরা দুজনেই সেই দণ্ডের উপর পড়েছিলাম।

শ্লোক ১৫০

দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাদের দুজনার ভারে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সেই খণ্ডগুলি যে কোথায় পড়েছে তা আমি কিছুই জানি না।

শ্লোক ১৫১

মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হইল খণ্ড ।
যে উচিত হয়, মোর কর তার দণ্ড ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার অপরাধে তোমার দণ্ড খণ্ড খণ্ড হল। এখন আমাকে সেই অপরাধের জন্য তুমি যে দণ্ড দিতে চাও দিতে পার।"

শ্লোক ১৫২

শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা ।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটু দুঃখিত হলেন এবং ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করে তিনি বলতে লাগলেন—

তাৎপর্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিবেচনা করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড বহন করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই তিনি সেই দণ্ড ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন একটু ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, কেন না তিনি সমস্ত সন্ন্যাসীদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়ার আগে তাঁদের দণ্ড ত্যাগ না করাই উচিত। এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে শাস্ত্রবিধির শৈথিল্য হতে পারে বলে মনে করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং দণ্ড বহন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু সেটি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটু ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২১) বলা হয়েছে, *"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"*—"মহৎ ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করে থাকেন, অন্য সকলে সেভাবেই তাঁদের অনুসরণ করেন।" পরমহংসদের অনুকরণকারী অনভিজ্ঞ কনিষ্ঠ-অধিকারী ভক্তদের রক্ষা করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫৩

নীলাচলে আনি' মোর সবে হিত কৈলা ।
সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমাকে নীলাচলে নিয়ে এসে তোমরা আমার অনেক উপকার করেছ! কিন্তু আমার একমাত্র সম্পদ ছিল আমার সন্ন্যাসদণ্ডটি কিন্তু তোমরা সেটিও রাখতে দিলে না।

শ্লোক ১৫৪

তুমি-সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ।
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখতে হয় তোমরা আগে যাও, নয়তো আমি আগে যাব। কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই না।"

শ্লোক ১৫৫

মুকুন্দ দত্ত কহে,—প্রভু, তুমি যাহ আগে ।
আমি-সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন মুকুন্দ দত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "প্রভু, তুমি আমাদের আগে যাও এবং আমরা তোমার পিছন পিছন যাব। আমরা তোমার সঙ্গে যাব না।"

শ্লোক ১৫৬

এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি ।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ভক্তদের আগে আগে চলতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—এই দুই প্রভুর মতিগতি কেউই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১৫৭

ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায় ।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তেরা বুঝতে পারলেন না, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কেন দণ্ড ভাঙ্গলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বা কেন তাঁকে দণ্ড ভাঙ্গতে দিলেন, আবার সেই দণ্ড ভাঙ্গার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কেন তাঁকে দোষ দিলেন।

শ্লোক ১৫৮

দণ্ডভঙ্গ-লীলা—এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা অত্যন্ত গম্ভীর। এই দুই প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে যিনি ঐকান্তিক ভক্তিসম্পন্ন তিনি এই লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব যিনি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনিই প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ এবং দণ্ডভঙ্গ-লীলার তাৎপর্য বুঝতে পারেন। পূর্বতন আচার্যেরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার অনুপ্রেরণায় সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে শরীর, মন ও বাক্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-আশ্রমের এই বিধি স্বীকার করেছিলেন। সেটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু পরমহংস স্তরে সন্ন্যাস-দণ্ড বহন করার প্রয়োজন থাকে না এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই পরমহংস স্তরে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জীবনের শেষভাগে সকলেরই যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য, সেই নির্দেশ দেওয়ার জন্য এমনকি পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরা অবিচলিতভাবে বিধি-নিষেধ অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সেটিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর নিত্য সেবক শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দণ্ড গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত, তা সারা জগতের কাছে ঘোষণা করার জন্য তিনি তাঁর সন্ন্যাস-দণ্ড তিন খণ্ডে ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১৫৯

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ গোপালের এই মহিমা ধন্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন তাঁর বক্তা এবং শ্রোতা হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

তাৎপর্য

সাক্ষিগোপালের এই কাহিনীতে চারটি নির্দেশ রয়েছে। (১) শ্রীগোপালমূর্তি নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। (২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করে সর্বদা সত্যের মর্যাদা স্থাপন করেন। (৩) ব্রাহ্মণ হওয়ার ফলে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্তব্য গভীর নিষ্ঠা সহকারে সত্যে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করা। (৪) ব্রহ্মণ্যদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, যাঁকে *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ*—এই মন্ত্রে আরাধনা করা হয়।

এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্ত স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্মণস্তরে অধিষ্ঠিত এবং এই ধরনের ব্রাহ্মণ কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন নন। এটি বাস্তব সত্য।

শ্লোক ১৬০

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যিনি সাক্ষিগোপালের এই কাহিনী শ্রবণ করেন, অচিরেই তিনি শ্রীগোপালের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন।

শ্লোক ১৬১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'সাক্ষিগোপালের কাহিনী' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উদ্ধার

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে তার বাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যান। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য, মুকুন্দকে দেখে পূর্ব পরিচয়-সূত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল আগমনের কথা শুনলেন। লোক পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করে সকলেই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভবনে গমন করলেন। নিত্যানন্দ আদি সকলে সার্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করে এলে দ্বিতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যত্ন সহকারে সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করালেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয় হলে সার্বভৌম তাঁকে তার মাসীর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে 'ভগবান' বলে স্থাপন করলে সার্বভৌম ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তার অনেক বিতর্ক হয়। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁর ভগবত্তা জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁর ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করা যায় না,—এই কথা গোপীনাথ আচার্য তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান, তা *ভাগবত* ও *মহাভারত* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন; তা সত্ত্বেও সার্বভৌম ভট্টাচার্য সে কথার প্রতি পরিহাস করলে' সেই সমস্ত কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হয়। মহাপ্রভু বলেন, ভট্টাচার্য আমাদের গুরু, স্নেহ করে তিনি যা বলেন, তা আমাদের মঙ্গলজনক।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হলে, ভট্টাচার্য তাঁকে 'বেদান্ত' শ্রবণ করতে আজ্ঞা দেন। মহাপ্রভু তা স্বীকার করে সাতদিন পর্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেন, হে কৃষ্ণচৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝতে পার না? প্রভু উত্তর দেন, আপনি শ্রবণ করতে বলেছেন, আমি শ্রবণ করছি; ব্যাসদেবকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ ভাল বুঝতে পারি, কেবল আপনি যে 'মায়াবাদী ভাষ্য' পড়ছেন, তা বুঝতে পারি না। ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ ও বেদান্ত ব্যাখ্যা করে 'সবিশেষবাদ' স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, 'মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদীদের এই দুইটিই মহাভ্রম। বেদে সর্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁর সচ্চিদানন্দ (সৎ-চিৎ-আনন্দ) অপ্রাকৃত বিগ্রহও স্বীকৃত হয়েছে। বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বর ও জীব যুগপৎ স্বরূপগত ও স্বভাবত নিত্য ভিন্ন এবং অভিন্ন। তার ফলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদীরা প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক।' ভট্টাচার্য অনেক বিচার করে পরাস্ত হয়ে গেলেন।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রার্থনা অনুসারে *আত্মারাম* শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করলেন। ভট্টাচার্যের যখন জ্ঞান উদয় হল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর স্বরূপ প্রদর্শন করান। সার্বভৌম ভট্টাচার্য একশ'টি শ্লোক পাঠ

করে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখে গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই আনন্দিত হলেন।

পরে একদিন মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করে জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে ভট্টাচার্যকে দিলেন। ভট্টাচার্য তখন মতবাদজনিত জাড্যশূন্য হয়ে পরমানন্দে 'মহাপ্রসাদ' প্রাপ্ত হলেন। আর একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানতে ইচ্ছা করলে মহাপ্রভু তাকে 'নামসংকীর্তন' করতে উপদেশ দেন। আর একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য *তত্তেঽনুকম্পাং* শ্লোকের শেষ অংশে 'মুক্তিপদে'র পরিবর্তন করে, 'ভক্তিপদে' এই শব্দটি প্রয়োগ করে মহাপ্রভুকে শোনালেন। মহাপ্রভু বললেন—*শ্রীমদ্ভাগবতের* পাঠ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। 'মুক্তিপদ' শব্দে 'কৃষ্ণ'-কে বোঝায়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শুদ্ধভক্তির পাত্র হয়ে বললেন, যদিও 'মুক্তিপদ' শব্দে 'কৃষ্ণ' এই অর্থ হয়, তথাপি আশ্লিষ্য দোষে 'মুক্তিপদ' শব্দটি ব্যবহার করতে রুচি হয় না, 'ভক্তিপদ' বললে ভক্তের বড় সুখ হয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মায়াবাদ থেকে নিস্তারের কথা শুনে, নীলাচলবাসী পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হন।

শ্লোক ১

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্ ।
সার্বভৌমং সর্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

নৌমি—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তম্**—তাঁকে; **গৌর-চন্দ্রম্**—গৌরচন্দ্র নামক পরমেশ্বর ভগবানকে; **যঃ**—যিনি; **কুতর্ক**—কুতর্ক; **কর্কশ-আশয়ম্**—কঠিন হৃদয়; **সার্বভৌম**—সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে; **সর্বভূমা**—সবকিছুর অধীশ্বর; **ভক্তি-ভূমানম্**—যে মহান ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিতে পূর্ণ; **আচরৎ**—রূপান্তরিত করেছিলেন।

অনুবাদ

"আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি কুতর্ককর্কশ-হৃদয় সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে এক মহান ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আঠারনালা থেকে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে তিনি ভগবৎপ্রেমে অস্থির হলেন।

শ্লোক ৪

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতে দ্রুত ছুটে গেলেন, কিন্তু তখন তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন।

শ্লোক ৫

দৈবে সার্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এইভাবে মন্দিরে মূর্ছিত হয়ে পড়লে, তখন মন্দির রক্ষকেরা তাঁকে মারতে উদ্যত হল, কিন্তু দৈবক্রমে তখন সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন, এবং তিনি তাদের নিরস্ত করলেন।

শ্লোক ৬

প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি' সার্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সৌন্দর্য এবং প্রেম-বিকার দর্শন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৭

বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল ।
সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

বহুক্ষণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে এল না; ইতিমধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদনের সময় হল, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মনে মনে একটি উপায় চিন্তা করলেন।

শ্লোক ৮

শিষ্য পড়িছা-দ্বারা প্রভু নিল বহাঞা ।
ঘরে আনি' পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াঞা ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কয়েক জন শিষ্য এবং মন্দিরের কয়েক জন রক্ষীদের দিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বহন করে, তার বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং একটি পবিত্র স্থানে তাঁকে শুইয়ে রাখলেন।

তাৎপর্য

সেই সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র উপকূলের বালুতটে মারকণ্ডেয়-সরস্তটে বাস করতেন। বর্তমানে এই গৃহ 'গঙ্গামাতা মঠ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্লোক ৯

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্যের মন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ পরীক্ষা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেখলেন যে, তাঁর নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেই এবং উদরে স্পন্দন নেই। তাঁর এই অবস্থা দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত চিন্তিত হলেন।

শ্লোক ১০

সূক্ষ্ম তুলা আনি' নাসা-অগ্রেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি' ধৈর্য হৈল ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন সূক্ষ্ম তুলো এনে নাকের উপর ধরলেন, এবং যখন তিনি দেখলেন যে সেই তুলো ঈষৎ (খুব ক্ষীণভাবে) নড়ছে, তখন তিনি আশ্বস্ত হলেন।

শ্লোক ১১

বসি' ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার ।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাশে বসে তিনি ভাবলেন, "এটি কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লোক ১২

'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' এই নাম যে 'প্রলয়' ।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে 'সূদ্দীপ্ত ভাব' হয় ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বুঝতে পারলেন, এটি কৃষ্ণপ্রেম জনিত সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, তার নাম 'প্রলয়'। নিত্যসিদ্ধ ভক্তদেরই কেবল এই ভাব দেখা যায়।

তাৎপর্য

'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শুদ্ধভক্তের শরীরে আট প্রকার সাত্ত্বিক বিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তেরা কখনও কখনও এই বিকার গোপন রাখার চেষ্টা করেন। এই বিকার দুই প্রকার *ধূমায়িতা* এবং *জ্বলিতা*। এক অথবা দু'টি ভাব সহজ-ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয়, সেই ভাবকে *ধূমায়িতা* বলে। এককালে দু'টি বা তিনটি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশমান এবং কষ্টে তা সংগোপন সম্ভব হলে তাকে *জ্বলিতা* বলে। তিন-চার বা পাঁচটি প্রৌঢ়ভাবের এককালীন উদয়ে তাদের সংবরণ করার চেষ্টা বিফল হলে, ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাকে *দীপ্তা* বলেন। এককালে পাঁচ-ছয়টি অথবা সকল ভাব প্রকাশিত হয়ে প্রেমের পরমোৎকর্ষতায় আরোহণ করলে তাকে *উদ্দীপ্ত* বলে। উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের প্রকার ভেদে কোন কোন স্থলে *সূদ্দীপ্ত* বলে আখ্যাত হয়। সাত্ত্বিকভাবসমূহ কোটীগুণিত হয়ে পরমোৎকর্ষতা লাভ করলে যখন প্রেমপরাকাষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, তখন *সূদ্দীপ্ত* সংজ্ঞা লাভ করে। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলতে ভগবানের নিত্যপার্ষদকে বোঝায়। এই ধরনের ভক্তেরা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মধুর, এই চার ভাবে ভগবানের সান্নিধ্য উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৩

'অধিরূঢ় ভাব' যাঁর, তাঁর এ বিকার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি,—বড় চমৎকার ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভাবলেন, "এই সমস্ত 'অধিরূঢ় ভাব'—কি করে মানুষের শরীরে প্রকাশিত হচ্ছে? এতো বড় চমৎকার ব্যাপার!"

তাৎপর্য

অধিরূঢ় ভাব বা *অধিরূঢ় মহাভাব* শ্রীল রূপ গোস্বামী *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"প্রীতিপাত্র নায়কের রূপ, গুণ, মাধুর্য পূর্বে নিত্য আস্বাদন করা সত্ত্বেও অনাস্বাদিত-বোধে নায়িকার অনুভবে নায়িকার যে রাগ নায়ককেও নতুন নতুন বোধ করায়; সেই রাগ নতুন

নতুন হয়ে 'অনুরাগ' নামে কথিত হয়। নিজের অনুরাগের দ্বারা অনুরাগের সম্বেদনযোগ্য দশা লাভ করে প্রকাশযুক্ত হলে যদি অনুরাগ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহলে তাকে 'ভাব' বলে। দেহের লক্ষণগুলি যদি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়, তাহলে সেই অবস্থাকে 'ভাব' না বলে 'অনুরাগ' বলা হয়। ভাব ঘনীভূত হলে তাকে 'মহাভাব' বলে। মহাভাব কেবল ব্রজগোপিকাদের শরীরেই দেখা যায়।

শ্লোক ১৪

এত চিন্তি, ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিল আসিয়া ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

গৃহে বসে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এইভাবে যখন চিন্তা করছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

তাঁহা শুনে লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্ ।
এক সন্ন্যাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ ॥ ১৫ ॥
মূর্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে ।
সার্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে ভক্তেরা লোকদের বলাবলি করতে শুনলেন যে, এক সন্ন্যাসী জগন্নাথদেবকে দর্শন করে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে তার গৃহে নিয়ে গেছেন।

শ্লোক ১৭

শুনি, সবে জানিলা এই মহাপ্রভুর কার্য ।
হেনকালে আইলা তাহাঁ গোপীনাথাচার্য ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে ভক্তেরা বুঝতে পারলেন যে, তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথাই বলছেন। ঠিক সেই সময় শ্রীগোপীনাথ আচার্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ১৮

নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য ছিলেন নদীয়া নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের জামাতা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন ভক্ত। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব জানতেন।

তাৎপর্য

মহেশ্বর বিশারদ ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহপাঠী। তিনি নদীয়া জেলার বিদ্যানগর গ্রামে বাস করতেন। মধুসূদন বাচস্পতি এবং বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন তাঁর দুই পুত্র, এবং তাঁর জামাতা ছিলেন গোপীনাথ আচার্য।

শ্লোক ১৯

মুকুন্দ-সহিত পূর্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে শ্রীগোপীনাথ আচার্যের পূর্বে পরিচয় ছিল এবং মুকুন্দকে জগন্নাথপুরীতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ২০

মুকুন্দ তাঁহারে দেখি' কৈল নমস্কার ।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে যখন গোপীনাথ আচার্যের সাক্ষাৎ হল তখন মুকুন্দ দত্ত তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন। তাকে আলিঙ্গন করে গোপীনাথ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ২১

মুকুন্দ কহে,—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে ।
আমি-সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্ত উত্তর দিলেন, "মহাপ্রভু ইতিমধ্যেই এখানে এসে গেছেন। আমরা সকলে মহাপ্রভুর সঙ্গে এসেছি।"

শ্লোক ২২

নিত্যানন্দ-গোসাঞিকে আচার্য কৈল নমস্কার ।
সবে মেলি' পুছে প্রভুর বার্তা বার বার ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে গোপীনাথ আচার্য তাঁকে তার প্রণতি নিবেদন করলেন। এইভাবে, সমস্ত ভক্তগণ বার বার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩

মুকুন্দ কহে,—'মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা-সবা লঞা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্ত বললেন, "সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে এসেছেন এবং তিনি আমাদের সকলকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

শ্লোক ২৪

আমা-সবা ছাড়ি' আগে গেলা দরশনে ।
আমি-সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাদের সকলকে ছেড়ে তিনি আগে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে এসেছেন। আমরা সকলে পিছন পিছন তাঁর অন্বেষণ করতে করতে এসেছি।

শ্লোক ২৫

অন্যোন্যে লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্বভৌম-গৃহে প্রভু,—অনুমান কৈল ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্যান্য লোকের মুখে যে সমস্ত কথা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যেরই গৃহে রয়েছেন।

শ্লোক ২৬

ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে সেই অবস্থায় তার গৃহে নিয়ে গেছেন।

শ্লোক ২৭

তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন ।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলুঁ তোমার দরশন ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মনে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে হল, দৈবক্রমে তখন তোমার দর্শন পেলাম।

শ্লোক ২৮

চল, সবে যাই সার্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি' পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"চল আমরা সকলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করি। পরে আমরা শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করব।"

শ্লোক ২৯

এত শুনি' গোপীনাথ সবারে লঞা ।
সার্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে, গোপীনাথ আচার্য সেই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গেলেন।

শ্লোক ৩০

সার্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ।
প্রভু দেখি' আচার্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গিয়ে সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচেতন অবস্থা দর্শন করলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে গোপীনাথ আচার্যের অত্যন্ত দুঃখ হল, আবার সেই সঙ্গে মহাপ্রভুকে পেয়ে তারা খুব আনন্দিতও হলেন।

শ্লোক ৩১

সার্বভৌমে জানাঞা সবা নিল অভ্যন্তরে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুমতি নিয়ে গোপীনাথ আচার্য সমস্ত ভক্তদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৩২

সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন ।
প্রভু দেখি' সবার হৈল হরষিত মন ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে সমস্ত ভক্তদের পরিচয় হল, এবং তিনি তাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানালেন।

শ্লোক ৩৩

সার্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে ।
'চন্দনেশ্বর' নিজপুত্র দিল সবার সাথে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাদের সকলকে জগন্নাথ দর্শন করতে পাঠালেন, এবং তাদের সঙ্গে তার পুত্র চন্দনেশ্বরকে পথ প্রদর্শক রূপে দিলেন।

শ্লোক ৩৪

জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবকে দর্শন করে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হল, বিশেষ করে নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়ে ভাবাবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ৩৫

সবে মেলি' ধরি তাঁরে সুস্থির করিল ।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু যখন ভগবৎ-প্রেমে এইভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন সকলে তাঁকে ধরে শান্ত করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক তখন তাদের শ্রীজগন্নাথদেবের মালা-প্রসাদ এনে দিলেন।

শ্লোক ৩৬

প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে ।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবের মালা-প্রসাদ পেয়ে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে ছিলেন, সেখানে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৩৭

উচ্চ করি' করে সবে নাম-সংকীর্তন ।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে লাগলেন। তৃতীয় প্রহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে এল।

শ্লোক ৩৮

হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি' ।
আনন্দে সার্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরি', 'হরি' বলে হুঙ্কার করে উঠলেন। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহা-আনন্দে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৩৯

সার্বভৌম কহে,—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন ।
মুঞি ভিক্ষা দিমু আজি মহা-প্রসাদান্ন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"আপনি দয়া করে এখন শীঘ্র মধ্যাহ্ন স্নান করে আসুন। আজ আমি আপনাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ নিবেদন করব।"

শ্লোক ৪০

সমুদ্রস্নান করি' মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা ।
চরণ পাখালি' প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তেরা শীঘ্র ফিরে এলেন। তারপর পাদপ্রক্ষালন করে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য মহাপ্রভু আসনে বসলেন।

শ্লোক ৪১

বহুত প্রসাদ সার্বভৌম আনাইল ।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথ মন্দির থেকে বহু রকমের মহাপ্রসাদ আনিয়েছিলেন। মহাসুখে মহাপ্রভু তখন সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করলেন।

শ্লোক ৪২

সুবর্ণ-থালীর অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সোনার থালায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অন্ন এবং অতি উত্তম ব্যঞ্জন নিবেদন করা হয়েছিল। তাঁর ভক্তের সঙ্গে মহাপ্রভু সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৪৩

সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে ।
প্রভু কহে,—মোরে দেহ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিজেই পরিবেশন করছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে অনুরোধ করলেন—"দয়া করে আমাকে কেবল লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন দিন।

তাৎপর্য

'লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন' হচ্ছে একপ্রকার পাঁচমিশালি সব্জীর ব্যঞ্জন। সেই সমস্ত সব্জীগুলি একত্রে সিদ্ধ করে পাঁচ-ফোড়নের সেঁকা দিয়ে অত্যন্ত সরলভাবে রান্না করা হয়।

শ্লোক ৪৪

পীঠা-পানা দেহ তুমি ইঁহা-সবাকারে ।
তবে ভট্টাচার্য কহে যুড়ি' দুই করে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

পিঠা-পানাগুলি আপনি এদের সকলকে দিন।" সেই কথা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য হাতজোড় করে বললেন—

শ্লোক ৪৫

জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ কিভাবে আজ ভোজন করেছেন, তা আস্বাদন করার জন্য আপনি আজ এই সমস্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।"

শ্লোক ৪৬

এত বলি' পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা ।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পিঠা-পানা ইত্যাদি সমস্ত উপাদেয় খাদ্য ভোজন করালেন এবং তারপর ভোজন সমাপ্ত হলে তাঁকে আচমন করালেন।

শ্লোক ৪৭

আজ্ঞা মাগি' গেলা গোপীনাথ আচার্যকে লঞা ।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তদের আদেশ নিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্যকে নিয়ে ভোজন করতে গেলেন। ভোজনান্তে তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৪৮

'নমো নারায়ণায়' বলি' নমস্কার কৈল ।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি' গোসাঞি কহিল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "নমো নারায়ণায়"। তার উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "কৃষ্ণে মতিরস্তু"।

তাৎপর্য

চতুর্থ আশ্রমে সন্ন্যাসীরা, *ওঁ নমো নারায়ণায়* বলে পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করেন। *নীতি-শাস্ত্র* অনুসারে, সন্ন্যাসীর পক্ষে কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা উচিত নয় এবং নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীরা কখনও মনে করেন না যে, তাঁরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন; তাঁরা সর্বদাই নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক বলে মনে করেন এবং তাঁরা চান যে, পৃথিবীর সকলে যেন কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করেন। এইজন্য, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা সকলকে তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করে বলেন, *কৃষ্ণে মতিরস্তু*—'শ্রীকৃষ্ণে তোমাদের মতি হোক'।

শ্লোক ৪৯

শুনি' সার্বভৌম মনে বিচার করিল ।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো, বচনে জানিল ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য বুঝতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী।

শ্লোক ৫০

গোপীনাথ আচার্যেরে কহে সার্বভৌম ।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্বাশ্রম ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন গোপীনাথ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি এই সন্ন্যাসীটির পূর্বাশ্রমের কথা জানতে চাই।"

তাৎপর্য

পূর্বাশ্রম কথাটি হচ্ছে জীবনের পূর্ববর্তী অবস্থা। ভক্তগণ কখনও কখনও এই গৃহস্থ-আশ্রম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আবার কখনও কখনও কেউ ব্রহ্মচারী আশ্রম থেকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গৃহস্থরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমের কথা সার্বভৌম ভট্টাচার্য জানতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১

গোপীনাথাচার্য কহে,—নবদ্বীপে ঘর ।
'জগন্নাথ' নাম, পদবী—'মিশ্র পুরন্দর' ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিলেন, "জগন্নাথ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর নিবাস ছিল নবদ্বীপে এবং তাঁর পদবী ছিল 'মিশ্র পুরন্দর'।

শ্লোক ৫২

'বিশ্বম্ভর'—নাম ইঁহার, তাঁর ইঁহো পুত্র ।
নীলাম্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, এবং পূর্বে তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। তিনি হচ্ছেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র।

শ্লোক ৫৩

সার্বভৌম কহে,—নীলাম্বর চক্রবর্তী ।
বিশারদের সমাধ্যায়ী,—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন আমার পিতা মহেশ্বর বিশারদের সহপাঠী। সেই সূত্রে আমি তার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম।

শ্লোক ৫৪

'মিশ্র পুরন্দর' তাঁর মান্য, হেন জানি ।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি' মানি ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরকে আমার পিতা খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমার পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে আমি জগন্নাথ মিশ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তী উভয়কেই আমার পূজ্য বলে মানতাম।"

শ্লোক ৫৫

নদীয়া-সম্বন্ধে সার্বভৌম হৃষ্ট হৈলা ।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে নদীয়ার অধিবাসী, সেকথা জেনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে বললেন—

শ্লোক ৫৬

'সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত' সন্ন্যাস ।
অতএব হঙ তোমার আমি নিজ-দাস ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি স্বাভাবিকভাবেই পূজ্য। আর তাছাড়া তুমি সন্ন্যাসী; তাই আমি তোমার দাস হওয়ার বাসনা করি।"

তাৎপর্য

গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীদের সর্বদা পূজা করা এবং তাদের সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যদিও বয়সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে বড় ছিলেন তবুও সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী এবং পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে প্রভুরূপে বরণ করে তাঁর দাসত্ব বাসনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

শুনি' মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ।
ভট্টাচার্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শোনা মাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ৫৮

"তুমি জগদ্‌গুরু—সর্বলোক-হিতকর্তা ।
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্তা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু আপনি বেদান্ত-দর্শন পড়ান, তাই আপনি সমস্ত জগতের গুরু এবং সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনি সমস্ত সন্ন্যাসীদেরও হিতৈষী।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যেহেতু তাদের শিষ্যদের *বেদান্ত দর্শন* পড়ান, তাই প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাদের 'জগদ্‌গুরু' বলা হয়। এইভাবে ইঙ্গিত করা হয় যে, তারা সমস্ত মানুষের হিতকারী। যদিও সার্বভৌম ভট্টাচার্য সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন গৃহস্থ, তবুও তিনি সমস্ত সন্ন্যাসীদের তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ নিবেদন করতেন। তার ফলে তাঁকে সমস্ত সন্ন্যাসীদের পরম হিতৈষী এবং বন্ধু বলে গণনা করা হত।

শ্লোক ৫৯

আমি বালক-সন্ন্যাসী—ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
তোমার আশ্রয় নিলুঁ, গুরু করি, মানি ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি একজন নবীন সন্ন্যাসী, এবং ভালমন্দ জ্ঞান আমার নেই; আমি আপনাকে আমার গুরু বলে মনে করে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

শ্লোক ৬০

তোমার সঙ্গ লাগি' মোর ইহাঁ আগমন ।
সর্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার সঙ্গলাভ করার জন্যই কেবল আমি এখানে এসেছি। এখন আমি আপনার শরণ গ্রহণ করলাম। দয়া করে আপনি সর্বতোভাবে আমাকে পালন করুন।

শ্লোক ৬১

আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি ।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥" ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ যে ঘটনা ঘটল, তা ছিল আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপত্তিজনক, কিন্তু আপনি এসে আমাকে তা থেকে অব্যাহতি দান করেছেন।"

শ্লোক ৬২

ভট্টাচার্য কহে,—একলে তুমি না যাইহ দর্শনে ।
আমার সঙ্গে যাবে, কিম্বা আমার লোক-সনে ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—"তুমি আর একলা জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যেও না; হয় তুমি আমার সঙ্গে যাবে, নয়তো আমার কোন লোকের সঙ্গে যাবে।"

শ্লোক ৬৩

প্রভু কহে,—'মন্দির ভিতরে না যাইব ।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব ॥' ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন—"আমি আর কখনও মন্দিরের ভিতরে যাব না। গরুড়স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করব।"

শ্লোক ৬৪

গোপীনাথাচার্যকে কহে সার্বভৌম ।
'তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দরশন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন গোপীনাথ আচার্যকে বললেন—"তুমি গোস্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথদেবের দর্শন করিও।

শ্লোক ৬৫

আমার মাতৃস্বসা-গৃহ—নির্জন স্থান ।
তাহাঁ বাসা দেহ, কর সব সমাধান ॥' ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আর, আমার মাসীর বাড়ী অত্যন্ত নির্জন, তুমি সেখানে তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত কর।"

শ্লোক ৬৬

গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহাঁ বাসা দিল ।
জল, জলপাত্রাদিক সর্ব সমাধান কৈল ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে কোথায় জল আছে, কোথায় জলপাত্র আছে—সবকিছু দেখালেন।

শ্লোক ৬৭

আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন গোপীনাথ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শয্যোত্থান দর্শন করাতে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৬৮

মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্বভৌম স্থানে।
সার্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য তারপর মুকুন্দ দত্তকে নিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ী গেলেন। তারা যখন এসে পৌঁছলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মুকুন্দ দত্তকে বললেন—

শ্লোক ৬৯

'প্রকৃতি-বিনীত, সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহুপ্রীতি বাড়ে ইঁহার উপর ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সন্ন্যাসীর প্রকৃতি অত্যন্ত বিনীত, এবং তাঁকে দেখতেও খুব সুন্দর। তারফলে তাঁর প্রতি আমার স্নেহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন অত্যন্ত বিনীত এবং নম্র, কেননা সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও দৈন্যক্রমে তিনি সন্ন্যাসীর শিষ্য 'ব্রহ্মচারী' নামে পরিচয় দেওয়া সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতী-সম্প্রদায়ের কেশবভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, যে সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীর সহকারী ব্রহ্মচারী নাম 'চৈতন্য'। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সন্ন্যাসীর বিনীত সেবকরূপে 'চৈতন্য' নাম বজায় রেখেছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর এই বিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭০

কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস কর্যাছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার, শুনিতে হয় মন ॥' ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন্ সম্প্রদায়ে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর নাম কি, তা জানতে আমি অত্যন্ত ব্যগ্র।"

শ্লোক ৭১

গোপীনাথ কহে,—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশব-ভারতী মহাধন্য ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিলেন—"ইনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং ইনার সন্ন্যাস-গুরু হচ্ছেন মহাভাগ্যবান কেশব-ভারতী।"

শ্লোক ৭২

সার্বভৌম কহে,—'ইঁহার নাম সর্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় ইঁহো—হয়েন মধ্যম ॥' ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—" 'শ্রীকৃষ্ণ' নামটি সর্বোত্তম, কিন্তু তিনি ভারতী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলে মধ্যম শ্রেণীর সন্ন্যাসী হয়েছেন।"

শ্লোক ৭৩

গোপীনাথ কহে,—ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়ের নাহিক অপেক্ষা ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বাহ্যিক বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা করেন না। তাই বড় সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন তিনি মনে করেন নি।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভারতী-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্য তার সন্ন্যাস-শিষ্যদের নাম প্রবর্তন করেছিলেন। এই নাম দশটি। তার মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম' ও 'সরস্বতী'—সর্বোচ্চ। শৃংগেরী মঠে 'সরস্বতী'—উত্তম, 'ভারতী'—মধ্যম ও 'পুরী'—কনিষ্ঠ', এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর উপাধি আছে।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীদের দশটি নামের ব্যাখ্যা রয়েছে—যিনি ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে *তত্ত্বমসি* প্রভৃতি লক্ষণ যুক্ত বাক্য অনুসারে তত্ত্বের অর্থ বুঝে স্নান করেন, তিনি 'তীর্থ' নামে কথিত। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমে আগ্রহ বিশিষ্ট, যিনি সবরকম জাগতিক কার্যকলাপে অনাসক্ত, যিনি কোনরকম জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি 'আশ্রম' নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জন স্থল বনে বাস করেন এবং আশাবন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি 'বন' নামে পরিচিত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থেকে আনন্দরূপ নন্দন কাননে বাস করার জন্য, এই বিশ্বের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেন, তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্বতে কাননে বাস করে সর্বদা গীতা অধ্যয়নে রত, যার বুদ্ধি অচলের ন্যায় গম্ভীর, তিনি 'গিরি'। যিনি পবর্তবাসী প্রাণীদের মধ্যে বাস করে গভীর জ্ঞান লাভ করে সংসারের সার এবং অসার বস্তুর ভেদ জেনেছেন, তিনি, 'পর্বত'। যিনি তত্ত্বসাগরে জ্ঞানরূপ রত্ন আহরণ করে কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি 'সাগর'। যিনি উদাত্ত আদি অথবা সরজ ঋষভ আদি স্বরজ্ঞান—চর্চায় রত, স্বরলাপাদি নিপুণ এবং অসার সংসার বিনাশকারী, তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করে অবিদ্যার সমস্ত ভার পরিত্যাগ করেছেন এবং কোন দুঃখ ভারে পীড়িত হন না, তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পারঙ্গম এবং পূর্ণ তত্ত্বপদে অবস্থিত হয়ে নিত্যকাল পরম ব্রহ্ম চর্চায় রত, তিনি 'পুরী' নামে খ্যাত।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'ব্রহ্মচারী' নামের অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—যিনি নিজ স্বরূপ বিশেষরূপে জানেন, স্বধর্ম পরিচালনা করেন এবং নিত্যকাল সানন্দে মগ্ন, তিনি 'স্বরূপ' নামক ব্রহ্মচারী। যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞান বিকাশের দ্বারা বিশেষরূপে যোগযুক্ত, তিনিই 'প্রকাশ' নামে কথিত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে সর্বদা ধ্যান করেন এবং সানন্দে বিহার করেন, তিনি 'আনন্দ' নামে খ্যাত। যিনি চিৎ-অচিৎ-এর পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ, যিনি জড়ের বিকারের দ্বারা বিচলিত হন না এবং যিনি অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মকে জানেন, তিনি বিদ্বান এবং 'চৈতন্য' নামে অভিহিত হন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্যকে বললেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম—'শ্রীকৃষ্ণ' এবং ব্রহ্মচারী উপাধি—'চৈতন্য'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নাম—সমস্ত নাম থেকে উত্তম, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বোচ্চ সরস্বতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ না করে মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়েছেন।" তার উত্তরে গোপীনাথ আচার্য বললেন যে, এঁর মধ্যম সম্প্রদায়ে প্রবেশ করার কারণ এই যে, এঁর বাহ্যাপেক্ষা নেই। অন্তরে মর্যাদা-অহঙ্কার থাকলে মানুষ মর্যাদা বিশিষ্ট হওয়ার প্রয়াস করে। অকিঞ্চন হয়ে দীনভাবে হরিভজন করতে ইচ্ছা হলে ভারতী সম্প্রদায় উপেক্ষা করে সরস্বতী সম্প্রদায় অনুসন্ধান করতে এবং তাতে প্রবেশ করতে আকাঙ্ক্ষা হয় না।

শ্লোক ৭৪

ভট্টাচার্য কহে,—'ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন ।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম হইবে রক্ষণ ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণযৌবন সম্পন্ন। অতএব কিভাবে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করবেন?

শ্লোক ৭৫

নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব ।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি একে নিরন্তর বেদান্ত-দর্শন শোনাব এবং বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাব।"

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতে, সন্ন্যাসীরা *বেদান্ত-দর্শন* আলোচনা করার মাধ্যমে বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হতে পারেন। তার সঙ্গে তিনি সন্ন্যাসী আশ্রমের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন। এই মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে কথা বলার বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ, এই ছয়টি বেগ দমন করা যায়। তখন যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তার ফলে যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলন করতে হয়। কেউ যখন ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রতি আসক্ত থাকেন, তিনি তখন সন্ন্যাস আশ্রম বজায় রাখতে পারেন না। তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেছিলেন যে বৈরাগ্য বিষয়ে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়তো পূর্ণযৌবনের কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

শ্লোক ৭৬

কহেন যদি, পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া ।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া ॥' ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন প্রস্তাব করলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি চান, তাহলে আমি তাঁকে পুনরায় যোগপট্ট (সন্ন্যাসীদের বেশ বিশেষ) দান করে সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে নিয়ে আসতে পারি।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভারতী-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তা সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পছন্দ হয়নি, তাই তিনি তাঁকে সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় জানতেন না। পরমেশ্বর ভগবানরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চ বা নিম্ন সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। পরমেশ্বর ভগবান সর্বাবস্থাতেই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৭৭

শুনি' গোপীনাথ-মুকুন্দ দুঁহে দুঃখী হৈলা ।
গোপীনাথাচার্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে গোপীনাথ আচার্য এবং মুকুন্দ দত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। গোপীনাথ আচার্য তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ৭৮

'ভট্টাচার্য' তুমি ইঁহার না জান মহিমা ।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভট্টাচার্য মশাই, আপনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানেন না। পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত লক্ষণগুলি এঁর মধ্যে সর্বতোভাবে বিরাজ করছে।

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন নির্বিশেষবাদী, তাই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির অতীত পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু গোপীনাথ আচার্য তাকে বলেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাঁরা তত্ত্ববেত্তা তাঁরা পরমতত্ত্বকে তিনটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যাঁরা তত্ত্ববিদ তাঁরা অদ্বয় পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন।" পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ। গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন যে, এই ছ'টি ঐশ্বর্যই পূর্ণরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে বিদ্যমান।

শ্লোক ৭৯

তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর ।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥' ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য বললেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বররূপে বিখ্যাত। যারা অজ্ঞ তাদের পক্ষে এই তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করা কঠিন।"

শ্লোক ৮০

শিষ্যগণ কহে,—'ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে' ।
আচার্য কহে,—'বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে' ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা তখন প্রশ্ন করল—"কোন্ প্রমাণে আপনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর ভগবান বলছেন?" গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিলেন—"পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আচার্যেরা যে লক্ষণ উল্লেখ করে গেছেন সেই প্রমাণে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর, ভারতবর্ষে বহু ভণ্ড অবতারের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের কোন শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ নেই। পাঁচশ' বছর আগে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা—যাঁরা সকলে ছিলেন পণ্ডিত, তাঁরা যথাযথভাবে গোপীনাথ আচার্যের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তার প্রমাণ চেয়েছিলেন। কেউ যদি বলে সে স্বয়ং ভগবান অথবা ভগবানের অবতার, তাহলে তার সেই দাবী প্রমাণ করার জন্য তাকে অবশ্যই শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন করাতে হবে। তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যদের এই অনুরোধ যথাযথ। দুর্ভাগ্যবশত আজকাল শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতীতই ভগবানের অবতার তৈরি করার একটা ফ্যাশান দেখা দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষদের পক্ষে কাউকে ভগবান বলে মেনে নেওয়ার পূর্বে, তার ভগবত্তার প্রমাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা অবশ্যই কর্তব্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা যখন গোপীনাথ আচার্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—"পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানতে হলে মহান আচার্যদের মতামত এবং প্রমাণের শরণাগত হতে হবে।" শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণিত হয়েছে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, অসিত, অর্জুন আদি মহাজনদের উক্তিতে। তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তাও প্রমাণিত হয়েছে সেই সমস্ত মহাপুরুষদের উক্তিতে। তা পরে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৮১

শিষ্য কহে,—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে' ।
আচার্য কহে,—'অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা বললেন—"ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধিত হয় অনুমানের মাধ্যমে।" গোপীনাথ আচার্য তখন উত্তর দিলেন—"অনুমানের দ্বারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না।"

তাৎপর্য

বিশেষ করে মায়াবাদী দার্শনিকেরা অনুমানের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানতে চায়। তারা যুক্তি দেখায় যে, জড়-জগতে আমরা দেখি যে সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি কোন কিছুর ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই—একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তাই এই বিশাল জগতের নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা রয়েছেন। এই ধরনের যুক্তির মাধ্যমে তারা সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন উচ্চতর শক্তি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

মায়াবাদীরা স্বীকার করে না যে, সেই মহত্তর শক্তিটিই হচ্ছেন একজন ব্যক্তি। তাদের অনুর্বর মস্তিষ্ক ধারণা করতে পারে না যে, এই বিশাল জড় জগৎ কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন। তার কারণ হচ্ছে, যখনই তারা কোন ব্যক্তির কথা চিন্তা করেন, তখনই তারা এই জড় জগতের ঘৃণিত শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কথা ভাবেন। কখনও কখনও মায়াবাদী দার্শনিকেরা শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্রকে ভগবান বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তারা মনে করেন যে ভগবান একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন। মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময়। তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ, একজন মানুষ, যার মধ্যে পরম শক্তি, ব্রহ্ম রয়েছে। তাই তারা চরম সিদ্ধান্ত করেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্মই হচ্ছে পরমতত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন। এটিই হচ্ছে মায়াবাদ-দর্শনের ভিত্তি। কিন্তু শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যাঁর দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি নামে পরিচিত। সেই অনন্ত, অশেষ এবং সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং অন্তহীন জীবনিচয়ের সৃষ্টির কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০)

মায়াবাদীরা বৈদিক-শাস্ত্র পাঠ করে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে পরমতত্ত্ব-জ্ঞানের চরম উপলব্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তারা স্বীকার করে যে, জগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন, কিন্তু সেটি কেবল অনুমান মাত্র। মায়াবাদীদের বিচার হল *পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ* অর্থাৎ ধূম দেখে বোঝা যায় যে সেখানে নিশ্চয় আগুন রয়েছে। ধোঁয়া দেখে যেমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে আগুন রয়েছে, তেমনই মায়াবাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে জগতের নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা রয়েছেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে, সমস্ত জগতের স্রষ্টা তার প্রমাণ চেয়েছিলেন, এবং প্রমাণ সাপেক্ষে কেবল তারা তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে রাজী হয়েছিলেন। গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিয়েছিলেন যে, অনুমানের দ্বারা কখনও ভগবানকে জানা যায় না। সে কথা শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৫) বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"মূর্খ এবং বুদ্ধিহীন লোকেদের কাছে আমি কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকি; তাই মোহাচ্ছন্ন জড়-জগৎ, অজ এবং অব্যয়রূপে

আমাকে জানে না।" পরমেশ্বর ভগবান অভক্তদের কাছে প্রকাশিত হন না। ভক্তরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) বলেছেন *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমাকে জানা যায়।" *ভগবদ্‌গীতাতে* চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন *ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্*—এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে, যেহেতু তিনি তাঁর ভক্ত তাই *ভগবদ্‌গীতার* নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি তার কাছে প্রকাশ করেছেন। অর্জুন সন্ন্যাসী ছিলেন না, অথবা বৈদান্তিক বা ব্রাহ্মণও ছিলেন না। তিনি ছিলেন কেবল একজন কৃষ্ণভক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হয় ভক্তের কাছ থেকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছেন—'গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ'। (*চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৫১*)

কৃষ্ণভক্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণের করুণা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না, তার বহু প্রমাণ প্রদর্শন করা যায়। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৮২

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবে কেবল তাঁকে জানা যায়, অনুমান বা জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নয়।"

তাৎপর্য

ভেল্কিবাজী দেখিয়ে কখনও ভগবানকে কেউ জানতে পারে না। ভেল্কিবাজী দেখে মূর্খ লোকেরা মুগ্ধ হয়, এবং তারা তখন সেই যাদুকরকে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে মনে করে। ভগবানকে জানার পন্থা এটি নয়। অথবা অনুমান বা জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবান বা ভগবানের অবতারকে জানা যায় না। ভগবানের কাছ থেকে বা ভগবানের প্রতিনিধির কাছ থেকে ভগবান সম্বন্ধে জানতে হয়, ঠিক যেভাবে অর্জুন জেনেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাঁর পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে বহু ইঙ্গিত দিয়েছেন। শাস্ত্র এবং মহাজনদের দেওয়া প্রমাণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হয়। ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে ভগবানের কৃপা লাভ হলেই কেবল ভগবানকে জানা যায়।

শ্লোক ৮৩

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য আরও বললেন—"ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব জানতে পারেন।"

শ্লোক ৮৪

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৮৪ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—অবশ্যই; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **পদ-অম্বুজদ্বয়**—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; **প্রসাদ**—কৃপা; **লেশ**—কণামাত্র; **অনুগৃহীতঃ**—অনুগৃহীত; **এব**—অবশ্যই; **হি**—যথার্থ; **জানাতি**—জানে; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহিম্নঃ**—মহিমা; **ন**—কখনই না; **চ**—ও; **অন্য**—অন্য; **একঃ**—এক; **অপি**—যদিও; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **বিচিন্বন্**—জল্পনা-কল্পনা করে।

অনুবাদ

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশ মাত্রও লাভ করে থাকেন, তাহলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/২৯) থেকে উদ্ধৃত। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৩) বলা হয়েছে, *বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ।* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমস্ত জ্ঞানের চরম লক্ষ্য (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*), তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত না শুদ্ধভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায় ততক্ষণ ভগবানকে জানা যায় না। তাই ব্রহ্মা বলেছেন—*বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ।* কিন্তু যারা ভগবানের ভক্ত, তারা অনায়াসে ভগবানকে জানতে পারেন। ভগবানের একটি নাম হচ্ছে 'অজিত'; অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু, তাঁর ভক্তের কাছে ভগবান পরাজয় স্বীকার করেন। সেইটি হচ্ছে তাঁর স্বভাব। সে সম্বন্ধে *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর আদি জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়—তখন ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।" সেইটিই হচ্ছে তাঁকে জানার পন্থা।

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে গোপীনাথ আচার্য যে শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন, সেটি শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর গোপসখা এবং গো-বৎসদের হরণ করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি দর্শন করে ব্রহ্মা স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির কাছে তার

অলৌকিক শক্তির তুলনাই হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে জানতে যদি ব্রহ্মারও ভ্রম হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কি কথা, তারা হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতেই পারে না অথবা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য যাকে-তাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে চালাবার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৮৫-৮৬

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি—শাস্ত্র-জ্ঞানবান্ ।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৫ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে ।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন—"যদিও আপনি একজন মহান পণ্ডিত এবং বহু শিষ্যের গুরু এবং প্রকৃতপক্ষে আপনার মতো পণ্ডিত পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তবুও আপনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লেশমাত্র লাভ করতে পারেন নি, তাই আপনি তাঁকে জানতে পারছেন না, যদিও তিনি আপনার গৃহেই উপস্থিত রয়েছেন।

শ্লোক ৮৭

তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে ।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥' ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এতে আপনার দোষ নেই; শাস্ত্রেই বলা হয়েছে—পাণ্ডিত্যের দ্বারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বড় বড় পণ্ডিতেরা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না, অথচ তাঁরা *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করতে সাহস করেন। *ভগবদ্গীতা* পাঠ করার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা, অথচ আমরা দেখি কত বড় বড় সব পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করতে গিয়ে মহাবিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। গোপীনাথ আচার্যের এই উক্তিটি বৈদিক শাস্ত্রের বহু বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়েছে। *কঠোপনিষদে* (১/২/২৩) বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

কঠোপনিষদে আরও (১/২/৯) এক জায়গায় বলা হয়েছে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।
যং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥

"পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মাকে প্রবচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা, যুক্তি-তর্কের দ্বারা এমনকি

বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও লাভ করা যায় না। কিন্তু, কেউ যদি ভগবানের কৃপার কণামাত্রও লাভ করেন, ভগবান যদি তার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহলে তিনি তাঁকে জানতে পারেন।" কিন্তু এই কৃপা লাভের যোগ্যপাত্র কে? কেবল ভগবদ্ভক্ত। তারাই কেবল পারেন পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে। ভক্তের সেবায় ভগবান যখন প্রীত হন, তখন তিনি তার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন, *স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*। *বেদের* বর্ণনার মাধ্যমে কেবল ভগবানকে জানার চেষ্টা করলে, অথবা সেই সমস্ত উক্তি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করলে কোন লাভ হয় না।

শ্লোক ৮৮

সার্বভৌম কহে,—আচার্য কহ, সাবধানে ।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রতিপ্রশ্ন করলেন—"গোপীনাথ আচার্য! একটু সাবধানে কথা বলুন। আপনি যে ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, তার প্রমাণ কোথায়?"

শ্লোক ৮৯

আচার্য কহে,—"বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তু-জ্ঞান ।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিলেন—"পরমতত্ত্ব বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রমাণ।"

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্যকে বললেন, "পরমেশ্বর ভগবান আমাকে কৃপা না করতে পারেন, কিন্তু তিনি যে আপনাকে কৃপা করেছেন তার প্রমাণ কি?" তার উত্তরে গোপীনাথ আচার্য বললেন যে, পরমতত্ত্ব এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি অভিন্ন। তাই তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানা যায়। পরমতত্ত্ব বস্তুতে তার সমস্ত শক্তিও একাধারে বিরাজমান। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি সমন্বিত এবং তিনিই হচ্ছেন বাস্তব বস্তু—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*।

বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব বিবিধ শক্তি সমন্বিত। কেউ যখন পরমতত্ত্বের বিবিধ বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি পরমতত্ত্বকেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। জড় জাগতিক স্তরেও কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে সেই বস্তুকে জানা হয়। যেমন, তাপ থেকে বোঝা যায় যে আগুন রয়েছে। আগুন দেখা না গেলেও, তাপ অনুভব করার মাধ্যমে আগুনের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তেমনই কেউ যদি পরমতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি ভগবানের কৃপার প্রভাবে পরমতত্ত্ব-বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) বলা হয়েছে—*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য*—"পরমেশ্বর ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না।" *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ* —"ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করেন।" অর্থাৎ ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই ভগবানকে জানতে পারেন না। জল্পনা-কল্পনার দ্বারা বা অনুমানের দ্বারা কখনও ভগবানকে জানা যায় না। এটিই হল *ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৯০-৯১

ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ ।
মহা-প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৯০ ॥
তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার ।
ঈশ্বরের মায়া এই—বলি ব্যবহার ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত লক্ষণগুলি, মহাপ্রেমাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরে, আপনি দর্শন করেছেন। কিন্তু তবুও আপনি তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পারলেন না। একেই বলে ঈশ্বরের মায়া।

তাৎপর্য

গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন যে, যদিও তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবিষ্ট অবস্থা দর্শন করেছেন, এবং এই সমস্ত লক্ষণগুলি দেখে বোঝা যায় যে তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাসমূহ জাগতিক বলে মনে করেছিলেন। সেটি অবশ্যই ভগবানের মায়ারই প্রভাব।

শ্লোক ৯২

দেখিলে না দেখে তারে বহির্মুখ জন ।"
শুনি' হাসি' সার্বভৌম বলিল বচন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত বহির্মুখ মানুষ, দেখেও দেখতে পায় না।" সেই কথা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য হেসে বললেন—

তাৎপর্য

হৃদয় নির্মল না হলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* ৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যাঁরা পূর্বজন্মে এবং এই জন্মে বহু পুণ্যকর্ম করেছেন, যাঁরা সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছেন

এবং দ্বন্দ্ব ও মোহমুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সুদৃঢ় ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।"

কেউ যখন শুদ্ধভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন—তখন বুঝতে হবে যে, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। পাপী, দুষ্কৃতকারী কখনও ভগবৎ-সেবা সম্পাদন করতে পারে না। তেমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুমানের মাধ্যমেও কেউ ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তবৎ-প্রেমে ভগবানের সেবা করতে হলে, ভগবানের কৃপালাভের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়।

শ্লোক ৯৩

ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"আমরা বন্ধুভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি, সুতরাং রাগ কর না। আমি শাস্ত্রের ভিত্তিতেই যা কিছু বলার বলছি। দয়া করে এর দোষ দর্শন কর না।

শ্লোক ৯৪

মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি ।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই একজন মহাভাগবত, কিন্তু আমরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে গ্রহণ করতে পারি না, কেননা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিকালে ভগবানের অবতার নেই।

শ্লোক ৯৫

অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণুনাম ।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীবিষ্ণুর আর এক নাম হচ্ছে 'ত্রিযুগ', কেননা কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নেই। এটি শাস্ত্রেরই কথা।"

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীবিষ্ণুর আর এক নাম 'ত্রিযুগ', অর্থাৎ তিনি তিন যুগে প্রকাশিত হন। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, তিনি কলিযুগে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত না হয়ে

প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৩৮) বলা হয়েছে—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সঃ ত্বম্ ॥

"হে ভগবান, নর, পশু, দেব, ঋষি, জলচর আদি রূপে অবতীর্ণ হয়ে, আপনি এই জগতের সমস্ত শত্রুদের সংহার করেন। এইভাবে আপনি দিব্যজ্ঞানের আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করেন। হে মহাপুরুষ, কলিযুগে আপনি কখনও কখনও প্রচ্ছন্নভাবে আবির্ভূত হন। তাই আপনি 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীও প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রীবিষ্ণু কলিযুগে আবির্ভূত হন, কিন্তু অন্যান্য যুগে তিনি যেভাবে আচরণ করেন সেভাবে আচরণ করেন না। শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—*পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। অর্থাৎ "তিনি আবির্ভূত হন, ভক্তদের সঙ্গে লীলাবিলাস করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য।" সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে এই উদ্দেশ্যগুলি তাঁকে সাধন করতে দেখা যায়, কিন্তু কলিযুগে ভগবান আবির্ভূত হন প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি সরাসরিভাবে অসুরদের সংহার করে ভক্তদের পরিত্রাণ করেন না। কলিযুগে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু অন্য তিন যুগে করা যায়, তাই তাঁর নাম 'ত্রিযুগ'।

শ্লোক ৯৬-৯৮

শুনিয়া আচার্য কহে দুঃখী হঞা মনে ।
শাস্ত্রজ্ঞ করিঞা তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৬ ॥
ভাগবত-ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান ।
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥ ৯৭ ॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ-অবতার ।
তুমি কহ,—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে গোপীনাথ আচার্য অন্তরে দুঃখিত হয়ে বললেন, "আপনি নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলে অভিমান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারত, এই দুটি শাস্ত্র সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আপনি অবগত নন। সেই দুই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে ভগবান সাক্ষাৎ অবতরণ করেন, কিন্তু আপনি বলছেন যে, কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নেই।

শ্লোক ৯৯

কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্ ।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কলিযুগে ভগবানের লীলা-অবতার নেই। তাই তাঁর নাম 'ত্রিযুগ'।"

তাৎপর্য

লীলা-অবতারে ভগবান অনায়াসে লীলাবিলাস করেন। তিনি একের পর এক লীলাবিলাস করেন, এবং সেই সমস্ত লীলা অপ্রাকৃত আনন্দে পূর্ণ ও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। এই সমস্ত লীলায় পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় (*চৈঃ চঃ মঃ* ২০/২৯৮) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেন যে, ভগবানের লীলা-অবতার অসংখ্য—

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় বর্ণন ।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্ দরশন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন, "কিন্তু তবুও ভগবানের প্রধান লীলা-অবতারদের কথা আমি তোমাকে বলব।"

মৎস, কূর্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ।
বরাহাদি—লেখা যার না যায় গণন ॥

এইভাবে ভগবানের অসংখ্য লীলা-অবতার রয়েছেন, এবং তাঁরা সকলে অদ্ভুত সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেন। বরাহ অবতারে ভগবান বরাহদেব সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। কূর্ম অবতারে তিনি মন্দার পর্বত তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন সমুদ্র মন্থন করার জন্য, এবং নরসিংহ অবতারে তিনি তাঁর নখকমল দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় বিদীর্ণ করে তাকে সংহার করেছিলেন, তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য। এগুলি ভগবানের লীলা-অবতারের একটি অসাধারণ এবং অলৌকিক লীলা।

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘু-ভাগবতামৃত* গ্রন্থে নিম্নলিখিত ২৫টি লীলা অবতারের উল্লেখ করেছেন—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষ (হয়গ্রীব), হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রাঘবেন্দ্র, ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি।

তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম লীলা-অবতাররূপে উল্লেখ করেননি, কেননা তিনি তাঁর স্বরূপ আচ্ছাদিত করে অবতীর্ণ হয়েছেন (*ছন্ন-অবতার*)। এই কলিযুগে ভগবানের লীলা-অবতার নেই, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান তাঁর অবতার প্রকাশ করেছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০০

প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার ।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য বললেন, "প্রতি যুগে ভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাঁর সেই অবতারকে বলা হয় যুগাবতার। কিন্তু আপনার তর্কনিষ্ঠ হৃদয় এতই কঠিন যে, তা বিচার করার ক্ষমতা আপনার নেই।

শ্লোক ১০১

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০১ ॥

আসন্—ছিল; **বর্ণ**—রং; **ত্রয়**—তিনটি; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—তার; **গৃহ্ণত**—গ্রহণ করে; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে; **তনূঃ**—দেহ; **শুক্লঃ**—শ্বেত (সাদা); **রক্তঃ**—লাল; **তথা**—ও; **পীত**—পীত (স্বর্ণাভ); **ইদানীম্**—এখন; **কৃষ্ণতাম্**—কৃষ্ণ; **গতঃ**—গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

" 'পূর্বে আপনার পুত্র, যুগ অনুসারে তিনটি বিভিন্ন বর্ণের শরীর ধারণ করেছিল। সেগুলি হচ্ছে শ্বেত, রক্ত এবং পীত। এখন (দ্বাপর যুগে) সে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮/১৩) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উৎসবে এটি গর্গ মুনির উক্তি। তিনি বলেন যে অন্যান্য যুগে ভগবান শ্বেত, রক্ত এবং পীত বর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই পীত বর্ণ সমন্বিত ভগবানের অবতার হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্বের অষ্টাবিংশতি কলিযুগেও ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিভিন্ন যুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি) ভগবান বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। পীতবর্ণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটি সমস্ত বৈদিক আচার্যদের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ১০২

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ১০২ ॥

ইতি—এইভাবে; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **উরু-ঈশ**—হে রাজন; **স্তুবন্তি**—বন্দনা করেন; **জগৎ ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নানা**—বিভিন্ন; **তন্ত্র**—বেদানুগ শাস্ত্র; **বিধানেন**—বিধির দ্বারা; **কলৌ**—কলিযুগে; **অপি**—অবশ্যই; **তথা**—তেমনই; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

"কলিযুগে এবং দ্বাপরযুগে, বিবিধ শাস্ত্র এবং বৈদিক শাস্ত্রবিধি অনুশীলনের দ্বারা মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করেন। এখন দয়া করে আপনি আমার কথা শুনুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৩

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০৩ ॥

কৃষ্ণ-বর্ণম্—'কৃষ্' এবং 'ণ' এই দুটি পদাংশ উচ্চারণ করতে; **ত্বিষা-অকৃষ্ণম্**—অকৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে; **স-অঙ্গ**—অঙ্গ স্বরূপ অংশ সহ; **উপ-অঙ্গ**—ভক্তগণসহ; **অস্ত্র**—'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনরূপ অস্ত্র; **পার্ষদম্**—গদাধর, স্বরূপ দামোদর আদি পার্ষদসহ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **সংকীর্তন**—সমবেতভাবে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন; **প্রায়ৈঃ**—প্রধানতঃ; **যজন্তি**—আরাধনা করে; **হি**—অবশ্যই; **সুমেধসঃ**—যারা যথার্থ বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

"যে পরমেশ্বর ভগবান 'কৃষ' ও 'ণ' পদাংশ দুটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নামসংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনিই কৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত (১১/৫/৩২) এই শ্লোকটি শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ক্রমসন্দর্ভে* বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৫১ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ১০৪

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১০৪ ॥

সুবর্ণ-বর্ণঃ—যাঁর অঙ্গকান্তি সোনার মতো; **হেম-অঙ্গ**—তপ্ত কাঞ্চনের মতো যাঁর অঙ্গ; **বর-অঙ্গ**—যাঁর দেহ অত্যন্ত সুন্দর; **চন্দন-অঙ্গদী**—চন্দন চর্চিত; **সন্ন্যাস-কৃত**—সন্ন্যাস গ্রহণ করে; **শমঃ**—আত্ম সংযম; **শান্তঃ**—শান্ত; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **শান্তি**—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের দ্বারা শান্তি স্থাপনকারী; **পরায়ণঃ**—সর্বদা ভগবৎ-প্রেমানন্দে মগ্ন।

অনুবাদ

"ভগবান তপ্ত কাঞ্চনের মতো অঙ্গকান্তি ধারণ করে (গৌরসুন্দররূপে) অবতীর্ণ হবেন। তাঁর সুন্দররূপ তপ্ত কাঞ্চনেরই মতো এবং তা চন্দন চর্চিত। তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে কঠোরভাবে আত্মসংযমী হবেন এবং মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতো নির্বিশেষবাদী না হয়ে তিনি ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠা পরায়ণ হবেন এবং সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করবেন।' "

তাৎপর্য

গোপীনাথ আচার্য *মহাভারত* থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন।

শ্লোক ১০৫

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন ।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর গোপীনাথ আচার্য বললেন—"তোমার কাছে এত সমস্ত প্রমাণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তুমি হচ্ছ একজন শুষ্ক মনোধর্মী। ঊষর (শুষ্ক) ভূমিতে বীজ রোপণ করে যেমন কোন লাভ হয় না, তেমনই তোমার কাছে এই সমস্ত প্রমাণ দেখিয়ে কোন লাভ নেই।

শ্লোক ১০৬

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে ।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ

"তোমার উপর যখন ভগবানের কৃপা হবে, তখন তুমিও এ সমস্ত সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে এবং এই সমস্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দেবে।

শ্লোক ১০৭

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানাবাদ ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার শিষ্যরা যে কুতর্ক করছে এবং নানারকম অপসিদ্ধান্তের অবতারণা করছে, তাতে তাদের কি দোষ—তা হল মায়াবাদেরই কুফল।

শ্লোক ১০৮

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সংবাদ-ভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ১০৮ ॥

যৎ—যার; **শক্তয়ঃ**—শক্তি সমূহ; **বদতাম্**—তর্ক, যুক্তি; **বাদিনাম্**—পরস্পর বিরোধী; **বৈ**—অবশ্যই; **বিবাদ**—বিরুদ্ধ; **সংবাদ**—সাম্য; **ভুবঃ**—বিষয়; **ভবন্তি**—হয়ে যায়; **কুর্বন্তি**—করে;

চ—এবং; এষাম্—ঐ সকলের; মুহুঃ—সর্বদা; আত্ম-মোহম্—দেহাত্মবুদ্ধি; তস্মৈ—তাঁর প্রতি; নমঃ—প্রণতি; অনন্ত—অনন্ত; গুণায়—গুণান্বিত; ভূম্নে—পরম।

অনুবাদ

"আমি সেই অনন্ত গুণে গুণান্বিত পরম পুরুষকে আমার দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর বিবিধ শক্তির ফলে পরস্পর বিরোধ ও সাম্য ঘটে থাকে। এইভাবে মায়া পরস্পর বিরোধী-ভাবসকলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেহাত্মবুদ্ধির উৎপত্তি করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৬/৪/৩১) একটি উদ্ধৃতি।

শ্লোক ১০৯

যুক্তং চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥ ১০৯ ॥

যুক্তম্—যুক্ত; চ—এবং; সন্তি—হয়; সর্বত্র—সর্বত্র; ভাষন্তে—বলেন; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; যথা—যথা; মায়াম্—মায়া; মদীয়াম্—আমার; উদ্গৃহ্য—গ্রহণ করে; বদতাম্—মনোধর্মী; কিম্—কি; নু—নিশ্চয়; দুর্ঘটম্—দুর্ঘট।

অনুবাদ

" 'ব্রাহ্মণগণ যা বলেছেন, তা সর্বত্র যুক্ত হয়েছে; কেননা আমার মায়াকে অবলম্বন করে যাঁরা বলেন, তাঁদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়।' "

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত (১১/২২/৪) এই শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাঁর মায়াশক্তি অসম্ভব কার্য সম্পাদন করতে পারে; এমনই হচ্ছে মায়াশক্তির প্রভাব। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মনোধর্মী দার্শনিকেরা প্রকৃত সত্যকে আচ্ছাদিত করে নিঃসঙ্কোচে ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপন করেছে। পূর্বে কপিল, কনাদ, গৌতম, জৈমিনি, প্রমুখ ব্রাহ্মণ দার্শনিকেরা ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদ সমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বর্তমান যুগেও তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা আপাত দৃষ্টিতে যুক্তি-প্রমাণ দেখিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত মতবাদ স্থাপন করছে। এ সমস্ত পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাব। তাই ভগবানের মায়াকে কখনও কখনও সত্য বলে মনে হয়, কেননা তা পরম সত্য থেকে উদ্ভূত। মোহময়ী মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই কেবল মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

শ্লোক ১১০

তবে ভট্টাচার্য কহে, যাহ গোসাঞির স্থানে ।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্যকে বললেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে যাও, এবং তাঁর পার্ষদসহ আমার বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ কর।

শ্লোক ১১১

প্রসাদ আনি' তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ।
পশ্চাৎ আসি' আমারে করাইহ শিক্ষা ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথের প্রসাদ এনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদদের আগে সেবা করাও। তারপর, আমাকে শিক্ষা দিও।"

শ্লোক ১১২

আচার্য—ভগিনীপতি, শ্যালক—ভট্টাচার্য ।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করা'ন আচার্য ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর শ্যালক। তাই তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং মধুর। সুতরাং কখনও নিন্দা করে, কখনওবা স্তুতি করে এবং কখনও পরিহাস করে গোপীনাথ আচার্য তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

শ্লোক ১১৩

আচার্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ।
ভট্টাচার্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্যের সিদ্ধান্ত শুনে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত খুব সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উক্তিতে তিনি অন্তরে অন্তরে দুঃখিত হলেন এবং একটু বিরক্ত হলেন।

শ্লোক ১১৪

গোসাঞির স্থানে আচার্য কৈল আগমন ।
ভট্টাচার্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুসারে গোপীনাথ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ১১৫

মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্যের কথা ।
ভট্টাচার্যের নিন্দা করে, মনে পাঞা ব্যথা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দের সঙ্গে তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনেই আলোচনা করলেন, এবং অন্তরে ব্যথিত হয়ে ভট্টাচার্যের নিন্দা করলেন।

শ্লোক ১১৬

শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এভাবে কথা বলো না। আমার প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য গভীর স্নেহ প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ১১৭

আমার সন্ন্যাস-ধর্ম চাহেন রাখিতে ।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার প্রতি বাৎসল্য-স্নেহবশত করুণা করে তিনি আমার সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করতে চান, তাতে তার কি দোষ?"

শ্লোক ১১৮

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য-সনে ।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন সকালবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে জগন্নাথমন্দিরে গেলেন এবং মহানন্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন।

শ্লোক ১১৯

ভট্টাচার্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা ।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর গৃহে এলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বসবার আসন দিয়ে, সন্ন্যাসীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে নিজে মেঝেতে বসলেন।

শ্লোক ১২০

বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা ।
স্নেহ-ভক্তি করি' কিছু প্রভুরে কহিলা ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত-দর্শন পড়াতে লাগলেন এবং স্নেহ ও ভক্তিসহকারে তিনি মহাপ্রভুকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব রচিত *বেদান্ত-সূত্র* বা *ব্রহ্ম-সূত্র*, সমস্ত পরমার্থ-বাদীরাই বিশেষ করে সমস্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই পাঠ করেন। *বেদান্ত-সূত্র* সন্ন্যাসীদের অবশ্য পাঠ্য, কেননা তাতে তাঁরা বৈদিক জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। অবশ্য এখানে যে *বেদান্তের* উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে *শারীরক-ভাষ্য* নামক শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসীতে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে *বেদান্ত-সূত্রের* শঙ্করাচার্যের কৃত *শারীরক-ভাষ্য* উপদেশ দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সমস্ত সন্ন্যাসীরা গভীর নিষ্ঠা সহকারে *বেদান্ত-সূত্রের শারীরক-ভাষ্য* অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ*—অর্থাৎ, "সর্বদা *বেদান্ত-সূত্রের* অধ্যয়নের আনন্দ উপভোগ করা উচিত।"

শ্লোক ১২১

বেদান্ত-শ্রবণ,—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"বেদান্ত শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য। তাই তুমি নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ কর।"

শ্লোক ১২২

প্রভু কহে,—'মোরে তুমি কর অনুগ্রহ ।
সেই সে কর্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ॥' ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—"আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ এবং তাই আপনার উপদেশ শ্রবণ করা আমার কর্তব্য।"

শ্লোক ১২৩

সাত দিন পর্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে ।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে এক নাগাড়ে সাতদিন ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেন। কিন্তু তিনি ভালমন্দ কিছুই বললেন না। কেবল সেখানে বসে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা শুনে গেলেন।

শ্লোক ১২৪-১২৫

অষ্টম-দিবসে তাঁরে পুছে সার্বভৌম ।
সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ১২৪ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি' ।
বুঝ, কি না বুঝ,—বুঝিতে না পারি ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টম দিবসে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—"সাতদিন ধরে তুমি বেদান্ত শ্রবণ করছ, ভালমন্দ কিছুই না বলে কেবল মৌনাবলম্বন করে শ্রবণ করছ। তাই আমি বুঝতে পারছি না, আমার ব্যাখ্যা তুমি বুঝতে পারছ কি না।"

শ্লোক ১২৬-১২৭

প্রভু কহে—"মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন ।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১২৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি ।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি ॥" ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—"মূর্খ আমি, তাই আমি বেদান্ত-সূত্র অধ্যয়ন করি না। আপনি আদেশ দিয়েছেন তাই আমি কেবল শ্রবণ করছি। সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করার জন্যই কেবল আমি শ্রবণ করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনি যে অর্থ বিশ্লেষণ করছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিনয় করেছিলেন, যেন তিনি নামে মাত্র সন্ন্যাসী এবং একজন মূর্খ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নিজেদের জগদ্‌গুরু বলে প্রচার করতে অভ্যস্ত, যদিও তাদের গ্রাম অথবা শহরের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এই ধরনের সন্ন্যাসীরা যথেষ্ট শিক্ষিতও নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে

এই ধরনের বহু মূর্খ সন্ন্যাসী বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য না বুঝে *বেদান্ত* পাঠ করছে। নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজীর সঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোচনা হয়, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *বেদের* একটি শ্লোক উল্লেখ করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। যারা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করেন এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তারাই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর *বেদান্ত-সূত্র* বা *ব্রহ্ম-সূত্র* পাঠ করা অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু তিনি শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্য* অনুমোদন করেননি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'—শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্য* শুনলে সর্বনাশ হয়। সন্ন্যাসী এবং পরমার্থবাদীদের নিয়মিত *বেদান্ত-সূত্র* পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু *শারীরক-ভাষ্য* কখনও পাঠ করা উচিত নয়। এইটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। *'অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম সূত্রাণাম্'*—*বেদান্ত-সূত্রের* প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং তাঁর (*বেদান্ত-সূত্রের*) ভাষ্যও রচনা করেছেন এবং তা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*।

শ্লোক ১২৮-১২৯

ভট্টাচার্য কহে,—না বুঝি', হেন জ্ঞান যার ।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্বার ॥ ১২৮ ॥
তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন মাত্র ধরি' ।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"আমি বুঝতে পারছি না' এই জ্ঞান যার রয়েছে, সে বোঝবার জন্য পুনর্বার প্রশ্ন করে। কিন্তু তুমি কেবল চুপচাপ বসে রয়েছ, তোমার হৃদয়ে যে কি আছে তা আমি বুঝতে পারছি না।"

শ্লোক ১৩০

প্রভু কহে,—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল ।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে বললেন—"সূত্রের অর্থ আমি খুব সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মন বিচলিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ সূর্য-কিরণের মতো স্বচ্ছ। কিন্তু মায়াবাদীরা শঙ্করাচার্য এবং তার অনুগামীদের কল্পিত অর্থরূপ মেঘের দ্বারা সেই সূর্যকিরণকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১৩১

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ।
তুমি, ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু আপনি যে ভাষ্য আমাকে শোনাচ্ছেন তা মেঘের মত সূত্রের অর্থকে আচ্ছাদন করছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, অনুগ্রহপূর্বক আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদের ১০৬—১৪৬ শ্লোক সমূহ পাঠ করুন।

শ্লোক ১৩২

সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান ।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি ব্রহ্ম-সূত্রের মুখ্য অর্থ বিশ্লেষণ করছেন না, পক্ষান্তরে আপনি আপনার কল্পিত অর্থের দ্বারা মুখ্য অর্থকে আচ্ছাদন করছেন।"

তাৎপর্য

মায়াবাদী অথবা নাস্তিকেরা তাদের মনগড়া অর্থ দিয়ে বৈদিক শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করতে চায়। এই ধরনের মূর্খদের একমাত্র কাজ হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উপর নির্বিশেষবাদ আরোপ করা। মায়াবাদী নাস্তিকেরা *ভগবদ্গীতারও* বিশ্লেষণ করে। *ভগবদ্গীতার* প্রতিটি শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। প্রতিটি শ্লোকে ব্যাসদেব বলেছেন, *শ্রীভগবান উবাচ*—"পরমেশ্বর ভগবান বললেন।" সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু মায়াবাদী নাস্তিকেরা তা সত্ত্বেও প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার এবং নির্বিশেষ। তাদের ভ্রান্ত, কল্পিত অর্থ প্রতিপন্ন করার জন্য তাদের এমন সমস্ত বাক্‌চাতুর্য এবং ব্যাকরণের বিশ্লেষণ করতে হয় যে, যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন,—"মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।"

শ্লোক ১৩৩

উপনিষদ-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"বেদান্ত-সূত্র সমস্ত উপনিষদের সারাতিসার; তাই উপনিষদের যে মুখ্য অর্থ তা সবই বেদান্ত-সূত্র বা ব্যাস-সূত্রে রয়েছে।

তাৎপর্য

উপনিষদ শব্দটির অর্থ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বিশ্লেষণ করেছেন। অনুগ্রহ পূর্বক আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোক এবং আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদের ১০৬ এবং ১০৮ শ্লোকের বিশ্লেষণ পাঠ করুন।

শ্লোক ১৩৪

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন রকম কদর্থ না করে প্রতিটি শ্লোকের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আপনি মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে আপনার মনগড়া সমস্ত অর্থ সৃষ্টি করছেন।

শ্লোক ১৩৫

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ—প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ হচ্ছে সর্ব প্রধান। শ্রুতি বা বেদে যে মুখ্য অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।"

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর *তত্ত্ব-সন্দর্ভের* (১০/১১) দুটি শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য এবং *ব্রহ্ম-সূত্রের* এই সূত্রগুলি, যথা—*শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ*, (১/১/৩) *তর্কাপ্র তিষ্ঠানাৎ*, (২/১/১১) এবং *শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ* (২/১/২৭)—সম্বন্ধে শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য আলোচ্য। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর *সর্ব-সংবাদিনী* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, শ্রুতি-প্রমাণ, ঐতিহ্য-প্রমাণ, অনুমান আদি দশ প্রকার প্রমাণ রয়েছে, তবুও তার মধ্যে শব্দ-প্রমাণ বা শ্রুতি-প্রমাণ ব্যতীত অন্য সবকটি প্রমাণই ভ্রান্ত। বদ্ধজীব যেহেতু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারটি ভ্রান্তির দ্বারা চালিত, তাই তাদের বিশ্লেষণ কখনও অভ্রান্ত হতে পারে না। একমাত্র 'শব্দ-প্রমাণ' বা 'বৈদিক-প্রমাণ' অভ্রান্ত। তাই বৈদিক প্রমাণকে একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বদ্ধজীবের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ কখনই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যায় না, বড় জোর সেগুলিকে প্রমাণের দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভগবদ্গীতায় প্রথমে *ধৃতরাষ্ট্র-উবাচ* উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

ভগবদ্‌গীতার এই বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, কুরুক্ষেত্র নামক এক ধর্মক্ষেত্রে পাণ্ডব এবং কৌরবেরা যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। তারপর তারা কি করেছিলেন? সে কথা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছেন। এই বর্ণনাটি যদিও অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু তবুও নাস্তিকেরা 'ধর্মক্ষেত্র' এবং 'কুরুক্ষেত্র' শব্দ দুটির বিভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন, কোন রকম কল্পিত অর্থ শ্রবণ না করতে। কোনরকম কল্পিত অর্থ ছাড়া যথাযথভাবে শ্লোকগুলি গ্রহণ করাই শ্রেয়।

শ্লোক ১৩৬

জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ-গোময় ।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয় ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"শঙ্খ এবং গোময় যথাক্রমে জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা, কিন্তু বেদের বর্ণনা অনুসারে এ দুটি অত্যন্ত পবিত্র।

তাৎপর্য

বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে অস্থি এবং বিষ্ঠা সাধারণত অত্যন্ত অপবিত্র। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অস্থি এবং বিষ্ঠা স্পর্শ করলে তৎক্ষণাৎ স্নান করতে হয়। কিন্তু সেই *বেদেই* আবার বলা হয়েছে যে, 'শঙ্খ' এবং 'গোময়' যদিও 'অস্থি' এবং 'বিষ্ঠা' তথাপি সে দুটি অত্যন্ত পবিত্র। আপাত দৃষ্টিতে এই ধরনের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও, শ্রুতিবাক্য বলে আমরা সেগুলি অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করি। অস্থি এবং গোময় যে মহা পবিত্র সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

শ্লোক ১৩৭

স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় ।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদ স্বতঃ প্রমাণ। বেদে যা বলা হয়েছে তা সবই সত্য। আমরা যদি আমাদের কল্পনার দ্বারা তার অর্থ বিশ্লেষণ করি, তা হলে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়।"

তাৎপর্য

প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য এবং বেদ (শব্দ-প্রমাণ) এই চারিটি মুখ্য, প্রমাণের মধ্যে বৈদিক-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণ হচ্ছে প্রধান। আমরা যদি বেদের বাণীর অর্থ বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে আমাদের সে সম্বন্ধে কল্পনা বা অনুমান করতে হয়। তারফলে বেদের স্বতঃ-প্রামাণ্যের হানি হয়।

বেদান্ত-সূত্রের 'দৃশ্যতে তু' (২/১/৬) —এই সূত্রটি সম্বন্ধে *ভবিষ্য-পুরাণের* উল্লেখ করে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

ঋক্-যজুঃ-সামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।
মূল-রামায়ণং চৈব বেদ ইত্যেব শব্দিতাঃ ॥
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ ।
স্বতঃ প্রামাণ্যং এতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যতে ॥

ঋক্-বেদ, যজুঃবেদ, সাম-বেদ, অথর্ব-বেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং *মূল রামায়ণ*—এই সবকটি বৈদিক-শাস্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। পুরাণসমূহ (যেমন *ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, নারদীয়-পুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ* এবং *ভাগবত-মহাপুরাণ*) বিশেষ করে বৈষ্ণবদের জন্য এবং এগুলিও বৈদিক শাস্ত্র। *পুরাণে, মহাভারতে* এবং *রামায়ণে* যা কিছু বলা হয়েছে তা সবকিছু স্বতঃই প্রমাণিত। তার আর অর্থ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। *ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের* অন্তর্ভুক্ত; তাই *ভগবদ্‌গীতার* বাণী স্বতঃই প্রমাণিত। তারও অর্থ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন হয় না, তার অন্য অর্থ বিশ্লেষণ করলে *বেদের* সমস্ত প্রামাণিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ১৩৮

ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্যের কিরণ ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"শ্রীল ব্যাসদেব রচিত ব্রহ্ম-সূত্র সূর্যের কিরণের মতো স্বতঃ প্রকাশিত। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা তাদের মনগড়া ভাষ্যরূপ মেঘের দ্বারা সেই কিরণকে আচ্ছাদিত করে।

শ্লোক ১৩৯

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদ, পুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে। সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দে পরমতত্ত্ব, বৃহৎ-বস্তু পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝান হয়েছে।

তাৎপর্য

বৃহত্তম তত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*—"সমস্ত বেদের মধ্যে, আমিই হচ্ছি একমাত্র বেদ্য।" *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্বকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায়, যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে*)। তাই পরমতত্ত্ব উপলব্ধি বা ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরম স্তর হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা।

শ্লোক ১৪০

সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান, এবং তিনি সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁকে আপনি নিরাকার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

তাৎপর্য

'ব্রহ্ম' শব্দটির মানে হচ্ছে বৃহৎ। সর্ব বৃহৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান তাই পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব বৃহত্তম। তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে সম্বোধন করা হোক, বা 'পরমেশ্বর ভগবান' বলে সম্বোধন করা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা তা অভিন্ন তত্ত্ব। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে *পরম ব্রহ্ম পরম ধাম* বলে স্বীকার করেছেন। যদিও জীব অথবা জড়া-প্রকৃতিকে কখনও কখনও ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র শক্তি, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শ্রী এবং সমগ্র বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁর ব্যক্তিত্ব নিত্য এবং তাঁর পরমেশ্বরত্বও নিত্য। কেউ যদি সেই পরমতত্ত্বকে নিরাকার বা নির্বিশেষ বলে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে, তাহলে সে ব্রহ্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থটি বিকৃত করে।

শ্লোক ১৪১

'নির্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদে কখনও কখনও তাঁকে 'নির্বিশেষ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বোঝান হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু 'অপ্রাকৃত' অর্থাৎ এই প্রাকৃত জগতের অতীত।"

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে *বেদে* বহু নির্বিশেষ বর্ণনা রয়েছে। যেমন *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১৯) বলা হয়েছে—

> *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।*
> *স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥*

'পরমেশ্বর ভগবান যদিও হস্তপদহীন, তথাপি যজ্ঞে নিবেদিত সমস্ত বস্তুই তিনি গ্রহণ করেন। যদিও তিনি চক্ষুহীন, তথাপি তিনি সবকিছু দর্শন করেন। যদিও তিনি কর্ণহীন

তথাপি তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন।" তাঁকে হস্তপদহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে বলে তাঁকে নিরাকার বা নির্বিশেষ বলে মনে করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে বোঝান হয়েছে যে, আমাদের মতো তাঁর জড় হাত পা নেই। "চক্ষুহীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবকিছু দর্শন করেন।" অর্থাৎ আমাদের মতো জড় চক্ষু বিশিষ্ট তিনি নন। পক্ষান্তরে, তাঁর এমনই চক্ষু রয়েছে, যার দ্বারা জগতের সর্ব স্থানের, সর্ব জীবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারা যায়। বৈদিক-শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যে নির্বিশেষ বর্ণনা, তা কেবল তাঁর জড়াতীত চিন্ময়ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য। পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার বা নির্বিশেষ বলে প্রতিপন্ন করা *বেদের* উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ১৪২

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ১৪২ ॥

যা যা—যা কিছু; **শ্রুতি**—বৈদিক মন্ত্র; **জল্পতি**—বর্ণনা করে; **নির্বিশেষম্**—নির্বিশেষ তত্ত্ব; **সা**—তা; **সা**—তা; **অভিধত্তে**—সরাসরি বর্ণনা (অভিধানের অর্থের মতো); **সবিশেষম্**—নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি ব্যক্তিত্ব বাচক বৈশিষ্ট্য; **এব**—অবশ্যই; **বিচার-যোগে**—বুদ্ধির দ্বারা যখন গ্রহণ করা হয়; **সতি**—সত্তা; **হন্ত**—হায়; **তাসাম্**—সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের; **প্রায়ঃ**—সর্বতোভাবে; **বলীয়ঃ**—মুখ্য তাৎপর্য; **স-বিশেষম্**—ব্যক্তিত্ব বাচক বৈশিষ্ট্য; **এব**—অবশ্যই।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রে পরমতত্ত্বকে প্রথমে 'নির্বিশেষ' বলে বর্ণনা করে, সেই সেই বৈদিকমন্ত্র অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকে প্রতিপাদন করে। 'নির্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের দুটি গুণই নিত্য। কেউ যখন এই দুটি রূপেই পরমেশ্বর ভগবানকে বিবেচনা করেন, তখন তিনি যথাযথভাবে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষত্বই প্রবল, কেননা জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্বিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না।'

তাৎপর্য

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের এই শ্লোকটি *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে* (৬/৬৭) উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৪৩

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্ম থেকেই এই জগতের প্রকাশ হয়; ব্রহ্মে তার স্থিতি হয় এবং প্রলয়ে তা পুনরায় ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

তৈত্তিরীয়-উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*—"ব্রহ্ম থেকেই সমগ্র জড় জগৎ আবির্ভূত হয়েছে।" *ব্রহ্ম-সূত্রের* প্রথম শ্লোক হচ্ছে *জন্মাদস্য যতঃ*—"পরমতত্ত্ব হচ্ছে তা'—যার থেকে সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে।" (*ব্রহ্ম-সূত্র* ১/১২) পরমতত্ত্ব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি সমস্ত জড় ও চেতন জগতের উৎস। সবকিছু আমাতেই বিরাজ করে।" তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৪) শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উল্লেখ করেছেন, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত।" *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* (৫/৩৭) বর্ণনা করা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—"যদিও পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, তথাপি তিনি সর্বব্যাপ্ত।" তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপ নির্বিশেষ, কেননা তাতে তাঁর রূপ দর্শন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তাঁর দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় বিরাজ করছে। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৪০) বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিস্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।

"ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে, ঠিক যেমন সূর্য থেকে গ্রহ সকলের সৃষ্টি হয়েছে।"

শ্লোক ১৪৪

'অপাদান', 'করণ' এবং 'অধিকরণ'-কারক তিন ।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

'অপাদান', 'করণ' এবং 'অধিকরণ' আদি হল পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের তিনটি চিহ্ন।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন যে, *উপনিষদের* নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন তিনি, যাঁর থেকে সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে। সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান থেকে। পরমব্রহ্মের শক্তিতে সমগ্র জগতের স্থিতি এবং পরমব্রহ্মে সবকিছুর লয় হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পরমব্রহ্মের 'অপাদান' 'করণ' ও 'অধিকরণ'—কারকত্বরূপ তিন প্রকার লক্ষণ আছে। এই তিন প্রকার নিত্য লক্ষণের দ্বারা ভগবান নিত্য সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হন। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *ঐতরেয়-উপনিষদের* (১/১/১) একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্
নান্যৎ কিঞ্চনম্ ঈষৎ,
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥

"প্রথমে কেবল পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন। অন্য কিছুই ছিল না। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তেমনই *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/৯) বলা হয়েছে—

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি ।
অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ ॥

তৈত্তিরীয়-উপনিষদে (৩/১/১) বলা হয়েছে—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি,
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ।

বারুণী ভৃগু যখন তাঁর পিতা বরুণদেবকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তরে এটি বরুণদেবের উক্তি। এই মন্ত্রে '*যতো*' (যে ব্রহ্ম থেকে বিশ্বের উদয়)—অপাদান-কারক; '*যেন*' (যে ব্রহ্ম কর্তৃক বিশ্বপালিত)—করণ-কারক; '*যৎ*' অর্থাৎ '*যস্মিন্*' (যে ব্রহ্মে বিশ্বের প্রবেশ)—অধিকরণ-কারক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/২০) বর্ণিত হয়েছে—

ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতর যতো জগৎস্থাননিরোধ সম্ভবাঃ

"পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপে সমগ্র জগৎ বিরাজমান। তাঁর থেকে সবকিছুর উদ্ভব হয়, তাঁর শক্তিতেই সবকিছুর স্থিতি এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই সবকিছুর লয় হয়।"

শ্লোক ১৪৫-১৪৬

ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন ।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ ১৪৫ ॥
সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মনোনয়ন ।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান যখন বহু হতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি জড়া-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃত মন অথবা নয়ন ছিল না; অতএব এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের নেত্র ও মন 'অপ্রাকৃত'।"

তাৎপর্য

ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৬/২/৩) বর্ণিত হয়েছে, *তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।* এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান বহু হওয়ার বাসনা করেছিলেন এবং জড়া-প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বে

পরমেশ্বর ভগবান জড়া-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। জড় সৃষ্টির পূর্বে জড় মন বা জড় চক্ষু ছিল না, তাই যে মনের দ্বারা ভগবান সৃষ্টি করার অভিলাষ করেছিলেন তা অপ্রাকৃত এবং যে চক্ষু দ্বারা তিনি জড়া-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন তা-ও অপ্রাকৃত। অতএব ভগবানের মন, চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত।

শ্লোক ১৪৭

ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

'ব্রহ্ম' শব্দে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে নির্দেশ করা হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এইটি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতেও এ সত্য প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*—"সমস্ত বৈদিক-শাস্ত্রের পরমতত্ত্ববস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।" সকলেই তাঁকে খুঁজছে। *ভগবদ্গীতার* আর একটি শ্লোকেও (৭/১৯) এই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু বহু জন্মের পর, যথার্থ জ্ঞানবান আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ জেনে আমার শরণাগত হয়। এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

বৈদিক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, তখনই কেবল বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/২/৭-৮) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥
ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"বাসুদেবকে জানাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। বাসুদেবের প্রতি ভক্তির প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। তখন জীব জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হয়। এইটিই হচ্ছে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য। বেদের নির্দেশ অনুসারে যদি ধর্ম অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু তার ফলে যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের উদয় না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই সমস্ত অনুষ্ঠান কেবল সময়ের অপচয় মাত্র (*শ্রম এব হি কেবলম্*)।"

সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত মন এবং ইন্দ্রিয় নিয়ে বিরাজমান ছিলেন। এই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, *উপনিষদে* শ্রীকৃষ্ণের কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, জড় বুদ্ধি এবং জড় ইন্দ্রিয়

দিয়ে বৈদিক-মন্ত্রের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এ সম্বন্ধে *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ*—"শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।" তাই বৈদিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ হয়েছে পুরাণের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের (*স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাম্*) বোধগম্য করার জন্য মহান ঋষিরা *পুরাণ* সমূহ রচনা করেছেন। স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু (ব্রাহ্মণের অযোগ্য সন্তান)—এরা সরাসরিভাবে বৈদিক-মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না বলে, শ্রীল ব্যাসদেব *মহাভারত* রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান *বেদেষু দুর্লভম্* (বেদেরও দুর্লভ), কিন্তু বৈদিক জ্ঞান যখন যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় অথবা ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে যখন বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়—তখন স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করছে।

ব্রহ্ম-সূত্রেও (১/২/৩) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বর্ণনা করা হয়েছে—*শাস্ত্রযোনিত্বাৎ*। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্য বলেছেন, "*ঋক্‌বেদ, যজু-বেদ, সাম-বেদ, অথর্ব-বেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র* এবং মহামুনি বাল্মীকির মূল *রামায়ণ*—এইগুলি হচ্ছে বৈদিক-শাস্ত্র। যে সমস্ত শাস্ত্র বেদের অনুকূল তা বৈদিক-শাস্ত্র। এছাড়া অন্য যে সমস্ত গ্রন্থ, তা শাস্ত্রই নয়, তা কেবল মানুষকে বিপথগামী করে।" তাই মহান আচার্যদের পদাঙ্ক-অনুসরণ করে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্তব্য—*মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ*। মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করলে বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

শ্লোক ১৪৮

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয় ।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধারণ মানুষেরা বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারে না, তাই পুরাণের মাধ্যমে সেই অর্থ সহজবোধ্য করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪৯

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৪৯ ॥

অহো—অহো; **ভাগ্যম্**—ভাগ্য; **অহো**—অহো; **ভাগ্যম্**—ভাগ্য; **নন্দ**—নন্দমহারাজ; **গোপ**—গোপ; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীগণ; **যৎ**—যাদের; **মিত্রম্**—মিত্র; **পরম-আনন্দম্**—পরম-আনন্দ; **পূর্ণম্**—পূর্ণ; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **সনাতন**—সনাতন।

অনুবাদ

'অহো! নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদের ভাগ্যের সীমা নেই, যেহেতু পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন তাদের মিত্ররূপে প্রকট হয়েছেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৩২) শ্রীব্রহ্মার উক্তি।

শ্লোক ১৫০

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ ।
পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব গ্রহণ ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদের 'অপাণি-পাদ' মন্ত্রে জড় হাত এবং পা-এর ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান অত্যন্ত দ্রুত গমন করেন এবং তাঁকে যা নিবেদন করা হয় তা'ই তিনি গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৫১

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্বিশেষ ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম সবিশেষ, কিন্তু মায়াবাদীরা মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে, পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করে।

তাৎপর্য

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

অপাণিপাদ জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*পুরুষং মহান্তম্*। পুরুষ হচ্ছেন 'ব্যক্তি বিশেষ'। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, '*পুরুষম্ শাশ্বতম্*' তখন আমরা বুঝতে পারি যে, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই *পুরুষম্ মহান্তম্*, হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর হাত এবং পা প্রাকৃত নয়, তা অপ্রাকৃত। কিন্তু তিনি যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। (*অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্*)। যে সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে বেদ পাঠ করেনি, যে বৈদিক জ্ঞান আহরণ করেনি, সে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। তাই তাকে বলা হয় 'মূঢ়'। এই ধরনের মূর্খেরা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে অবগত নয় (*পরমভাবমজানন্ত*)। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।* কেবলমাত্র বৈদিক-শাস্ত্র পাঠ করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে ভগবদ্ভক্তের কৃপা লাভ করতে হয়। ভগবদ্ভক্তের

কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। এক কথায় *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন প্রতিপন্ন করেছেন—"হে প্রভু, তোমার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।" অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা ভক্তের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) বলা হয়েছে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"অত্যন্ত বিনম্রভাবে ভগবত্তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর শরণাগত হতে হয়, ঐকান্তিকভাবে তাঁকে প্রশ্ন করতে হয়, তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়।"

শ্লোক ১৫২

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার ।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার? ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—তাঁর বিগ্রহ নিত্য-আনন্দময়, আপনি সেই ভগবানকে নিরাকার বলে বর্ণনা করছেন?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদি নিরাকার হতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দ্রুত গমন করা এবং তাঁকে নিবেদিত সমস্ত বস্তু গ্রহণ করা কি ভাবে সম্ভব হতো? মায়াবাদীরা বৈদিক মন্ত্রের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে, তাদের নিজেদের মনগড়া অর্থ কল্পনা করে পরমতত্ত্বকে নিরাকার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত, নিত্য আনন্দময় রূপ রয়েছে। মায়াবাদীরা পরমতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু *শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে* (৬/৮) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—"পরমেশ্বর ভগবান বিবিধ শক্তি সমন্বিত।"

শ্লোক ১৫৩

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয়? ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে, অথচ আপনি তাঁকে 'নিঃশক্তিক' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন?"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের বিভিন্ন শক্তির কথা বিশ্লেষণ করে *শ্রীবিষ্ণুপুরাণ* থেকে (৬/৭/৬১-৬৩ এবং ১/১২/৬৯) চারটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শ্লোক ১৫৪

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

বিষ্ণু-শক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; **পরা**—চিন্ময়; **প্রোক্তা**—উক্ত হয়; **ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা**—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; **তথা**—তেমনই; **পরা**—চিন্ময়; **অবিদ্যা**—অজ্ঞান; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **সংজ্ঞা**—পরিচয়; **অন্যা**—অন্য; **তৃতীয়া**—তৃতীয়; **শক্তিঃ**—শক্তি; **ইষ্যতে**—এইভাবে পরিচিত।

অনুবাদ

"বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও অবিদ্যা। পরাশক্তি হচ্ছে 'চিৎ-শক্তি'। ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি হচ্ছে 'জীবশক্তি', যা পরাশক্তি সম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে; এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্ম সংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তি অর্থাৎ 'মায়াশক্তি'।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে আলোচনা করে, শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে জীব—যে তার কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অবগত। জড় জগতে জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। এই বিস্মৃতিকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান। জড়জগতের অবিদ্যা-শক্তিও পরমেশ্বর ভগবানেরই শক্তি, এবং তাঁর বিশেষ ক্রিয়া হচ্ছে জীবকে বিস্মৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে এদের এই দুর্গতি হয়। জীব যদিও তার স্বরূপে তাঁর পরা-শক্তি সম্ভূত, কিন্তু ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়ার ফলে সে অবিদ্যা-শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিভাবে তা হয়, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৫৫

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১৫৫ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ**—জীব; **সা**—সেই শক্তি; **বেষ্টিত**—আচ্ছাদিত; **নৃপ**—হে রাজন; **সর্ব-গা**—চিৎ অথবা জড় উভয় জগতে, সর্বত্র গমন করতে সক্ষম; **সংসার-তাপান**—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নানা প্রকার দুঃখ; **অখিলান**—সর্ব প্রথমে; **অবাপ্নোতি**—যুক্ত হয়; **অত্র**—এই জড় জগতে; **সন্ততান্**—নানা প্রকার কর্মফল ভোগের জন্য।

অনুবাদ

" 'হে রাজন, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি হল জীবশক্তি। সেই জীবশক্তি সর্বগ হওয়া সত্ত্বেও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হয়ে, নিত্য সংসার-দুঃখ ভোগ করে।'

শ্লোক ১৫৬

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ ১৫৬ ॥

তয়া—তার দ্বারা; **তিরোহিতত্বাৎ**—প্রভাবযুক্ত হয়ে; **চ**—ও; **শক্তিঃ**—শক্তি; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **সংজ্ঞিতা**—নামক; **সর্বভূতেষু**—বিভিন্ন প্রকার শরীরে; **ভূ-পাল**—হে রাজন; **তারতম্যেন**—ভিন্ন মাত্রায়; **বর্ততে**—বিরাজ করে।

অনুবাদ

" 'হে রাজন্ অবিদ্যা-শক্তির দ্বারা আবৃত হয়ে জীব জড়-জগতের বিভিন্ন অবস্থায় তারতম্যসহ বর্তমান থাকে।'

তাৎপর্য

জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব অনুসারে জড়া-প্রকৃতি বিভিন্ন মাত্রায় জীবের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। চুরাশী লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী রয়েছে—এদের কেউ অধম, কেউ মধ্যম এবং কেউ উত্তম। এই সমস্ত জীব শরীর নির্ধারিত হয় মায়াশক্তির আবরণ অনুসারে। জলচর, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষী ইত্যাদির পারমার্থিক চেতনা প্রায় নেই বললেও চলে। মধ্যম স্তরে হল মানুষ—তার চেতনা তুলনামূলকভাবে উন্নত। যাদের পারমার্থিক চেতনা বিকশিত হয়েছে, তারা উত্তম স্তরের জীব। এই পারমার্থিক চেতনা পূর্ণরূপে বিকশিত হলে জীব তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয় এবং কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে মায়াশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১৫৭

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জিতে ॥ ১৫৭ ॥

হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী শক্তি; **সন্ধিনী**—সত্তা শক্তি; **সম্বিৎ**—জ্ঞান শক্তি; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **একাঃ**—একা; **সর্ব-সংশ্রয়ে**—সবকিছুর সম্যক আশ্রয়; **হ্লাদ**—আনন্দ; **তাপ**—বেদনা; **করী**—প্রদানকারী; **মিশ্রা**—দুই-এর মিশ্রণ; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **নো**—না; **গুণ-বর্জিতে**—যিনি জড়া-প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

"হে ভগবান, আপনি সবকিছুর আশ্রয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় এক অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে আপনার মধ্যে বিরাজ করে। জড়া-প্রকৃতির ত্রিগুণ, যা সুখ, দুঃখ এবং এই দুই-এর মিশ্রণ, তা আপনার মধ্যে বিরাজ করে না, কেননা আপনি জড়-গুণ বর্জিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত (১/১২/৬৯) হয়েছে।

শ্লোক ১৫৮

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। এই তিন অংশে চিৎ-শক্তি তিনটি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে, জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে—পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং মায়াশক্তি (এই জড় জগৎ)। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা সকলের কর্তব্য। প্রথমে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করা উচিত। শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। একশ' চুয়ান্ন শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে (*বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা*) পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত শক্তির উৎস এবং তাঁর সমস্ত শক্তি চিন্ময়।

শ্লোক ১৫৯

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' সদংশে 'সন্ধিনী' ।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি মানি ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

আনন্দ থেকে 'হ্লাদিনী', সৎ থেকে 'সন্ধিনী', এবং চিৎ থেকে 'সম্বিৎ'—এই তিনটি শক্তির প্রকাশ হয়। তাদের সম্বন্ধে জানা হলে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হলে, ভগবানের সম্বিৎ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ১৬০

অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি ।
বহিরঙ্গা—মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের তিনটি শক্তি হচ্ছে অন্তরঙ্গা-শক্তি বা চিৎশক্তি, তটস্থা-শক্তি বা জীব-শক্তি এবং বহিরঙ্গা-শক্তি বা মায়াশক্তি—এই তিনটি শক্তি ভগবানের প্রেমভক্তিতে যুক্ত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রধানত তিনটি প্রকাশ দেখা যায়—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিৎ-শক্তি স্বয়ং, 'তটস্থা' অর্থাৎ জীব-শক্তি; 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই তিনটি প্রকাশে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-এর ক্রিয়া অনুসারে তিন তিনটি ভাব বলে বুঝতে হবে। চিৎশক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎ উভয়ই যখন জীবকে অর্পণ করা হয় এবং জীব যখন তা গ্রহণ করে, তখন জীব বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া যা জীবের চিন্ময় স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে রাখে, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জীব যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন তার হৃদয়ে প্রেমভক্তির উদয় হয় এবং তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়।

শ্লোক ১৬১

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস ।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ-শক্তির বিলাস। সেই শক্তিকে আপনি স্বীকার করেন না, এত সাহস আপনার!

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাঁর এই সমস্ত ঐশ্বর্য চিন্ময়। সেই পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ এবং নিঃশক্তিক বলে মনে করা চরম অপরাধ এবং সম্পূর্ণভাবে বেদ-বিরুদ্ধ।

শ্লোক ১৬২

'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান মায়ার অধীশ্বর এবং জীব মায়াবশযোগ্য। ভগবান এবং জীবে এই পার্থক্য। কিন্তু আপনি ঘোষণা করেছেন যে জীব এবং ঈশ্বর অভেদ তত্ত্ব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই সর্বশক্তিমান। জীব স্বাভাবিকভাবে অনু সদৃশ হওয়ার ফলে সর্বদাই ভগবানের শক্তির অধীন। মুণ্ডক উপনিষদে (৩/১/১-২) বলা হয়েছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

মুণ্ডক-উপনিষদে স্পষ্টভাবে ভগবানের সঙ্গে জীবের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। জীব কর্মফলের ভোক্তা, কিন্তু ভগবান কেবল সাক্ষীরূপে সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করেন এবং তার ফল প্রদান করেন। জীব তার বাসনা অনুসারে পরমাত্মার পরিচালনায় এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে গমন করে। কিন্তু ভগবানের করুণার ফলে জীব যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন সে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। তার ফলে মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন সে তার পরম সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবানকে দেখতে পায় এবং সমস্ত শোক মোহ থেকে মুক্ত হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*—অর্থাৎ "জীব যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে পরমব্রহ্মকে জানতে পারে এবং তখন সে সমস্ত শোক-মোহ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়।" এইভাবে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সমস্ত শক্তির অধীশ্বর এবং জীব সর্বদাই সেই সমস্ত শক্তির অধীন। এইটিই মায়াধীশ এবং মায়াবশ-এর পার্থক্য।

শ্লোক ১৬৩

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে ।
হেন জীবে 'ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা-শক্তি। অথচ আপনি বলছেন যে, জীব—ঈশ্বর থেকে ভিন্ন।"

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সূত্রের 'শক্তি শক্তিমতোরভেদ' তত্ত্ব-অনুসারে জীব এবং ঈশ্বরে নিত্য ভেদ এবং অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে। গুণগতভাবে জীব এবং ঈশ্বর এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন (অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব) অনুসারে জীব এবং ঈশ্বরে ভেদ এবং নিত্য অভেদ প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৬৪

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৬৪ ॥

ভূমিঃ—মাটি; **আপঃ**—জল; **অনলঃ**—আগুন; **বায়ুঃ**—বায়ু; **খম্**—আকাশ; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **অহঙ্কারঃ**—অহংকার; **ইতি**—এই; **ইয়ম্**—এইভাবে; **মে**—আমার; **ভিন্না**—বহিরঙ্গা; **প্রকৃতিঃ**—শক্তি; **অষ্টধা**—আট প্রকার।

অনুবাদ

"ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার,—এই আটটি আমারই বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তি বিশেষ।"

শ্লোক ১৬৫

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ১৬৫ ॥

অপরা—নিকৃষ্ট; **ইয়ম্**—এই; **ইতঃ**—এর থেকে; **তু**—কিন্তু; **অন্যাম্**—আর একটি; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **বিদ্ধি**—জেনে রেখো; **মে**—আমার; **পরাম্**—চিন্ময়; **জীবভূতাম্**—জীব; **মহা-বাহো**—হে মহা বলবান অর্জুন; **যয়া**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **ধার্যতে**—ধারণ করে; **জগৎ**—জড় জগৎ।

অনুবাদ

"হে মহাবলবান (অর্জুন), এই নিকৃষ্ট শক্তিরূপা জড় জগৎ ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তি রয়েছে, যা এই সমগ্র জড় জগৎকে ধারণ করে।"

তাৎপর্য

১৬৪ এবং ১৬৫ এই শ্লোক দুটি *ভগবদ্গীতা* (৭/৪-৫) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৬৬

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু আপনি বলছেন যে এই বিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার।

শ্লোক ১৬৭

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী ।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ডী ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের চিন্ময় রূপ যে মানে না সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী। তাকে দর্শন করা এবং স্পর্শ করা উচিত নয়। যমরাজ অবশ্যই তাকে দণ্ডদান করবেন।"

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য চিন্ময় রূপ রয়েছে, যা পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, "জড়" হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ সমূহ, এবং "চিন্ময়" হচ্ছে নিরাকার। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, এই জড়া-প্রকৃতির অতীত আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা চিন্ময়। এই জড় জগতে যেমন জড় রূপ রয়েছে, চিৎ-জগতে তেমনই চিন্ময় রূপ রয়েছে। এই সত্য বৈদিক সাহিত্যে প্রতিপন্ন

হয়েছে। চিৎ-জগতের চিন্ময় রূপ জড় আকারের বিপরীত তত্ত্ব, নিরাকার নয়। ভগবানের চিন্ময় রূপ যে স্বীকার করে না, সে একটি পাষণ্ডী।

ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ধর্মই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা বর্জন করেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ জড়বাদী (মায়াবাদীরা) ভগবানের পাঁচটি বিশেষ রূপ কল্পনা করে, কিন্তু তারা যখন এই কল্পনা প্রসূত উপাসনাকে ভগবদ্ভক্তির সমপর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা করে, তখন মহা অপরাধে অপরাধী হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, *ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ* —"ভগবদ্বিদ্বেষী মায়াবাদীরা প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত।" তাদের দর্শন করা এবং স্পর্শ করা ভগবদ্ভক্তদের উচিত নয়, কেননা পাপীদের দণ্ডদানকারী যমরাজ তাদের দণ্ড দেবেন। মায়াবাদী পাষণ্ডীরা তাদের ভক্তিবিরোধী আচরণের জন্য, জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করে। যমরাজ নিরন্তর তাদের দণ্ডদান করেন। ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন যে ভক্ত, তারাই কেবল যমরাজের দণ্ড থেকে নিস্তার লাভ করেন।

শ্লোক ১৬৮

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৌদ্ধরা বেদ মানে না, তাই তারা নাস্তিক। কিন্তু যারা বেদের আশ্রয় গ্রহণ করে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে, সেই সমস্ত মায়াবাদীরা বৌদ্ধদের থেকেও অধিক নাস্তিক।"

তাৎপর্য

বৌদ্ধরা সরাসরিভাবে *বৈষ্ণব-দর্শন* বা বেদকে অস্বীকার করে, কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা বেদের আশ্রয় গ্রহণ করে বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে, তাই তারা অধিক ভয়ঙ্কর। শাক্যসিংহ-বুদ্ধ বেদ-বিধি না মানায়, তাকে বৈদিক আচার্যেরা 'নাস্তিক' বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে 'নির্বাণ' মানে সর্বপ্রকার জড় জাগতিক কার্যকলাপের নিবৃত্তি। বুদ্ধদেব জড় জগতের অতীত চিন্ময় রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তিনি কেবল জড় অস্তিত্বের অতীত শূন্যবাদের বর্ণনা করেছেন। মায়াবাদীরা মুখে বেদ মানে কিন্তু বেদবিহিত কর্ম-অনুষ্ঠান অস্বীকার করে। তারা নিজেদের মনগড়া চিন্ময় স্থিতি কল্পনা করে নিজেদের নারায়ণ বা ভগবান বলে প্রচার করে। মায়াবাদীরা মনে করে যে তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবের অতীত। তাদের কাছে চিৎ-জগতের তত্ত্ব সকল বৌদ্ধদের শূন্যবাদের মতো অস্তিত্বহীন। মায়াবাদীদের নির্বিশেষবাদ এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্প। শূন্যবাদ স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কিন্তু মায়াবাদীদের নির্বিশেষবাদ বুঝেও বোঝা যায় না। মায়াবাদীরা অবশ্য চিন্ময় অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তারা চিৎ-জগৎ এবং চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বর্ণনা করা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"মায়াবাদীদের বুদ্ধিবৃত্তি নির্মল হয়নি; তাই মুক্তিলাভের আশায় কৃচ্ছ্রসাধন করে তারা নির্বিশেষ জ্যোতিতে উন্নীত হলেও, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়।" চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে মায়াবাদীদের ধারণা অনেকটা চরম অস্তিত্বের ইতিবাচক ধারণার মতো। মায়াবাদীরা মনে করে যে, চিৎ-জগতে বৈচিত্র্য সমন্বিত বাস্তব বস্তু নেই। তার ফলে তারা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সেবা ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বুঝতে পারে না। মায়াবাদীরা মনে করে, ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে প্রতিবিম্ববাদ বা অনিত্য জড় রূপের প্রতিবিম্বের পূজা। তাই ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন চিন্ময় রূপ মায়াবাদীদের কাছে অজ্ঞাত। যদিও, 'ভগবান' শব্দটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবুও তা তারা বুঝতে পারে না। *ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে*—"পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান বলা হয়।" মায়াবাদীরা কেবল ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করে, অথবা বড় জোর পরমাত্মাকে। কিন্তু তারা ভগবানকে জানতে অক্ষম। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*মায়য়া অপহৃত জ্ঞানা*—মায়াবাদীদের বিকৃত মনোভাবের ফলে, তাদের প্রকৃত জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। যেহেতু তারা ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে না, তাই তারা সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় রূপের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে। নির্বিশেষবাদীরা উপলব্ধির তিনটি স্তর—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা অস্বীকার করে। 'জ্ঞান' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি, 'জানেন', জানবার বিষয়টি রয়েছে এবং 'জ্ঞান' রয়েছে। মায়াবাদীরা তিনটি তত্ত্বকে একাকার করে; এবং তার ফলে তারা বুঝতে পারে না—পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করে। তাদের জ্ঞানের অভাববশতঃ তারা চিৎ-জগতে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদেরকে বৌদ্ধদের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর বলে বিবেচনা করেছেন।

শ্লোক ১৬৯

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বদ্ধজীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু কেউ যদি সেই সূত্রের মায়াবাদী-ভাষ্য শোনে, তাহলে তার সর্বনাশ হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে *বেদান্ত-সূত্রে* ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদীরা, *শারীরক-ভাষ্য* নামক একটি ভাষ্য রচনা করেছেন, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপ

অস্বীকার করা হয়েছে। মায়াবাদীরা মনে করে যে, জীব পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। তাদের *বেদান্ত-সূত্রের* ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তির বিরোধী। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সেই সমস্ত ভাষ্য সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন। কেউ যদি শঙ্করাচার্যের *শারীরক ভাষ্য* শ্রবণ করে, তাহলে সে অবশ্যই প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।

দাম্ভিক মায়াবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার অভিলাষ করে, বা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করতে চায়। কিন্তু এই মুক্তির অর্থ হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অর্থাৎ এটি এক প্রকার আত্মহত্যা। এই মতবাদ ভগবদ্ভক্তির দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ভক্তিযোগ জীবকে অমৃতত্ব দান করে। কেউ যদি মায়াবাদ দর্শন অনুসরণ করে, তাহলে সে এই জড়দেহ ত্যাগের পর অমৃতত্ব লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। মৃত্যুর জগৎ অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করা হচ্ছে জীবের পরম প্রাপ্তি।

শ্লোক ১৭০

'পরিণাম-বাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত ।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত-সূত্রে শ্রীল ব্যাসদেব 'পরিণামবাদ' স্বীকার করেছেন। পরিণামবাদের মূল অর্থ হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি জড় জগৎ-রূপে পরিণত হয়েছে।

তাৎপর্য

আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ১২১থেকে ১৩৩ শ্লোকে পরিণামবাদ সম্বন্ধে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭১

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার ।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণি যেমন তার স্পর্শের দ্বারা লোহাকে সোনায় পরিণত করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কোন পরিবর্তন হয় না; ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, তথাপি তাঁর নিত্য চিন্ময় রূপের কোন বিকার হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের *অনুভাষ্য* অনুসারে, জড় জগৎ যে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির পরিণাম, সেই সত্য প্রতিপন্ন করাই *বেদান্ত-সূত্রের* 'জন্মাদস্য' শ্লোকের উদ্দেশ্য। পরমেশ্বর ভগবান অসংখ্য অনন্ত নিত্যশক্তির অধীশ্বর। এই সমস্ত শক্তি কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত। তথাপি এই সমস্ত শক্তি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; তাই তিনি সমস্ত শক্তির

আধার—পরম শক্তিমান। অনন্তরূপে বিরাজমান নিত্য ও অনিত্য শক্তি, আত্ম ও অনাত্ম শক্তি প্রভৃতির যুগপৎ ঈশ্বরে অবস্থিতি কিভাবে সম্ভব, তা জীব বর্তমান জড়বদ্ধ অবস্থায় মায়াশক্তির অধীনে থাকাকালে বুঝতে পারে না। তাই মানুষের জ্ঞানে সেই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সমাশ্রয়—অচিন্ত্য, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানে তা নিত্য অবস্থিত।

কোন নাস্তিক দার্শনিক অথবা মায়াবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হয়ে নির্বিশেষ শূন্যের কল্পনা করে। তাদের কল্পনা তাদের চিন্তা শক্তির প্রকারভেদ মাত্র। জড় জগতে কোন কিছুই অচিন্ত্য নয়। চিন্তাশীল দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা জড় শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে, কিন্তু চিৎ-শক্তি সম্বন্ধে বুঝতে অক্ষম হয়ে তারা শক্তিরাহিত্যরূপ একটি অবস্থাকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করে। এটি কেবল জড় অবস্থায় বিরুদ্ধভাব মাত্র। এই ধরনের ভ্রান্ত কল্পনার বশবর্তী হয়ে মায়াবাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে, জড় জগৎ ঈশ্বরের বিকার। তার ফলে তাদের বিবর্তবাদ (ঈশ্বরের মায়াচ্ছন্ন অবস্থা) স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য, এবং তাই আমরা বুঝতে পারি তিনি কিভাবে জড় জগতে আবির্ভূত হয়ে জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না বা কলুষিত হন না।

শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্পর্শমণি বলে একপ্রকার মণি রয়েছে, যার স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়। পর্বত প্রমাণ লোহাকে সোনায় পরিণত করলেও স্পর্শমণিটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই রয়ে যায়। একটি জড় পাথরে যদি এইরকম অচিন্ত্য শক্তি থাকতে পারে, তাহলে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তি পরিচালনা করে সেই শক্তিকে বিকারযোগ্য গুণময় জগৎরূপে পরিণত করতে পারেন—এতে কোনই সন্দেহ নেই। পরমেশ্বর ভগবান নিজের অন্যতম শক্তিকে বিকারময় জগৎরূপে পরিণত করেও নিজ স্বরূপকে বিকার-রহিত রাখতে পারেন, এই নিত্য শক্তি তাঁতে বর্তমান আছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে কেবল ক্রিয়া করেন। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি*—শ্রীকৃষ্ণ জড় শক্তি পরিচালনা করেন, এবং সেই শক্তি এই জড় জগতে ক্রিয়া করে। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়ও* (৫/৪৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় দুর্গাদেবী (জড়া-শক্তি) কার্যাদি করে থাকেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সাধিত হয় দুর্গাদেবীর দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ পরিচালনা করেন আড়াল থেকে। যদিও তিনি অদ্ভুতভাবে ক্রিয়াশীল ও বিবিধ শক্তি সমন্বিত জড় জগৎ সৃষ্টিকারী তাঁর শক্তিকে পরিচালনা করছেন, তবুও তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্লোক ১৭২

ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
'বিবর্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"শঙ্করাচার্যের মতবাদ প্রচার করে যে, পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বর পরিবর্তিত হন। এই মতবাদ স্বীকার করে মায়াবাদীরা ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে। এইভাবে তারা বেদান্ত-সূত্রকে ভ্রান্ত বলে কল্পনা প্রসূত 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সূত্রের প্রথম সূত্র *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। অর্থাৎ, এখন আমাদের ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে। তার পরবর্তী শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—*জন্মাদস্য যতঃ*। অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সবকিছুর উৎস। *জন্মাদস্য যতঃ* বলতে এই বুঝায় না যে, সেই আদিপুরুষের পরিবর্তন হয়েছে। পক্ষান্তরে তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তা *ভগবদ্গীতায়ও* (১০/৮) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মত্ত সর্বং প্রবর্ততে*—"আমার থেকে সবকিছুর প্রকাশ হয়।" *তৈত্তিরীয় উপনিষদেও* (৩/১/১) এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*—"সেই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন তিনিই যাঁর থেকে সবকিছুর জন্ম হয়েছে।" তেমনই *মুণ্ডক-উপনিষদেও* বলা হয়েছে, *যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ*—"মাকড়সা যেমন জাল তৈরি করে তারপর আবার তা তার নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, তেমনই পরম-ঈশ্বর এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং বিনাশ করেন। এই সমস্ত সূত্রে ভগবানের শক্তির পরিণামের কথা বলা হয়েছে। এমন নয় যে, ভগবান স্বয়ং পরিবর্তিত হন, যাকে বলা হয় 'পরিণামবাদ'। কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেবকে যাতে সমালোচনা না করা হয় সেই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হয়ে শঙ্করাচার্য কপট ভদ্রতার মুখোশ পরে 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করেছেন। শঙ্করাচার্য পরিণামবাদের হেরফের করে এবং বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা পরিণামবাদকে বিবর্তবাদরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

শ্লোক ১৭৩

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয় ।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয় ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"জীব যখন তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে—সেটি মিথ্যা। কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়, তা কেবল নশ্বর মাত্র।

তাৎপর্য

জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে তার স্বরূপে সে পবিত্র, কিন্তু জড়াশক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে সে তার সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। স্বরূপ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত এবং তা হচ্ছে 'বিবর্তবাদ'-এর প্রকৃত ভিত্তি। জীব নিত্যবস্তু; সে কখনও তার সূক্ষ্ম বা স্থূল জড় শরীরের মতো কালক্ষোভ্য নয়। জগৎ কখনও মিথ্যা নয়; কিন্তু তা কালের প্রভাবে পরিবর্তনশীল।

জীব যখন জড় জগৎকে তার ইন্দ্রিয় তর্পণের ক্ষেত্র বলে মনে করে তাতে অবশ্যই 'বিবর্ত' আছে। এই জড় জগৎ ভগবানের জড়াশক্তির প্রকাশ। একথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

জড় জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতে পরিণত হয়েছেন। প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে মায়াবাদীরা বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা 'বিবর্তবাদ' এবং 'পরিণামবাদের' বিভ্রান্তিজনক অর্থ বিশ্লেষণ করেছে। কোন জীব যখন তার শরীরকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখন তার বেলায় বিবর্তবাদ প্রযোজ্য। জীব ভগবানের উৎকৃষ্টতর শক্তি, এবং জড় জগৎ ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি। কিন্তু উভয়েই ভগবানের শক্তি বা প্রকৃতি। শক্তি যদিও সর্বদাই শক্তিমানের সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন, কিন্তু শক্তিমান ভগবান অন্তহীন শক্তি বিস্তার করলেও তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের কোন বিকার হয় না।

শ্লোক ১৭৪

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি ।
প্রণব হৈতে সর্ববেদ, জগৎ-উৎপত্তি ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাবাক্য 'প্রণব' বা 'ওঁকার' হল শব্দ রূপে ভগবানের প্রকাশ, সুতরাং তা ভগবানেরই মূর্তি। এই প্রণব থেকে সর্ববেদ এবং জগতের উৎপত্তি হয়েছে।

তাৎপর্য

'প্রণব' হল শব্দ-ব্রহ্ম। তাঁর এই দিব্য নামরূপ শব্দ-ব্রহ্ম হল মহাবাক্য, যাঁর থেকে এই নশ্বর জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই নশ্বর জগতে থাকাকালে কেউ যদি শব্দরূপে ভগবানের প্রকাশ—এই দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১৭৫

'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য ।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তত্ত্বমসি' ("তুমিই সেই") বেদের এই বাক্যটি জীবদের হৃদয়ঙ্গম হেতু প্রাদেশিক বাক্য, কিন্তু মহাবাক্য হচ্ছেন 'ওঁকার'। শঙ্করাচার্য 'ওঁকার' কে না মেনে 'তত্ত্বমসি' কে মহাবাক্য বলেছেন।"

তাৎপর্য

যারা ভগবানের চিন্ময় নাম, *বেদের* মহাবাক্য *প্রণব* মানে না তারাই *তত্ত্বমসি*-কে মহাবাক্য বলে মনে করেন। বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা শঙ্করাচার্য ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে এক বিভ্রান্তিজনক মতবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'তৎ ত্বম্ *অসি*' জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে ভুল না করার সাবধান বাণী। তাই 'তৎ ত্বম্ *অসি*' বিশেষ করে বদ্ধজীবদের জন্য। '*ওঁকার*' বা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' মুক্ত জীবদের জন্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *অয়ি মুক্ত কুলৈরুপাস্যমানম্* (*নামাষ্টক* ১)—"ভগবানের দিব্য নাম মুক্ত পুরুষেরাই কেবল কীর্তন করেন।" তেমনই পরীক্ষিত মহারাজ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১/৪) বলেছেন, *নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ*—যাঁদের জড় কামনা বাসনা সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়েছে বা যাঁরা সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানকে প্রণাম ও কীর্তন করতে পারেন।" জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত না হলে ভগবানের নাম কীর্তন করা যায় না। (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*)। প্রাদেশিক বাক্য 'তৎ ত্বম্ *অসি*'-কে বেদের মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করে শঙ্করাচার্য পরোক্ষভাবে *বেদের* মহাবাক্য 'ওঁকার'-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন।

শ্লোক ১৭৬

এইমতে কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল ।
ভট্টাচার্য পূর্বপক্ষ অপার করিল ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের কল্পিত 'শারীরক ভাষ্যের' সমালোচনা করে তার শত শত দোষ প্রদর্শন করলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 'শারীরক ভাষ্যের' পক্ষ অবলম্বন করে বহু যুক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করলেন।

শ্লোক ১৭৭

বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল ।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য অনেক বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ আদি উঠালেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সে সমস্ত খণ্ডন করে তাঁর নিজের মত স্থাপন করলেন।

তাৎপর্য

নিজের মত স্থাপন না করে পরের মত খণ্ডন করার চেষ্টাকে 'বিতণ্ডা' বলা হয়। শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যকে অন্য কাল্পনিক বিষয়রূপে আরোপ করে খণ্ডন করাকে 'ছল' বলা হয়। অপরপক্ষের পরাজয়কে বলা হয় 'নিগ্রহ'।

শ্লোক ১৭৮

ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয় ।
প্রেমা—'প্রয়োজন', বেদে তিনবস্তু কয় ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 'সম্বন্ধ', ভগবদ্ভক্তি—' অভিধেয়', এবং ভগবৎ-প্রেম লাভ হল জীবনের পরম 'প্রয়োজন'। এই তিনটি তত্ত্ব বেদে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায়ও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*—"বেদ অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা।" ভগবান নিজেই উপদেশ দিয়েছেন—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু* (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩৪) তাই *বেদ* পাঠ করার পর সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের কথা মনে মনে চিন্তা করে ভগবানের সেবা করা উচিত। অর্থাৎ, তাঁর ভক্ত হয়ে সর্বদা তাঁর আরাধনা করা উচিত। একে বলা হয় বিষ্ণু আরাধনা, এবং সেটি হচ্ছে জীবের পরম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায়। বৈদিক সভ্যতায় সমাজের মানুষকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করে এবং জীবনকে চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের এক বিজ্ঞানসম্মত পরম উৎকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এই যুগে সেই পন্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণে অধিক আগ্রহশীল না হয়ে কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে এবং ভগবানের শুদ্ধভক্তের কাছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে। সেটিই হচ্ছে *বেদ* পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১৭৯

আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা ।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে কল্পেন লক্ষণা ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি অন্য কোনভাবে বৈদিক শাস্ত্র বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন, তা হলে সেটি তার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বেদ স্বতঃপ্রমাণ, তার অন্য কোন অর্থ করা—কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাৎপর্য

বদ্ধজীব যখন নির্মল হয়, তখন তাকে বলা হয় ভক্ত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে কেবল ভক্তির সম্পর্ক এবং তার একমাত্র কাজ হচ্ছে ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য তাঁর সেবা করা। এই সেবা অবশ্য সম্পাদিত হয় ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে—*যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ*। ভক্ত যখন যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন

শ্লোক ১৮৬

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৮৬ ॥

আত্মারামাঃ—ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দ আস্বাদনকারী; চ—ও; মুনয়ঃ—সবরকমের জড়-ভোগবাসনা সকামকর্ম ইত্যাদি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন যে মহাত্মা; নির্গ্রন্থাঃ—সর্ব প্রকার জড় কামনা-বাসনা মুক্ত হয়েছে; অপি—অবশ্যই; উরুক্রমে—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; কুর্বন্তি—করে; অহৈতুকীম্—অহৈতুকী; ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; ইত্থম্ভূত—এতই অদ্ভুত যে তা আত্মারামদেরও আকর্ষণ করে; গুণঃ—যিনি অপ্রাকৃত গুণ সমন্বিত; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

"আত্মাতে যারা রমণ করেন, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিরাও অত্যদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন; কেননা জগতে চিত্তহারী হরির এইরকম একটি গুণ আছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিখ্যাত আত্মারাম শ্লোক (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/১০)।

শ্লোক ১৮৭

শুনি' ভট্টাচার্য কহে,—'শুন, মহাশয় ।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়' ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে 'আত্মারাম' শ্লোকটি শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "মহাশয়, এই শ্লোকটির অর্থ শুনতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী।"

শ্লোক ১৮৮

প্রভু কহে,—'তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি' ।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি ॥' ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন—"আপনি কি অর্থ করছেন, তা আগে আমি শুনি। তারপর আমি যা জানি, সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।"

শ্লোক ১৮৯

শুনি' ভট্টাচার্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য 'আত্মারাম' শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, এবং তর্ক-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি বিবিধ বিধান উঠালেন।

শ্লোক ১৯০

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা ।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শাস্ত্রের ভিত্তিতে 'আত্মারাম' শ্লোকের নয়টি অর্থ বিশ্লেষণ করলেন। সেই বিশ্লেষণ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে বলতে লাগলেন—

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যে ঋষিরা *আত্মারাম* শ্লোকটির আলোচনা করেছিলেন। তারা সেই সভার সভাপতি শ্রীল সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত পরমহংস শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কেন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন'। অর্থাৎ, তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কেন *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠে ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯১

'ভট্টাচার্য, জানি—তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"ভট্টাচার্য মহাশয়, আপনি সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি। শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করার এরকম শক্তি এই জগতে আর কারো নেই।

শ্লোক ১৯২

কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু আপনি আপনার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় যে অর্থ বিশ্লেষণ করলেন, তা ছাড়াও এই শ্লোকের আরও অন্য অর্থ আছে।"

শ্লোক ১৯৩

ভট্টাচার্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ।
তাঁর নব অর্থ-মধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার দেওয়া নয়টি অর্থের একটিও স্পর্শ না করে সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৯৪

আত্মারামাশ্চ-শ্লোকে 'একাদশ' পদ হয় ।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

আত্মারামাশ্চ শ্লোকে এগারটি পদ রয়েছে, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একে একে সেই সবকয়টি পদের অর্থ বিশ্লেষণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১/৭/১০) এই *আত্মারামাশ্চ* শ্লোকের এগারটি পদ হচ্ছে ১) *আত্মারামাঃ,* ২) *চ,* ৩) *মুনয়ঃ,* ৪) *নির্গ্রন্থাঃ,* ৫) *অপি,* ৬) *উরুক্রমে,* ৭) *কুর্বন্তি,* ৮) *অহৈতুকীম্,* ৯) *ভক্তিম্,* ১০) *ইত্থম্ভূতগুণঃ,* ১১) *হরিঃ।*

শ্লোক ১৯৫

তত্তৎপদ-প্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাঞা ।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পদগুলির সঙ্গে প্রধান পদ "আত্মারাম" পদটি মিলিয়ে আঠারটি ভিন্ন অর্থে বিশ্লেষণ করলেন।

শ্লোক ১৯৬

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলী, এই তিনের প্রভাব অচিন্ত্য এবং তা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৯৭

অন্য যত সাধ্য-সাধন করি' আচ্ছাদন ।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য সমস্ত সাধ্য-সাধন আদি পারমার্থিক কার্যকলাপকে আচ্ছাদন পূর্বক এই তিনটি তত্ত্ব, সিদ্ধ-সাধকেরও মন হরণ করে।"

তাৎপর্য

জ্ঞানী, কর্মী বা অন্যাভিলাষীর দলে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও অভিধেয় কল্পিত হয়, তাদের আচ্ছাদন করে এই অচিন্ত্য প্রভাব বিশিষ্ট ভগবান, তাঁর শক্তি ও তাঁর গুণাবলী—এই তিনটি বস্তু সাধক ও সিদ্ধের মন হরণ করে। পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন, যা তাঁর চিন্ময় সত্তা, তাঁর শক্তি এবং তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সবই ঐকান্তিক সাধকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ভগবানের একটি নাম কৃষ্ণ, কেননা তিনি সর্বাকর্ষক।

শ্লোক ১৯৮

সনকাদি-শুকদেব তাহাতে প্রমাণ ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুকদেব গোস্বামী এবং সনক, সনৎকুমার, সনাতন ও সনন্দন এই চারজন ঋষির দৃষ্টান্ত দিয়ে এই শ্লোকটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক। তার উদাহরণ হচ্ছে সনকাদি চারজন ঋষি এবং শুকদেব গোস্বামী আদি মুক্ত মনীষীবৃন্দের তাঁর প্রতি আকর্ষণ। তাঁরা সকলেই ছিলেন মুক্ত পুরুষ, কিন্তু তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* মধ্যলীলায় (২৪/১১২) বলা হয়েছে—*মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে*—"মুক্ত পুরুষেরাও শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাই তারা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।" জন্ম থেকেই শুকদেব গোস্বামী এবং সনকাদি চার কুমার 'ব্রহ্মময়' ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁর সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। চার কুমারেরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত ফুল ও তুলসীর সৌরভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তাঁরা ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেবের কৃপায় *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি এক মহান ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তা নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির আনন্দ থেকে অনেক বেশী আনন্দময়।

শ্লোক ১৯৯

শুনি' ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য চমৎকৃত হলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এবং তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২০০

'ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ,—মুঞি না জানিয়া ।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্বিত হইয়া ॥' ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তা না জেনে, আমার বিদ্যার গর্বে গর্বিত হয়ে আমি মহা অপরাধ করেছি।"

শ্লোক ২০১

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

এই অপরাধের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ নিলেন, এবং মহাপ্রভু তখন তাকে কৃপা করলেন।

শ্লোক ২০২

নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন ।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করালেন।

শ্লোক ২০৩

দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমে তাকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করালেন এবং তারপর তাঁর শ্যামসুন্দর, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রদর্শন করালেন।

শ্লোক ২০৪

দেখি' সার্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি' ।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তা দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং তারপর উঠে দুই কর যুক্ত করে তাঁর বন্দনা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২০৫

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব ।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সমস্ত তত্ত্ব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে প্রকাশিত হল, এবং তখন তিনি ভগবানের নামের মহিমা ও ভগবৎ-প্রেম দানের মহিমা ইত্যাদি বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২০৬

শতশ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে ।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য একশটি শ্লোক রচনা করেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষেও সেরকম শ্লোক রচনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত এই একশটি শ্লোক সমন্বিত গ্রন্থটির নাম *সুশ্লোক-শতক*।

শ্লোক ২০৭

শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
ভট্টাচার্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই একশটি শ্লোক শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে আলিঙ্গন করলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ২০৮

অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি ।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি' ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শরীরে অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প আদি অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখা দিল এবং তিনি এই প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে কখনও নাচতে লাগলেন, কখনও গান গাহিতে লাগলেন। আবার কখনও বা ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আলিঙ্গন করে ভূপতিত হলেন।

শ্লোক ২০৯

দেখি' গোপীনাথাচার্য হরষিত-মন ।
ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখি' হাসে প্রভুর গণ ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দর্শন করে গোপীনাথ আচার্য অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নৃত্য দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা হাঁসতে লাগলেন।

শ্লোক ২১০

গোপীনাথাচার্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ।
'সেই ভট্টাচার্যের প্রভু কৈলে এই গতি ॥' ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—"প্রভু, আপনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এই গতি করলেন।"

শ্লোক ২১১

প্রভু কহে,—'তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে ।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥' ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—"তুমি ভক্ত, তাই তোমার সঙ্গলাভ করেছে বলে জগন্নাথদেব এঁকে খুব ভালভাবে কৃপা করেছেন।"

শ্লোক ২১২

তবে ভট্টাচার্যে প্রভু সুস্থির করিল ।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য বহু স্তুতি কৈল ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে সুস্থির করলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বহু স্তুতি করলেন।

শ্লোক ২১৩

'জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য ।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য' ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"হে প্রভু, তুমি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেছ, এটি তোমার কাছে তেমন একটি বড় কাজ নয়। কিন্তু তুমি যে আমাকে উদ্ধার করেছ, এটি সত্যিই মস্তবড় আশ্চর্যের বিষয়।

শ্লোক ২১৪

তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড ।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তর্ক-শাস্ত্র পাঠ এবং আলোচনার ফলে ভক্তিবিমুখ হয়ে আমার চেতনা লৌহ পিণ্ডের মতো কঠিন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তুমি আমাকে দ্রবীভূত করলে। তোমার প্রচণ্ড প্রতাপের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে।"

শ্লোক ২১৫

স্তুতি শুনি' মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা ।
ভট্টাচার্য আচার্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন, এবং গোপীনাথ আচার্যের মাধ্যমে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজন করালেন।

শ্লোক ২১৬

আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

পরদিন প্রভাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন, এবং জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান দর্শন করলেন।

শ্লোক ২১৭

পূজারী আনিয়া মালা-প্রসাদান্ন দিলা ।
প্রসাদান্ন-মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূজারী তাঁকে জগন্নাথদেবের প্রসাদী-মালা ও প্রসাদান্ন দিলেন, তা পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুবই আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ২১৮

সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া ।
ভট্টাচার্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রসাদান্ন এবং মালা আঁচলে বেঁধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গেলেন।

শ্লোক ২১৯

অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন ।
সেইকালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

অরুণোদয়-কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন ঘুম থেকে উঠলেন।

শ্লোক ২২০

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য জাগিলা ।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য জেগে উঠলেন, এবং তার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আনন্দ বর্ধিত হল।

শ্লোক ২২১

বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন ।
আস্তে-ব্যস্তে আসি' কৈল চরণ বন্দন ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরের বাইরে এসে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন, এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা করলেন।

শ্লোক ২২২

বসিতে আসন দিয়া দুঁহে ত বসিলা ।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে বসার আসন দিলেন এবং তিনি নিজেও বসলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আঁচলে বাঁধা প্রসাদান্ন খুলে তাঁর হাতে দিলেন।

শ্লোক ২২৩

প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্যের আনন্দ হৈল ।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্নান করেননি, সন্ধ্যা করেননি, দন্ত ধাবনও করেননি, তবুও জগন্নাথদেবের সেই প্রসাদান্ন পেয়ে তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হল।

শ্লোক ২২৪

চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনের সমস্ত জড়তা দূর হল এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করতে করতে তিনি সেই প্রসাদান্ন গ্রহণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২৫

শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ২২৫ ॥

শুষ্কম্—শুষ্ক; পর্যুষিতম্—বাসী; বা—অথবা; অপি—যদিও; নীতম্—আনীত; বা—অথবা; দূরদেশতঃ—দূর-দেশ থেকে; প্রাপ্তিমাত্রেণ—পাওয়া মাত্রই; ভোক্তব্যম্—ভক্ষণ করা উচিত; ন—না; অত্র—এ বিষয়ে; কাল-বিচারণা—স্থান অথবা কালের বিচার।

অনুবাদ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"মহাপ্রসাদ শুষ্কই হোক, বাসীই হোক বা দূরদেশ থেকে আনীতই হোক, তা পাওয়া মাত্রই ভক্ষণ করা উচিত; তাতে কাল বিচারের প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২২৬

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ২২৬ ॥

ন—না; দেশ—দেশ; নিয়মঃ—নিয়ম; তত্র—এ বিষয়ে; কাল—সময়ের; ন—না; নিয়মঃ—নিয়ম; তথা—তাতে; প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত; অন্নম্—প্রসাদ; দ্রুতম্—তৎক্ষণাৎ; শিষ্টৈঃ—শিষ্টলোক; ভোক্তব্যম্—ভক্ষণ করা উচিত; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণের অন্ন প্রসাদ পাওয়া মাত্রই শিষ্টলোক তা ভোজন করবেন, তাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নেই। এটি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ।"

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২২৭

দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি তাতে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২২৮

দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্তন ।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে, দোঁহার ফুলে মন ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রভু এবং ভৃত্য পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নৃত্য করতে লাগলেন। পরস্পর পরস্পরের স্পর্শে তাঁদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

শ্লোক ২২৯

স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের অঙ্গে স্বেদ, কম্প, অশ্রু আদি সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল, এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

শ্লোক ২৩০

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন ।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"আজ আমি অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করেছি, আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেছি।"

তাৎপর্য

মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহগুলি অতিক্রম করে, অষ্ট আবরণ ভেদ করে, ব্রহ্মজ্যোতি অতিক্রম করে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে আরোহণ করতে হয়। ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটার মধ্যে অসংখ্য চিন্ময় গ্রহ রয়েছে। পুণ্যকর্মের প্রভাবে কেউ ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক আদি উচ্চতর স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি লাভ করলে তিনি আর এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে থাকতে চান না; এমনকি উচ্চতর স্বর্গলোকেও নয়। পক্ষান্তরে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে চান। তখন তিনি কোন একটি বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত হতে পারেন। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রভাবে ভক্তেরা চিৎ-জগতের সর্বোচ্চলোক, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের আবাসস্থল গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করার অভিলাষ করেন।

শ্লোক ২৩১

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব অভিলাষ ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—"আজ আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হল, কেননা আজ আমি দেখলাম যে, জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গভীর বিশ্বাস জন্মেছে।

শ্লোক ২৩২

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয় ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছ, এবং কৃষ্ণ আজ নিষ্কপটে তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন।

শ্লোক ২৩৩

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন ।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ কৃষ্ণ তোমার দেহাদি-বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন, এবং আজ তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করলে।

শ্লোক ২৩৪

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন ।
বেদ-ধর্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ তোমার মন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করল, কেননা বৈদিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে তুমি প্রসাদ ভক্ষণ করেছ।

শ্লোক ২৩৫

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্ ।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২৩৫ ॥

যেষাম্—যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত তাদের প্রতি; সঃ—তিনি; এষঃ—এই; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; দয়য়েত—কৃপা প্রদর্শন করতে পারেন; অনন্তঃ—অন্তহীন; সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে; আশ্রিত-পদঃ—শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত; যদি—যদি; নির্ব্যলীকম্—নিষ্কপট; তে—তারা; দুস্তরাম্—দুস্তর; অতি-তরন্তি—অতিক্রম করেন; চ—ও; দেব-মায়াম্—দৈবী মায়া; ন—না; এষাম্—এই; মম অহম্—'আমি' এবং 'আমার'; ইতি—এইপ্রকার; ধীঃ—বুদ্ধি; শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে—কুকুর এবং শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহে।

অনুবাদ

"কেউ যখন সর্বতোভাবে অনন্ত স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন দয়াময় ভগবান তাদের কৃপা করেন। তাঁর ফলে তাঁরা দুরতিক্রম্য দৈবী মায়াকে অতিক্রম করেন। শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য এই জড় দেহে যাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে তাদের ভগবান দয়া করেন না।"

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধিপরায়ণ মানুষদের ভগবান কখনও কৃপা করেন না। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তাহলে তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।"

শ্রীমদ্ভাগবতের (২/৭/৪২) এই যে শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। অর্জুনকে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করেছিলেন *ভগবদ্‌গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।* এই দেহের একজন 'দেহী' রয়েছে, তাই কখনই দেহকে আত্মা বলে মনে করা উচিত নয়। ভক্তদের এই উপদেশের তাৎপর্য সর্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। কেউ যখন দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়, তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে না। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপা প্রত্যাশা করা যায় না, এবং বিশাল ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না। সেই কথাও *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।* শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হলে কখনই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যে সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভ্রান্তভাবে নিজেদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত বলে মনে করেন, *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাদের বলা হয়েছে *বিমুক্তমানিনঃ।* প্রকৃতপক্ষে তারা মুক্ত নন, কিন্তু তারা মনে করেন যে, তারা মুক্ত হয়েছেন এবং নারায়ণ হয়ে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও তারা উপলব্ধি করেছেন যে, তারা তাদের জড় দেহ নন, তাদের স্বরূপে তারা হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা, কিন্তু যেহেতু তারা আত্মার ধর্ম ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ করেছেন, তাই তাদের বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে। বুদ্ধি নির্মল না হলে তা ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত করা যায় না। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় তখনই ভগবদ্ভক্তির শুরু হয়। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তাদের মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার নির্মল করে না, তাই তারা ভগবানের সেবায়ও যুক্ত হতে পারে না এবং ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে না। তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করার ফলে যদিও তারা অনেক উচ্চে আরোহণ করেন, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ না করার ফলে তাদের আবার এই জড় জগতে অধঃপতন হয়। কখনও কখনও তারা ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত উন্নীত হন, কিন্তু তাদের হৃদয় এবং মন নির্মল না হওয়ার ফলে, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়।

কর্মীরা সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন, আর জ্ঞানীরা যদিও তত্ত্বগতভাবে জানেন যে, তারা তাদের দেহ নন, তবুও ভগবান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে তারা নির্বিশেষবাদীতে পরিণত হন। কর্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই কৃপালাভের অযোগ্য এবং ভগবদ্ভক্তে পরিণত হতে অক্ষম। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—"কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড"—যারা সকাম কর্মের পন্থা এবং মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানার পন্থা অবলম্বন করেছেন তারা কেবল বিষই পান করছেন। তাদের জন্ম-জন্মান্তরে এই জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মজন্মান্তরের পর যিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

শ্লোক ২৩৬

এত কহি' মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
সেই হৈতে ভট্টাচার্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন। সেই দিন থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অভিমান খণ্ডন হল।

শ্লোক ২৩৭

চৈতন্য-চরণ বিনে নাহি জানে আন ।
ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বিনা আর কিছু জানেন না, এবং সেই দিন থেকে তিনি ভক্তি ছাড়া শাস্ত্রের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা করেন না।

শ্লোক ২৩৮

গোপীনাথাচার্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া ।
'হরি' 'হরি' বলি' নাচে হাতে তালি দিয়া ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দর্শন করে তার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য আনন্দে অধীর হয়ে 'হরি' 'হরি' বলে হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩৯

আর দিন ভট্টাচার্য আইলা দর্শনে ।
জগন্নাথ না দেখি' আইলা প্রভুস্থানে ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, জগন্নাথদেবকে প্রথমে দর্শন না করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গেলেন।

শ্লোক ২৪০

দণ্ডবৎ করি' কৈল বহুবিধ স্তুতি ।
দৈন্য করি' কহে নিজ পূর্বদুর্মতি ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর বহুবিধ স্তুতি করলেন, এবং গভীর দৈন্য সহকারে তিনি তার পূর্ব দুর্মতির কথা বললেন।

শ্লোক ২৪১

ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন ।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্তন ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবদ্ভক্তি সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা কি?" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন যে, ভগবানের নাম-সংকীর্তনই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি-সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

তাৎপর্য

সাধনভক্তির নয়টি অঙ্গ রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/২৩) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

"ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, মন্দিরে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, ভগবানের দাস্য বরণ করা, ভগবানের সখা হওয়া ও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা—ভগবদ্ভক্তি সাধনের এই নয়টি অঙ্গ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে তা চৌষট্টিটি অঙ্গে বিস্তারিত হয়েছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবদ্ভক্তি সাধনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কি? তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তারপর তাঁর এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তিনি *বৃহন্নারদীয়-পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪২

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২৪২ ॥

হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; এব—অবশ্যই; কেবলম্—একমাত্র; কলৌ—এই কলিযুগে; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; গতিঃ —গতি; অন্যথা—অন্য কোন।

অনুবাদ

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই।"

তাৎপর্য

যেহেতু এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই তাদের উদ্ধারের জন্য ভগবান 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার অতি সরল পন্থা প্রদান করেছেন। এই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে তারা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সর্বতোভাবে নির্মল না হলে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যারা পূর্বজন্মে বহু পুণ্যকর্ম করেছে, এবং তার ফলে সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছে এবং দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই দৃঢ়ব্রতী হয়ে আমার সেবায় যুক্ত হয়।" অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের এত ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দিতে দেখে বহু মানুষ অনেক সময় আশ্চর্য হন। সর্বতোভাবে আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ এবং জুয়া-পাশা ইত্যাদি অবৈধ ক্রিয়া বর্জন করার ফলে এবং নিষ্ঠা সহকারে সদ্গুরুর নির্দেশ পালন করার ফলে তারা সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই তারা সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পেরেছেন।

কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১-৫২) বলা হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

"কলিযুগ একটি পাপের সমুদ্রের মতো, কিন্তু তা' হলেও তার একটি মহৎ গুণ রয়েছে। এই যুগে কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে জীব সমস্ত কলুষ মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সত্যযুগের ধ্যানের প্রভাবে আত্ম-উপলব্ধি হত, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে তা লাভ হত এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের অর্চনা করার মাধ্যমে তা পাওয়া যেত। কলিযুগে কেবল মাত্র ভগবানের নাম অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে তা লাভ হয়।"

শ্লোক ২৪৩

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার ।
শুনি' ভট্টাচার্য-মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবিস্তারে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করলেন। তা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ২৪৪

গোপীনাথাচার্য বলে,—'আমি পূর্বে যে কহিল ।
শুন, ভট্টাচার্য, তোমার সেইত' হইল' ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন—"ভট্টাচার্য, আমি তোমাকে আগে যা বলেছিলাম, এখন তো তোমার তাই হল।"

তাৎপর্য

পূর্বে গোপীনাথ আচার্য সার্বভৌমকে বলেছিলেন যে, তিনি যখন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবেন তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত মহিমা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তার সেই ভবিষ্যৎ-বাণী এখন সার্থক হল। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হলেন, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করতে লাগলেন। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪০) তাই বলা হয়েছে—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—"কেবলমাত্র স্বল্প ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।" সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কেননা তিনি ছিলেন মায়াবাদ-দর্শনের অনুগামী। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসার ফলে তিনি শুদ্ধভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি নির্বিশেষবাদের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৫

ভট্টাচার্য কহে তাঁরে করি' নমস্কারে ।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্যকে প্রণতি নিবেদন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"যেহেতু তুমি একজন ভক্ত এবং আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে কৃপা করলেন।

শ্লোক ২৪৬

তুমি—মহাভাগবত, আমি—তর্ক-অন্ধে ।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি একজন মহাভাগবত, আর আমি তর্ক-পরায়ণ অন্ধ। তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে মহাপ্রভু আমাকে এইভাবে কৃপা করেছেন।"

শ্লোক ২৪৭

বিনয় শুনি' তুষ্ট্যে প্রভু হৈল আলিঙ্গন ।
কহিল,—যাঞা করহ ঈশ্বর দরশন ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এই বিনয়-বাক্য শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, এবং তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "এখন যাও, মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন কর।"

শ্লোক ২৪৮

জগদানন্দ দামোদর,—দুই সঙ্গে লঞা ।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগদানন্দ পণ্ডিত এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২৪৯

উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা ।
নিজবিপ্র-হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য খুব ভাল ভাল সমস্ত প্রসাদ নিয়ে এলেন এবং তার সেবক ব্রাহ্মণের হাতে সেই দুই জনের (জগদানন্দ ও দামোদর গোস্বামী) সঙ্গে তিনি সেই প্রসাদ পাঠালেন।

শ্লোক ২৫০

নিজ কৃত দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে ।
'প্রভুকে দিহ' বলি' দিল জগদানন্দ-হাতে ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার রচিত দুটি শ্লোক তালপাতায় লিখে জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে দিয়ে বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এটি দিও।"

শ্লোক ২৫১

প্রভু-স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা ।
মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রসাদ এবং শ্লোক লেখা তালপত্রটি নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে এলেন। তালপত্রটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়ার আগেই মুকুন্দ দত্ত সেটি জগদানন্দ পণ্ডিতের হাত থেকে নিয়ে নিলেন।

শ্লোক ২৫২

দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল ।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্ত এই শ্লোক দুটি ঘরের বাইরের দেয়ালে লিখে রাখলেন। তারপর জগদানন্দ পণ্ডিত সেই তালপত্রটি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দিলেন।

শ্লোক ২৫৩

প্রভু শ্লোক পড়ি' পত্র ছিণ্ডিয়া ফেলিল ।
ভিত্ত্যে দেখি' ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোক দুটি পাঠ করা মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তালপত্রটি ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু, দেয়ালের লেখাটি থেকে ভক্তেরা সেই শ্লোক কণ্ঠস্থ করলেন। সেই শ্লোক দুটি হচ্ছে—

শ্লোক ২৫৪

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২৫৪ ॥

বৈরাগ্য—কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি; বিদ্যা—জ্ঞান; নিজ—নিজের; ভক্তি-যোগ—ভগবদ্ভক্তি; শিক্ষা-অর্থম্—শিক্ষা দেওয়ার জন্য; একঃ—অদ্বিতীয়; পুরুষঃ—পরম পুরুষ; পুরাণঃ—সনাতন; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু; শরীর-ধারী—শরীর ধারণ করে; কৃপাম্বুধিঃ—অপ্রাকৃত করুণার সমুদ্র; যঃ—যিনি; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; প্রপদ্যে—আত্মনিবেদন করি।

অনুবাদ

"বৈরাগ্য-বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপধারী এক সনাতন পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, আমি তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করি।

শ্লোক ২৫৫

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২৫৫ ॥

কালাৎ—অন্য অভিলাষ যুক্ত কর্ম, জ্ঞান, জড় আসক্তির প্রাবল্যের ফলে কালধর্মবশে; নষ্টম্—নষ্ট; ভক্তিযোগম্—ভক্তিযোগ; নিজম্—যা কেবল তাঁর বেলায় প্রযোজ্য; যঃ—যে; প্রাদুষ্কর্তুম্—পুনরায় প্রকট করার জন্য; কৃষ্ণ-চৈতন্য-নামা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নামক; আবির্ভূত—যিনি আবির্ভূত হয়েছেন; তস্য—তাঁর; পাদ-অরবিন্দে—শ্রীপাদপদ্মে; গাঢ়ম্ গাঢ়ম্—অত্যন্ত গভীরভাবে; লীয়তাম্—লীন হোক; চিত্তভৃঙ্গঃ—আমার চিত্তরূপ ভ্রমর।

অনুবাদ

"কালের বশে নিজের ভক্তিযোগকে বিনষ্ট প্রায় দেখে 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামক সনাতন পুরুষ তা পুনরায় প্রচার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হোক।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি হয়ে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণও তেমনই। শ্রীকৃষ্ণ আত্মগোপন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অবতরণের কথা *শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত* এবং অন্যান্য বৈদিক-শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জড় জগতের অধঃপতিত জীবদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, কেননা এই কলিযুগে প্রায় সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত। সকলেই প্রায় সকামকর্ম এবং মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত হয়ে ধর্মবিমুখ। এই কারণে সকল ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার এক বিরাট প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই ভগবান স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যাতে অধঃপতিত জনসাধারণ ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের যথার্থ মঙ্গল সাধন করতে পারে।

ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর ভক্তকে তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা এতই অধঃপতিত যে, তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ গ্রহণ করতে চায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ আবার এসেছেন তাঁর সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য, কিন্তু তা তিনি সম্পাদন করেছেন ভিন্নভাবে। শ্রীকৃষ্ণরূপে, পরমেশ্বর ভগবানরূপে, তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হতে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভক্তভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হয়। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর বন্দনা করে বলেছেন—*নমঃ মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে*। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো উদার নন। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন তাঁর ভক্ত হওয়ার (*মন্মনা ভব মদ্ভক্ত*), কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হতে হয়। কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হতে চায় তাহলে সর্বপ্রথমে তাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ মহান ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হতে হবে।

শ্লোক ২৫৬

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে রত্নহার ।
সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য-রচিত এই দুটি শ্লোক চিরকাল তার কীর্তি ঢাকের বাজনার মতো সর্বতোভাবে ঘোষণা করবে, কেননা এই শ্লোক দুটি ভক্তকণ্ঠের রত্নহারে পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ২৫৭

সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান ।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি জানে আন ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য যথার্থই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন; মহাপ্রভুর সেবা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না।

শ্লোক ২৫৮

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম' ।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য সর্বদাই শচীমাতার পুত্র, সমস্ত গুণের আধার, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করতেন এবং তাঁর ধ্যান করতেন।

শ্লোক ২৫৯

একদিন সার্বভৌম প্রভু-আগে আইলা ।
নমস্কার করি' শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে প্রণতি নিবেদন করে একটি শ্লোক পড়তে লাগলেন।

শ্লোক ২৬০

ভাগবতের 'ব্রহ্মস্তবে'র শ্লোক পড়িলা ।
শ্লোক শেষে দুই অক্ষর-পাঠ ফিরাইলা ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব পাঠ করছিলেন। পাঠ করার সময় তিনি শ্লোকের শেষে দুটি অক্ষরের (পদ-এর) পরিবর্তন করলেন।

শ্লোক ২৬১

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২৬১ ॥

তৎ—সুতরাং; তে—আপনার; অনুকম্পাম্—কৃপা; **সুসমীক্ষমাণঃ**—আশা করে; **ভুঞ্জানঃ**—ভোগ করে; **এব**—অবশ্যই; **আত্ম-কৃতম্**—স্বীয় কর্ম; **বিপাকম্**—কর্মফল; **হৃদ্**—হৃদয়; **বাক্**—বাক্য; **বপুর্ভিঃ**—দেহ; **বিদধন্**—আত্মনিবেদন করে; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **জীবেত**—জীবন যাপন করতে পারে; **যঃ**—যে কেউ; **ভক্তিপদে**—ভক্তিপদে; **সঃ**—তিনি; **দায়ভাক্**—যোগ্য পাত্র।

অনুবাদ

"যিনি আপনার কৃপালাভের আশায় সকর্মের মন্দফল ভোগ করতে করতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনার প্রতি ভক্তি বিধান করে জীবন-যাপন করেন তিনি ভক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি ভক্তিপদ লাভ করেন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/১৪/৮) এই শ্লোকটি পাঠ করার সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য *'মুক্তিপদে'* শব্দটির পরিবর্তন করে *'ভক্তিপদে'* পাঠ করেছিলেন। 'মুক্তি' বলতে সাধারণত ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিকেই বোঝায়। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধভক্তি লাভ করার ফলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ব্রহ্মকে ইঙ্গিতকারী *'মুক্তিপদে'* শব্দটি ব্যবহার করতে চাননি। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরিবর্তন করার অধিকার

তাঁর নেই, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরবর্তী শ্লোকে তাঁকে বলেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যদিও ভগবদ্ভক্তির আবেগে সেই পদটির পরিবর্তন করেছিলেন, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা সমর্থন করেননি।

শ্লোক ২৬২

প্রভু কহে, 'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয় ।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয় ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললেন—"শ্লোকটিতে 'মুক্তিপদে' কথাটি রয়েছে, কিন্তু তুমি কেন তা পরিবর্তন করে 'ভক্তিপদে' করলে? তার কারণ কি?"

শ্লোক ২৬৩

ভট্টাচার্য কহে—'ভক্তি'-সম নহে মুক্তি-ফল ।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—"মুক্তির ফল ভক্তির সমতুল্য নয়। যারা ভগবদ্ভক্তি বিমুখ তারা কেবল দণ্ডই ভোগ করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বলা হয়েছে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

"তমসাচ্ছন্ন জড়-জগতের ঊর্ধ্বে সিদ্ধলোকে (ব্রহ্মলোকে) দুই প্রকার জীব রয়েছে—ব্রহ্মসুখে মগ্ন সিদ্ধগণ এবং হরি কর্তৃক নিহত দৈত্যগণ।" আটটি জড় আবরণ ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে আছে এবং এই আবরণের ঊর্ধ্বে আছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি। কেউ যদি ভগবানের অঙ্গজ্যোতি নির্বিশেষ ব্রহ্মে গতিলাভ করে, তাহলে সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ভক্তেরা মনে করেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করা-একপ্রকার দণ্ড। কখনও কখনও ভক্তেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থিত হতে চান এবং তার ফলে তারা সিদ্ধলোকে উন্নীত হন। প্রকৃতপক্ষে তাদের নির্বিশেষ ধারণার জন্য তারা দণ্ডভোগ করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য পরবর্তী শ্লোকে *মুক্তিপদ* এবং *ভক্তিপদের* পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২৬৪-২৬৫

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৬৪ ॥

সেই দুইর দণ্ড হয়—'ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি'।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বিগ্রহকে সত্য বলে মানে না এবং যে সমস্ত দৈত্য শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে ও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে, এই দুই প্রকার জীব দণ্ড স্বরূপ 'ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি' লাভ করে। কিন্তু যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তারা এ ধরনের মুক্তি লাভ করে না।

শ্লোক ২৬৬

যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ-পরকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মুক্তি পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে, ভগবান যেখানে বাস করেন সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিকে বলা হয় 'সালোক্য', ভগবানের কাছে থাকার মুক্তিকে বলা হয় 'সামীপ্য', ভগবানের মতো চতুর্ভুজ প্রাপ্ত হওয়াকে বলা হয় 'সারূপ্য'। ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভরূপ মুক্তিকে বলা হয় 'সার্ষ্টি', এবং ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'সাযুজ্য'। এই পাঁচ প্রকার মুক্তি।

শ্লোক ২৬৭

'সালোক্যাদি' চারি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য অথবা সার্ষ্টি, এই চার প্রকার মুক্তিতে সেবা করার সুযোগ রয়েছে বলে ভক্ত কখনও কখনও তা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ভক্ত কখনও সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ২৬৮

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"'সাযুজ্য' শব্দটি ভক্তের হৃদয়ে ঘৃণা এবং ভয়ের উদ্রেক করে। ভক্ত নরকে পর্যন্ত যেতে রাজী থাকেন, কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করতে চান না।"

তাৎপর্য

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন—*কৈবল্যম্ নরকায়তে*। নির্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ধারণা নরক-গতি লাভের মতো। তাই, পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম চারটি (সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি) ততটা অবাঞ্ছিত নয়, যদি তাতে ভগবানের সেবা করার সুযোগ থাকে। কিন্তু তাহলেও, শুদ্ধভক্ত সেই সমস্ত মুক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কেবল চান যেন জন্ম-জন্মান্তরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা করতে পারেন। তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে চান না, পক্ষান্তরে তিনি কেবল ভগবানের প্রেমসেবাই করতে চান, এমনকি নরকেও। শুদ্ধভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে ভয় করেন। এই সাযুজ্য মুক্তি ভক্তি বিরোধকারী অপরাধের ফল এবং শুদ্ধ ভক্ত কখনও তা কামনা করেন না।

শ্লোক ২৬৯

ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলে যেতে লাগলেন, "সাযুজ্য মুক্তি দুই প্রকার—'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' এবং 'ঈশ্বর-সাযুজ্য'। ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়া-রূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য থেকেও জঘন্য।"

তাৎপর্য

মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মতে, জীবের পরমসিদ্ধি হল—'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' মুক্তি লাভ করা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক নামে পরিচিত। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে,—*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*—"অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা থেকে।" পতঞ্জলির *যোগদর্শন* অনুসরণকারী যোগীরা ঈশ্বরের সবিশেষত্ব স্বীকার করেন কিন্তু তারা ঈশ্বরের চিন্ময় দেহে লীন হয়ে যেতে চান। সমস্ত কিছুর পরম উৎসরূপে পরমেশ্বর ভগবান স্বচ্ছন্দে অনন্ত কোটি জীবকে তাঁর দেহে বিলীন হতে দিতে পারেন। ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি ব্রহ্মলোক অথবা সিদ্ধলোক নামে পরিচিত। এইভাবে ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ স্বরূপ, অসংখ্য চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপ জীব রয়েছে। যেহেতু এই সমস্ত জীব তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় না, তাই তাদের পুঞ্জীভূত অবস্থায় ব্রহ্মলোকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেমন সূর্য-কিরণ বিচ্ছুরিত হয়।

'সিদ্ধ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধি করেছেন এবং পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে জীব জড় পদার্থ নয়, 'চিন্ময় আত্মা'—তাকে বলা হয় সিদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* তাঁদের ব্রহ্মভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ-অবস্থায় জীবকে বলা হয় জীবভূত, বা "জড়ের মধ্যে জীব শক্তি।" ব্রহ্মভূত অবস্থায় জীবেরা ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোকে থাকতে পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কখনও কখনও তাদের পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়, কেননা তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত নন। তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) *যেহন্যে অরবিন্দাক্ষ* শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই সমস্ত আপাত মুক্ত আত্মারা ভ্রান্তভাবে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, ততক্ষণ তারা জড়-জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন না। তাই এই সমস্ত জীবদের *বিমুক্তমানিনঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যদিও তাদের বুদ্ধি নির্মল হয়নি তবুও তারা ভ্রান্তভাবে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে তারা সিদ্ধলোকে উন্নীত হন, কিন্তু তারা সেখানে থাকতে পারেন না, কেননা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অবহেলা করার ফলে তারা নিরানন্দ হয়ে পড়েন। সুতরাং ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হয়ে ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, ভগবানের সেবায় অবহেলা করার ফলে তাদের পুনরায় অধঃপতিত হতে হয়। ভগবান সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র জ্ঞান তারা অর্জন করেছে—তার যথার্থ সদ্ব্যবহার তারা করে না। আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয়ে তারা জড় সুখ উপভোগ করার জন্য পুনরায় জড়-জগতে নেমে আসে। এটি অবশ্যই মুক্তদের অধঃপতন। ভগবদ্ভক্তেরা এই ধরনের অধঃপতনকে নরক প্রাপ্তির সমতুল্য বলে মনে করেন।

পতঞ্জলির *যোগ-দর্শনের* অনুসরণকারীরা ঈশ্বরের দেহে লীন হয়ে যেতে চান। এর থেকে বোঝা যায় যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর সেবায় যুক্ত হতে চান না এবং তার ফলে তাদের অবস্থা ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী নির্বিশেষবাদীদের থেকেও জঘন্য। এই সমস্ত যোগীরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপের ধ্যান করেন, তাঁর দেহে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য। পতঞ্জলির *যোগ-দর্শনে* ভগবানের রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *ক্লেশকর্ম বিপাকাশয়ৈর অপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ*—"ঈশ্বর এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড়-জগতের কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেন না।" *স পূর্বেষাম্ অপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ*—"সেই পুরুষ সর্বদাই শ্রেষ্ঠ এবং তিনি কালের দ্বারা প্রভাবিত হন না"—এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা যোগীরা সবিশেষ ঈশ্বরের স্বীকার করেন বলে বোঝা যায়। কিন্তু তবুও—*পুরুষার্থ শূন্যানাম্ প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বাচিতিশক্তিরিতি*—"কৈবল্য লাভ বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন আর অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না।" তাদের বর্ণনা অনুসারে—*চিতিশক্তিরিতি*। তারা মনে করেন কৈবল্য প্রাপ্ত হলে তখন আর তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে না। এই যোগ-পদ্ধতি তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য, কেননা চরমে তা নির্বিশেষবাদ পোষণ করে। প্রথমে যোগীরা ভগবানকে স্বীকার করেন, কিন্তু চরমে তারা নির্বিশেষবাদ আশ্রয়

করে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা, কেননা ঈশ্বরের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকা সত্ত্বেও, তারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা স্বীকার না করে পুনরায় এই জড়-জগতে অধঃপতিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—"পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবহেলা করার ফলে এই সমস্ত যোগীরা পুনরায় জড়-জগতে অধঃপতিত হয় (*পতন্ত্যধঃ*)। তাই এই যোগের পন্থা, 'নির্বিশেষবাদ'-এর পন্থা থেকে অধিকতর জঘন্য। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে (৩/২৯/১৩) এই সিদ্ধান্ত ভগবান কপিলদেব সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২৭০

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ ॥ ২৭০ ॥

সালোক্য—ভগবদ্ধামে অবস্থান করা; **সার্ষ্টি**—ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা; **সারূপ্য**—ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া; **সামীপ্য**—ভগবানের সঙ্গলাভ করা; **একত্বম্**—ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; **অপি**—তাও; **উত**—উক্ত; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ন**—না; **গৃহ্নন্তি**—গ্রহণ করা; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎসেবনম্**—আমার সেবা পরায়ণ; **জনাঃ**—ভক্তবৃন্দ।

অনুবাদ

"আমার ভক্তদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তি দান করা হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না, কেননা আমার অপ্রাকৃত সেবা করা ব্যতীত তাঁদের আর কোন বাসনা নেই।"

শ্লোক ২৭১

প্রভু কহে,—'মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয় ।
মুক্তিপদ-শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয় ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—মুক্তিপদের আর একটি অর্থ হয়। 'মুক্তিপদ' শব্দে স্বয়ং ভগবানকে বোঝান হয়।

শ্লোক ২৭২

মুক্তি পদে যাঁর, সেই 'মুক্তিপদ' হয় ।
কিম্বা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয় ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"সবরকম মুক্তি ভগবানের চরণতলে বিরাজ করে; তাই তাঁর নাম 'মুক্তিপদ'। এই শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে নবম পদার্থ মুক্তি যাকে আশ্রয় করে থাকে, সেই 'দশম' বস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম মুকুন্দ, অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার মুক্তি দান করে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বারটি স্কন্ধ রয়েছে, এবং নবম স্কন্ধে সর্বপ্রকার মুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দশম স্কন্ধে সর্বপ্রকার মুক্তির মূল আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনার দশম বিষয় এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে কেবল তাঁরই আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রকার মুক্তি যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে বিরাজ করে, তাই মুক্তিপদ বলতে তাঁকেই বোঝান হয়।

শ্লোক ২৭৩

দুই-অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কেনে পাঠ ফিরি ।
সার্বভৌম কহে,—ও-পাঠ কহিতে না পারি ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সেই দুটি অর্থ অনুসারে 'মুক্তিপদ' শব্দটি যখন শ্রীকৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করে, তখন তার পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন?" সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন উত্তর দিলেন—"আমি ঐভাবে শ্লোকটি পাঠ করতে পারি না।

শ্লোক ২৭৪

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয় ।
তথাপি 'আশ্লিষ্য-দোষে' কহন না যায় ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আপনার ব্যাখ্যা অভ্রান্ত, তবুও 'আশ্লিষ্য-দোষ' রয়েছে বলে আমি 'মুক্তিপদ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারছি না।

তাৎপর্য

যে শব্দের দুই প্রকার অর্থ হতে পারে, তাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি হয়, এই দোষকে 'আশ্লিষ্য-দোষ' বলা হয়।

শ্লোক ২৭৫

যদ্যপি 'মুক্তি'-শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি ।
রূঢ়িবৃত্ত্যে কহে তবু 'সাযুজ্যে' প্রতীতি ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও 'মুক্তি' শব্দের পাঁচটি বৃত্তি রয়েছে, তথাপি তার মুখ্যবৃত্তিতে সাযুজ্য মুক্তিকেই বোঝান হয়।

শ্লোক ২৭৬

মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস ।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'মুক্তি' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র মনে ঘৃণা এবং ত্রাসের সঞ্চার হয়, অথচ 'ভক্তি' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র হৃদয়ে উল্লাসের উদয় হয়।"

শ্লোক ২৭৭

শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত-মনে ।
ভট্টাচার্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এই ব্যাখ্যা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাসতে লাগলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২৭৮

যেই ভট্টাচার্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদে ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মায়াবাদ পড়তেন এবং পড়াতেন, তিনি এখন 'মুক্তি' শব্দটি উচ্চারণ করতে পর্যন্ত সঙ্কুচিত হচ্ছেন, এবং এইভাবে ভক্তির মহিমা প্রচার করছেন। তা সম্ভব হয়েছে কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে।

শ্লোক ২৭৯

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে ।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

স্পর্শমণি যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্পর্শের প্রভাবে লোহাকে সোনায় পরিণত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ স্পর্শমণিকে চিনতে পারে না।

শ্লোক ২৮০

ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্বজন ।
প্রভুকে জানিল—'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দর্শন করে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ২৮১

কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী ।
শরণ লইল সবে প্রভু-পদে আসি' ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

এই ঘটনার পর কাশীমিশ্র আদি জগন্নাথপুরীর সমস্ত অধিবাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ২৮২

সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন ।
সার্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

পরে আমি বর্ণনা করব, কিভাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সর্বক্ষণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮৩

যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্বাহন ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব, কিভাবে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত পরিপাটী করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভোগ নিবেদন করতেন।

শ্লোক ২৮৪-২৮৫

এই মহাপ্রভুর লীলা—সার্বভৌম-মিলন ।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ ॥ ২৮৪ ॥

জ্ঞান-কর্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্যচরণ ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মিলন-লীলা যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি অচিরেই শুষ্কজ্ঞান ও সকামকর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ২৮৬

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা ও তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'সার্বভৌম ভট্টাচার্য উদ্ধার' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাসুদেব বিপ্র উদ্ধার এবং মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* সপ্তম পরিচ্ছেদের 'কথাসার'-এ লিখেছেন—মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে ফাল্গুন মাসে নীলাচলে বাস করেন। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা দর্শন করে চৈত্র মাসে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার করেন; তারপর বৈশাখ মাসে দক্ষিণে যাত্রা করেন। একলা দক্ষিণ ভ্রমণ করবেন—এই প্রস্তাব করায় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গে 'কৃষ্ণদাস' নামক একজন ব্রাহ্মণকে দিলেন। যাত্রার সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে চারখানা কৌপীন-বহির্বাস দিয়ে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তীরে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করেন। আলালনাথ পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাদের পরিত্যাগ করে কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলতে বলতে চলতে লাগলেন। যে গ্রামে তিনি রাত্রিবাস করতেন, সেখানে শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করে সারা দেশকে 'বৈষ্ণব' করতে আজ্ঞা দেন। তারা আবার অন্যান্য লোককে ভক্তি শিক্ষা দিয়ে অন্যান্য গ্রামে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এইভাবে কূর্মস্থানে উপস্থিত হলে সেখানে 'কূর্ম' নামক ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন, 'বাসুদেব' নামক বিপ্রকে গলিত কুষ্ঠরোগ থেকে উদ্ধার করেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করার ফলে 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' বলে প্রভুর একটি নাম হল।

শ্লোক ১

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধী।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

ধন্যম্—ধন্য; **তম্**—তাঁকে; **নৌমি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **চৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **বাসুদেবম্**—বাসুদেব বিপ্রকে; **দয়ার্দ্রধী**—দয়া পরবশ হয়ে; **নষ্ট-কুষ্ঠম্**—কুষ্ঠরোগ নিরাময় করেছেন; **রূপপুষ্টম্**—সৌন্দর্যময়; **ভক্তিতুষ্টম্**—ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে; **চকার**—করেছিলেন; **যঃ**—যে পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে 'বাসুদেব' নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত করে সুন্দররূপে পুষ্ট করে ভক্তিতুষ্ট করেছিলেন, সেই মহা যশস্বী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

এই মতে সার্বভৌমের নিস্তার করিল ।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে প্রচার করতে যেতে ইচ্ছা করলেন।

শ্লোক ৪

মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ফাল্গুন মাসে তিনি জগন্নাথপুরীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

ফাল্গুন মাসের শেষে তিনি দোলযাত্রা দর্শন করেছিলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে বহু নৃত্য-গীত করেছিলেন।

শ্লোক ৬

চৈত্রে রহি' কৈল সার্বভৌম-বিমোচন ।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

চৈত্রমাসে জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করে তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার করেছিলেন এবং বৈশাখ মাসের প্রথমদিকে তিনি দক্ষিণ-ভারতে যেতে ইচ্ছা করেছিলেন।

শ্লোক ৭-৮

নিজগণ আনি' কহে বিনয় করিয়া ।
আলিঙ্গন করি সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥ ৭ ॥
তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি' ।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা-সবা ছাড়িতে না পারি ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সমস্ত ভক্তদের ডেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীহস্তে ধরে তাদের আলিঙ্গন করে, অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিলেন—"তোমরা সকলে আমার প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয়। প্রাণ ছাড়া যায়, কিন্তু তোমাদের ছাড়া যায় না।

শ্লোক ৯

তুমি-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে ।
ইহাঁ আনি' মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা সকলে আমার বন্ধু এবং এখানে আমাকে এনে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়ে তোমরা বন্ধুর কর্তব্যই সম্পাদন করেছ।

শ্লোক ১০

এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে ।
সবে মেলি' আজ্ঞা দেহ, যাইব দক্ষিণে ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি এখন তোমাদের সকলের কাছে একটি ভিক্ষা চাইব—দয়া করে আমাকে দক্ষিণ-ভারতে যেতে অনুমতি দাও।

শ্লোক ১১

বিশ্বরূপ-উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব ।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বিশ্বরূপকে খুঁজতে যাব। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে আমি একলাই যাব।

শ্লোক ১২

সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"সেতুবন্ধ থেকে আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত, তোমরা সকলে জগন্নাথপুরীতে থেকো।"

শ্লোক ১৩

বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল ।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানতেন যে বিশ্বরূপ ইতিমধ্যে তাঁর প্রকট লীলা সংবরণ করেছেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভারত উদ্ধার করার জন্য এই ছলনা করলেন।

শ্লোক ১৪

শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ ।
নিঃশব্দ হইলা, সবার শুকাইল মুখ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে সকলের মনে মহা দুঃখ হল, তারা নিঃশব্দ হলেন এবং তাদের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

শ্লোক ১৫

নিত্যানন্দপ্রভু কহে,—"ঐছে কৈছে হয় ।
একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয় ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু বললেন—"তা কি করে সম্ভব? তুমি একলা যাবে, তা কে সহ্য করতে পারে?

শ্লোক ১৬

দুই—এক সঙ্গে চলুক, না পড় হঠ-রঙ্গে ।
যারে কহ সেই দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাদের দুইএকজন অন্ততঃ তোমার সঙ্গে যাক, তা না হলে পথে তুমি চোর-ডাকাতের হাতে পড়তে পার। তুমি যাদের নিতে চাও সেই দুজনই তোমার সঙ্গে যাক।

শ্লোক ১৭

দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি ।
আমি সঙ্গে যাই, প্রভু, আজ্ঞা দেহ তুমি ॥" ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"দক্ষিণ-ভারতের সমস্ত পথ এবং তীর্থস্থানগুলি আমি জানি। যদি তুমি আজ্ঞা দাও, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।"

শ্লোক ১৮

প্রভু কহে, "আমি—নর্তক, তুমি সূত্রধার ।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্তন আমার ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—"আমি নর্তক আর তুমি সূত্রধার। যেভাবে তুমি আমাকে নাচাও, সেইভাবেই আমি নাচি।

শ্লোক ১৯

সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন ।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর আমি ঠিক করেছিলাম বৃন্দাবনে যাব, কিন্তু তুমি আমাকে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে নিয়ে গেলে।

শ্লোক ২০

নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড ।
তোমা-সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য-ভঙ্গ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"নীলাচলে আসার পথে তুমি আমার সন্ন্যাস-দণ্ড ভেঙ্গে দিলে। আমি জানি যে তোমরা সকলে আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-পরায়ণ, কিন্তু তোমাদের এই গভীর স্নেহের ফলে আমার সমস্ত কার্য ভঙ্গ হচ্ছে।

শ্লোক ২১

জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে ।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"জগদানন্দ আমাকে বিষয় ভোগ করাতে চায় এবং তার ভয়েই সে আমাকে যা বলে তা আমাকে করতে হয়।

শ্লোক ২২

কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা ।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"কখনও যদি আমি তার বাক্যের অন্যথা করি, তাহলে ক্রোধে সে তিন দিন আমার সঙ্গে কথা বলে না।

শ্লোক ২৩

মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম ।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি সন্ন্যাসী, তাই শীতের সময়ও আমাকে দিনে তিনবার স্নান করতে হয় এবং মাটিতে শয়ন করতে হয়; কিন্তু তা দেখে মুকুন্দ দুঃখিত হয়।

শ্লোক ২৪

অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে ।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মুকুন্দ অবশ্য মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার অন্তরের দুঃখ আমি বুঝতে পারি এবং তার দুঃখ দেখে আমার আরও দুঃখ হয়।

শ্লোক ২৫

আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী ।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি' ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও আমি সন্ন্যাসী আর স্বরূপ দামোদর ব্রহ্মচারী, কিন্তু তবুও সে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাতে ছড়ি নিয়ে থাকে।

শ্লোক ২৬

ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার ।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বরূপ দামোদর মনে করে, কিভাবে আচরণ করতে হয় তা আমি জানি না, এবং আমার স্বাধীন ব্যবহার সে পছন্দ করে না।

শ্লোক ২৭

লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে ।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণকৃপা অধিক বলে, তারা লোকাপেক্ষা না করে আমাকে নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করাতে চায়, কিন্তু আমি দীন সন্ন্যাসী, লোকাপেক্ষা ছাড়তে না পেরে যথা ধর্ম ব্যবহার করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীর সহায়তা করা, তাই ব্রহ্মচারীর কোন সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। এই সূত্রে দামোদরের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া উচিত হয়নি।

শ্লোক ২৮

অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে ।
দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥" ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই তোমরা সকলে নীলাচলে থাকো, আর আমি কিছুদিন একলা তীর্থ ভ্রমণ করি।"

শ্লোক ২৯

ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে ।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর ভক্তদের গুণের বশীভূত। দোষারোপ করার ছলে তিনি এই সমস্ত গুণ আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় ভক্তদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দোষারোপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাদের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের প্রশংসা। তবুও তিনি একের পর এক তাদের দোষগুলির উল্লেখ করেছিলেন—যেন তাদের গভীর প্রীতিতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্যদেরা তাঁর প্রতি তাদের গভীর প্রেমের বশবর্তী হয়ে কখনও কখনও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করেছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে কখনও কখনও সন্ন্যাস-ধর্ম লঙ্ঘন করেছেন। সাধারণ মানুষের চোখে এই সমস্ত বিধি লঙ্ঘন অসমীচীন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের প্রেমের দ্বারা এতই বশীভূত ছিলেন যে, কখনও কখনও তাঁকে বিধি-নিষেধগুলি লঙ্ঘন করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি তাদের বিশুদ্ধ প্রেমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই এই পরিচ্ছেদের সপ্তবিংশতি শ্লোকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্ত সামাজিক আচার-ব্যবহার থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের ভালবাসার অধিক গুরুত্ব দেন। পূর্বতন আচার্যদের ঐকান্তিক ভগবদ্ভজনে, কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে, যতক্ষণ আমরা এই জড় জগতে রয়েছি, ততক্ষণ আমাদের সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতেই হবে, তা না হলে জনসাধারণ আমাদের সমালোচনা করবে। সেটিই ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোগত বাসনা।

শ্লোক ৩০

চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য—অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য কেউই যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে না। তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের নানারকম দুঃখ-কষ্ট সব সময়ে সহ্য করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

সেই দুঃখ দেখি' যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সেই দুঃখ দেখে ভক্তরা দুঃখিত হতেন। সন্ন্যাস আশ্রমের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না।

শ্লোক ৩২

গুণে দোষোদ্‌গার-ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তাই বৈরাগ্য অবলম্বন করে একাকী তীর্থ ভ্রমণের জন্য তিনি তাদের গুণগুলিকে দোষরূপে বর্ণনা করে, তাদের তাঁর সঙ্গে যেতে নিষেধ করলেন।

শ্লোক ৩৩

তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন চারজন ভক্ত তাঁকে বহু মিনতি করলেন তাঁর সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সেই অনুরোধ শুনলেন না।

শ্লোক ৩৪

তবে নিত্যানন্দ কহে,—যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যে হউক্ কর্তব্য আমার ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন নিত্যানন্দ প্রভু বললেন—"তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য, তাতে আমার সুখ হোক অথবা দুঃখ হোক তা পালন করা আমার কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি নিবেদন রয়েছে। দয়া করে তা বিচার করে অঙ্গীকার কর।

শ্লোক ৩৬-৩৭

কৌপীন, বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র ॥ ৩৬ ॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র-বহির্বাস বহিবে কেমনে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি কেবল কৌপীন, বহির্বাস আর জলপাত্র সঙ্গে নেবে, আর কিছু নেবে না। কিন্তু তোমার দুটি হাত তো সব সময় নাম গণনে ব্যস্ত থাকবে। তাহলে তুমি জলপাত্র এবং বহির্বাস বহন করবে কি করে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সংখ্যাপূর্বক নাম জপ করতেন। গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন এবং হরিদাস ঠাকুরও সেই পন্থা অনুসরণ করতেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী—এই ছয় গোস্বামী সম্বন্ধে শ্রীনিবাস আচার্য গেয়েছেন—*সংখ্যাপূর্বক*

নাম-গান নতিভিঃ (ষড়্‌গোস্বামী অষ্টক-৬)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্যান্য নিত্যকৃত্যের সঙ্গে সংখ্যা পূর্বক হরিনাম জপ করার পন্থা প্রবর্তন করে গেছেন, যা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে (তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হাতে নাম গণনা করতেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর *শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত* এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর *স্তব-মালায়ও* তার বর্ণনা রয়েছে—

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ ।
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্ ॥

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত, ১৬)

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লোকমঙ্গল 'হরেকৃষ্ণ' নাম অবিরত জপ করছেন, প্রেমভরে তাঁর শ্রীহস্ত কম্পিত হচ্ছে, আবার সেই কম্পিত করকমলে লোকশিক্ষার নিমিত্ত কটিডোরে গ্রন্থি দিয়ে নামের সংখ্যা রাখছেন।"

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগ-কটীসূত্রোজ্জ্বলোকরঃ ।

(প্রথম চৈতন্যাষ্টক, ৫)

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তদের প্রতিদিন অন্ততঃ ষোল মালা জপ করা অবশ্য কর্তব্য। এটি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের নির্ধারিত সংখ্যা। হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। ষোল মালা জপ করলে প্রায় আটাশ হাজার নাম গ্রহণ হয়। হরিদাস ঠাকুর অথবা গোস্বামীদের অনুকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই, তবে প্রতিদিন সংখ্যাপূর্বক ভগবানের নাম করা প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য।

শ্লোক ৩৮

প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন ।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যখন পথে প্রেমাবিষ্ট হয়ে অচেতন হবে, তখন তোমার এই সমস্ত সামগ্রী কে রক্ষা করবে?

শ্লোক ৩৯

'কৃষ্ণদাস'-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—"কৃষ্ণদাস নামক সরল ব্রাহ্মণটিকে তুমি তোমার সঙ্গে নাও। এই আমার অনুরোধ।

তাৎপর্য

কালাকৃষ্ণদাস নামক এই ব্রাহ্মণ, আদিলীলার একাদশ পরিচ্ছেদের সাঁইত্রিশ শ্লোকে বর্ণিত কালাকৃষ্ণদাস নন। একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কালাকৃষ্ণদাস দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর একজন মহান ভক্ত। কালাকৃষ্ণদাস নামক যে ব্রাহ্মণটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন পরে তিনি গৌড়ে গিয়েছিলেন। সেই কথা মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে বাষট্টি থেকে চুয়াত্তর শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এই দুই ব্যক্তিকে এক বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে ।
যে তোমার ইচ্ছা, কর, কিছু না বলিবে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"সে তোমার জলের পাত্র আর বহির্বাস বহন করবে। তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার, সে তোমাকে কিছুই বলবে না।"

শ্লোক ৪১

তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি' অঙ্গীকারে ।
তাহা-সবা লঞা গেলা সার্বভৌম ঘরে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরোধ মেনে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গেলেন।

শ্লোক ৪২

নমস্করি' সার্বভৌম আসন নিবেদিল ।
সবাকারে মিলি' তবে আসনে বসিল ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে বসার আসন দিলেন। তারপর অন্য সকলকে বসার আসন দিয়ে তিনি বসলেন।

শ্লোক ৪৩

নানা কৃষ্ণবার্তা কহি' কহিল তাঁহারে ।
'তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "তোমার অনুমতি প্রার্থনা করার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি।

শ্লোক ৪৪

সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে ।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ, সন্ন্যাস গ্রহণ করে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছেন। আমাকে এখন অবশ্যই তাঁকে খুঁজতে যেতে হবে।

শ্লোক ৪৫

আজ্ঞা দেহ, অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব ।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি' আসিব ॥" ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে অনুমতি দিন, কেন না দক্ষিণ ভারতে আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মহাসুখে অচিরেই ফিরে আসব।"

শ্লোক ৪৬

শুনি' সার্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর ।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত কাতর হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমল জড়িয়ে ধরে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বললেন,—

শ্লোক ৪৭

'বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বহু জন্মের পুণ্যফলে আমি তোমার সঙ্গ লাভ করেছিলাম, সেই দুর্লভ সঙ্গ থেকে বিধি আমাকে বঞ্চিত করছে।

শ্লোক ৪৮

শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায় ।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মাথায় যদি বজ্রপাত হয় অথবা আমার পুত্র যদি মরে যায়, তাও আমি সহ্য করতে পারি; কিন্তু তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব না।

শ্লোক ৪৯

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি করিবে গমন ।
দিন কথো রহ, দেখি তোমার চরণ' ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি যাবে, তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু তবুও আমি তোমায় অনুরোধ করব, আর কিছুদিন তুমি এখানে থাকো, যাতে আমি তোমার চরণকমল দর্শন করতে পারি।"

শ্লোক ৫০

তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন ।
রহিল দিবস কথো, না কৈল গমন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন শিথিল হল। তিনি আরও কয়েকদিন সেখানে রইলেন।

শ্লোক ৫১

ভট্টাচার্য আগ্রহ করি' করেন নিমন্ত্রণ ।
গৃহে পাক করি' প্রভুকে করা'ন ভোজন ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

আগ্রহ সহকারে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং গৃহে রন্ধন করে তাঁকে ভোজন করান।

শ্লোক ৫২

তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম—'ষাঠীর মাতা' ।
রান্ধি' ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য তাঁর কথা ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহিণী, যার নাম ছিল 'ষাঠীর মাতা', তিনি রান্না করতেন। সেই সমস্ত লীলা অপূর্ব।

শ্লোক ৫৩

আগে' ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার ।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-সমাচার ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

পরে আমি বিস্তারিতভাবে সেই সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করব। এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের কথা বলতে চাই।

শ্লোক ৫৪

দিন পাঁচ রহি' প্রভু ভট্টাচার্য-স্থানে ।
চলিবার লাগি' আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

পাঁচদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করবার জন্য তার অনুমতি চাইলেন।

শ্লোক ৫৫

প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য সম্মত হইলা ।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহ দর্শন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সম্মত হলেন। তখন তাকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন।

শ্লোক ৫৬

দর্শন করি' ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিলা ।
পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি' দিলা ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁরও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন পূজারী তাঁকে জগন্নাথের প্রসাদী-মালা এনে দিলেন।

শ্লোক ৫৭

আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি' ।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে মালারূপে জগন্নাথদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরষিত চিত্তে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং মহা আনন্দে দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৫৮

ভট্টাচার্য-সঙ্গে আর যত নিজগণ ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি' করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং তাঁর অন্য সমস্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করে যাত্রা শুরু করলেন।

শ্লোক ৫৯

সমুদ্র-তীরে তীরে আলালনাথ-পথে ।
সার্বভৌম কহিলেন আচার্য-গোপীনাথে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমুদ্রের তীর ধরে আলালনাথের পথে যেতে যেতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্যকে বললেন—

শ্লোক ৬০

চারি কৌপীন-বহির্বাস রাখিয়াছি ঘরে ।
তাহা, প্রসাদান্ন, লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার বাড়ীতে আমি চারটি কৌপীন এবং বহির্বাস রেখেছি। আর শ্রীজগন্নাথদেবের কিছু প্রসাদও রয়েছে। তুমি কোন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলো নিয়ে এস।"

শ্লোক ৬১-৬২

তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে ।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে ॥ ৬১ ॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে ।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন—"হে প্রভু, আপনার শ্রীচরণে আমার একটি অনুরোধ রয়েছে, আমি আশা করি আপনি অবশ্যই তা পালন করবেন। গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় নামক একজন উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী আছেন।

তাৎপর্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, এই বিদ্যানগর বর্তমানে 'পোরবন্দর' নামে পরিচিত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাটেও পোরবন্দর নামক একটি স্থান রয়েছে।

শ্লোক ৬৩

শূদ্র বিষয়ি-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে ।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শূদ্র কুলোদ্ভূত এবং বিষয়ী বলে তাঁকে উপেক্ষা করবেন না। আমার অনুরোধ—যেন আপনি অবশ্যই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।"

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্মে শূদ্র হচ্ছে চতুর্থ বর্ণ। *পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। (ভঃ গীঃ* ১৮/৪৪) শূদ্রদের কর্তব্য হচ্ছে তিনটি উচ্চ বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সেবা করা। শ্রীরামানন্দ রায় ছিলেন উৎকল দেশীয় করণ জাতি, যা বাংলাদেশের কায়স্থদের পর্যায়ভুক্ত। এই শ্রেণীকে উত্তর ভারতে শূদ্র বলে গণনা করা হয়। কথিত আছে যে বাঙ্গালী কায়স্থরা উত্তর ভারত থেকে বঙ্গভূমিতে আগত এবং তারা ব্রাহ্মণদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা বাংলাদেশে কায়স্থে পরিণত হয়। এখন বহু সঙ্কর বর্ণ কায়স্থ নামে পরিচিত হয়েছে। কখনও কখনও বলা হয় যে, যার কোন বিশেষ বর্ণ নেই—সে-ই কায়স্থ বর্ণ। যদিও এই সমস্ত কায়স্থ অথবা করণদের শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়, তারা কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উচ্চ শিক্ষিত। তাদের অধিকাংশই উকিল অথবা রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের কায়স্থদের কখনও কখনও ক্ষত্রিয় বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু উড়িষ্যায় কায়স্থ বা করণদের শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়। শ্রীল রামানন্দ রায় ছিলেন করণ সম্প্রদায় ভুক্ত; তাই তাঁকে শূদ্র বলে গণনা করা হয়েছিল। উড়িষ্যার রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজত্বে তিনি ছিলেন দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যপাল। তাঁর সম্বন্ধে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন যে, জাতিতে শূদ্র হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে ও রাজনীতির ব্যাপারে শূদ্রেরা সাধারণত অযোগ্য। তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেছিলেন, রামানন্দ রায়কে যেন তিনি অবহেলা না করেন। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করলেও বস্তুত তিনি ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণদেরও গুরু—বৈষ্ণব-পরম-হংস ছিলেন।

স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত জড় ইন্দ্রিয় তর্পণরত মানুষদের বিষয়ী বলা হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় সুখভোগে অথবা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা যায়। যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়ে কেবল জড় সুখভোগে আগ্রহী—তাদের বলা হয় বিষয়ী। শ্রীল রামানন্দ রায় ছিলেন রাজ কর্মচারী এবং জাতিতে করণ। তিনি অবশ্যই গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী

ছিলেন না, কিন্তু গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি চিন্ময় পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করার পূর্বে সার্বভৌম ভট্টাচার্য রামানন্দ রায়কে একজন সাধারণ বিষয়ী বলে মনে করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন রাজকার্যে নিযুক্ত একজন গৃহস্থ। কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনের প্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করলে, তিনি শ্রীল রামানন্দ রায়ের নৈসর্গিক বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে 'অধিকারী রসিক-ভক্ত' বলে বুঝেছিলেন। 'অধিকারী' হচ্ছেন তিনি, যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত; তাই সমস্ত গৃহস্থ ভক্তদের 'দাস-অধিকারী' বলা হয়।

শ্লোক ৬৪

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো এক জন ।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"রামানন্দ রায় তোমার সঙ্গ করার যোগ্য ব্যক্তি; তাঁর মতো রসিক ভক্ত পৃথিবীতে নেই।

শ্লোক ৬৫

পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা ।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি হচ্ছেন সব চাইতে বড় পণ্ডিত এবং তাঁর ভগবদ্ভক্তি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলে তুমি তাঁর মহিমা জানতে পারবে।

শ্লোক ৬৬

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া ।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' বলিয়া ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর অলৌকিক কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। তাকে 'বৈষ্ণব' বলে আমি পরিহাস করেছি।"

তাৎপর্য

যিনি বৈষ্ণব নন অথবা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত নন, তিনি অবশ্যই বিষয়ী হতে বাধ্য। যে বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করছেন তিনি অবশ্যই জড় স্তরে অধিষ্ঠিত নন। 'চৈতন্য' মানে "চেতন শক্তি"। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়েছিল চিন্ময় উপলব্ধির স্তরে; তাই যারা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত নন, তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না। যে সমস্ত জড়বাদীরা মহাপ্রভুর তত্ত্ব

হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, তাদের সাধারণত বলা হয় 'কর্মী' অথবা 'জ্ঞানী'। জ্ঞানীরা হচ্ছে জল্পনা-কল্পনা পরায়ণ মনোধর্মী, যারা কেবল ব্রহ্ম বা আত্মাকে জানার চেষ্টা করে। তাদের পন্থা হচ্ছে *নেতি নেতি*—"এটি আত্মা নয়, এটি ব্রহ্ম নয়।" জ্ঞানীরা স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ইন্দ্রিয়-তর্পণে আসক্ত কর্মীদের থেকে একটু উন্নত। বৈষ্ণব হওয়ার পূর্বে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন জ্ঞানী এবং তাই তিনি সর্বদা বৈষ্ণবদের পরিহাস করতেন। বৈষ্ণবেরা কখনও মনোধর্মী জ্ঞানীদের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। জ্ঞানী এবং কর্মী, উভয়েই তাদের অপূর্ণ জ্ঞানের জন্য তাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির উপর নির্ভর করেন। কর্মীরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত কোন কিছুই স্বীকার করতে চান না, আর জ্ঞানীরা কেবল তাদের অনুমানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বৈষ্ণবেরা, ভগবানের অনন্য ভক্তরা, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অনুভূতি অথবা মনোধর্ম প্রসূত অনুমানের ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জনের পন্থা অনুসরণ করেন না। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, তাই তারা সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* সেই জ্ঞান দান করেছেন এবং অন্তরে থেকে চৈত্য-গুরুরূপেও তিনি সেই জ্ঞান দান করেন। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিয়ত প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দান করি; যার ফলে তারা আমাকে জানতে পেরে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

বেদ ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। সেই বাণী প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা *(তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে)*। পরম্পরার ধারায় কৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মায়, ব্রহ্মা থেকে নারদের; নারদ থেকে ব্যাস, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ষড় গোস্বামী, এইভাবে এই জ্ঞান অবিকৃতরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে এই জ্ঞান দান করেছিলেন। আমাদের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং অভ্রান্ত, কেননা তা আমরা গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত হয়েছি। বৈষ্ণব সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাই কর্মী অথবা জ্ঞানীরা বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে পারে না। কথিত আছে, 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'—প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অনুভূতির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহশীল বড় বড় পণ্ডিতেরা পর্যন্ত বৈষ্ণবদের কার্যকলাপ বুঝতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে বৈষ্ণবে পরিণত হওয়ার পর সার্বভৌম ভট্টাচার্য বুঝতে পারেন যে, মহা পণ্ডিত এবং মহান ভগবদ্ভক্ত রামানন্দ রায়কে বোঝার চেষ্টা না করে তিনি কি বিরাট ভুল করেছেন।

শ্লোক ৬৭

তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব ।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন—"তোমার কৃপার প্রভাবে আমি এখন রামানন্দ রায়ের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি; তার সঙ্গে আলোচনা হলে তুমিও তাঁর মহত্ত্ব জানতে পারবে।"

শ্লোক ৬৮

অঙ্গীকার করি' প্রভু তাঁহার বচন ।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধ স্বীকার করে মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন।

শ্লোক ৬৯

"ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্বাদে ।
নীলাচলে আসি' যেন তোমার প্রসাদে ॥" ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "ঘরে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার প্রসাদে আমি আবার নীলাচলে ফিরে আসতে পারি।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন। সন্ন্যাসীরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্থান ছিল সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে, এবং গৃহস্থ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান ছিল তার থেকে অনেক নীচে। তাই সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থকে আশীর্বাদ করা। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহস্থের আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন। এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলকেই সমান পদমর্যাদা প্রদান করেছেন। তাঁর আন্দোলন সর্বতোভাবে অপ্রাকৃত। গৃহস্থ সার্বভৌম ভট্টাচার্য যদিও আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত কর্মীদের মতো ইন্দ্রিয় তর্পণ-পরায়ণ ছিলেন, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি যথার্থ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; তাই তখন তাঁর পক্ষে সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত আশীর্বাদ করা সম্ভব ছিল। গৃহে অবস্থান কালেও তিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন। আমাদের পরম্পরায়, এরকম বহু গৃহস্থ পরমহংসের আদর্শ দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। *শরণাগতি* (৩১/৬) নামক গ্রন্থে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—'যেদিন গৃহে, ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়'। গৃহস্থ যখন তার গৃহে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে তখন তার গৃহটি গোলোক-বৃন্দাবনে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভৌম-বৃন্দাবনে তাঁর লীলা প্রদর্শন

করেছিলেন, সেই ভৌম-বৃন্দাবন গোলোক-বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করে আমরাও বিভিন্ন স্থানে 'নব-বৃন্দাবন' প্রতিষ্ঠা করছি, যেখানে ভক্তরা সর্বক্ষণ ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত, এবং সেই বৃন্দাবনও গোলোক-বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায়, যে গৃহস্থ তাঁর গৃহে রাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন, তার গৃহটি বৃন্দাবনে পরিণত হয়, এবং সেই গৃহস্থ সন্ন্যাসীদেরও আশীর্বাদ করতে সক্ষম। সন্ন্যাসী যদিও অত্যন্ত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত, তথাপি তাঁকে ভগবদ্ভক্তির অধিকতর উন্নত স্তরে উন্নীত হতে হবে। এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে নিজে আচরণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে বৈষ্ণবের জাতি, কুল, বর্ণ ইত্যাদির বিচার না করে, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হয়।

শ্লোক ৭০

এত বলি' মহাপ্রভু করিলা গমন ।
মূর্ছিত হঞা তাহাঁ পড়িলা সার্বভৌম ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের জন্য যাত্রা করলেন এবং তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন।

শ্লোক ৭১

তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন ।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য মূর্ছিত হলেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে উপেক্ষা করে দ্রুতগতিতে গমন করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন এবং অভিপ্রায় কে বুঝতে পারে?

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য মূর্ছিত হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়তো তার পরিচর্যা করবেন এবং তার চেতনা ফিরে আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তাই, মহাপুরুষদের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কখনও কখনও তাঁদের অদ্ভুত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি জড় জাগতিক বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে—চিন্ময় স্তরেই স্থির থাকেন।

শ্লোক ৭২

মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয় ।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

মহানুভব ব্যক্তির চিত্তের স্বভাবই এইরকম। তিনি কুসুমের মতো কোমল এবং বজ্রের মতো কঠিন।

তাৎপর্য

মহাপুরুষদের ব্যবহারে কুসুমের কোমলতা এবং বজ্রের কঠোরতা দর্শন করা যায়। উত্তর-*রামচরিত* (২/৭) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে সেই আচরণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে সম্পর্কে মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২১২ শ্লোকও আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্লোক ৭৩

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥

বজ্রাৎ-অপি—বজ্রের থেকেও; **কঠোরাণি**—কঠোর; **মৃদূনি**—কোমল; **কুসুমাৎ-অপি**—ফুলের থেকেও; **লোকোত্তরাণাং**—অসাধারণ মানুষদের; **চেতাংসি**—অন্তঃকরণ; **কঃ**—কে; **নু**—কিন্তু; **বিজ্ঞাতুম্**—বোঝা; **ঈশ্বরঃ**—সমর্থ।

অনুবাদ

"অলৌকিক পুরুষদের চিত্ত বজ্রের থেকেও কঠোর, আবার কুসুমের থেকেও কোমল; তাদের অন্তঃকরণ বোঝা কার পক্ষে সম্ভব?"

শ্লোক ৭৪

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্যে উঠাইল ।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উঠালেন, এবং তার লোকদের দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর ঘরে পাঠালেন।

শ্লোক ৭৫

ভক্তগণ শীঘ্র আসি' লৈল প্রভুর সাথ ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন ভক্তেরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ নিলেন, তার একটু পরেই, বস্ত্র এবং প্রসাদ নিয়ে গোপীনাথ আচার্য এলেন।

শ্লোক ৭৬

সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ।
নমস্কার করি' তারে বহুস্তুতি কৈলা ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আলালনাথে এলেন। সেখানে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে তারা বিবিধ প্রকারে তাঁর স্তুতি করলেন।

শ্লোক ৭৭

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
দেখিতে আইলা তাহাঁ বৈসে যত জন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করলেন। আর সেখানকার সমস্ত মানুষেরা তা দেখতে এল।

শ্লোক ৭৮

চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্দিকে সমস্ত লোকেরা সমবেত হয়ে 'হরি' 'হরি' বলছিলেন, আর তাদের মাঝখানে প্রেমাবেশে গৌরহরি নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৭৯

কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন ।
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ তপ্ত কাঞ্চনের মতো এবং তাঁর পরনে অরুণ রঙে রঞ্জিত বসন। তাঁর সেই অপূর্ব সুন্দর রূপকে অলঙ্কৃত করেছিল পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ আদি ভগবৎ-প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার সমূহ।

শ্লোক ৮০

দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ।
যত লোক আইসে, কেহ নাহি যায় ঘর ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য এবং তাঁর দেহে সাত্ত্বিক বিকার সমূহ দর্শন করে সমস্ত লোকেরা মনে চমৎকৃত হলেন। যারাই সেখানে আসছিলেন তাদের কেউই আর ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন না।

শ্লোক ৮১

কেহ নাচে, কেহ গায়, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোপাল' ।
প্রেমেতে ভাসিল লোক,—স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের কেউ নাচছিল, কেউ 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোপাল' নাম উচ্চারণ করে গান গাইছিল। এইভাবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসতে লাগল।

শ্লোক ৮২

দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ।
এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে-গ্রামে ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নৃত্য-গীত দর্শন করে নিত্যানন্দ প্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিটি গ্রামে এভাবে নৃত্যগীত হবে।

তাৎপর্য

নিত্যানন্দ প্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নয়, সারা বিশ্ব সম্বন্ধে। তাঁর কৃপার প্রভাবে আজ তা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কৃষ্ণভক্তেরা এখন পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ নিয়ে নৃত্য করছে এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে আঁকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। আমরা আশা করি যে, এই সমস্ত ভক্তেরা যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছে, তারা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তারা যদি বিধি-নিষেধগুলি পালন করে প্রতিদিন ১৬ মালা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করে, তাহলে তাদের মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হবে।

শ্লোক ৮৩

অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায় ।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিলা উপায় ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তবুও লোকেরা যাচ্ছে না দেখে, সকলের গুরু নিত্যানন্দ গোসাঞি একটি উপায় বার করলেন।

শ্লোক ৮৪

মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লঞা ।
তাহা দেখি' লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে মধ্যাহ্ন করতে গেলেন, তখন চারিদিক থেকে সমস্ত লোকেরা ছুটে এল।

শ্লোক ৮৫

মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে ।
নিজগণ প্রবেশি' কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্নান করে তারা মন্দিরে এলেন, এবং নিজ জনদের প্রবেশ করিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু বহিরের দ্বার বন্ধ করে দিলেন।

শ্লোক ৮৬

তবে গোপীনাথ দুইপ্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি' খাইল ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য তখন দুই প্রভুর জন্য প্রসাদ নিয়ে এলেন, এবং তাদের খাওয়া হয়ে গেলে তাঁদের অবশিষ্ট প্রসাদ সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বেঁটে দিলেন।

শ্লোক ৮৭

শুনি' শুনি' লোক-সব আসি' বহির্দ্বারে ।
'হরি' 'হরি' বলি' লোক কোলাহল করে ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

লোকমুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শুনে বহুলোক বহির্দ্বারে সমবেত হল, এবং 'হরি' 'হরি' বলে কোলাহল করতে লাগল।

শ্লোক ৮৮

তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন ।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বার খুলে দিতে বললেন। তখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে সকলে তাঁর দর্শন লাভ করল।

শ্লোক ৮৯

এইমত সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক আসে, যায় ।
'বৈষ্ণব' হইল লোক, সবে নাচে, গায় ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক যাতায়াত করতে লাগল, এবং তাদের সকলেই বৈষ্ণব-ভক্তে পরিণত হয়ে নৃত্যগীত করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯০

এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে ।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মহা আনন্দে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে সেই রাত্রি কাটালেন।

শ্লোক ৯১

প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন ।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি' আলিঙ্গন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকাল বেলা স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের আলিঙ্গন করে—তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৯২

মূর্ছিত হঞা সবে ভূমিতে পড়িলা ।
তাঁহা-সবা পানে প্রভু ফিরি' না চাহিলা ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তারা সকলে মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

শ্লোক ৯৩

বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে দুঃখিত অন্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এগিয়ে চললেন, আর তাঁর ভৃত্য কৃষ্ণদাস জলপাত্র নিয়ে তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৪

ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা ।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেইদিন উপবাসী হয়ে ভক্তরা সেখানেই রইলেন এবং তার পরের দিন দুঃখিত অন্তরে তারা নীলাচলে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ৯৫

মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন ।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সংকীর্তন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

মত্তসিংহের মতো মহাপ্রভু চলতে লাগলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে নাম সংকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৬

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে ।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্ ॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু পথ চলতে চলতে গাইছিলেন—"হে কৃষ্ণ, দয়া করে আমাকে তুমি রক্ষা কর! আমাকে তুমি পালন কর! হে রাম, হে রাঘব, দয়া করে তুমি আমাকে পালন কর।"

শ্লোক ৯৭

এই শ্লোক পড়ি' পথে চলিলা গৌরহরি ।
লোক দেখি' পথে কহে,—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে গৌরহরি পথ চলতে লাগলেন, পথে কাউকে দেখলেই বলেন, 'হরি' 'হরি' বল!

শ্লোক ৯৮

সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ' ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই লোক তখন প্রেমোন্মত্ত হয়ে 'হরি' 'কৃষ্ণ' বলতে লাগলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য আকুল হয়ে তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৯

কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া ।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করে তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে তাকে ঘরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* বিশ্লেষণ করেছেন—"হ্লাদিনী শক্তির সারভাগ ও সম্বিৎ শক্তির সারভাগ,—দুই একত্রে 'ভক্তিশক্তি' হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করে সেই শক্তি যাকে সঞ্চার করেন, তিনি 'পরম ভক্ত' হন। মহাপ্রভু যাকে কৃপা করতেন, তার মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করে তাকে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের ভার অর্পণ করতেন।

শ্লোক ১০০

সেইজন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন ।
'কৃষ্ণ' বলি হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্যক্তি তখন তার গ্রামে ফিরে গিয়ে সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করে কখনও হাসতেন, কখনও কাঁদতেন এবং কখনও নৃত্য করতেন।

শ্লোক ১০১

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম ।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

যাকেই তারা দেখতেন, তাকেই তারা বলতেন,—"কৃষ্ণনাম কীর্তন কর।" এইভাবে তারা সকলে তাদের নিজেদের গ্রামের সমস্ত অধিবাসীদের বৈষ্ণবে পরিণত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে এবং তাঁর ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপার প্রভাবেই কেবল শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারক হওয়া যায়। সকলকেই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে অনুরোধ করা উচিত। এমনি করে, কিভাবে ভগবানের শুদ্ধভক্ত হতে হয় তা তাদের দেখিয়ে, তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করতে হয়।

শ্লোক ১০২

গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন ।
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রামান্তর থেকে যারা এই শক্ত্যাবিষ্ট প্রচারককে দর্শন করতে আসতেন, তারাও তাঁর দর্শনের কৃপায় তাঁরই মতো বৈষ্ণবে পরিণত হতেন।

শ্লোক ১০৩

সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয় ।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয় ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারা যখন তাদের গ্রামে ফিরে যেতেন, তখন তারা সেই গ্রামের অধিবাসীদের ভগবদ্ভক্ত-বৈষ্ণবে পরিণত করতেন। আর অন্য গ্রামের লোকেরা যখন তাদের দেখতে আসতেন, তখন তারাও বৈষ্ণবে পরিণত হতেন।

শ্লোক ১০৪

সেই যাই' আর গ্রামে করে উপদেশ ।
এইমত 'বৈষ্ণব' হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে যখন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণকথা উপদেশ করতে লাগলেন, তখন সমস্ত দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা বৈষ্ণবে পরিণত হলেন।

শ্লোক ১০৫

এইমত পথে যাইতে শত শত জন ।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পথে যেতে যেতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শত শত মানুষকে আলিঙ্গন করে বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন।

শ্লোক ১০৬

যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে ।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

যেই গ্রামে মহাপ্রভু ভিক্ষা করার জন্য থামতেন, সেই গ্রামের সমস্ত লোক তাঁকে দর্শন করতে আসতেন।

শ্লোক ১০৭

প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত ।
সেই সব আচার্য হঞা তারিল জগৎ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারা সকলে মহাভাগবতে পরিণত হলেন। পরে তারা সকলে আচার্য হয়ে সমস্ত জগৎ উদ্ধার করলেন।

শ্লোক ১০৮

এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে ।
সর্বদেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্যন্ত গেলেন এবং তাঁর প্রভাবে সমগ্র দক্ষিণ-দেশ বৈষ্ণবে পরিণত হল।

শ্লোক ১০৯

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে ।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

যে শক্তি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে প্রকাশ করেন নি, সেই শক্তি প্রকাশ করে তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত উদ্ধার করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপ ধাম হলেও তখন *ন্যায়* ও *স্মৃতি-শাস্ত্রের* বিশেষ প্রবলতা থাকায়, সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকগুলি বহির্মুখ লোক ছিল, তাদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেননি; তাই গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে যে শক্তি প্রকাশ করেছিলেন, নবদ্বীপে তিনি তা করেননি। তাই দক্ষিণ-ভারতে সকলে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। এর থেকে বুঝতে হবে যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনুকূল পরিবেশে প্রচার করতে উৎসাহী। যাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে তারা যদি আগ্রহী না হয়, তা হলে প্রচারক তাদের কাছে ভগবানের কথা প্রচার না-ও করতে পারেন। অনুকূল পরিবেশে প্রচার করতে যাওয়াই শ্রেয়। প্রথমে

ভারতবর্ষে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা রাজনৈতিক চিন্তায় মগ্ন থাকায়, তা গ্রহণ করেনি। তারা রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই আমরা আমাদের গুরুমহারাজের নির্দেশ অনুসারে, পাশ্চাত্যে গিয়েছি এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে এই আন্দোলন সফল হয়েছে।

শ্লোক ১১০

প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয় ।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি' লয় ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যিনি ভজনা করেন, তার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হয় এবং তিনি মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলাকে সত্য বলে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১১১

অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস ।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলায় যার বিশ্বাস হয় না, তার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ১১২

প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন ।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ-ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে আমি মহাপ্রভুর প্রারম্ভিক দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের যে বর্ণনা করলাম, সেভাবেই তিনি সারা দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১১৩

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্মস্থানে ।
কূর্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কূর্মস্থানে উপস্থিত হলেন, এবং সেখানে কূর্মদেবের বিগ্রহ দর্শন করে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন ও তাঁর স্তব করলেন।

তাৎপর্য

'কূর্মস্থান' একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে কূর্মদেবের মন্দির রয়েছে। *প্রপন্নামৃত* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একরাত্রে জগন্নাথদেব রামানুজাচার্যকে জগন্নাথপুরী থেকে কূর্মতীর্থে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। এই কূর্মক্ষেত্র দক্ষিণ রেলওয়ে লাইনে অবস্থিত। ট্রেনে করে চিকাকোল রোড স্টেশনে যেতে হয়। সেখান থেকে আট মাইল পূর্বে এই পবিত্র তীর্থস্থান 'কূর্মাচল' নামে পরিচিত। তেলেগু-ভাষীদের কাছে এই কূর্মক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই বিবৃতিটি *গঞ্জাম ম্যানুয়েল* নামক সরকারী গেজেটে পাওয়া যায়। জগন্নাথদেব যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র থেকে রামানুজাচার্যকে কূর্মক্ষেত্রে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, তখন রামানুজাচার্য কূর্মদেব বিগ্রহকে শিব বিগ্রহ বলে মনে করেন, এবং তাই তিনি সেখানে উপবাস করতে থাকেন। পরে তিনি যখন বুঝতে পারেন যে, সেটি শ্রীবিষ্ণুরই কূর্মমূর্তি, তখন তিনি সেখানে অতি আড়ম্বরের সঙ্গে কূর্মদেবের পূজার ব্যবস্থা করেন। এই বর্ণনাটি *প্রপন্নামৃত* গ্রন্থের ছত্রিশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। কূর্মক্ষেত্র বা কূর্মস্থপ নামক এই পবিত্র স্থানটি শ্রীপাদ রামানুজাচার্য জগন্নাথদেবের প্রভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই মন্দিরটি বিজয় নগরের রাজার তত্ত্বাবধানে আসে। তখন মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা শ্রীকূর্মদেবের বিগ্রহ পূজা করতেন। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের রচিত নয়টি শ্লোকের প্রস্তরফলক এই মন্দিরে পাওয়া গেছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই নয়টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেছেন—১) শ্রীপুরুষোত্তম জ্যোতি বহু বিজ্ঞের উপদেষ্টারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। ২) তাঁর বাক্যাবলী জগতে সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছিল। কুঞ্জের মত্ত হস্তী যেমন বিপক্ষকে ধ্বংস করে, তেমনই তিনি অভক্ত বিবাদীদের যুক্তি সমূহ পরাভূত করেছিলেন। ৩) তিনি আনন্দতীর্থকে দীক্ষাদান করেন এবং বহু বিপথগামী মূর্খকে নিজ গৃহীত সন্ন্যাস দণ্ড দ্বারা সুপথে আনয়ন করেন। ৪) তাঁর কথামালা বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠ সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ। ৫) তাঁর ভক্তি শিক্ষা সমূহ মানুষকে হরিপাদপদ্মদানে সক্ষম। ৬) নরহরিতীর্থ তাঁরই কাছে দীক্ষিত হন, এবং কলিঙ্গ প্রদেশের রাজা হন। ৭) নরহরিতীর্থ শবরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শ্রীকূর্ম মন্দির রক্ষা করেছিলেন। ৮) নরহরিতীর্থের অসীম সাহস ছিল। ৯) শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্মাণপূর্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে স্বানন্দে উৎসর্গীকৃত হল। (অধ্যাপক কিলহর্ণের মতে সেই শিলালিপিটির তারিখ ১২৮১ সেপ্টেম্বর ১৯শে মার্চ, শনিবার)।

শ্লোক ১১৪

প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' নৃত্য-গীত কৈল ।
দেখি' সর্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে হেসে, কেঁদে, নৃত্য-গীত করেছিলেন, এবং তা দেখে সমস্ত মানুষ অন্তরে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৫

আশ্চর্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈলা চমৎকারে ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা শুনে লোকেরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, এবং তাঁর রূপ ও কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করে তারা চমৎকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৬

দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্ধ্ববাহু করি' ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে সকলে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হলেন, এবং তারা 'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম কীর্তন করতে করতে প্রেমাবেশে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৭

কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম ।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

নিরন্তর লোক মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে সেই সমস্ত লোকেরা অন্য সমস্ত গ্রামের মানুষদেরও কৃষ্ণভক্তে পরিণত করলেন।

শ্লোক ১১৮

এইমত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল ।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পরম্পরাক্রমে সারা দেশ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হল; যেন কৃষ্ণনামামৃতের বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেল।

শ্লোক ১১৯

কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা ।
কূর্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর বাহ্য চেতনা প্রকাশ করলেন, তখন কূর্মদেবের পূজারী তাঁকে বহু সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ১২০

যেই গ্রামে যায় তাহাঁ এই ব্যবহার ।
এক ঠাঞি কহিল, না কহিব আর বার ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে গ্রামেই যেতেন, সেই গ্রামেই তিনি এইভাবে আচরণ করতেন এবং সেখানকার মানুষেরা তাঁর প্রতি এইভাবে ব্যবহার করতেন। একবার আমি তা বর্ণনা করলাম, বার বার আর তার পুনরাবৃত্তি করব না।

শ্লোক ১২১

'কূর্ম' নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গ্রামে 'কূর্ম' নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বহু শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ১২২

ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন ।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘরে এনে সেই ব্রাহ্মণ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করলেন, এবং তার পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে সেই পাদোদক পান করলেন।

শ্লোক ১২৩

অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল ।
গোসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর স্নেহে সেই কূর্মবিপ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য খাওয়ালেন, এবং তারপর তার পরিবারের সকলের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ পেলেন।

শ্লোক ১২৪

'যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করে সেই ব্রাহ্মণ বললেন—"হে প্রভু, তোমার শ্রীপাদপদ্ম ব্রহ্মা নিরন্তর ধ্যান করেন, আর সেই পাদপদ্ম আজ সাক্ষাৎ আমার ঘরে এল।

শ্লোক ১২৫

মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন ।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আমার অসীম সৌভাগ্যের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আজ আমার জন্ম, আমার কুল, আমার ধন-সম্পদ সবই ধন্য হল।"

শ্লোক ১২৬

কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাঙ তোমা-সঙ্গে ।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে ॥' ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "হে প্রভু, দয়া করে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। এই জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার তরঙ্গ আমি সহ্য করতে পারছি না।"

তাৎপর্য

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই উক্তিটি সকলের বেলায় প্রযোজ্য। সেই সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—"সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে"। সংসাররূপ বিষের প্রভাবে হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হয়, এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ধন-সম্পদ থাকার ফলে জড়-জাগতিক সুখ লাভ হয় ঠিকই এবং ঐশ্বর্যও লাভ করা যায় ঠিকই, কিন্তু তবুও পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ এবং দেহের চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য বিষয় সামলাতে হয়। তার ফলে নানারকম অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন"। বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে হৃদয় নির্মল না হলে অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন হওয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন 'কূর্ম' নামক সেই ব্রাহ্মণটি জড়-জাগতিক দিক দিয়ে বেশ সুখী ছিলেন, কেননা তিনি উল্লেখ করেছেন 'জন্ম-কুল-ধন', অর্থাৎ তার উচ্চকুলে জন্ম হয়েছিল এবং তিনি ধনী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই জড় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে ভগবানের সেবায় বাকী জীবন উৎসর্গ করার জন্য বৃন্দাবনের বনে যেতে হয়।

শ্লোক ১২৭

প্রভু কহে, ঐছে বাত্ কভু না কহিবা ।
গৃহে রহি' কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "এইরকম কথা আর কখনও বলো না। গৃহে থেকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর।

তাৎপর্য

কলিযুগে হঠাৎ গৃহত্যাগ না করাই বাঞ্ছনীয়, কেন না এই যুগের মানুষেরা যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য এবং গার্হস্থ্য আশ্রম পালন করার শিক্ষা লাভ করেনি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়েছিলেন, গৃহত্যাগ করার জন্য এত আগ্রহী না হতে। গৃহে থেকেই, সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে, নিয়মিতভাবে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করার প্রভাবে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। এই পন্থা যদি সকলে অনুসরণ করেন, তাহলে আর সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকে না। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, নিরপরাধে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে এবং সেই পন্থা সকলকে শিক্ষা দিয়ে আদর্শ গৃহস্থ হওয়ার জন্য।

শ্লোক ১২৮

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর। আমার আজ্ঞায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে তুমি এই দেশ উদ্ধার কর।

তাৎপর্য

এটিই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের পরম মহিমান্বিত উদ্দেশ্য। অনেকেই এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের এই সংস্থায় যোগ দিতে হলে তাদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করতে হবে কিনা। না, তা ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। গৃহে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুসরণ করা যায়। আমরা সকলকে কেবল অনুরোধ করি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—**'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'** জপ করতে। কেউ যদি শিক্ষিত হয় এবং *ভগবদ্গীতা যথাযথ* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে পারে তাহলে তো আরও ভাল। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী এখন

ইংরেজী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে, এবং তাতে সমস্ত স্তরের মানুষের বোধগম্য অত্যন্ত প্রামাণিক তাৎপর্য প্রদান করা হয়েছে। জড় বিষয়ে আসক্ত না থেকে এই আন্দোলনের মহতী সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। পরিবার পরিজনদের সঙ্গে গৃহে থেকেও কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার মাধ্যমে এই সুযোগ গ্রহণ করা যায়। তবে সেই সঙ্গে আমিষ আহার, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ, নেশা এবং জুয়াখেলা, এই চারটি পাপকর্ম থেকে বিরত হতে হয়। এই চারটির মধ্যে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অত্যন্ত জঘন্য পাপ। বিবাহ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। বিশেষ করে প্রতিটি মেয়ের বিবাহ হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের সংখ্যা যদি পুরুষদের থেকে অধিক হয়, তাহলে পুরুষেরা একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করতে পারে। তাহলে সমাজে আর পতিতাবৃত্তি থাকবে না। পুরুষেরা যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তাহলে অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ থাকবে না। ফল, মূল, শাক, সব্জী, অন্ন এবং দুধ দিয়ে নানারকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। তাহলে অনর্থক পশুহত্যা করে তাদের মাংস খাওয়ার কি প্রয়োজন? সিগারেট, মদ, চা, কফি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য গ্রহণ করার কি প্রয়োজন? মানুষতো এমনিতেই জড়-ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের নেশায় মত্ত; আবার তারা যদি আরও নেশা করে, তাহলে আত্মজ্ঞান লাভের কি আর কোন সম্ভাবনা থাকবে? তেমনই, জুয়া, পাশা ইত্যাদি অবৈধ ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে অনর্থক মনকে বিচলিত করা কি প্রয়োজন? মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির সারমর্ম। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই চেষ্টা করছে, কূর্মবিপ্রকে দেওয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে মানব সমাজকে যথার্থ উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করাতে। সেটিই হচ্ছে গৃহে থেকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা এবং *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করা।

শ্লোক ১২৯

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥" ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাহলে, ভবসমুদ্রের বিষয়-তরঙ্গ কখনও তোমাকে পারমার্থিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। পুনরায় তুমি এই স্থানে আমার সঙ্গ লাভ করবে।"

তাৎপর্য

এই সুযোগ সকলেরই জন্য। কেউ যদি কেবল সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করেন, এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে সকলকে যথাসাধ্য এই পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন, তাহলে এই জড় জগতের কলুষ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। কেউ বৃন্দাবন, নবদ্বীপ অথবা জগন্নাথপুরীর মতো পবিত্র স্থানে বাস করুক অথবা জড় জগতের প্রভাবে পঙ্কিল ইউরোপ বা আমেরিকার শহরে বাস করুক; তাতে কিছু যায় আসে না। ভক্ত যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করবেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সেই স্থানটিকে তিনি বৃন্দাবন বা নবদ্বীপে রূপান্তরিত করবেন। অর্থাৎ, জড় জগতের প্রভাব তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি লাভ করার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৩০

এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা ।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে, যার ঘরে মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করতেন, তিনি ঐভাবে তাঁর সঙ্গে যেতে চাইতেন, এবং মহাপ্রভু তাকে তখন এই শিক্ষাই দান করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থা এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যিনি সর্বান্তকরণে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তাকে তার স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না, অথবা তার অবস্থারও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তাকে কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করতে হয়, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশ শিক্ষা দিতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, ঘরে থেকেই বিনয় এবং নম্রতা শিক্ষা লাভ করতে হয়, এবং তার ফলে তার জীবন পারমার্থিক সাফল্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজেকে একজন মহাভাগবত বলে মনে করে কৃত্রিমভাবে উত্তম ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই ধরনের মনোভাব সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কোন শিষ্য গ্রহণ না করা সবচাইতে ভাল। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পন্থা শিক্ষাদান করে গৃহে থেকেই পবিত্র হওয়া যায়। এইভাবে গুরু হওয়া যায় এবং জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও রঘুনাথ দাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাত্মাদের গ্রন্থ লিখে উপদেশ প্রদান এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল মধ্বাচার্য, শ্রীল রামানুজাচার্য প্রমুখ আচার্যদের বহু শিষ্য করাকে ভক্তির বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলে কল্পনা করে অনেক নির্বোধ সহজিয়া প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তদের চরণে অপরাধী হন। তারা যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ ভালভাবে আলোচনা করেন এবং কপট দৈন্য ও বিনয় না দেখিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তদের চরণে অপরাধ করা থেকে বিরত হন। তাঁর বাণীর প্রচারকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই উপদেশগুলি দিয়ে গেছেন।

শ্লোক ১৩১-১৩২

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে ।
যাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥ ১৩১ ॥
কূর্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব ঠাঞি ।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গ্রামের দেবালয়ে রাত্রি যাপন করতেন। যার ঘরে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করতেন, এবং কূর্মবিপ্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই মহাজনকে সেই উপদেশই দিতেন। দক্ষিণ-দেশ থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি সর্বত্র এই একই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ১৩৩

অতএব ইহাঁ কহিলাঙ করিয়া বিস্তার ।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি সবিস্তারে কূর্ম বিপ্রের কাহিনী বর্ণনা করলাম, কেননা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে সর্বত্র এভাবেই আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৪

এইমত সেই রাত্রি তাহাঁই রহিলা ।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সেই রাত্রি সেইখানে থেকে, পরের দিন সকালবেলা স্নান করে মহাপ্রভু আবার যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৩৫

প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম বহু দূর আইলা ।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন যাত্রা করলেন, তখন কূর্মবিপ্র বহুদূর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অবশেষে মহাপ্রভু বহু যত্ন করে তাকে ঘরে পাঠালেন।

শ্লোক ১৩৬

'বাসুদেব'-নাম এক দ্বিজ মহাশয় ।
সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব নামক একজন মহান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়েছিল এবং তার ক্ষতগুলি কৃমি কীটে পূর্ণ ছিল।

শ্লোক ১৩৭

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

কুষ্ঠরোগের প্রবল যন্ত্রণা ভোগ করলেও বাসুদেব বিপ্র ছিলেন তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষ। যখনই তার অঙ্গ থেকে কোন কীড়া (পোকা) খসে পড়ত, তখনই তিনি সেই কীড়াটিকে উঠিয়ে সেই স্থানে রাখতেন।

শ্লোক ১৩৮

রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন ।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্মের ভবন ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রিবেলা বাসুদেব সংবাদ পেলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন। তাই তার পরের দিন প্রভাতে তাঁকে দেখার জন্য তিনি কূর্ম বিপ্রের গৃহে এলেন।

শ্লোক ১৩৯

প্রভুর গমন কূর্ম-মুখেতে শুনিঞা ।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্ছিত হঞা ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

কূর্ম বিপ্রের গৃহে এসে তিনি শুনলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইতিমধ্যেই প্রস্থান করেছেন। বাসুদেব তখন দুঃখে মূর্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন।

শ্লোক ১৪০

অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

নানাভাবে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৪১

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর স্পর্শে তার অন্তরের দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে দেহের কুষ্ঠও দূর হল এবং তার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গও সুন্দর হল।

শ্লোক ১৪২

প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন ।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি, করয়ে স্তবন ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত কৃপা দর্শন করে বাসুদেব বিপ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমল স্পর্শ করে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করলেন।

শ্লোক ১৪৩

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

ক্ব—কোথায়; অহম্—আমি; দরিদ্রঃ—অত্যন্ত গরীব; পাপীয়ান্—পাপী; ক্ব—কোথায়; কৃষ্ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান; শ্রী-নিকেতনঃ—লক্ষ্মীর আশ্রয়; ব্রহ্মবন্ধুঃ—ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীরহিত জাতিব্রাহ্মণ; ইতি—এইভাবে; স্ম—অবশ্যই; অহম্—আমি; বাহুভ্যাম্—বাহুযুগলের দ্বারা; পরিরম্ভিতঃ—আলিঙ্গিত।

অনুবাদ

"কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র ও যোগ্যতাহীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ; অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান হলেও আমাকে তিনি আলিঙ্গন করলেন—এটি অতি আশ্চর্যের বিষয়।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি (১০/৮১/১৬) দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সুদামা বিপ্রের উক্তি।

শ্লোক ১৪৪-১৪৫

বহু স্তুতি করি' কহে,—শুন, দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥ ১৪৪ ॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর ।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি,—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব বিপ্র বললেন—"হে দয়াময়, জীবের এই গুণ থাকা সম্ভব নয়। এই গুণ কেবল তোমার মধ্যেই দেখা যায়। আমাকে দেখে আমার শরীরের দুর্গন্ধে অত্যন্ত পাপী মানুষেরা পর্যন্ত পালিয়ে যায়। আর তুমি আমাকে স্পর্শ করলে! এমনই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ।"

শ্লোক ১৪৬

কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা ।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমি যখন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অধম ছিলাম তখনই ভাল ছিলাম, কিন্তু এখন রোগমুক্ত সুন্দর শরীর পেয়েছি বলে আমার অহঙ্কার হবে।"

শ্লোক ১৪৭

প্রভু কহে,—"কভু তোমার না হবে অভিমান ।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন—"তুমি নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' কর, তাহলে তোমার কোন অভিমান হবে না।

শ্লোক ১৪৮

কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥" ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

জীবকে কৃষ্ণকথা উপদেশ দিয়ে তুমি তাদের উদ্ধার কর, তাহলে অচিরেই কৃষ্ণ তোমাকে অঙ্গীকার করবেন।"

তাৎপর্য

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বাসুদেব বিপ্রকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রোগমুক্ত করেছিলেন। তার বিনিময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল চেয়েছিলেন যে, বাসুদেব বিপ্র যেন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রচার করে সমস্ত জীবদের উদ্ধার করেন। এইটিই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের পন্থা। এই সংস্থার প্রতিটি সদস্যকে অত্যন্ত জঘন্য অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখন তারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করছে। তারা কেবল ভবরোগ নামক ভয়ঙ্কর রোগ থেকেই মুক্ত হয়নি, উপরন্তু তারা এক অতি আনন্দময় জীবন-যাপন করছে। সকলেই তাদের মহান কৃষ্ণভক্ত বলে স্বীকার করেন এবং তাদের গুণাবলী তাদের মুখের কমনীয়তায় প্রকাশিত হয়েছে। কেউ যদি কৃষ্ণভক্তরূপে পরিচিত হতে চান, তাহলে তাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে কৃষ্ণকথা প্রচার করতে হবে। তাহলে নিঃসন্দেহে অতি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা যাবে।

শ্লোক ১৪৯

এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধানে ।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব বিপ্রকে এইভাবে উপদেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হলেন। তখন দুই বিপ্র—কূর্ম ও বাসুদেব পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত গুণাবলী স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫০

'বাসুদেবোদ্ধার' এই কহিল আখ্যান ।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর নাম হল 'বাসুদেবামৃতপ্রদ'।

শ্লোক ১৫১

এই ত' কহিল প্রভুর প্রথম গমন ।
কূর্ম-দরশন, বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

কিভাবে তিনি কূর্ম-দর্শন করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার করেছিলেন—এ সকল কথা বলে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণের বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ১৫২

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করেন, অচিরেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করবেন।

শ্লোক ১৫৩

চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি ।
সেই লিখি, যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যলীলার আদি এবং অন্ত আমি জানি না, কেবল মহান্তদের মুখে আমি যা শুনেছি তাই লিখছি।

তাৎপর্য

কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে তার চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তখন তার পারমার্থিক জীবনের উন্মেষ হয় এবং তিনি তখন ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন। তখনই কেবল তিনি আচার্যরূপে আচরণ করতে পারেন। অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেরই ভগবানের বাণী প্রচার করা উচিত। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি প্রীত হবেন এবং অচিরেই তিনি তাকে সুকৃতি দান করবেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বাণী প্রচার করে ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকৃত বৈদিক-জ্ঞান প্রচারের ফলে সমগ্র মানব সমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

শ্লোক ১৫৪

ইথে অপরাধ মোর না লইও, ভক্তগণ ।
তোমা-সবার চরণ—মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

হে ভক্তগণ, এইজন্য তোমরা আমার অপরাধ নিও না। তোমাদের সকলের শ্রীপাদপদ্ম আমার একমাত্র আশ্রয়।

শ্লোক ১৫৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—*'বাসুদেব বিপ্র উদ্ধার এবং মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের কথোপকথন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে* অষ্টম পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেছেন।

মহাপ্রভু জিয়ড়-নৃসিংহ দর্শন করে গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে স্নান করার জন্য আগত রায়-রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পরিচয় হওয়ার পর রামানন্দ তাঁকে সেই গ্রামে কয়েকদিন থাকতে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধে কোন বৈদিক-ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি অবস্থান করলেন। সন্ধ্যাবেলা রামানন্দ রায় দীনবেশে মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবৎ প্রণাম করলে, মহাপ্রভু তাঁকে সাধ্য-নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়তে আজ্ঞা দিলেন।

রামানন্দ রায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্মরূপ সজ্জন সামান্য ধর্মের উল্লেখ করে 'কর্মার্পণ', পরে 'আসক্তিশূন্য কর্ম' পরে 'জ্ঞানমিশ্রাভক্তি' ও অবশেষে 'জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি' সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক পাঠ করলে মহাপ্রভু শেষটিকে 'সাধ্যবস্তু' বলে স্বীকার করলেন। আবার, ভক্তি সম্বন্ধে (প্রভু রায়কে) উচ্চ অধিকার বর্ণনা করতে বললে, রায় প্রথমে 'শুদ্ধকৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি' পরে 'দাস্য প্রেম', পরে 'সখ্যপ্রেম', পরে 'বাৎসল্যপ্রেম' এবং (অবশেষে) 'কান্তভাগবত প্রেম'কে 'সাধ্যসার' বলে বর্ণনা করলেন। কান্তপ্রেম কিভাবে সাধ্যসার হয়, তা-ও বিবিধরূপে বর্ণনা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেটিকে সাধ্যাবধি স্বীকার করলে রায় রামানন্দ শ্রীমতী রাধিকার প্রেম বর্ণনা করলেন। পরে তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধারাণীর স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণনা করলেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, রামানন্দ রায় প্রেমবিলাস বিবর্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়ভাবময়, তাঁর নিজের রচিত একটি গীত বললেন। অবশেষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ পরম সাধ্যবস্তু পাওয়ার উপায়স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য বিশেষভাবে বর্ণিত হল। কয়েকদিন প্রতি রাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর, মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্ব-স্বরূপ দেখতে পেয়ে রামানন্দ মূর্ছিত হলেন। কয়েকদিন পর রামানন্দকে রাজকার্য পরিত্যাগ করে পুরুষোত্তমে যেতে আদেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করলেন। এই সমস্ত বিবরণ শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন।

শ্লোক ১

সঞ্চার্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥ ১ ॥

সঞ্চার্য—সঞ্চারিত করে; রামা-অভিধ—রাম নামক; ভক্তমেঘে—সিদ্ধান্তরূপ অমৃত বর্ষণকারী মেঘ সদৃশ ভক্ত রায় রামানন্দ; স্ব-ভক্তি—তাঁর নিজ ভক্তি; সিদ্ধান্ত—সিদ্ধান্ত; চয়—সমূহ; অমৃতানি—অমৃত; গৌরাব্ধিঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ সিদ্ধান্ত অমৃতের সমুদ্র; এতৈঃ—এদের দ্বারা; অমুনা—রামানন্দ রায় রূপ মেঘের দ্বারা; বিতীর্ণৈঃ—বর্ষণ; তজ্‌জ্ঞত্ব—ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান; রত্ন-আলয়তাম্—অমূল্য রত্ন সমন্বিত সমুদ্রের মতো; প্রযাতি—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

সিদ্ধান্তরূপ অমৃত-সমুদ্রের মতো শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ নামক ভক্ত মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তের অমৃত সঞ্চার করে তার দ্বারা বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত কর্তৃক পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা লাভ করলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

পূর্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা ।
'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বরীতি অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এগিয়ে চললেন এবং কিছুদিন পরে তিনি 'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

বিশাখাপত্তনের পাঁচ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর এই জিয়ড়-নৃসিংহমন্দির। সেখানে সিংহাচল-নামক একটি রেল স্টেশন আছে। বিশাখাপত্তনের মধ্যে এই মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিরাজমান। একটি প্রস্তর-ফলকে দেখা যায় যে, একজন ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করে দেন। বিশাখাপত্তন গেজেটারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দিরের কাছে শ্রীনৃসিংহদেবের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য অধিবাসীরা বাস করেন। এখন শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন অনেক যাত্রীর থাকবার স্থান ও অনেক গৃহ আছে। বিজয়বিগ্রহ আলোকময় স্থানে এবং মূল নৃসিংহ-বিগ্রহ অভ্যন্তরে বিরাজমান। কয়েকজন রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বিজয়নগর রাজার অধীনে শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন।

শ্লোক ৪

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎপ্রণতি ।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দিরে নৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। তারপর প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি বহু নৃত্য-গীত ও স্তুতি করলেন।

শ্লোক ৫

"শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥" ৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীনৃসিংহদেবের জয়! প্রহ্লাদ মহারাজের ঈশ্বর শ্রীনৃসিংহদেবের জয়, ভ্রমরের মতো তিনি নিরন্তর তাঁর বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর মুখপদ্ম দর্শন করেন।

তাৎপর্য

লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নৃসিংহদেবের বক্ষে বিরাজ করেন। সেকথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম-স্কন্ধের সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী তাঁর রচিত একটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
যস্যান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহং অহং ভজে ॥

"বাগ্‌দেবী সরস্বতী সর্বদা নৃসিংহদেবের সহযোগিতা করেন এবং লক্ষ্মীদেবী সর্বদা তাঁর বক্ষে বিরাজ করেন। তিনি সর্বদা সম্বিৎ শক্তিতে পূর্ণ। আমি সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে ভজনা করি।"

তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধর স্বামী নৃসিংহদেবের বর্ণনা করে বলেছেন—

প্রহ্লাদহৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্ ।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্ ॥

"প্রহ্লাদের হৃদয়ে আহ্লাদ প্রদানকারী, ভক্তদের অবিদ্যা নিবারণকারী, শ্রীনৃসিংহদেবকে আমি বন্দনা করি। তাঁর কৃপা শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো বিতরিত হয়। তাঁর মুখমণ্ডল সিংহের মতো, তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ৬

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

উগ্রঃ—ভয়ঙ্কর; অপি—যদিও; অনুগ্রঃ—অনুগ্র; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই; স্ব-ভক্তানাম্—তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের; নৃ-কেশরী—নর এবং সিংহরূপী; কেশরী-ইব—সিংহের মতো; স্ব-পোতানাম্—তার শাবকদের; অন্যেষাম্—অন্যদের কাছে; উগ্র—ভয়ঙ্কর; বিক্রমঃ—যার পরাক্রম।

অনুবাদ

"কেশরী যেমন উগ্রবিক্রম হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় সন্তানদের প্রতি শান্ত এবং কোমল, নৃসিংহদেবও তেমনই হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদের প্রতি উগ্র হলেও প্রহ্লাদ আদি ভক্তের প্রতি অনুগ্র (স্নেহপূর্ণ)।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* টীকায় (৭/৯/১) শ্রীধর স্বামীপাদ রচনা করেছেন।

শ্লোক ৭

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল ।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নানা শ্লোক পাঠ করে নৃসিংহদেবের বন্দনা করলেন, তখন নৃসিংহদেবের সেবক তাঁকে প্রসাদী মালা এনে দিলেন।

শ্লোক ৮

পূর্ববৎ কোন বিপ্রে কৈল নিমন্ত্রণ ।
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' করিলা গমন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

আগের মতোই কোন ব্রাহ্মণ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, এবং সেই রাত্র মন্দিরে থেকে পরের দিন সকালে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন।

শ্লোক ৯

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে ।
দিগ্ বিদিক্ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সকালে ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু চলতে শুরু করলেন। তাঁর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না এবং রাত্রি-দিবসও জ্ঞান ছিল না।

শ্লোক ১০

পূর্ববৎ 'বৈষ্ণব' করি' সর্ব লোকগণে ।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বের মতো সকলকে বৈষ্ণবে পরিণত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোদাবরী নদীর তীরে এলেন।

শ্লোক ১১

গোদাবরী দেখি' হইল 'যমুনা'-স্মরণ ।
তীরে বর্ণ দেখি' স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

গোদাবরী দর্শন করে তাঁর 'যমুনা'-স্মরণ হল এবং তীরে বন দেখে তাঁর বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ল।

শ্লোক ১২

সেই বনে কতক্ষণ করি' নৃত্যগান ।
গোদাবরী পার হঞা তাহাঁ কৈল স্নান ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বনে কিছুক্ষণ নৃত্যগীত করার পর তিনি গোদাবরী পার হয়ে নদীতে স্নান করলেন।

শ্লোক ১৩

ঘাট ছাড়ি' কতদূরে জল-সন্নিধানে ।
বসি' প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্নান করার পর ঘাট থেকে কিছু দূরে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪

হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায় ।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায় ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় বাদ্যযন্ত্র সহকারে দোলায় চড়ে স্নান করার জন্য রামানন্দ রায় সেখানে এলেন।

শ্লোক ১৫

তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সঙ্গে বহু বৈদিক-ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। বৈদিক-বিধি অনুসারে রামানন্দ রায় স্নান করলেন এবং তর্পণ করলেন।

শ্লোক ১৬

প্রভু তাঁরে দেখি' জানিল—এই রাম রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি' ধায় ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন যে এই ব্যক্তিই হচ্ছেন রামানন্দ রায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মহাপ্রভু এতই ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, তাঁর মন তার প্রতি ধাবিত হল।

শ্লোক ১৭

তথাপি ধৈর্য ধরি' প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন যদিও রামানন্দ রায়ের প্রতি ধাবিত হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধরে সেখানে বসে রইলেন। তখন সেই অপূর্ব দর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে রামানন্দ রায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

শ্লোক ১৮

সূর্যশত-সম কান্তি, অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমল-লোচন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রামানন্দ রায় দেখলেন—সে সন্ন্যাসীর অঙ্গকান্তি শতসূর্যের মতো উজ্জ্বল, পরণে তাঁর অরুণ বসন, তাঁর দেহ প্রকাণ্ড এবং সুবলিত, এবং তাঁর নয়নযুগল পদ্মফুলের মতো।

শ্লোক ১৯

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অপূর্ব সন্ন্যাসীকে দর্শন করে রামানন্দ রায় চমৎকৃত হলেন এবং ভূপতিত হয়ে তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ২০

উঠি' প্রভু কহে,—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন উঠে দাঁড়িয়ে রামানন্দ রায়কে বললেন, "ওঠ ওঠ, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলো"; এবং তাকে আলিঙ্গন করার জন্য মহাপ্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ হল।

শ্লোক ২১

তথাপি পুছিল,—তুমি রায় রামানন্দ?
তেঁহো কহে,—সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি রায় রামানন্দ?" তিনি তখন উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি আপনার অতি মন্দ শূদ্র সেবক।"

শ্লোক ২২

তবে তারে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন নিবিড়ভাবে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করলেন, এবং প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই প্রেমাবেশে অচেতন হলেন।

শ্লোক ২৩

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন উভয়েরই পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হল, এবং তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রামানন্দ রায় হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর সখী বিশাখাদেবীর অবতার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ। তাই বিশাখাদেবীর প্রতি রাধাকৃষ্ণের এবং রাধাকৃষ্ণের প্রতি বিশাখাদেবীর যে স্বাভাবিক প্রেম, তারই উদয় হল।

শ্লোক ২৪

স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য ।
দুঁহার মুখেতে শুনি' গদগদ 'কৃষ্ণ' বর্ণ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা যখন এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, তখন স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকার সমূহ দুজনের অঙ্গেই দেখা দিল; এবং দুজনেরই মুখে গদগদ স্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হতে লাগল।

শ্লোক ২৫

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার ।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তা দেখে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা চমৎকৃত হলেন এবং তাঁরা সকলে তখন বিচার করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৬

এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম ।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, "এই সন্ন্যাসীর তেজ ব্রহ্মজ্যোতির মতো, কিন্তু শূদ্রকে আলিঙ্গন করে কেন তিনি ক্রন্দন করছেন?"

শ্লোক ২৭

এই মহারাজ—মহাপণ্ডিত, গম্ভীর ।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আর এই মহারাজ রামানন্দ রায়, তিনি মহাপণ্ডিত এবং গম্ভীর, কিন্তু এই সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করে কেন তিনি এইভাবে উন্মত্ত এবং অস্থির হলেন।"

শ্লোক ২৮

এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন ।
বিজাতীয় লোক দেখি, প্রভু কৈল সম্বরণ ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের আচরণ দর্শন করে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন বিজাতীয় লোক দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভাব সংবরণ করলেন।

তাৎপর্য

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত ছিলেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে সজাতীয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণেরা ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুগামী, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তারা শুদ্ধভক্তও ছিলেন না। সুতরাং তারা বিজাতীয় অর্থাৎ অভক্ত। কেউ অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের শুদ্ধভক্ত না হন, তাহলে তিনি বিজাতীয়—অর্থাৎ, ভগবান তাদের আপনজন বলে গ্রহণ করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায় যদিও ভাবাবিষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করছিলেন, তবুও কিন্তু সেই বিজাতীয় ব্রাহ্মণদের দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অপ্রাকৃত ভাব সংবরণ করলেন।

শ্লোক ২৯

সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা ।
তবে হাসি' মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সুস্থ হয়ে তাঁরা দুজনে সেখানে বসলেন, এবং মৃদু হেসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন—

শ্লোক ৩০

'সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিল তোমার গুণে ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমাকে তোমার গুণের কথা বলেছেন এবং তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে বার বার অনুরোধ করেছেন।

শ্লোক ৩১

তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন ।
ভাল হৈল, অনায়াসে পাইলুঁ দরশন ॥' ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার সঙ্গ করার জন্যই আমি এখানে এসেছি। ভাল হল যে, অনায়াসে তোমার দর্শন পেলাম।"

শ্লোক ৩২

রায় কহে,—সার্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান ।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমাকে তাঁর অনুগত সেবক বলে মনে করেন। তাই আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি সচেতন।

শ্লোক ৩৩

তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন ।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কৃপায় আজ আমি আপনার দর্শন পেলাম। তাই আজ আমার মনুষ্য-জন্ম সফল হল।

শ্লোক ৩৪

সার্বভৌমে তোমার কৃপা,—তার এই চিহ্ন ।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যে আপনি কত কৃপা করেন এটি তারই চিহ্ন—তাঁর প্রেমাধীন হয়ে আজ আপনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করলেন।"

শ্লোক ৩৫

কাহাঁ তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ ।
কাহাঁ মুঞি—রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি পরমেশ্বর ভগবান—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর আমি রাজার সেবক শূদ্রেরও অধম, বিষয়ী।

শ্লোক ৩৬

মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয় ।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদে শূদ্রকে দর্শন ও স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ আপনি সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে বেদ-বিরুদ্ধ আচরণ করতে ভয় পেলেন না, এবং আমাকে স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করলেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণের মানুষেরা যদি আমার অনন্যভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তাহলে তারাও অবিলম্বে পরমগতি লাভ করে।"

পাপযোনয়ঃ মানে অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ। বৈশ্যরা হচ্ছেন ব্যবসায়ী এবং শূদ্রেরা চাকর। বৈদিক বর্ণবিভাগ অনুসারে তারা সমাজের নিম্ন স্তরে স্থিত। নিম্ন স্তরের জীবন মানে কৃষ্ণভক্তিবিহীন জীবন। বৈদিক সমাজে উচ্চ নীচ বর্ণবিভাগ হত কোন ব্যক্তির কৃষ্ণচেতনার মান অনুসারে। ব্রাহ্মণেরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কেননা তারা ব্রহ্ম বা পরম সত্যকে জানতেন। তারপরের বর্ণ ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মকে জানতেন, তবে ব্রাহ্মণদের মতো এত ভালভাবে নয়। বৈশ্য এবং শূদ্রদের স্পষ্টভাবে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা ছিল না, কিন্তু তারা যদি সদ্গুরুর কৃপায় এবং কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে আর তারা নিম্নবর্ণে থাকেন না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—*তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।*

জীবনের পরম স্তর প্রাপ্ত না হলে আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি না। কেউ শূদ্র হতে পারে, বৈশ্য হতে পারে, অথবা স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু তিনি যদি ভক্তিসহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাহলে আর তারা তাদের দেহের উপাধির দ্বারা প্রভাবিত থাকেন না। নিম্নকুলোদ্ভূত মানুষ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তাহলে আর তাকে নিম্নকুলোদ্ভূত বলে মনে করা উচিত নয়। *পদ্মপুরাণে* নিষেধ করা হয়েছে—*বীক্ষতে জাতি সামান্যাতি। স জাতি নরকং ধ্রুবম্*—"যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে তার জন্ম অনুসারে বিবেচনা করে সে অচিরেই নরকে গমন করে।" রামানন্দ রায় যদিও আপাতদৃষ্টিতে শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাকে শূদ্র বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তিনি হচ্ছেন একজন অতি উন্নত ভগবদ্ভক্ত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাই আলিঙ্গন করেছিলেন। অপ্রাকৃত বিনয়ের বশে রামানন্দ রায় নিজেকে শূদ্র (রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম) বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। কেউ রাজকার্যে লিপ্ত থাকতে পারেন অথবা ব্যবসা আদি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে পারেন—কিন্তু তাকে কিন্তু কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা অত্যন্ত সরল। কেবলমাত্র পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে। তার ফলে তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন। যারা পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের রাজকর্মচারী এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ মানুষদের সঙ্গ করা উচিত নয়। কেন না তাদের বলা হয় বিষয়ী। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে* (৮/২৭) বলা হয়েছে—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

"যারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী হয়ে নিষ্কিঞ্চনভাবে ভগবানের ভজনা করছেন, তাদের পক্ষে বিষয়ী অথবা স্ত্রীলোকদের মুখ দর্শন করা বিষ ভক্ষণ করার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর।"

শ্লোক ৩৭

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাই আপনার মর্ম কেউই বুঝতে পারে না। আপনার কৃপার প্রভাবে আপনি আমাকে স্পর্শ করেছেন, যদিও বেদে এই ধরনের কার্য অনুমোদিত হয়নি।

তাৎপর্য

জড় কার্যকলাপে আসক্ত বিষয়ীদের সঙ্গ করা সন্ন্যাসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অন্তহীন এবং অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কৃপা করতে পারেন।

শ্লোক ৩৮

আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন ।
পরম-দয়ালু তুমি পতিত-পাবন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে উদ্ধার করার জন্য আপনি এখানে এসেছেন। আপনি পরম দয়ালু এবং পতিতপাবন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর তাঁর প্রার্থনায় গেয়েছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার ।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥

"হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে কৃপা করুন। এই জগৎ-সংসারে আপনার থেকে দয়ালু আর কে আছে? পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য আপনি অবতরণ করেছেন, কিন্তু আমার মতো পতিত আর কাউকে কোথাও পাবেন না।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা। এই যুগে হয়তো এমন কেউ নেই যিনি বৈদিক বিচারে অধঃপতিত নন। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তথাকথিত বৈদিক-ধর্ম অনুশীলনকারীদের বর্ণনা করে বলেছেন—

বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ 'মুখে' মানে ।
বেদনিষিদ্ধ-পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৪৬*)

"তথাকথিত বেদের নির্দেশের অনুগামীরা কেবল বেদ মুখে মানে, কিন্তু তাদের আচার-আচরণ বেদ-বিরুদ্ধ।" এইটিই হচ্ছে কলিযুগের লক্ষণ। মানুষেরা দাবী করে যে, তারা বিশেষ বিশেষ ধর্ম অনুশীলন করছে, এবং মুখে তারা বলে, "আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি এটা অথবা আমি ওটা।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-শাস্ত্রে যে সমস্ত নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলি তারা মানে না। এটিই হচ্ছে এই যুগের রোগ। কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন—*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।* ভগবান যাকে ইচ্ছা তাকেই উদ্ধার করতে পারেন, তা তিনি যদি বিধি-নিষেধ ভঙ্গকারী অত্যন্ত অধঃপতিতও হন তবুও এইটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা। তাই তাঁর নাম পতিতপাবন।

শ্লোক ৩৯

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর ।
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"মহান্তের স্বভাবই হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করা। তাই তাঁদের নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা মানুষদের বাড়ীতে যান।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়। তিনি তার উদর-পূর্তির জন্য ভিক্ষা করেন না। তাঁর ভিক্ষা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থদের কৃষ্ণভক্তি প্রদান করা। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত যে সন্ন্যাসী, তিনি কেন এইভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। তা কি কেবল ভিক্ষা করার জন্য? ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় রাজা-মহারাজারা পর্যন্ত তাঁদের রাজ্য, সিংহাসন, পরিত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন রাজমন্ত্রী, কিন্তু তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য স্বেচ্ছায় ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ ।
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ॥

যদিও তাঁরা ছিলেন রাজার মতো সম্ভ্রান্ত, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে অধঃপতিত মানুষদের কৃপা করার জন্য তাঁরা কৌপীন ও কন্থা আশ্রয় করেছিলেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করেন, বুঝতে হবে যে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রিত-জন এবং তাঁরই দ্বারা পরিচালিত। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুক নয়; তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা। তাই তাঁরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণভক্তি-গ্রন্থ বিতরণ করতে পারেন, যাতে সেগুলি পাঠ করে আপামর জনসাধারণ যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে পারেন। পূর্বে সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতেন। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, কেউ ভিক্ষা করলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ভিক্ষা করা অপরাধ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের ভিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক গ্রন্থাবলী দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, যাতে সেগুলি পাঠ করে মানুষ লাভবান হতে পারে। তবে সেজন্য কেউ যদি তাদের কিছু দান করে, তা তারা প্রত্যাখ্যান করে না।

শ্লোক ৪০

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥

মহৎ-বিচলনম্—মহাত্মাদের স্থানে স্থানে গমন; নৃণাম্—মানুষদের; গৃহিণাম্—গৃহস্থদের; দীন-চেতসাম্—হীন চেতনা সম্পন্ন; নিঃশ্রেয়সায়—পরম মঙ্গল সাধনের জন্য; ভগবন্—হে প্রভু; ন অন্যথা—অন্য কোন উদ্দেশ্য; কল্পতে—কল্পনা করা; ক্বচিৎ—কখনও।

অনুবাদ

"হে প্রভু! হীনচেতনা-সম্পন্ন গৃহী লোকদের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহৎ ব্যক্তিরা তাদের গৃহে গিয়ে থাকেন। অন্য কোন কারণে তারা গমন করেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮/৪) মহর্ষি গর্গের প্রতি নন্দমহারাজের উক্তি।

শ্লোক ৪১

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন ।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণসহ প্রায় এক হাজার লোক রয়েছে—এবং আপনাকে দর্শন করে তাদের সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম শুনি সবার বদনে ।
সবার অঙ্গ—পুলকিত, অশ্রু—নয়নে ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সকলেরই মুখে আমি 'কৃষ্ণ' নাম শুনছি। তাদের সকলেরই অঙ্গ পুলকিত এবং তাদের সকলেরই নয়নে অশ্রু।

শ্লোক ৪৩

আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণের সমাবেশ জীবের মধ্যে কখনও সম্ভব নয়।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহের আকৃতি ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর নিজ বাহু-পরিমিত চার হাত দীর্ঘ ও চার হাত বিস্তৃত ছিলেন। এই লক্ষণটিকে বলা হয় 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' তাঁর প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন সকলের প্রতি পরম দয়াপরবশ। পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য কেউ সকলের প্রতি পরম দয়ালু হতে পারেন না। তাই ভগবানের নাম কৃষ্ণ—সর্বাকর্ষক। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি দয়াময়, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের বীজপ্রদ পিতা। তাহলে তিনি কারোর প্রতি নির্দয় হবেন কি করে? মানুষ, পশু, পক্ষী এমন কি গাছপালার প্রতিও ভগবান কৃপা-পরায়ণ। এইটিই হচ্ছে ভগবানের গুণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯), তিনি আরও বলেছেন—*সমোঽহং সর্বভূতেষু*—"সমস্ত জীবের প্রতি তিনি সমভাবে কৃপা-পরায়ণ এবং তিনি উপদেশ দিয়েছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। তাঁর এই উপদেশ কেবল অর্জুনের জন্য নয়, সমস্ত জীবের জন্য। যিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। এই জগতে লীলা-বিলাসকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

শ্লোক ৪৪

প্রভু কহে,—তুমি মহা-ভাগবতোত্তম ।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে বললেন—"তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাভাগবত, তাই তোমাকে দর্শন করে সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে।

তাৎপর্য

মহাভাগবত না হলে প্রচারক হওয়া যায় না। ভগবানের বাণীর প্রচারক হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, কিন্তু জনসাধারণের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য তাকে ভক্ত এবং

অভক্তের পার্থক্য বিচার করতে হয়। উত্তম অধিকারী সকলের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। তার কাছে সকলেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। কিন্তু ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য তাকে ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য বিচার করতে হয় এবং দেখতে হয় যে, কে ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং কে যুক্ত নয়। প্রচারককে তখন ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে অজ্ঞ নিরীহ মানুষদের প্রতি কৃপা-পরায়ণ হতে হয় এবং তাদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৫) উত্তম ভক্তের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

"উত্তম অধিকারী ভক্ত সমস্ত জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যে রয়েছেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই রয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি উত্তম ভাগবতের পক্ষে সম্ভব।"

শ্লোক ৪৫

অন্যের কি কথা, আমি—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' ।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি' ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্যের কি কথা, আমি 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' হওয়া সত্ত্বেও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়েছি।

শ্লোক ৪৬

এই জানি' কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে ।
সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেকথা জেনে, আমার কঠিন হৃদয় সংশোধন করার জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য আমাকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন।"

শ্লোক ৪৭

এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণ ।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তাঁরা দুজনেই পরস্পর পরস্পরের গুণ কীর্তন করতে লাগলেন, এবং উভয়ে উভয়কে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৪৮

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় একজন বেদানুগ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সেখানে এসে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ৪৯

নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটিকে বৈষ্ণব জেনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন, এবং ঈষৎ হেসে রামানন্দ রায়কে বললেন—

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণটিকে বৈষ্ণব জেনে তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। কেউ যদি সাত্ত্বিক আচরণ পরায়ণ ব্রাহ্মণ হন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী ভগবদ্ভক্ত না হন, তাহলে তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করা উচিত নয়। বর্তমানে মানুষ এত অধঃপতিত হয়ে গেছে যে, তারা বৈদিক-বিধিরও অনুসরণ করে না, বৈষ্ণবোচিত আচরণ করা তো দূরে থাকুক—তারা তাদের ইচ্ছামতো অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের নিমন্ত্রণ গ্রহণের বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত।

শ্লোক ৫০

তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন ।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনতে চাই। তাই যেন আমি পুনরায় তোমার দর্শন লাভ করতে পারি।"

শ্লোক ৫১-৫২

রায় কহে,—আইলা যদি পামর শোধিতে ।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥ ৫১ ॥
দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জন ।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—"আপনি যদিও এই পামরটিকে সংশোধন করবার জন্য এখানে এসেছেন, তবুও কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করে আমার দুষ্ট চিত্ত শুদ্ধ হয়নি। দয়া করে দিন পাঁচ-সাত এখানে থেকে আমার কলুষিত চিত্তকে মার্জন করুন, তাহলে অবশ্যই আমার এই দুষ্ট মন শুদ্ধ হবে।"

শ্লোক ৫৩

যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি' চলিলা রামরায় ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও তাঁদের কাছে পরস্পর পরস্পরের বিচ্ছেদ সহ্য করা অসম্ভব ছিল, তবুও রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

শ্লোক ৫৪

প্রভু যাই' সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি' সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায় উভয়েই উৎকণ্ঠিতভাবে সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, অবশেষে সন্ধ্যা সমাগত হল।

শ্লোক ৫৫

প্রভু স্নান-কৃত্য করি' আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য-সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বসেছিলেন, তখন একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে রামানন্দ রায় এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত বৈষ্ণব, তা তিনি সন্ন্যাসীই হন বা গৃহস্থই হন, তার দিনে তিনবার—সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় স্নান করা কর্তব্য। যারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন, তাদের বিশেষ করে *পদ্ম-পুরাণের* নির্দেশ অনুসারে নিয়মিত স্নান করতে হয়। স্নান করার পর দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করতে হয়।

শ্লোক ৫৬

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কয় রহঃস্থানে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করলে পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর এক নির্জন স্থানে বসে তাঁদের আলোচনা শুরু করলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'রহঃস্থানে' বা 'নির্জন স্থানে' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণ এবং তাঁর লীলাবিষয়ক কথা—বিশেষ করে তাঁর বৃন্দাবনলীলা এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে লীলা অত্যন্ত গোপনীয়। সেগুলি জনসাধারণের সামনে আলোচনার বিষয় নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষেরা সেই সমস্ত লীলার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ এবং ব্রজ-গোপিকাদের সাধারণ স্ত্রীলোক বলে মনে করে মহা অপরাধ করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও জনসাধারণের সামনে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা আলোচনা করেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যরাও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা জনসাধারণের সামনে আলোচনা করেন না। জনসাধারণের কৃষ্ণভক্তি উন্মেষ করার জন্য সংকীর্তনই হচ্ছে সব চাইতে কার্যকরী পন্থা। যদি সম্ভব হয়, তাহলে *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব আলোচনা করা উচিত। এই কথাটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করেছিলেন। *ভগবদ্গীতার* দর্শন তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মহাপণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী প্রমুখ ভক্তদের প্রদান করেছিলেন এবং ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ তত্ত্ব ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস, তিনি রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। জনসাধারণের জন্য তিনি প্রবলভাবে সংকীর্তন করেছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করার সময় এই পন্থাটি আমাদের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৫৭

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥" ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জীবনের পরম উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক শোনাতে বললেন। রামানন্দ রায় তার উত্তরে বললেন—"স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়।"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীরামানুজাচার্য *বেদার্থ-সংগ্রহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি জীবেরই অত্যন্ত প্রিয়। যথার্থই তা জীবনের উদ্দেশ্য। এই ভক্তি পরম জ্ঞান, এবং তা জড় বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আনে। সেই ভক্তি থেকে জাত জ্ঞান দ্বারাই ভগবান বরণীয় হন এবং ভক্তদের লভ্য হন। এই জ্ঞান লাভ করে, স্বধর্মে যুক্ত হওয়াকে ভক্তিযোগ বলে। এই ভক্তিযোগ সম্পাদন করার ফলে শুদ্ধভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা মহাত্মা পরাশর মুনি উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে স্বধর্ম আচরণ করলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। পরমেশ্বর ভগবান বর্ণাশ্রম ধর্ম-প্রণয়ন করেছেন, যাতে মানুষ এই ধর্ম আচরণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে (*ভগবদ্‌গীতায়* ৪/১৩) 'পুরুষোত্তম' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি এসে ঘোষণা করেছেন যে, এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥

ভগবদ্‌গীতার (১৮/৪৫-৪৬) আরও এক জায়গায় ভগবান বলেছেন—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

মানব সমাজকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের স্ব-স্ব ধর্মে নিযুক্ত থাকা। ভগবান বলেছেন, যারা তাদের স্বধর্মে যুক্ত, তারা স্বীয় ধর্ম আচরণকালে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে পরমসিদ্ধি লাভ করতে পারেন। আধুনিক মানব যে বর্ণবিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখছে, তা কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষ তাদের স্বধর্ম অনুসারে কার্য করুক এবং তাদের কার্যের ফল তারা ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করুক। তাহলেই তাদের সেই স্বপ্ন সফল হবে। অর্থাৎ, স্বধর্ম অনুসারে কর্ম করে তার ফল ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। সেই পন্থাটি বোধায়ণ, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দি এবং ভারুচি প্রমুখ মহাত্মারা প্রতিপন্ন করে গেছেন। তা *বেদান্ত সূত্রেও* প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৫৮

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥ ৫৮ ॥

বর্ণ-আশ্রম্-আচারবতা—চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম অনুসারে যিনি আচরণ করেন; পুরুষেণ—মানুষের দ্বারা; পরঃ পুমান্—পরম পুরুষ; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; আরাধ্যতে—আরাধিত হন; পন্থা—উপায়; ন—না; অন্যৎ—অন্য; তৎ-তোষ-কারণম্—ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের কারণ।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু, বর্ণ-ধর্ম ও আশ্রম-ধর্মের আচারযুক্ত পুরুষদের দ্বারা আরাধিত হন। বর্ণাশ্রম আচার ব্যতীত তাঁকে পরিতুষ্ট করার অন্য কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণুপুরাণ* (৩/৮/৯) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন—"এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, কেবলমাত্র ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের মাধ্যমে জীবনের পরম সিদ্ধিলাভ হয়।" *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/২/১৩) বলা হয়েছে—

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে স্বধর্ম আচরণ করার মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধান করাই জীবনের পরম সিদ্ধি।"

সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বিশেষ প্রবণতা অনুসারে স্বধর্ম আচরণ করা। স্বীয় স্বভাব অনুসারে নির্ণীত বর্ণ-ধর্ম ও অবস্থা অনুসারে নির্ণীত আশ্রম ধর্ম পালন করলে ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ। প্রতিটি বর্ণের যে ধর্ম শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, তা আচরণ করে মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আশ্রম-বিহিত ধর্মাচরণ করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবে। কেউ যদি এই কর্তব্যের অবহেলা করে, তাহলে সে ব্যভিচারী হয় এবং নরকগামী হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নরকম কর্মে লিপ্ত; তাই তাদের কর্ম অনুসারে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন। জীবনের পরমসিদ্ধি লাভের জন্য, ভগবদ্ভক্তিকে জীবনের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে তার কার্যকলাপ, সঙ্গ এবং শিক্ষার মাধ্যমে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগরিত করা যায়। গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই বর্ণাশ্রম বিভাগ, জন্ম অনুসারে নয়। এই পদ্ধতির প্রচলন না হলে, মানুষের কার্যকলাপ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পাদিত হবে না।

ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, যারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন। তারা সর্বদাই জ্ঞান-চর্চায় রত। যারা স্বাভাবিকভাবে শৌর্য-বীর্য-সম্পন্ন এবং অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের শাসন করে, তারা ক্ষত্রিয়। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য আদি ক্রিয়াতে যাদের স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, তারা বৈশ্য। যারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যোচিত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নয়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে—এই তিন বর্ণের সেবা করা এবং তারা—শূদ্র। এইভাবে সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন। সমাজ যদি একটি স্বাভাবিক বিভাগ অনুসারে পরিচালিত না হয়, তাহলে সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতন হবে। সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্মের এই বৈজ্ঞানিক পন্থা মানব-সমাজের গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৫৯

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে, "কৃষ্ণে কর্মার্পণ—সর্বসাধ্য-সার ॥" ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এটি বাহ্য। এর পরে যা আছে, তা বল।" তখন রামানন্দ রায় বললেন, "কৃষ্ণে কর্ম অর্পণই সকল সাধ্যের সার।"

শ্লোক ৬০

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

যৎ—যা কিছু; করোষি—তুমি কর; যৎ—যা কিছু; অশ্নাসি—তুমি খাও; যৎ—যা কিছু; জুহোষি—তুমি যজ্ঞে অর্পণ কর; দদাসি—যা কিছু তুমি দান কর; যৎ—যা কিছু; তপস্যসি—তুমি তপস্যা কর; কৌন্তেয়—হে কুন্তীর পুত্র; তৎ—তা; কুরুষ্ব—কর; মৎ—আমাকে; অর্পণম্—অর্পণ।

অনুবাদ

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু খাও, যজ্ঞে যা কিছু অর্পণ কর, যা কিছু দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।"

তাৎপর্য

মহাপ্রভু বললেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম এই কলিযুগে যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় না তাই তিনি রামানন্দ রায়কে বললেন, তারও উপরে যা আছে, তা বলতে। রামানন্দ রায় তার উত্তরে *ভগবদ্গীতার* (৯/২৭) এই শ্লোকটি উল্লেখ করে বললেন, "বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানকালে কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিসহকারে নিবেদন করা যেতে পারে।" স্বাভাবিকভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে ভগবদ্ভক্তির কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রামানন্দ রায় বিষয়াসক্ত মানুষদের কথা বিবেচনা করে বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বর্ণনা করলেন। কিন্তু, বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ চিন্ময় নয়; মানুষ যখন জড়-জগতে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অপ্রাকৃত। বর্ণাশ্রম ধর্ম জড় জগতে তিনটি গুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চিৎ-জগৎ থেকে এসেছিলেন, এবং প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলনও তিনি চিৎ-জগৎ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—'গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিল কেনে তায়'। এর থেকে বোঝা যায় যে সংকীর্তন আন্দোলন এই জড় জগতের বস্তু নয়। তা চিৎ-জগৎ গোলোক-বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং নরোত্তম দাস ঠাকুর অনুশোচনা

করেছেন যে, বিষয়াসক্ত মানুষেরা এই সংকীর্তন আন্দোলনের গুরুত্ব দেয় না। ভগবদ্ভক্তি এবং সংকীর্তন আন্দোলনের কথা বিবেচনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মকে পর্যন্ত জড়-জাগতিক বলে বিবেচনা করেছেন, যদিও এই বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা। সংকীর্তন আন্দোলন জীবকে সংকীর্তন করা মাত্র চিন্ময় স্তরে উন্নীত করতে পারে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মকে বাহ্য বলে রামানন্দ রায়কে আরও গভীর পারমার্থিক তত্ত্বের কথা বলতে বলেছেন।

কখনও কখনও জড়বাদীরা বিষ্ণুকেও জাগতিক ভাবে বিচার করে। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে বিষ্ণুর ঊর্ধ্বে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্বিশেষবাদীরা বিষ্ণুপূজার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে তাঁর অঙ্গে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য। বিষ্ণু আরাধনা সম্বন্ধে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা না থাকে—সেজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে তারও পরে যা আছে তা বলতে বললেন। রামানন্দ রায় তখন *ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকটির উল্লেখ করে বললেন যে, স্বধর্ম আচরণ করে তার ফলটি শ্রীবিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নিবেদন করা কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"কেউ যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তার স্বধর্ম পালন করে, কিন্তু তার ফলে যদি তার কৃষ্ণকথায় রতি না জন্মায়, তাহলে তার সে সমস্ত ধর্ম-অনুষ্ঠান অনর্থক পরিশ্রম মাত্র।"

শ্লোক ৬১

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে, "স্বধর্ম-ত্যাগ,—এই সাধ্য-সার ॥" ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

একথা শুনেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এটিও বাহ্য, এরও পরে যা আছে, তা বল।" রামানন্দ রায় তখন বললেন, "স্বধর্ম-ত্যাগই সকল সাধ্যের সার।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ তার গৃহ-ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা বৈরাগ্য লক্ষণ যুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করতে পারেন। এই সন্ন্যাসের নাম স্বধর্ম ত্যাগ বা কর্মত্যাগ। এই ত্যাগের ফলে পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হন। কিন্তু এই কর্ম ত্যাগের পন্থা সম্পূর্ণরূপে জড়-কলুষ থেকে মুক্ত নয় এবং তাই তা জড়স্তরের বিষয়। এই কার্যটি জড় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বাহ্য বলে বিবেচনা করেছেন। তখন রামানন্দ রায় ঐ ভাব শোধন করে ক্রমোন্নত জীবের যেভাবে ধারণার উন্নতি করতে হবে, সেই ভাব বিশিষ্ট হয়ে স্বধর্ম ত্যাগের দ্বারা যে সাধ্য লাভ হয় তা প্রমাণ করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে পরবর্তী শ্লোকটির (১১/১১/৩২) উল্লেখ করলেন।

শ্লোক ৬২

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৬২ ॥

আজ্ঞায়—সম্যক রূপে জেনে; এবং—এইভাবে; গুণান্—গুণসমূহ; দোষান্—দোষ সমূহ; ময়া—আমার দ্বারা; আদিষ্টান্—আদিষ্ট হয়ে; অপি—যদিও; স্বকান্—স্বীয়; ধর্মান্—বর্ণাশ্রম ধর্ম; সংত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; যঃ—যিনি; সর্বান্—সমস্ত; মাম্—আমাকে; ভজেৎ—সেবা করতে পারে; স—তিনি; চ—এবং; সত্তমঃ—সাধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

"(শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের উক্তি) ধর্মশাস্ত্রে আমি যা 'ধর্ম' বলে আদেশ করেছি তার দোষ-গুণ বিচার পূর্বক সেই সমস্ত ধর্ম প্রবৃত্তি ত্যাগ করে যিনি আমাকে ভজন করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু।"

শ্লোক ৬৩

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৩ ॥

সর্ব-ধর্মান্—জাগতিক সমস্ত ধর্ম; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; মাম্-একম্—কেবল আমার; শরণম্—শরণ; ব্রজ—হও; অহম্—আমি; ত্বাম্—তোমাকে; সর্ব-পাপেভ্যঃ—সমস্ত পাপ থেকে; মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্তিদান করব; মা—করো না; শুচঃ—শোক।

অনুবাদ

(ভগবদ্গীতায় ভগবানের বাণী)—"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও! তাহলে আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি সেজন্য শোক করো না।"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর *মনঃশিক্ষায়* (২) নির্দেশ দিয়েছেন—

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্যাং ইহ তনু ॥

"বেদের নির্দিষ্ট ধর্ম বা অধর্ম আচরণ করার প্রয়োজন নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া।" এইটিই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/২৯/৪৬) নারদ মুনি বলেছেন—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥

"কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন তখন তিনি সর্বপ্রকার জাগতিক ধর্ম, এমনকি বৈদিক-শাস্ত্রের নির্দেশিত সমস্ত ধর্মও পরিত্যাগ করেন। এইভাবে তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিষ্ঠা পরায়ণ হন।"

শ্লোক ৬৪

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার ॥" ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুনেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এও বাহ্য, এরও পরে যা আছে, তা বল।" রামানন্দ রায় তখন বললেন—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে সাধ্যসার বলা যায়।"

তাৎপর্য

অবৈদিক মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি অবশ্যই শুদ্ধভক্তি নয়। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর 'অনুভাষ্যে' বলেছেন যে বেদবিধির অনুগমনে আত্ম-উপলব্ধির স্তর বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার মধ্যবর্তী নিষ্ক্রিয় স্তর। এই স্থানটি জড়-জগতের অতীত বিরজা নদীতে, সেখানে জড়-জগতের তিনটি গুণ প্রশমিত অথবা সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু চিৎ-জগতে চিৎ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশিত। সেই স্থান বৈকুণ্ঠলোক নামে পরিচিত অর্থাৎ সেখানে কোন কুণ্ঠা নেই। এই জড় জগতকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড। এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি থেকে সৃষ্ট। অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড, এই দুয়ের মাঝখানে ব্রহ্মলোক ও বিরজা নদী। যে সমস্ত জীব জড় বিষয়ে বিরক্ত এবং যারা জড় বৈচিত্র্য অস্বীকার করে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, এই বিরজা নদী এবং ব্রহ্মলোক তাদের আশ্রয়স্থল। যেহেতু এই স্থান দুটি বৈকুণ্ঠলোক বা চিৎ-জগতে অবস্থিত নয়, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বাহ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ব্রহ্মলোক এবং বিরজানদীতে বৈকুণ্ঠের অনুভূতি হয় না। কঠোর তপশ্চর্যার ফলে ব্রহ্মলোক এবং বিরজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেই স্থানে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না এবং ভগবৎ-সেবার মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। এই চিন্ময় জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র জড় বিষয়ে বিরক্তি জড় অস্তিত্বের আর একটি দিক মাত্র। চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বাহ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই প্রস্তাবটিকেও বাহ্য বলে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন রামানন্দ রায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে আরও উন্নত স্তরের শুদ্ধ বস্তু বলে প্রস্তাব করলেন। তাই তিনি *ভগবদ্গীতার* (১৮/৫৪) নিম্নোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ করলেন—

শ্লোক ৬৫

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মভূতঃ—জড় ধারণা থেকে মুক্ত নির্বিশেষ অনুভূতি পরায়ণ; প্রসন্ন আত্মা—অভাব ধর্ম রহিত; ন শোচতি—শোক করেন না; ন কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন না; সমঃ—সমভাবাপন্ন; সর্বেষু-ভূতেষু—সমস্ত জীবের প্রতি; মদ্ভক্তিম্—আমার ভক্তি; লভতে—লাভ করে; পরাম্—পরম শুদ্ধ।

অনুবাদ

"ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত অভাব মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হন। তিনি কোন কিছুর জন্য শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই স্তরে তিনি আমার শুদ্ধভক্তি লাভ করেন।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—অভেদ ব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চার দ্বারা স্বয়ং প্রসন্ন-আত্মা, শোক ও বাঞ্ছা রহিত; এবং সর্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করে, পরে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়। তার অর্থ এই যে, পূর্বে কর্মমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ হয়েছিল, তার থেকে উৎকৃষ্ট হল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

শ্লোক ৬৬

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার ॥" ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এও বাহ্য; এর পরে যা আছে, তা বল।" রামানন্দ রায় বললেন, "জ্ঞান-শূন্যা-ভক্তি সাধ্য বস্তুর সার।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর 'অনুভাষ্যে' বলেছেন—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতেও 'অস্মিতা' এবং তার বৃত্তি শুদ্ধ বৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠ উদ্দিষ্ট নয় বলে তাও বাহ্য। জড় ধারণা থাকলে তা সে অনুকূল হোক বা প্রতিকূলই হোক—সেই সেবা চিন্ময় নয়। তা জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের উপস্থিতি থাকায় তা সর্বতোভাবে নির্মল নয়। সম্পূর্ণভাবে নির্মল হতে হলে সমস্ত জড় ধারণার অতীত হতে হবে। জড় অস্তিত্ব অস্বীকার এবং বৈকুণ্ঠে স্থিতি এক বস্তু নয়। জড় অস্তিত্ব অস্বীকার করার পরেও চিন্ময় অস্তিত্ব—যথা *সৎ-চিৎ-আনন্দ* উপলব্ধি না-ও হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের উপলব্ধি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ জগতে প্রবেশ করা যায় না। চিন্ময় জীবন জড় আসক্তি-রহিত ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ জীবন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলেছেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরও অতীত যা—সে সম্বন্ধে বলতে। শুদ্ধভক্ত সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে

শরণাপন্ন এবং তাঁর প্রেমের দ্বারা কেবল তিনি অজিত শ্রীকৃষ্ণকে জয় করেন। সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল শুদ্ধভক্তি-স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটিতে (১০/১৪/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে। এই শ্লোকে গো-বৎস হরণ করবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত হয়ে স্তব করেছেন।

শ্লোক ৬৭

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৬৭ ॥

জ্ঞানে—জ্ঞান লাভে; প্রয়াসম্—অর্থহীন প্রচেষ্টা; উদপাস্য—দূরে সরিয়ে রেখে; নমন্তঃ—সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে; এব—অবশ্যই; জীবন্তি—জীবন ধারণ করে; সৎ-মুখরিতাং—মহাভাগবতদের মুখনিঃসৃত বাণী; ভবদীয়-বার্তাম্—আপনার কথা; স্থানে স্থিতাঃ—সস্থানে স্থিত; শ্রুতিগতাম্—কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট; তনু-বাক্-মনোভিঃ—দেহ, মন এবং বাক্যের দ্বারা; যে—যারা; প্রায়শঃ—প্রায় সর্বক্ষণ; অজিত—হে অজিত ভগবান; জিতঃ—পরাজিত; অপি—অবশ্যই; অসি—আপনি; তৈঃ—সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; ত্রি-লোক্যাম্—এই ত্রিলোকে।

অনুবাদ

"ব্রহ্মা বললেন, 'হে ভগবান, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে যে ভক্তেরা সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, এই ত্রিলোকের মধ্যে আপনি দুর্লভ হয়েও তাদের কাছে সুলভ হয়ে পড়েন।' "

শ্লোক ৬৮

প্রভু কহে—"এহো হয়, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"প্রেমভক্তি—সর্বসাধ্যসার ॥" ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এখন সাধ্য নির্ণীত হল বটে, কিন্তু তার থেকেও অধিক যা আছে, তা বল।" তখন রামানন্দ রায় বললেন—"প্রেমভক্তি হচ্ছে সর্বসাধ্যসার।"

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* লিখেছেন, "একথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন,—এখন সাধ্য নির্ণীত হল বটে, এর চেয়ে অধিক যা আছে

তা-ই বল। এর অর্থ এই যে, কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন অপেক্ষা কর্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম ত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ-ধর্ম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হলেও সেই সমুদায়-ই বাহ্য; কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তা সেই চার প্রকার সিদ্ধান্তে নেই। 'আরোপসিদ্ধা', 'সঙ্গসিদ্ধা'-ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলে পরিচিত হয় না। 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'—একটি পৃথক তত্ত্ব; তা—কর্ম, কর্মার্পণ, কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকে নিত্য পৃথক। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে তা—অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। তাই সাধ্যবস্তু; কেন না, সাধ্য অবস্থায় এটাকে দেখতে পেলেও সিদ্ধ অবস্থায় এটাকে নির্মলরূপে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বললেন—প্রেমভক্তিই সর্বসাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথম অবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত হয়, তাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা বুদ্ধি থাকে না।"

শ্লোক ৬৯

নানোপচার-কৃতপূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥ ৬৯ ॥

নানা-উপচার—বিবিধ উপচারে; কৃত—অনুষ্ঠান করে; পূজনম্—পূজা; আর্তবন্ধোঃ—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত আর্ত ব্যক্তিদের বন্ধু; প্রেম্ণা—কৃষ্ণ-প্রেমের দ্বারা; এব—যথার্থই; ভক্ত-হৃদয়ম্—ভক্তের হৃদয়; সুখ-বিদ্রুতম্—দিব্য আনন্দের দ্বারা দ্রবীভূত; স্যাৎ—হয়; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; ক্ষুৎ—ক্ষুধা; অস্তি—আছে; জঠরে—উদরে; জরঠা—তীব্র; পিপাসা—পিপাসা; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; সুখায়—সুখের জন্য; ভবতঃ—হয়; ননু—যথার্থ; ভক্ষ্য—আহার্য; পেয়ে—পানীয়।

অনুবাদ

"জঠরে যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণ ভক্ষ্য-পেয় বস্তু সকল সুখদায়ক হয়। তেমনই আত্মবন্ধু ভগবানের নানা উপচারে পূজা হলেও তা প্রেমযুক্ত হলেই ভক্তদের হৃদয় আনন্দে দ্রবীভূত হয়।

শ্লোক ৭০

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে ।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা—কৃষ্ণ-সেবারস-ভাবনাময়ী; মতিঃ—বুদ্ধি; ক্রীয়তাম্—কেনা উচিত; যদি—যদি; কুতঃ অপি—কোথায়ও; লভ্যতে—পাওয়া যায়; তত্র—সেখানে; লৌল্যম্—লোভ; অপি—অবশ্যই; মূল্যম্—মূল্য; একলম্—কেবল; জন্মকোটি—বহু জন্ম-জন্মান্তরে; সুকৃতৈঃ—সুকৃতির দ্বারা; ন—না; লভ্যতে—পাওয়া যায়।

অনুবাদ

" 'কোটি কোটি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির দ্বারাও যা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়ে যা পাওয়া যায়, সেই কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতামতি যেখানেই পাও, অবিলম্বে তা ক্রয় করে নাও।' "

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোক দুটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *পদ্যাবলীতে* (১৩, ১৪) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম শ্লোকটি শ্রদ্ধামূলক বৈধীভক্তির সূচনা করছে। দ্বিতীয়টি লোভমূলক রাগানুগা ভক্তির সূচনা করছে। এর পর এই রাগানুগা ভক্তি অবলম্বন করে রামানন্দ রায়ের কথিত বচনগুলি ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ এখন থেকে তিনি রাগভক্তি-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করছেন এবং বৈধীভক্তির কথা পরিত্যাগ করলেন। রাগানুগা ভক্তির উদয় না হওয়া পর্যন্তই শাস্ত্র লিখিত বিধিগুলির অনুশীলনের প্রয়োজন। কিন্তু রাগ-ভক্তির উদয় হলে তখন আর বিধির প্রয়োজন থাকে না। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সাগরের দিকে নদীর প্রবাহ। এই গতি কেউ বাধা দিতে পারে না। তেমনই হৃদয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের যখন বিকাশ হয়, তখন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দিকে ধাবিত হয় এবং কোন কিছু আর তাকে বাধা দিতে পারে না। এখন থেকে রামানন্দ রায় যা কিছু বলবেন তা এই রাগভক্তি-ভিত্তিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাতে সম্মত হবেন, এবং তিনি এই বিষয়ে তাকে গভীর থেকে গভীরতর তত্ত্ব প্রকাশ করতে বলবেন।

শ্লোক ৭১

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর ।"
রায় কহে, "দাস্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার ॥" ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এ পর্যন্ত শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"তাতে কি; কিন্তু তার পরেও যা আছে, তা বল।" তার উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন—"দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।"

তাৎপর্য

স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেমে যখন সেব্য এবং সেবকের মধ্যে অন্তরঙ্গ আসক্তি যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় দাস্য-প্রেম। এই অন্তরঙ্গ আসক্তিকে বলা হয় মমতা। এই মমতার শুরু হয় দাস্য প্রেম থেকে। এই মমত্ববোধ না থাকলে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। 'ভগবানই আমার প্রভু'—এইরূপ মমতাভাব তাতে যুক্ত হলে সাধারণ প্রেম 'দাস্য-প্রেম'-এ পরিণত হয়। এই দাস্য-প্রেম সাধারণ প্রেম অপেক্ষা উন্নত।

শ্লোক ৭২

যন্নামশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৭২ ॥

যৎ—যার; নাম—নামে; শ্রুতি-মাত্রেণ—শোনা মাত্রই; পুমান্—ব্যক্তি; ভবতি—হয়; নির্মলঃ—বিশুদ্ধ; তস্য—তার; তীর্থপদঃ—পরমেশ্বর ভগবানের, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তীর্থের আশ্রয়; কিম্—কি; বা—অধিক; দাসানাম্—সেবকদের; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে।

অনুবাদ

" 'যাঁর নাম শ্রবণ করা মাত্রই নির্মল হওয়া যায়, সেই তীর্থপদ ভগবানের যারা দাস, তাদের কি আর অপ্রাপ্য থাকে?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/৫/১৬) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এইটি দুর্বাসা মুনির উক্তি। দুর্বাসা মুনি ছিলেন ব্রাহ্মণাভিমানী মহাযোগী। তিনি মহারাজ অম্বরীষের প্রতি দ্বেষভাবযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে অম্বরীষ মহারাজকে শাস্তি দিতে যান, তখন ভগবানের সুদর্শন-চক্র তাঁকে পীড়ন করতে থাকে। অবশেষে মহাভাগবত অম্বরীষের প্রার্থনার ফলে তা নিবৃত্ত হয়। তা দেখে দুর্বাসার জাতিবুদ্ধি দূরীভূত হয় এবং তিনি শুদ্ধভক্ত ও ভগবানের এইভাবে স্তুতি করেন—"ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করা মাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রভু, এবং তাঁর আশ্রিত ভক্তেরা স্বাভাবিকভাবে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন।"

শ্লোক ৭৩

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স-নাথ-জীবিতম্ ॥ ৭৩ ॥

ভবন্তম্—আপনি; এব—অবশ্যই; অনুচরন্—সেবা করা; নিরন্তরঃ—সর্বদা; প্রশান্ত—প্রশান্ত; নিঃশেষ—সমস্ত; মনঃ-রথ—বাসনা; অন্তরঃ—অন্য; কদা—কখন; অহম্—আমি; ঐকান্তিক—ঐকান্তিক; নিত্য—নিত্য; কিঙ্করঃ—সেবক; প্রহর্ষয়িষ্যামি—সর্বতোভাবে সুখী হব; স-নাথ—উপযুক্ত প্রভুর; জীবিতম্—জীবিত।

অনুবাদ

" 'আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হয়ে প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্য কিঙ্কর বলে নিজেকে জেনে—আপনার দাসত্ব স্বীকার করে আনন্দে উৎফুল্ল হব?' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি মহাভাগবত যামুনাচার্যের *স্তোত্র-রত্ন* (৪৩) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৭৪

প্রভু কহে,—"এহো হয়, কিছু আগে আর ।"
রায় কহে,—"সখ্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার ॥" ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"আর কিছু আগে যেতে পারলে সর্বসার মিলবে!" রামানন্দ রায় তার উত্তরে বললেন—"শ্রীকৃষ্ণে 'সখ্যপ্রেম'ই সর্বসাধ্য সার।"

তাৎপর্য

'দাস্য-প্রেমে' 'মমতা' থাকলেও তাতে ভগবান—প্রভু এই ভাবের ফলে একটি 'ভয়' ও 'সম্ভ্রম' সহজে উদিত হয়। সেই 'ভয়' ও 'সম্ভ্রম' পরিত্যাগ করে 'বিশ্রম্ভ' অর্থাৎ 'একান্ত বিশ্বাস'-কে বরণ করতে পারলে সেই প্রেমে 'সখ্য-প্রেম' হয়। এই প্রেমে কৃষ্ণ এবং তাঁর সখাদের মধ্যে 'সমতা ভাব' উদিত হয়।

শ্লোক ৭৫

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৭৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; সতাম্—ভগবানের নির্বিশেষ রূপের উপাসকদের; ব্রহ্ম—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি; সুখ—আনন্দ; অনুভূত্যা—যিনি অনুভব করেছেন; দাস্যম্—দাস্যভাব; গতানাম্—যারা গ্রহণ করেছেন; পর-দৈব-তেন—পরম আরাধ্য; মায়া-আশ্রিতম্—ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত সাধারণ মানুষদের; নরদারকেণ—নরশিশুরূপে; সার্ধম্—সখ্যভাবে; বিজহ্রুঃ—খেলা করেছিলেন; কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ—পুঞ্জিভূত পুণ্যকর্ম করেছেন যারা, সেই গোপ-বালকেরা।

অনুবাদ

"নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্মসুখরূপ উপলব্ধি করেন, দাস্যরসের ভক্তরা যাঁকে পরদেবতারূপে দর্শন করেন, এবং মায়াশ্রিতা সাধারণ মানুষেরা যাকে একটি মানব শিশুরূপে দর্শন করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপ-বালকেরা জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জিভূত পুণ্যকর্মের ফলে, সখারূপে খেলা করছেন।' "

তাৎপর্য

এটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১২/১১) পরীক্ষিত মহারাজের কাছে শুকদেবের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত এবং এখানে তিনি যমুনার উপকূলে বন-ভোজনরত, গোপ-বালকদের পরম সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭৬

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর ।"
রায় কহে, "বাৎসল্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার ॥" ৭৬ ॥

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—" 'সখ্যরস', 'দাস্যরস' থেকে উত্তম ঠিকই, কিন্তু আর একটু অগ্রগামী হলে সাধ্যসার পাওয়া যাবে।" তার উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন—" বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।"

তাৎপর্য

সখ্য-প্রেমের অধিকতর উন্নত অবস্থা বাৎসল্য-প্রেম। সখ্যরসে সমতা ভাব রয়েছে, কিন্তু এই সমতা যখন অধিকতর উন্নত হয়ে স্নেহে পর্যবসিত হয়, তখন তা বাৎসল্য-প্রেমে পরিণত হয়। সেই সূত্রে *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে (১০/৮/৪৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শুকদেব গোস্বামী নন্দমহারাজ এবং যশোদা মায়ের গভীর কৃষ্ণপ্রেমের প্রশংসা করেছেন।

শ্লোক ৭৭

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরি ॥ ৭৭ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গলপ্রদ কর্ম; **এবম্**—এইভাবে; **মহোদয়ম্**—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃপদ পাওয়ার মতো উন্নত অবস্থা; **যশোদা**—মা যশোদা; **বা**—অথবা; **মহাভাগা**—পরম সৌভাগ্যবতী; **পপৌ**—পান করেছিলেন; **যস্যাঃ**—যার; **স্তনম্**—স্তন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

"হে ব্রাহ্মণ, নন্দমহারাজ এমন কি সুকৃতি করেছিলেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন? আর মা যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করেছিলেন যে, সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে 'মা' বলে তাঁর স্তন পান করেছিলেন?"

শ্লোক ৭৮

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৭৮ ॥

ন—না; **ইমম্**—এই ভগবৎ-প্রেম; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **ভবঃ**—শিব; **ন**—না; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অপি**—এমন কি; **অঙ্গসংশ্রয়া**—পত্নী; **প্রসাদম্**—অনুগ্রহ; **লেভিরে**—লাভ করেছে; **গোপী**—মা যশোদা; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **বিমুক্তিদাৎ**—মুক্তিদাতা শ্রীহরির কাছ থেকে।

অনুবাদ

" 'যশোদা-গোপী সাধারণের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, তা ব্রহ্মা, শিব, বা বিষ্ণু-বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও পাননি।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯/২০) থেকে উদ্ধৃত। রজ্জু দ্বারা বন্ধন করতে উদ্যতা জননীকে অসমর্থা ও পরিশ্রান্তা দেখে কৃষ্ণ স্বয়ং বদ্ধ হলেন। মা যশোদার কৃষ্ণকে বশ করার এই গুণ দর্শন করে মহারাজ পরীক্ষিতকে শুকদেব গোস্বামী এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৭৯

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর ।"
রায় কহে, "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥" ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন—"তোমার এই বর্ণনা উত্তরোত্তর উত্তম হয়েছে ঠিকই, তবুও একেও অতিক্রম করে আর যা আছে তা বল।" তখন রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'কান্তাভাব'ই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার।"

তাৎপর্য

সাধারণ প্রেমে 'মমতা'র অভাব, দাস্যরসে 'বিশ্রম্ভ' বা 'বিশ্বাস'-এর অভাব, সখ্যরসে 'স্নেহাধিক্য'-এর অভাব এবং বাৎসল্য রসে 'নিসঙ্কোচ-ভাব'-এর অভাব; তাই সেই সমস্ত রসে সাধ্যপ্রেমের পূর্ণতা হয়নি। শ্রীকৃষ্ণে যখন কান্তা-ভাবের উদয় হয়, তখনই সেই সমস্ত অভাবশূন্য, সকল সাধ্যের সার—একটি অখণ্ড প্রেমতত্ত্ব পাওয়া যায়। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখে ভগবৎ-প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ৮০

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৮০ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **শ্রিয়**—লক্ষ্মীদেবীর; **অঙ্গে**—বক্ষে; **উ**—হায়; **নিতান্ত-রতেঃ**—যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহ; **স্ব**—স্বর্গের; **যোষিতাম্**—ললনাগণ; **নলিন**—পদ্মফুলের; **গন্ধ**—সৌরভ; **রুচাম্**—অঙ্গকান্তি; **কুতোঃ**—অনেক কম; **অন্যাঃ**—অন্যেরা; **রাসোৎসবে**—রাসনৃত্যের উৎসবে; **অস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **ভুজ-দণ্ড**—বাহুযুগলের দ্বারা; **গৃহীত**—আলিঙ্গিতা হয়ে; **কণ্ঠ**—কণ্ঠ; **লব্ধাশিষাম্**—যারা এই ধরনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যঃ**—যা; **উদগাৎ**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **ব্রজ-সুন্দরীণাম্**—বৃন্দাবনের সুন্দরী গোপ-রমণীদের।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে রাসোৎসবে ব্রজ-গোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন ব্রজ-গোপিকারা তাঁর বাহু যুগলের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অনুগ্রহ তাঁর বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি চিৎ-জগতের নিতান্ত অনুগত শক্তিদেরও লাভ হয়নি, পদ্মগন্ধা স্বর্গীয় রমণীদেরও যখন তা লাভ হয়নি, তখন এই জড় জগতের স্ত্রীলোকদের কথা আর কি বলব?"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি (১০/৪৭/৬০) উদ্ধবের উক্তি। উদ্ধব ব্রজগোপিকাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বহন করে যখন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কয়েক মাস সেখানে থাকেন এবং কৃষ্ণকথা কীর্তন করে গোপিকাদের হর্ষ উৎপাদনের চেষ্টা করেন, এবং কৃষ্ণ-বিরহ-সন্তপ্তা গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করে তাদের পরম সৌভাগ্যের প্রশংসা করেন।

শ্লোক ৮১

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৮১ ॥

তাসাম্—তাদের মধ্যে; আবিরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **শৌরীঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ময়মান**—হাসতে হাসতে; **মুখ-অম্বুজঃ**—মুখপদ্ম; **পীত-অম্বর-ধর**—পীত বসনধারী; **স্রগ্বী**—ফুলমালায় ভূষিত; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **মন্মথ**—কামদেবের; **মন্মথঃ**—কামদেব।

অনুবাদ

"পীতবসন পরিহিত এবং ফুলমালায় সজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে গোপিকাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, তাঁকে তখন ঠিক কামদেবেরও কামদেব বলে মনে হচ্ছিল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩২/২) থেকে উদ্ধৃত। রাসনৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যান এবং তখন গোপীরা তাঁর বিরহে এতই ব্যাকুল হয়ে গড়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে আবার তাদের সেখানে আবির্ভূত হতে হয়েছিল।

শ্লোক ৮২-৮৩

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয় ॥ ৮২ ॥
কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্বোত্তম ।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ তারতম্যও রয়েছে। কিন্তু যার যেই রস সেইটিই সর্বোত্তম। তটস্থ হয়ে বিচার করলে তার তারতম্য বোঝা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"এই শ্লোকের দ্বারা এটি বুঝতে হবে না যে, যার যে কোন মনোধর্ম বা খেয়াল, তার সেইটিই সর্বোত্তম; উচ্ছৃঙ্খলতা সর্বোত্তম হতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/১০১) গ্রন্থে বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বেদ এবং বেদানুগ শাস্ত্র অনুসারে হরিভক্তি অনুশীলন করতে হবে। মনগড়া ভক্তির পন্থা কেবল বৈষ্ণব-সমাজে উৎপাতের সৃষ্টি করে। সেইজন্য গৃহব্রত-ধর্ম যাজন, শাস্ত্র বিগর্হিত অপরাধময় ভাগবত ব্যবসা, মন্ত্র-ব্যবসা, শিষ্য-ব্যবসা, কীর্তন-ব্যবসা, বহির্মুখ-সামাজিকতা, লৌকিকতা প্রভৃতির অপেক্ষাযুক্ত মনোধর্মের সঙ্গে শুদ্ধভক্তির সমন্বয় এখানে উদ্দিষ্ট হয়নি; এবং আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, অতিবাড়ি, চূড়াধারী এবং গৌরাঙ্গনাগরী, নব্য-গোস্বামীর মত বা জাতিগোস্বামীর মত প্রচারকারী এবং ঐ জাতিগোস্বামীর মতকেই 'ষড় গোস্বামীর মত' বলে লোক-বঞ্চনাকারী, কৃষ্ণের অভক্ত, গৌরমন্ত্র ও গৌরনাম বিরোধী, নবছড়া রচনাকারী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, ভৃতক-পাঠক, নীচ জাতির সাহচর্যজনিত বর্ণব্রাহ্মণতাকেই 'বৈদিক ব্রাহ্মণতা' বলে প্রচারকারী, স্মার্ত, সাত্বতপঞ্চরাত্রবিরোধী, মায়াবাদী, স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি কখনই—নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণার্থ অখিলচেষ্ট, অনুক্ষণ হরিসেবারত সর্বস্বত্যাগী, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে আত্মবিক্রীত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সংযত গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এক বা সমান হতে পারে না।

যে প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই বাক্যের অবতারণা করেছেন, তা সিদ্ধভাব-পঞ্চকের কথা। অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ ভাবে এই পঞ্চরসের রসিকেরা সেবা করে থাকেন; অনর্থনিবৃত্তির পর সেই সমস্ত সিদ্ধভাবের মধ্যে যে-কোনটি কারও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের স্বভাব-অনুসারে উদিত হোক না কেন, তা সেই সেই রসের অধিকারীর পক্ষে সর্বোত্তমই বটে, কারণ, সকলের বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণেতর প্রাকৃত দেবাদি নন। আবার তটস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থ হয়ে বিচার করলে সেই ভাব-পঞ্চকের রসাস্বাদনের মধ্যে তারতম্য অনুভূত হয়;—যেমন, দাস্যরসে শান্ত রস ও দাস্য রস—উভয়ই সমকালে বর্তমান, অতএব তা শান্তরস থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার, সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য বর্তমান; সুতরাং তা শান্ত ও দাস্য থেকে আরও উন্নত। আবার বাৎসল্য রসে শান্ত, দাস্য এবং সখ্য অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাতে উক্ত পূর্ববর্তী ত্রিবিধ রস থেকে অধিকতর চমৎকারিতা বর্তমান। আবার, মধুর রসে পূর্ববর্তী চতুর্বিধ রসই বিরাজিত বলে তার চমৎকারিতা ও মাধুর্য সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণ মহাজনেরা এইভাবে পর্যায়ক্রমে স্বরূপ উপলব্ধির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বিচার করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত দৈবমায়া বিমূঢ় অসৎসিদ্ধান্ত-নিপুণ ব্যক্তিরা এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কিছু উপলব্ধি করতে না পেরে

শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করে থাকে,—তা সেই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় দেয়।

শ্লোক ৮৪

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৮৪ ॥

যথা-উত্তরম্—উত্তরোত্তর; **অসৌ**—সেই; **স্বাদ-বিশেষ**—কোন বিশেষ স্বাদের; **উল্লাস-ময়ী**—আধিক্যসম্পন্না; **অপি**—যদিও; **রতিঃ**—প্রেম; **বাসনয়া**—বিভিন্ন বাসনার দ্বারা; **স্বাদ্বী**—মধুর; **ভাসতে**—অবস্থান করে; **কা অপি**—কোন; **কস্যচিৎ**—কারও (ভক্তের)।

অনুবাদ

"রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন স্তরে আস্বাদিত হয়। সেই রতি ক্রমে ক্রমে চরম স্তরে পরম আস্বাদনীয় মধুর রসরূপে প্রকাশিত হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/৫/৬৮) থেকে উদ্ধৃত। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের পঁয়তাল্লিশ শ্লোকেও এই শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৮৫

পূর্ব-পূর্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয় ।
দুই-তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরবর্তী রসগুলিতে বর্তমান। দুই, তারপর তিন, এইভাবে গণনা করে পাঁচ পর্যন্ত তা বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৮৬

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে ।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতি রসে গুণের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেরও আধিক্য বর্ধিত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৮৭

আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে ।
দুই-তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটি এই পঞ্চ মহাভূতের গুণ যেমন এক, দুই, তিন করে, ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে ভূমিতে যেরূপ পাঁচটি গুণই পূর্ণরূপে দেখা যায় ঠিক সেরূপ।

শ্লোক ৮৮

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে ।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ভগবৎ-প্রেম থেকেই অর্থাৎ বিশেষ করে মাধুর্য-প্রেম থেকেই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের বশ। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

মাধুর্য-প্রেমের সর্বোৎকর্ষতা বিশ্লেষণ করার জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আকাশে 'শব্দ' বলে একটি গুণ আছে; বায়ুতে 'শব্দ' ও 'স্পর্শ'—এই দুটি গুণ আছে; অগ্নিতে 'শব্দ', 'স্পর্শ' ও 'রূপ'—এই তিনটি গুণ আছে; জলে 'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ' ও 'রস'—এই চারটি গুণ আছে; মৃত্তিকায় 'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ', 'রস' ও 'গন্ধ'—এই পাঁচটি গুণ আছে। এইভাবে দেখা যায়, আকাশাদি পরপর ভূতে ক্রমশঃ গুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে—অবশেষে পৃথিবীতে পাঁচটি গুণই দেখা যাচ্ছে। তেমনই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হয়ে মধুর রসে পাঁচটি গুণই পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। অতএব পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি, 'মধুর' বা 'শৃঙ্গার' রস স্বরূপ প্রেমে পাওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—মধুর রসে উৎফুল্ল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন, সর্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্য প্রেমের প্রতীক হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই রাধারাণীর বশীভূত।

শ্লোক ৮৯

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৮৯ ॥

ময়ি—আমাকে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **হি**—অবশ্যই; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **অমৃতত্বায়**—অমৃতত্ব; **কল্পতে**—যোগ্য হয়; **দিষ্ট্যা**—সেই ভাগ্যের ফলে; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—ছিল; **মৎ**—আমার জন্য; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **ভবতীনাম্**—তোমাদের সকলের; **মৎ**—আমার; **আপনঃ**—সাক্ষাৎকার।

অনুবাদ

"'জীব আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে অমৃতত্ব লাভ করে। হে ব্রজবালাগণ, তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছ, তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণজনক, কেন না এই অনুরাগই আমাকে লাভ করার একমাত্র উপায়।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে (১০/৮২/৪৪) মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোকের দুটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—'ভক্তি' এবং 'অমৃতত্ব'। মানবজীবনের লক্ষ্য হচ্ছে অমৃতত্ব লাভ করা। সেই অমৃতত্ব লাভ হয় কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে।

শ্লোক ৯০

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁকে যেভাবে ভজনা করবেন, তিনিও তাকে সেইভাবে ভজন করবেন।

তাৎপর্য

প্রাকৃত লোকের বিচারে—"যিনি যেভাবে ভজনা করুন না কেন, তিনি ভগবানকে পাবেন। এই ধরনের মানুষেরা বলে যে, ভগবানের আরাধনা করার একটি মনগড়া পথ তৈরি করা যেতে পারে এবং সেই পথ অনুসারে ভগবানের আরাধনা করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা যে উপায়েই ভগবানের ভজন করা যায়, তাতে কিছু যায় আসে না।" তারা দৃষ্টান্ত দেয় যে, "কোন স্থানে যেতে হলে যেমন তার বিভিন্ন পথ আছে, তেমনই ভগবানের কাছে যাওয়ারও বিভিন্ন পথ আছে, ভগবানকে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম, যে কোন নামে ডাকা হোক না কেন, একই কথা; অথবা যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাকে যে কোন নামে ডাকলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, তেমনই ভগবানের সম্বন্ধেও সেই একই কথা।" কিন্তু এই সমস্ত কথা জড়বাদী মনোধর্মীদের মনোরঞ্জক হলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিরা এই উক্তিকে সিদ্ধান্তপূর্ণ বলে মনে করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা যে যে দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা সেই সেই দেব-দেবীর লোক প্রাপ্ত হয়; যারা ভূত-প্রেতের পূজা করে তারা ঐলোক প্রাপ্ত হয়; যারা পিতৃপুরুষদের পূজা করে তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়; আর যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমার কাছে ফিরে আসে।"

ভগবদ্ভক্তরাই কেবল ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারেন, দেব-দেবীর উপাসক,

কর্মী, যোগী অথবা অন্য কেউ নয়। যারা স্বর্গকামী, তারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে, এবং ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি তাদের এই সমস্ত আধিকারিক দেবতাতেই শ্রদ্ধারূপ ফল প্রদান করে, তাকে আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ ফল থেকে বঞ্চিত করেন এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মচক্রে কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্যে ভ্রমণ করান। তাই, *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজা তারাই করে যাদের বুদ্ধি মায়া কর্তৃক অপহৃত হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়াঃ ॥

"জড়-ভোগ-বাসনার দ্বারা যাদের মনোবৃত্তি বিকৃত হয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অর্চনের বিধি অবলম্বন করে।"

স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও, তার ফল ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা দেব-দেবীর পূজা করে। তার ফলে তারা যা ফল প্রাপ্ত হয় তা ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত। যারা দেব-দেবীর পূজা করে তারা সেই সমস্ত দেব দেবীর লোকে গমন করে, কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হয়।" (*ভঃ গীঃ* ৭/২৩)

স্বর্গলোক বা এই জড় জগতের অন্য কোন গ্রহে গেলেও নিত্য জীবন, পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দ লাভ হয় না। এই জড়া প্রকৃতির যখন লয় হবে, তখন সমস্ত জড় উন্নতিও শেষ হয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, যারা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত তারাই কেবল চিৎ-জগৎ বা ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে, অন্য কেউ নয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির মাধ্যমে কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়। আর ভক্তির মাধ্যমে কেউ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করে, তখন তিনি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন।" (*ভঃ গীঃ* ১৮/৫৫)

নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না; তাই তাদের পক্ষে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকার ফল লাভ হয়। এমন নয় যে, সমস্ত প্রচেষ্টাই এক ফল প্রদান করে। অন্যাভিলাষশূন্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির তুলনা করা চলে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/২) তাই বলা হয়েছে—

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

"জড় বাসনাযুক্ত সবরকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই *ভাগবত-মহাপুরাণ* পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে—যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই *ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

যারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তারা নানারকম ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই তথাকথিত ধর্মকে কৈতব-ধর্ম বা ছল ধর্ম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধরনের মানুষেরা কখনও ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের উদ্দেশ্য এবং ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতারা—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপ বিরূপ বৈভব, তাঁরা ভগবানের আদেশে জগৎ-সৃষ্টির কার্যের বিভিন্ন অংশের পরিচালনা করছেন। জগৎ-সৃষ্টি কার্যটি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কোন ব্যাপার নয়। চিদ্ধামে যে সমস্ত কার্য হয়, তা-ই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য, তা যোগমায়া দ্বারা সাধিত হয়। যোগমায়া—ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎ-শক্তি, যারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবাপ্রার্থী হন, তারা যোগমায়ার নিষ্কপট কৃষ্ণসেবোন্মুখী কৃপা লাভ করেন। আর যারা জড় ব্রহ্মাণ্ডে ধর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎ-সেবা-বিমুখ নির্বিশেষ হতে ইচ্ছা করেন, তারা মহামায়া বা রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন।

ব্রজগোপিকাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে, ভক্তরা কখনও কখনও কাত্যায়নীদেবীর পূজা করেন, কিন্তু তারা জানেন যে কাত্যায়নীদেবী হচ্ছেন যোগমায়ার প্রকাশ। ব্রজগোপিকারা নন্দনন্দনকে পতিত্বে লাভ করার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁর নিত্যসেবা লাভের জন্য চিৎ-শক্তি যোগমায়ার আরাধনা করেছিলেন। পক্ষান্তরে, *সপ্তশতী* শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ এবং ধনী বৈশ্য সমাধি জড়সিদ্ধি লাভের জন্য জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। সুতরাং যোগমায়া এবং মহামায়াকে এক বলে বিবেচনা করে তাদের আরাধনা সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করাটা খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যারা নিতান্ত মূর্খ তারাই সবকিছুকে এক বলে চালাবার চেষ্টা করে। মূর্খ পাষণ্ডিরাই বলে যোগমায়ার আরাধনা এবং মহামায়ার আরাধনা এক। এই সিদ্ধান্তটি মনোধর্ম-প্রসূত, তার কোন শাস্ত্রসম্মত ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয়তঃ এই জগতে দেখা যায়—কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' হয়। কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরকম নয়। ভগবানের নাম ও নামীতে ভেদ নেই, ভগবানের কোন

নামই নিরর্থক বা ভগবানের বাস্তব সত্ত্বা থেকে ভিন্ন নয়। শ্রীভগবানের নাম—বহুবিধ যেমন, পরমাত্মা, ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা, নারায়ণ, রুক্মিণীরমণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। কিন্তু যিনি ভগবানকে 'সৃষ্টিকর্তা' বলে ডাকেন, তিনি নারায়ণের রস আস্বাদন করতে পারবেন না; কারণ, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি নামসমূহ জগতের বিষ্ণু-বহির্মুখ জীবের সৃষ্ট অক্ষজ জ্ঞানদত্ত নাম। 'সৃষ্টিকর্তা' বললে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্ত্বার উপলব্ধি হয় না; কারণ, সৃষ্টিকার্যটি ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য নয়, তাঁর বহির্মুখী শক্তির পরিচায়ক। আবার 'ব্রহ্ম' বললে ভগবানের ষড়বিধ ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; কারণ, ভগবানের নির্বিশেষ ভাবই 'ব্রহ্ম' নামে খ্যাত, সুতরাং তা-ও ভগবানের সম্যক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের দ্যোতক নাম নয়। 'পরমাত্মা' বললেও ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না; কারণ, ব্যষ্টি জীবের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই 'পরমাত্মা' বলে খ্যাত। আবার নারায়ণ ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত আবার এক কৃষ্ণতে মাধুর্যের দ্বারা নারায়ণের ঐশ্বর্য আচ্ছাদিত হয়ে সম্পূর্ণ চমৎকারিতা বর্তমান দেখে নারায়ণ ভজনে অভিলাষ করেন না—গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 'রুক্মিণীরমণ' বলে সম্বোধন করেন না। 'রুক্মিণীরমণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' জাগতিক অভিধানে প্রতিশব্দ বা সমপর্যায়ভুক্ত শব্দ হলেও, একটির পরিবর্তে আর একটি ব্যবহৃত হতে পারে না। যদি মূর্খতাবশে কেউ ব্যবহার করে; তাহলে 'রসাভাস' দোষ হয়। যারা ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, তারা অনভিজ্ঞ সমাজের মতো এই ধরনের রসাভাস বা সিদ্ধান্ত বিরোধ করেন না, কিন্তু তবুও কলির প্রাবল্যের ফলে উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহা-সমন্বয়বাদ বলে এবং সৎ-সিদ্ধান্তই মূর্খ লোকের দ্বারা গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা নামে প্রচারিত হচ্ছে।

শ্লোক ৯১

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৯১ ॥

যে—যারা; যথা—যেভাবে; মাম্—আমাতে; প্রপদ্যন্তে—প্রপত্তি করে; তান্—তাদের; তথৈব—সেইভাবে; ভজামি—আমার কৃপা প্রদান করি; অহম্—আমি; মম—আমার; বর্ত্ম—পথ; অনুবর্তন্তে—অনুসরণ করে; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; পার্থ—হে অর্জুন; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

"ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান বলেছেন—"যারা যেভাবে আমাকে প্রপত্তি করে—সেইভাবে আমি তাদের পুরস্কৃত করি। হে পার্থ সকলেই আমার পথ অনুসরণ করে।'

শ্লোক ৯২

এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে ।
অতএব 'ঋণী' হয়—কহে ভাগবতে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২২) বলা হয়েছে যে, মাধুর্য রসে যে কৃষ্ণপ্রেম, তার প্রতিদান শ্রীকৃষ্ণ যথাযথভাবে দিতে পারেন না, তাই তিনি সেই ধরনের ভক্তদের কাছে ঋণী থেকে যান।

শ্লোক ৯৩

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৯৩ ॥

ন—না; পারয়ে—করতে পারি; অহম্—আমি; নিরবদ্য সংযুজাম্—যারা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কপট, তাদের; স্ব-সাধু-কৃত্যম্—উপযুক্ত প্রতিদান; বিবুধ-আয়ুষা—স্বর্গের দেবতাদের মতো আয়ুসম্পন্ন; অপি—যদিও; বঃ—তোমাদের; যঃ—যারা; মা—আমাকে; অভজন্—ভজনা করেছ; দুর্জয়-গেহ-শৃঙ্খলাঃ—দুর্জয় গৃহরূপ শৃঙ্খল; সংবৃশ্চ—ছেদন করে; তৎ—তা; বঃ—তোমাদের; প্রতিযাতু—প্রতিশোধ করা; সাধুনা—কেবলমাত্র সৎকর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

"হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবার ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছ। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক।"

শ্লোক ৯৪

যদ্যপি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য—মাধুর্য্যের ধুর্য ।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য—তাঁর মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা, তবুও ব্রজদেবীর সঙ্গ হলে সেই মাধুর্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি পায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের অন্তরঙ্গতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মাধুর্য-প্রেমে। অন্যান্য রসে, ভগবান এবং ভক্ত, এমন পরিপূর্ণরূপে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন না। *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৩/৬) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে তা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৯৫

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৯৫ ॥

তত্র—সেখানে; অতিশুশুভে—অত্যন্ত সুন্দর; তাভিঃ—তাদের দ্বারা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; দেবকীসুতঃ—দেবকীর পুত্র; মধ্যে—মাঝখানে; মণীনাম্ হৈমানাম্—সুবর্ণখচিত মণীদের; মহামরকতঃ—মহামরকত নামে রত্ন; যথা—যেমন।

অনুবাদ

"দেবকীসুত ভগবান সর্বসৌন্দর্যের সার হলেও, ব্রজদেবীর সঙ্গে তিনি সুবর্ণখচিত মণিসমূহের মধ্যে মহামরকতের মতো অতিশয় শোভা পেয়ে থাকেন।"

শ্লোক ৯৬

প্রভু কহে, এই—'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয় ।
কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এটি অবশ্যই সাধ্য তত্ত্বের অবধি, তবুও যদি আরও কিছু থাকে, তা বল।"

শ্লোক ৯৭

রায় কহে,—ইহার আগে পুছে হেন জনে ।
এতদিন নাহি জানি, আছয়ে ভুবনে ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "এরও পরে আরও কিছু আছে কিনা, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে এমন কোন লোক এই পৃথিবীতে আছে বলে আমি এতদিন জানতাম না।"

শ্লোক ৯৮

ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি' ।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "ব্রজগোপিকাদের প্রেমের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম 'সাধ্য শিরোমণি', যাঁর মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯৯

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণুরত্যন্তবল্লভা ॥ ৯৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; প্রিয়া—অত্যন্ত প্রিয়া; বিষ্ণোঃ—শ্রীকৃষ্ণের; তস্যা—তাঁর; কুণ্ডম্—কুণ্ড; প্রিয়ম্—অত্যন্ত প্রিয়; তথা—তেমনই; সর্ব-গোপীষু—সমস্ত গোপীদের মধ্যে; সা—যিনি; এব—অবশ্যই; একা—একমাত্র; বিষ্ণোঃ—শ্রীকৃষ্ণের; অত্যন্ত-বল্লভা—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

"শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁর কুণ্ড রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তেমনই প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত, এবং তা শ্রীল রূপ গোস্বামীর *লঘুভাগবতামৃত* (২/১৪৫) গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এই শ্লোকটি আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের দুশ পনের, এবং পুনরায় মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকেও উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০০

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১০০ ॥

অনয়া—এই একজনের দ্বারা; আরাধিতঃ—আরাধিত; নূনম্—অবশ্যই; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; হরিঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; ঈশ্বরঃ—পরম ঈশ্বর; যৎ—যাঁর থেকে; নঃ—আমাদের; বিহায়—পরিত্যাগ করে; গোবিন্দঃ—গোবিন্দ; প্রীতঃ—প্রীত; যাম্—যাঁকে; অনয়ৎ—নিয়ে গিয়েছেন; রহঃ—নির্জন স্থানে।

অনুবাদ

"ভগবান যথার্থই তাঁর দ্বারা আরাধিত হয়েছেন। তাই তিনি (গোবিন্দ) তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাঁকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *অনয়ারাধিত* শব্দটির থেকে 'রাধা' নামটির উৎপত্তি। তার অর্থ হচ্ছে "তাঁর দ্বারা ভগবান আরাধিত হন"। কখনও কখনও *শ্রীমদ্ভাগবতের* সমালোচকেরা *শ্রীমদ্ভাগবতে* রাধারাণীর নামটি খুঁজে পান না, কিন্তু সেই রহস্য এখানে উদঘাটিত হয়েছে *অনয়ারাধিত* শব্দটিতে, যার থেকে 'রাধা' নামটি উদ্ভূত হয়েছে। অন্যান্য পুরাণে অবশ্য শ্রীমতী রাধারাণীর নাম সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গোপী—কৃষ্ণ আরাধনায় সর্বোত্তমা এবং তাই তাঁর নাম 'রাধা' বা আরাধনায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা।

শ্লোক ১০১

প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে ।
অপূর্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এরও আগের কথা বল। তোমার এই কথা শুনে আমি অত্যন্ত সুখ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তোমার মুখ থেকে এক অপূর্ব অমৃতের নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১০২

চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে ।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"রাসনৃত্যের সময়, অন্যান্য গোপিকাদের উপস্থিতি থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে প্রেম বিনিময় করেননি। কেননা অন্যের অপেক্ষা থাকায় তাঁদের প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশিত হয়নি, তাই তিনি তাঁকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অন্য গোপিকাদের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে জয়দেব গোস্বামীর *গীতগোবিন্দ* থেকে *কংসারিরপি* শ্লোকটির উল্লেখ করা হবে।

শ্লোক ১০৩

রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ ।
তবে জানি,—রাধাকৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যান্য গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ অত্যন্ত গভীর।"

শ্লোক ১০৪

রায় কহে,—তবে শুন প্রেমের মহিমা ।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন—"তাহলে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের মহিমা শ্রবণ করুন। ত্রিজগতে রাধারাণীর প্রেমের উপমা নেই।

শ্লোক ১০৫

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া ।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণ তাঁকে অন্যান্য গোপিকাদের সমতুল্যা বলে গণ্য করেছেন বলে, শ্রীমতী রাধারাণী এক সময় রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে যান। তখন শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ করতে করতে বনে বনে তাঁর অন্বেষণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০৬

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১০৬ ॥

কংস-অরিঃ—কংসারি শ্রীকৃষ্ণ; অপি—অধিকন্তু; সংসার—আনন্দের সার (রাসলীলা); বাসনা—বাসনার দ্বারা; বদ্ধ—আবদ্ধ; শৃঙ্খলাম্—যিনি শৃঙ্খলের মতো; রাধাম্—শ্রীমতী রাধারাণীকে; আধায়—ধারণ; হৃদয়ে—হৃদয়ে; তত্যাজ—ত্যাগ করেছিলেন; ব্রজ-সুন্দরীঃ—অন্যান্য গোপিকাদের।

অনুবাদ

"কংসারি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার আনন্দ উৎসবে শ্রীমতী রাধারাণীকে হৃদয়ে নিয়ে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের সার অনুভবের প্রধান সহায়িকা।"

শ্লোক ১০৭

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ১০৭ ॥

ইতঃ ততঃ—এখানে ওখানে; তাম্—তার; অনুসৃত্য—অন্বেষণ করে; রাধিকাম্—শ্রীমতী রাধারাণীকে; অনঙ্গ—কামদেবের; বাণব্রণঃ—বাণের আঘাতের দ্বারা; খিন্নমানসঃ—যার হৃদয় আহত হয়েছে; কৃতানুতাপঃ—অশোভন আচরণের জন্য অনুতপ্ত; স—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); কলিন্দনন্দিনী—যমুনা নদী; তটান্ত—তটপ্রান্ত; কুঞ্জে—কুঞ্জে; বিষসাদ—বিষণ্ণ হয়েছিলেন; মাধবঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

"অনঙ্গের বাণের দ্বারা আহত হয়ে খিন্নমানস ও কৃতানুতাপ মাধব—যমুনার তটস্থিত বনে ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণ করেও না পেয়ে, কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে বিষাদগ্রস্ত হলেন।"

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোক দুটি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত *গীতগোবিন্দ* (৩/১-২) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১০৮

এই দুই-শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দুটি শ্লোকের অর্থ বিচার করলে বোঝা যায় যে, এই ধরনের উচ্চারণে কি অমৃত রয়েছে! তা বিচার করলে যেন অমৃতের খনির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

শ্লোক ১০৯

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস ।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্যে রহে রাধা-পাশ ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যদিও শতকোটি গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্য-বিলাস করছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এক মূর্তিতে তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে তাদের মাঝখানে বিরাজ করছিলেন।

শ্লোক ১১০

সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্বত্র 'সমতা' ।
রাধার কুটিল-প্রেমে হইল 'বামতা' ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"সাধারণ প্রেমে সর্বত্র সমতা দেখা যায়। কিন্তু রাধারাণীর কুটিল প্রেমে 'বামতা' বা বিরুদ্ধভাব প্রকাশ পেল।

শ্লোক ১১১

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১১১ ॥

অহেঃ—সর্পের; ইব—মতো; গতিঃ—গতি; প্রেম্ণঃ—প্রেমের; স্বভাব—প্রকৃতিগতভাবে; কুটিলা—কুটিল; ভবেৎ—হয়; অতঃ—সুতরাং; হেতোঃ—কারণবশতঃ; অহেতোঃ—অকারণেও; চ—এবং; যূনোঃ—যুবক-যুবতীর; মানঃ—অভিমান; উদঞ্চতি—উদয় হয়।

অনুবাদ

"সর্পের মতোই প্রেমের স্বভাব-কুটিল গতি। সেইজন্য যুবক-যুবতীর মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুই প্রকার মানের উদয় হয়।"

তাৎপর্য

রাসনৃত্যের সময় দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পাশে—

এক মূর্তি কৃষ্ণ এইভাবে প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শ্রীমতী রাধারাণী স্বীয় কুটিল প্রেমে 'বামতা' প্রকাশ করেছিলেন। এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত *উজ্জ্বলনীলমণি* (শৃঙ্গারভেদ কথন ১০২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১২

ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি' ।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল শ্রীহরি ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী যখন অভিমান করে রাস ছেড়ে চলে গেলেন, তখন তাঁকে না দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৩-১১৪

সম্যক্‌সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা ।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ১১৩ ॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে ।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পরিপূর্ণ এবং তাঁর বাসনার সারভূত প্রকাশ হচ্ছে রাসলীলা, এবং সেই রাসলীলার বাসনাতে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সংযোগ-স্থাপনকারী শৃঙ্খলা; তাঁকে ছাড়া রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে উজ্জ্বল আনন্দের সঞ্চার করে না। তাই তিনি রাসমণ্ডলী ছেড়ে তাঁর অন্বেষণ করতে গেলেন।

শ্লোক ১১৫

ইতস্ততঃ ভ্রমি' কাহাঁ রাধা না পাঞা ।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ইতস্তত ভ্রমণ করে কোথাও শ্রীমতী রাধারাণীকে না পেয়ে, অনঙ্গের বাণে খিন্ন হয়ে তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন।

শ্লোক ১১৬

শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শতকোটি গোপীতেও শ্রীকৃষ্ণের কাম নির্বাপিত হল না, তা থেকেই শ্রীমতী রাধারাণীর অপ্রাকৃত গুণ অনুমান করা যায়।"

শ্লোক ১১৭-১১৮

প্রভু কহে—যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে ।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ॥ ১১৭ ॥
এবে সে জানিলু সাধ্য-সাধন-নির্ণয় ।
আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয় ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে বললেন—"যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, সেই সমস্ত তত্ত্ববস্তু আমার জানা হল। এখন আমি জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তা লাভের পন্থা জানতে পারলাম। কিন্তু তবুও, আমার মনে হয় যে, তারও আগে হয়তো আরও কিছু আছে, তা শুনতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে।

শ্লোক ১১৯

'কৃষ্ণের স্বরূপ' কহ 'রাধার স্বরূপ' ।
'রস' কোন্ তত্ত্ব, 'প্রেম'—কোন্ তত্ত্বরূপ ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি আমাকে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে বল। রস কোন্ তত্ত্ব, আর রূপই বা কোন্ তত্ত্ব, তাও তুমি আমাকে বিশ্লেষণ করে শোনাও।

শ্লোক ১২০

কৃপা করি' এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে ।
তোমা-বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃপা করে এই তত্ত্ব তুমি আমাকে শোনাও। তুমি ছাড়া আর কেউই এই তত্ত্ব নিরূপণ করতে সক্ষম নয়।"

শ্লোক ১২১

রায় কহে,—ইহা আমি কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি আমি বাণী ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আপনি আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন, আমি তাই বলছি।

শ্লোক ১২২

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"শুক পাখীর মতো আমি আপনার শেখানো বুলি আবৃত্তি করছি। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার নাট্যাভিনয় কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ১২৩

হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি হৃদয়ে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন এবং আমার জিহ্বা দিয়ে আমাকে বলান। আমি যে কি বলছি, তা ভাল না মন্দ কিছুই আমি জানি না।"

শ্লোক ১২৪

প্রভু কহে,—মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী ।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না, আমি কেবল মায়াবাদরূপ দর্শনের সমুদ্রে নিরন্তর ভাসছি।

শ্লোক ১২৫

সার্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্মল হইল ।
'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ', তাঁহারে পুছিল ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার মন নির্মল হল। আমি তখন তাঁকে কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব শোনাতে অনুরোধ করলাম।

শ্লোক ১২৬

তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা ।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন আমাকে বললেন, কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব আমি জানি না। তা কেবল রামানন্দ রায় জানেন, কিন্তু তিনি তো এখন এখানে নেই।"

শ্লোক ১২৭

তোমার ঠাঞি আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া ।
তুমি মোরে স্তুতি কর 'সন্ন্যাসী' জানিয়া ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার মহিমা শুনে আমি তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু আমি 'সন্ন্যাসী' বলে তুমি আমার স্তুতি করছ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সম্পর্কে বলেছেন—"অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী গুরু-বৈষ্ণবের কাছে জড় সম্পদের মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ বলে গুরু-বৈষ্ণবের কাছে ঐ সমস্ত বিষয়-মদের দম্ভ প্রদর্শন করা কখনও উচিত নয়। ঐ জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত ও শ্রীর অভিমানকে সম্বল করে কেউ যদি গুরু-বৈষ্ণবের কাছে বহির্দৃষ্টিতে উপস্থিত হয়েও প্রকৃত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার ভাব নিয়ে অভিগমন না করে, তাহলে বৈষ্ণব তাকে তার কাম্য বাহ্য সম্মান দিয়ে বিদায় করে। অব্রাহ্মণ বা শূদ্র-জ্ঞানে তাকে কখনও দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধানুভূতি বুদ্ধি প্রদান করেন না। তার ফলে সেই ব্যক্তি পরমার্থবঞ্চিত হয়ে নরকপথেই অগ্রসর হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতে স্বয়ং বর্ণাশ্রমধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় (ব্রাহ্মণ বর্ণ ও সন্ন্যাস আশ্রমে) অবস্থান করে এবং শ্রীরামানন্দ প্রভুকে তার থেকে নিকৃষ্টতর অবস্থায় (শূদ্র বর্ণ ও গৃহস্থ আশ্রমে) অবস্থাপিত দেখিয়ে কলিহত জড়বুদ্ধিসর্বস্ব নির্বোধ জীবকে ঐপ্রকার দুর্বুদ্ধি থেকে সতর্ক করবার জন্য জগদ্‌গুরু আচার্যরূপে শিক্ষা প্রদান করলেন।"

শ্লোক ১২৮

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই 'গুরু', তা তিনি ব্রাহ্মণ হোন, কিম্বা সন্ন্যাসীই হোন অথবা শূদ্রই হোন, তাতে কিছু যায় আসে না।"

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির পথে এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"কারও মনে করা উচিত নয়, যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বোচ্চ আশ্রম সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন, তাই শূদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীল রামানন্দ রায়ের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত হয়নি। এই ভ্রান্ত ধারণাটি নিঃসরণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলেছিলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান বর্ণাশ্রম থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রদের বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থায় সকলেই গুরু হওয়ার যোগ্য, কেননা কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান উপলব্ধ হয় চিন্ময় আত্মার স্তরে। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করতে হলে কেবল চিন্ময় আত্মার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। তাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ইত্যাদির কোন গুরুত্ব নেই। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু হতে পারেন।

হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে, "ব্রাহ্মণ বর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্র নেওয়া উচিত নয়'—এই নির্দেশটি জড় সমাজের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং জড় আসক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। কেউ যদি কৃষ্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐকান্তিকভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করার বাসনা করেন, তিনি যে কোন বর্ণের কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু গ্রহণ করতে পারেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও বলেছেন—"বর্ণে ব্রাহ্মণই হোন বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হোন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হোন বা ব্রহ্মচারী-বাণপ্রস্থ-গৃহস্থই হোন, যে কোন বর্ণে যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হোন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু, অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করে,—বর্ণ ও আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নয়। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে—

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্‌-ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনি কখনই শূদ্র নন, শূদ্র পরিবারে জন্ম হলেও নন। কিন্তু বিপ্র বা ব্রাহ্মণ যদি পঠন, পাঠন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই ছয়টি ব্রাহ্মণোচিত কর্মে অত্যন্ত নিপুণও হন এবং বৈদিক মন্ত্র-তন্ত্রের বিশারদ হন, কিন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব না হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন না। কিন্তু চণ্ডালের গৃহে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন। এগুলি শাস্ত্র-নির্দেশ এবং সেই নির্দেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী গুরু ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তেমনই নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অনেকের মতে, তিনি লক্ষ্মীপতি-তীর্থের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অদ্বৈত আচার্য যদিও গৃহস্থ, মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত শ্রীরসিকানন্দ ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত গুরুর কাছে ব্রাহ্মণের দীক্ষা নেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/১১/৩৫) বর্ণিত হয়েছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

কারও যদি শূদ্র পরিবারে জন্ম হয় অথচ তিনি যদি সদ্‌গুরুর সমস্ত গুণাবলী সম্পন্ন হন, তাহলে তাঁকে কেবল ব্রাহ্মণ বলেই নয়, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন গুরু বলে স্বীকার করতে হবে। এটিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই সমস্ত বৈষ্ণবদের বৈদিক-বিধি অনুসারে যজ্ঞ-উপবীত ধারণের প্রথা প্রবর্তন করে গেছেন।

কখনও কখনও ভজনানন্দী বৈষ্ণব সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করেন না, তার অর্থ এই নয় যে, প্রচারের জন্য সেই প্রথা অবলম্বন করা হবে না। দুই প্রকার বৈষ্ণব রয়েছেন—ভজনানন্দী এবং গোষ্ঠ্যানন্দী। ভজনানন্দী—প্রচারে উৎসাহী নন, কিন্তু গোষ্ঠ্যানন্দী—জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব প্রচারে উৎসাহী। বৈষ্ণবের স্তর ব্রাহ্মণের থেকেও ঊর্ধ্বে। প্রচারকদের ব্রাহ্মণ বলে চিনতে হবে, তা না হলে বৈষ্ণবের চিন্ময় অবস্থা বুঝতে ভুল হতে পারে। কিন্তু, বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণত্ব জন্ম অনুসারে নয়, কর্ম অনুসারে। দুর্ভাগ্যবশত নির্বোধ মানুষেরা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের পার্থক্য বুঝতে পারে না। তাদের ধারণা ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম না হলে গুরু হওয়া যায় না। সেইজন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকে উল্লেখ করেছেন—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

কেউ যখন গুরু হন, তখন তিনি আপনা থেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। কখনও কখনও 'কুলগুরু'রা বলে যে, 'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়', বলতে বোঝান হয়েছে যে, যারা ব্রাহ্মণ নয় তারা শিক্ষাগুরু বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু হতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা গুরু হতে পারেন না। এই সমস্ত কুলগুরুদের কাছে, জন্ম এবং বংশ পরিচয়ই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু, বৈষ্ণবদের কাছে বংশ-পরিচয়ের কোন গুরুত্ব নেই। গুরু শব্দটি বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পন্থা গ্রহণ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী—

পৃথিবীতে আছে যত-নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হৈবে মোর নাম ॥

সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের প্রচার হবেই। তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ তা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সেই সঙ্গে শূদ্র বা চণ্ডালই থাকবে। যখনই কেউ শুদ্ধ বৈষ্ণবরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তখন তাকে সৎ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতেই হবে। সেইটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নির্দেশের সারমর্ম।

শ্লোক ১২৯

'সন্ন্যাসী' বলিয়া মোরে না করিহ বঞ্চন ।
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি' পূর্ণ কর মন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"আমি 'সন্ন্যাসী' বলে আমাকে বঞ্চনা কর না। 'রাধাকৃষ্ণ'-এর তত্ত্ব বর্ণনা করে তুমি আমার মনকে তৃপ্ত কর।"

শ্লোক ১৩০-১৩১

যদ্যপি রায়—প্রেমী, মহাভাগবতে ।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১৩০ ॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা—পরম প্রবল ।
জানিলেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীরামানন্দ রায় ছিলেন মহান কৃষ্ণপ্রেমিক ও মহাভাগবত, এবং যদিও কৃষ্ণমায়া তাঁর মনকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে রামানন্দ রায়ের মন বিচলিত হল।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত সর্বদাই ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে ক্রিয়া করেন। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষ মায়ার প্রবাহে প্রবাহিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই বলেছেন—"মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।"

বহিরঙ্গা মায়া শক্তির কবলিত মানুষ ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যায়। অর্থাৎ, এই জড় জগতে মানুষ মায়ার দাস। কিন্তু, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত জীব ভগবানের দাস। রামানন্দ রায় যদিও জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নেই, তবুও তিনি সেই বিষয়ে বলে যেতে লাগলেন, কেননা তা ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা।

শ্লোক ১৩২

রায় কহে,—"আমি—নট, তুমি—সূত্রধার ।
যেই মত নাচাও, তৈছে চাহি নাচিবার ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন—"আমি—নট, আর আপনি—সূত্রধার। আপনি আমাকে যেভাবে নাচাবেন, আমি সেই ভাবেই নাচবো।

শ্লোক ১৩৩

মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি—বীণা-ধারী ।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আমার জিহ্বা একটি বীণার মতো, আর আপনি বীণাবাদক। আপনার মনে যেই ভাবের উদয় হয়, আমি সেই ভাবই উচ্চারণ করি।"

শ্লোক ১৩৪

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্ব-অবতারী, সর্বকারণ-প্রধান ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় তখন কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ, পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্ব অবতারের অবতারী এবং সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৩৫

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ,—সবার আধার ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত অবতার এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৩৬

সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
সর্বৈশ্বর্য-সর্বশক্তি-সর্বরস-পূর্ণ ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর অপ্রাকৃত দেহ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তিনি নন্দ মহারাজের পুত্র। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত রসে পূর্ণ।

শ্লোক ১৩৭

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১৩৭ ॥

ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; পরমঃ—পরম; কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সৎ—নিত্য স্থিতি; চিৎ—পরম জ্ঞান; আনন্দ—পরম আনন্দ; বিগ্রহঃ—রূপ; অনাদিঃ—অনাদি; আদিঃ—আদি; গোবিন্দঃ—শ্রীগোবিন্দ; সর্বকারণ-কারণম্—সমস্ত কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ নামেও পরিচিত, তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দ (নিত্য চেতন ও জ্ঞানময় এবং আনন্দময়)। তিনি হচ্ছেন সবকিছুর পরম উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে (৫/১) উদ্ধৃত হয়েছে, এবং আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১০৭ শ্লোকেও তার উল্লেখ রয়েছে।

শ্লোক ১৩৮

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' ।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্ময় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী এবং কামবীজ দ্বারা তাঁর উপাসনা হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৬) বৃন্দাবনের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে সবকিছুই চিন্ময়; অপ্রাকৃত লক্ষ্মী বা গোপীসমূহ—কান্তা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সকলের কান্ত, সেখানকার বৃক্ষসমূহ—কল্পতরু; ভূমি—চিন্তামণি, জল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, চন্দ্র-সূর্যাদিরূপ জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহ—চিদানন্দময়, সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়ভাবই আস্বাদ্য বা অনুশীলনীয়, সেখানকার চিন্ময় গাভীসমূহ থেকে ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে নিমেষার্ধকাল নিত্যকালই; অর্থাৎ সেখানে কাল বৃথা অতিবাহিত হয়ে কোন ভিন্ন কালে পরিণত হয় না। এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের—যাকে কতিপয় দুর্লভ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ সাধুরা 'গোলোক' বলে জানেন—"সেই শ্বেতদ্বীপের—আমি ভজনা করি।" জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়াসক্ত মানুষেরা বৃন্দাবনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; কেননা এই বৃন্দাবন অপ্রাকৃত। সেখানে ভগবানের সমস্ত লীলাবিলাস অপ্রাকৃত। সেখানে কোন কিছুই জড় নয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তৎকৃত প্রার্থনায় গেয়েছেন—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে ।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ-পদে হৈবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরীতি ॥

"কবে নিত্যানন্দ প্রভু আমাকে করুণা করবেন এবং তার ফলে কবে আমার সংসার-বাসনা তুচ্ছ হবে। বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কবে আমার মন শুদ্ধ হবে এবং কবে আমি শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে সক্ষম হব? কবে আমি রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রতি আকৃষ্ট হব; এবং কবে আমি বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব?"

নরোত্তম দাসের এই প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়, আমরা যদি বৃন্দাবনের মহিমা উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে সর্ব প্রথমে আমাদের সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে, সকাম কর্ম ও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে।

'অপ্রাকৃত নবীন মদন'—'অপ্রাকৃত' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—জড় বা প্রাকৃত-এর বিপরীত, চিন্ময় বা অপ্রাকৃত, উভয় অবস্থাতেই 'কাম' বর্তমান; তবে জড় কাম কালের প্রভাবে ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই তার অনুভূতি হয় এবং তারপর তা মলিন হয়ে যায় এবং অবশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। আর অপ্রাকৃত কাম—নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ কালের প্রভাবে তা শেষ হয়ে যায় না, সর্বদাই তা উজ্জ্বল থাকে। জড় জগতে, ক্ষণকাল পরেই বিরক্তিকর এবং বিষাদজনক হয়ে ওঠে—জড় কাম নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু চিৎ জগতে, অন্য সমস্ত বস্তুর মতো কামও নিত্য। আর যেখানে চিৎ-ইন্দ্রিয়ের সেব্য মদন—মন্মথমন্মথ কৃষ্ণচন্দ্র তিনি—নিত্য নবীন স্বয়ংরূপবিগ্রহ।

'কামগায়ত্রী'—শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ততঃ স্মৃতা।* "যে বস্তু গানকারীকে ত্রাণ করে বা গান দ্বারা ত্রাণ করায়, তা গায়ত্রী।' গায়ত্রী মন্ত্রের বিশ্লেষণ করে মধ্যলীলার একবিংশতি পরিচ্ছেদের একশো পঁচিশ শ্লোকে বলা হয়েছে—

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥

এই কামগায়ত্রী মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। কামগায়ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য নেই। তার সাড়ে চব্বিশটি অক্ষর। শব্দের আকারে এই মন্ত্র 'কৃষ্ণ', সেই অক্ষর চন্দ্রের মতো কৃষ্ণচন্দ্রকে উদয় করে, ত্রিজগৎ কামময় করল। এই মন্ত্রে—*'ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ'*; কামদেব বা মদনমোহন কৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্বের অধিদেবতা, পুষ্পবাণ বা গোবিন্দই অভিধেয়তত্ত্বের অধিদেবতা, এবং অনঙ্গ গোপীজনবল্লভ হয়ে প্রয়োজনতত্ত্বের অধিদেবতা। এই কামগায়ত্রী জড় জগতের বস্তু নয়—তা অপ্রাকৃত।

অপ্রাকৃত অনুভূতিতে অপ্রাকৃত-বচন অবলম্বন পূর্বক সাধক শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হলে সেবোন্মুখ শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বাসনা পূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করা যায়।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"তোমার মনের দ্বারা সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা কর। আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর এবং আমাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণতি নিবেদন কর। তাহলে অবশ্যই তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৭-২৮) বলা হয়েছে—

অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্তিময়ী গতিঃ ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ ॥
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥ ২৭ ॥
ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধিবিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্ ॥ ২৮ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের বেণুনিনাদ থেকে উদ্ভূত বেদমাতা গায়ত্রী, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মুখারবিন্দের মধ্যে প্রবেশ করলেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণের বেণু থেকে উদ্ভূত গায়ত্রী মন্ত্র প্রাপ্ত হলেন। এইভাবে তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হলেন। তিনটি বেদের মূর্তিময় প্রকাশ সেই গায়ত্রী স্মরণ করার ফলে ব্রহ্মা দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন এবং সমুদ্রসদৃশ তত্ত্ববিজ্ঞান উপলব্ধি করলেন। তারপর তিনি সমস্ত বেদের সারাতিসার শ্রীকৃষ্ণকে এই স্তোত্রের দ্বারা তুষ্ট করলেন।"

বৈদিক মন্ত্রের উৎস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনিনাদ। পদ্মাসীন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এই বেণুনিনাদ শ্রবণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩৯

পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম ।
সর্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"স্ত্রী, পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করেন; তিনি সাক্ষাৎ কামদেবকেও মোহিত করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যেমন বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে, তেমনই চিৎ-জগতে বহু বৈকুণ্ঠ-লোক রয়েছে। এই চিৎ-জগৎ জড়-ব্রহ্মাণ্ড থেকে অনেক অনেক দূরে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা

এই ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-নক্ষত্রের সংখ্যা গণনা করতে পারে না। তারা তাদের অন্তরীক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অন্যান্য নক্ষত্রেও যেতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতার* (৮/২০) বর্ণনা অনুসারে, এই জড় জগতের অতীত চিৎ-জগৎ রয়েছে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

"এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জড় জগতের অতীত আর একটি জগৎ রয়েছে, যা নিত্য এবং চিন্ময়। এই জড় জগতের বিনাশ হলেও সেই জগতের কখনও বিনাশ হয় না, সেই জগৎ যেমনটি আছে তেমনই থাকে।"

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা জড়া-প্রকৃতির অতীত। ভাব অথবা স্বভাব বলতে প্রকৃতি বোঝায়। পরা-প্রকৃতি নিত্য এবং জড় জগতের বিনাশ হলেও চিৎ-জগতের গ্রহগুলি বর্তমান থাকে। জড়দেহের বিনাশ হলেও আত্মা যেমন বর্তমান থাকে, তেমনই চিৎ-জগৎও নিত্য বর্তমান। সেই চিৎ-জগৎকে বলা হয় অপ্রাকৃত বা প্রাকৃত জগতের বিপরীত। সেই অপ্রাকৃত চিৎ-জগতের সর্বোচ্চলোক হচ্ছে গোলোক। সেটি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'। মদন কামদেবের নাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 'অপ্রাকৃত মদন'। তাঁর দেহ এই জড় জগতের কামদেবের মতো জড় নয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময়—সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ। তাই তাঁকে বলা হয় 'অপ্রাকৃত মদন'। তিনি মন্মথ মদন নামেও পরিচিত। যার অর্থ হচ্ছে, তিনি মন্মথকে পর্যন্তও আকৃষ্ট করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-গোপিকাদের সঙ্গে রাসনৃত্য-বিলাস করেছিলেন বলে স্থূল জড়বাদী নীতিবাগীশেরা তাঁর মনোহর রূপ এবং কার্যকলাপের নিন্দা করে, কিন্তু তাদের এই অভিযোগের প্রকৃত কারণ হচ্ছে তারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নন। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাঁর শ্রীঅঙ্গে কোন জড় কলুষ নেই, অতএব তাঁর শ্রীঅঙ্গকে রক্ত, মাংস এবং অস্থি-মজ্জা বলে মনে করা উচিত নয়। মায়াবাদীরা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড়, এবং সেটি হচ্ছে একটি অতি জঘন্য, স্থূল, জড় ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং ব্রজগোপিকারাও সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর চিন্ময় হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ স্বরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সহচরীবৃন্দসহ আনন্দচিন্ময় রসে প্রতিভাবিত হয়ে নিত্যকাল বিরাজ করেন।"

ব্রজগোপীরাও সেই চিন্ময় গুণ বিশিষ্টা (*নিজরূপতয়া*), কেননা তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজগোপীদের, জড় বস্তু বা জড় ধারণার সঙ্গে

কোন সম্পর্ক নেই। জড় জগতে জীব জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, এবং অজ্ঞানের ফলে তারা তাদের দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। কাম-বাসনা, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরকে উপভোগ হল জড় বিষয়। জড় জগতের মানুষের এই কাম-বাসনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামের কোন তুলনা করা যায় না। চিৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত না হলে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের অপ্রাকৃত কামের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* সোনার সঙ্গে গোপিকাদের কামকে তুলনা করা হয়েছে। আর জড় জগতের মানুষদের কামকে লোহার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোন অবস্থাতেই সোনার সঙ্গে লোহার তুলনা করা চলে না। স্থাবর এবং জঙ্গম—সমস্ত জীবই—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাই তাদের মধ্যেও কাম বাসনা রয়েছে। কিন্তু এই কাম বাসনা যখন জড়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তা অতি জঘন্য। জীব যখন জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে যথার্থ উন্নতি লাভ করে, তখন সে শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলা হয়েছে—

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন! যিনি জানেন যে আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, তাকে এই দেহ ত্যাগ করার পর আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। কেউ যখন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং তাঁর কার্যকলাপ অপ্রাকৃত, তিনি তৎক্ষণাৎ জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হন। জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীব কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৩) বলা হয়েছে—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন-দুজন সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা করে এবং সমস্ত সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন দুজন আমাকে তত্ত্বত জানতে পারে।"

সিদ্ধয়ে বলতে মুক্তিকে বোঝান হয়েছে। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে *(তত্ত্বতঃ)* জানতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগতে অবস্থান করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে যেন মনে হয় তিনি তার জড় দেহে বাস করছেন। চিন্ময় স্তরে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলে এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করা যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ব ২/১৮৭) গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

এই জড় জগতে কেউ যখন প্রীতি ও ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান, তখন তিনি এই জড় জগতে বিরাজ করছেন বলে মনে হলেও, আসলে তিনি মুক্ত। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে যিনি আমার সেবা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-গুণ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হন।"

কেবল মাত্র ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে মুক্তিলাভ করা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) বলা হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।* দিব্যজ্ঞান লাভ করে যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি কখনও কোন জড় বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা বা অনুশোচনা করেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ব্রহ্মভূত অবস্থার দুটি স্তর রয়েছে—স্বরূপগত এবং বস্তুগত। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানা সত্ত্বেও জড় জগতের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখেন, তার ব্রহ্মভূত অবস্থা স্বরূপগত। যার চেতনা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, যিনি এই ধরনের চেতনাসম্পন্ন তিনি প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনে বাস করছেন। জড় জাগতিক বিচারে তিনি যে কোন জায়গায় থাকতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বৃন্দাবনেই রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেউ যখন এইরকম উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি জড় দেহ ও মনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন এবং তখন তিনি যথার্থই বৃন্দাবনে বাস করেন। তাকে বলা হয় বস্তুগত।

স্বরূপগতস্তরে চিন্ময় কার্যকলাপ সম্পাদন করতে হয়। তাকে চিন্ময়ী গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করতে হয়—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহাঃ, বা ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নো অনঙ্গ প্রচোদয়াৎ। এগুলি কামগায়ত্রী বা কামবীজ মন্ত্র। সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হয়ে এই কামগায়ত্রী বা কামবীজ-মন্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* মধ্য লীলায় (৮/১৩৮-১৩৯) বলেছেন—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥
পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥

যিনি যথাযথভাবে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে পবিত্র হয়েছেন, তিনি এই মন্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। তিনি কামবীজ ও কামগায়ত্রী

জপ করেন, *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫) যে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে, সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য ভগবানের অপ্রাকৃত আরাধনা করা উচিত।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥

"সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তাহলে অবশ্যই তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে, তোমার কাছে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি, কেন না তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু।"

যেহেতু প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবেই সকলকে আকর্ষণ করেন। জড় আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার ফলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রতিহত হচ্ছে। এই জড় জগতে মানুষ সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট নয়, কিন্তু যখনই সে জড় জগতের আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ সকলের হৃদয়েই রয়েছে, এবং হৃদয় যখন নির্মল হয়, তখন সেই আকর্ষণ প্রকাশিত হয় *(চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্)।*

শ্লোক ১৪০

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ১৪০ ॥

তাসাম্—তাদের মধ্যে; **আবিরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **শৌরীঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্ময়মান**—হাসতে হাসতে; **মুখ-অম্বুজঃ**—মুখপদ্ম; **পীত-অম্বর-ধরঃ**—পীতবসনধারী; **স্রগ্বী**—ফুলমালায় ভূষিত; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **মন্মথ**—কামদেবের; **মন্মথঃ**—কামদেব।

অনুবাদ

"পীতবসন পরিহিত এবং ফুলমালায় সজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে গোপিকাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, তাঁকে তখন ঠিক কামদেবেরও কামদেব বলে মনে হচ্ছিল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩২/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪১

নানা-ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয় ।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়' ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রতিটি ভক্তই কোন বিশেষ রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই রসামৃতের আশ্রয় হচ্ছেন ভক্ত এবং বিষয় হচ্ছেন আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৪২

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ
প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ১৪২ ॥

অখিল-রস-অমৃত-মূর্তিঃ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য রস এবং হাস্য অদ্ভুত ইত্যাদি সাতটি গৌণ রস, এই সমস্ত রসের অমৃতময় ও পরমানন্দ সমন্বিত তাঁর মূর্তি; **প্রসৃমর**—প্রসরণশীল; **রুচি**—তাঁর দেহকান্তির দ্বারা; **রুদ্ধ**—অবরুদ্ধ করেছেন; **তারকা**—তারকানাম্নী গোপিকা; **পালি**—পালি নাম্নী গোপিকা; **কলিত**—আত্মসাৎ করেছেন; **শ্যামা**—শ্যামা নাম্নী গোপিকা; **ললিতঃ**—ললিতানাম্নী গোপিকা; **রাধাপ্রেয়ান্**—শ্রীমতী রাধারাণীর অত্যন্ত প্রিয়; **বিধুঃ**—কৃষ্ণচন্দ্র; **জয়তি**—জয়যুক্ত হোক।

অনুবাদ

অখিলরসামৃতমূর্তি, প্রসরণশীল কান্তির দ্বারা তারকা এবং পালিনাম্নী সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী, শ্যামা এবং ললিতা সখীর বশকারী, শ্রীমতী রাধারাণীর অত্যন্ত প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন।

তাৎপর্য

সকলেই কোন বিশেষ বিশেষ রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন বা ভক্তি করেন। সমস্ত রসের ভক্তদেরই পরম আকর্ষক হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁকে বলা হয় অখিল রসামৃত মূর্তি। কিন্তু তা হলেও তিনি শ্রীমতী রাধিকার রসেরই একমাত্র পরম বিষয়।

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।

শ্লোক ১৪৩

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্তিধর ।
অতএব আত্মপর্যন্ত-সর্ব-চিত্ত-হর ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রসের ভক্তদের আকর্ষণ করেন, কেননা তিনি রসরাজ, শৃঙ্গার রসের মূর্ত প্রকাশ, তাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরূপ তাঁর (কৃষ্ণের) পর্যন্ত চিত্ত হরণ করে।

শ্লোক ১৪৪

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ১৪৪ ॥

বিশ্বেষাম্—সমস্ত গোপীদের মধ্যে; **অনুরঞ্জনেন**—প্রীতি উৎপাদনের দ্বারা; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **আনন্দম্**—আনন্দ; **ইন্দীবর শ্রেণী**—নীলকমলের সারি; **শ্যামল**—শ্যামল; **কোমলৈঃ**—কোমল; **উপনয়ন্**—আনয়ন করেছিলেন; **অঙ্গৈঃ**—অঙ্গসহ; **অনঙ্গ-উৎসবম্**—কামদেবের উৎসব; **স্বচ্ছন্দম্**—স্বচ্ছন্দে; **ব্রজসুন্দরীভিঃ**—ব্রজ সুন্দরীদের দ্বারা; **অভিতঃ**—উভয়দিকে; **প্রত্যঙ্গম্**—প্রতিটি অঙ্গ; **আলিঙ্গিত**—আলিঙ্গিত; **শৃঙ্গারঃ**—শৃঙ্গার রস; **সখি**—হে সখি; **মূর্তিমান্**—মূর্তিমান; **ইব**—মতন; **মধৌ**—বসন্তকালে; **মুগ্ধঃ**—মুগ্ধ; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ক্রীড়তি**—ক্রীড়া করে।

অনুবাদ

"হে সখি, দেখ। কৃষ্ণ কিভাবে বসন্ত ঋতুকে উপভোগ করছে! তাঁর প্রতিটি অঙ্গ গোপীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছে এবং তাই তাঁকে ঠিক মূর্তিমান কামদেবের মতো মনে হচ্ছে। তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের দ্বারা সে সমস্ত গোপীদের এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দ দান করছে। তাঁর নীল কোমল অঙ্গ যেন অনঙ্গের আনন্দোৎসবের সৃষ্টি করেছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বিরচিত *গীতগোবিন্দ* (১/১১) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২২৪ শ্লোকরূপেও উল্লিখিত হয়েছে।

শ্লোক ১৪৫

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন ।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি—সঙ্কর্ষণের অবতার এবং লক্ষ্মীদেবীর পতি নারায়ণেরও মন হরণ করেন এবং লক্ষ্মী আদি নারীদেরও আকর্ষণ করেন।

শ্লোক ১৪৬

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা, ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে ।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্, হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ১৪৬ ॥

দ্বিজ-আত্ম-জাঃ—ব্রাহ্মণের পুত্রগণ; **মে**—আমার দ্বারা; **যুবয়ঃ**—তোমাদের দুজনের; **দিদৃক্ষুণা**—দর্শন করতে ইচ্ছুক হয়ে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপনীতা**—উপনীত হয়েছে; **ভুবি**—এই জগতে; **ধর্ম-গুপ্তয়ে**—ধর্ম সংরক্ষণের জন্য; **কলা**—সমস্ত শক্তিসহ; **অবতীর্ণ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **অবনে**—এই পৃথিবীতে; **ভরাসুরান্**—অসুরদের ভারে; **হত্বা**—হত্যা করে; **ইহ**—এই চিৎ-জগতে; **ভূয়**—পুনরায়; **ত্বরয়া**—অতি শীঘ্র; **ইতম্**—দয়া করে ফিরে আসুন; **অন্তি**—নিকটে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

"কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে সম্বোধন করে মহাবিষ্ণু (মহাকাল পুরুষ) বললেন—'হে কৃষ্ণার্জুন, তোমাদের দেখবার ইচ্ছা হওয়ায় আমি ব্রাহ্মণ-কুমারদের এখানে এনেছি। তোমরা জগতে ধর্ম রক্ষার জন্য তোমাদের সমস্ত শক্তি সহ অবতীর্ণ হয়েছ এবং পৃথিবীর ভাররূপ অসুরদের হত্যা করে শীঘ্র এখানে ফিরে এস।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৯/৫৮) থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে দ্বারকায় ব্রাহ্মণ-কুমারকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জুনের চেষ্টা বিফল দেখে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে জড় জগতের পরপারে 'মহাকালপুরে' নিয়ে গিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাবিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর রূপ দেখার জন্য ব্রাহ্মণ-কুমারদের অপহরণের ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুকে পর্যন্ত আকর্ষণ করেন।

শ্লোক ১৪৭

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৪৭ ॥

কস্য—কার; **অনুভাব**—ফল; **অস্য**—এই (কালীয়) সর্পের; **ন**—না; **দেব**—হে দেব; **বিদ্মহে**—আমরা জানি; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্ম; **রেণু**—ধূলিকণা; **স্পরশঃ**—স্পর্শ করার; **অধিকারঃ**—যোগ্যতা; **যৎ**—যা; **বাঞ্ছয়া**—বাসনা করে; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **ললনাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী; **অচরৎ**—আচরণ করেছিলেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিহায়ঃ**—পরিত্যাগ করে; **কামান্**—সমস্ত কামনা বাসনা; **সুচিরম্**—দীর্ঘকাল; **ধৃতব্রতাঃ**—ব্রতনিষ্ঠা পরায়ণা তপস্বিনী সতী।

অনুবাদ

"হে দেব, আপনার চরণ-রেণু লাভ করার বাসনায় লক্ষ্মীদেবী দীর্ঘকাল সমস্ত কাম পরিত্যাগ করে ধৃতব্রতা হয়ে তপস্যা করেছিলেন, সেই চরণ-রেণু এই কালীয় সর্প যে কি সুকৃতির দ্বারা লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করল, তা আমরা জানি না।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/১৬/৩৬) এই শ্লোকটি কালীয়-পত্নীদের উক্তি।

শ্লোক ১৪৮

আপন-মাধুর্যে হরে আপনার মন ।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এমনই মনোহর যে, তা তাঁর নিজের মনও হরণ করে এবং তিনি নিজে নিজেকে আলিঙ্গন করতে চান।

শ্লোক ১৪৯

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৯ ॥

অপরিকলিত—অনাস্বাদিত; পূর্বঃ—পূর্বে; কঃ—কে; চমৎকারকারী—অদ্ভুত কার্য সম্পাদনকারী; স্ফুরতি—প্রকাশিত হয়; মম—আমার; গরীয়ান্—মহান; এষঃ—এই; মাধুর্য-পূরঃ—অপরিমিত মাধুর্য; অয়ম্—এই; অহম্—আমি; অপি—তবুও; হন্ত—হায়; প্রেক্ষ্য—দর্শন করে; যম্—যা; লুব্ধচেতাঃ—আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয়; স-রভসম্—প্রেরণাযুক্ত; উপভোক্তুম্—উপভোগ করার জন্য; কাময়ে—বাসনা; রাধিকা ইব—শ্রীমতী রাধারাণীর মতো।

অনুবাদ

এক অনাস্বাদিত মাধুর্য যা প্রতিটি মানুষকেই চমৎকৃত করে, তা আমার থেকে অধিক আর কে প্রকাশ করে? এই মধুরিমা অবলোকন করে আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয়, এবং শ্রীমতী রাধারাণীর মতো আমি সেই রূপ-মাধুরী আস্বাদন করতে বাসনা করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচিত *ললিত-মাধব নাটক* (৮/৩৪) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৫০

এই ত' সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধা-তত্ত্বরূপ ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামানন্দ রায় তখন বললেন—"সংক্ষেপে আমি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করলাম। এখন আমি শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব বর্ণনা করব, তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১৫১

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন—প্রধান ।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তার মধ্যে তিনটি প্রধান—'চিৎ-শক্তি', 'মায়া শক্তি' এবং 'জীব-শক্তি'।

শ্লোক ১৫২

'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে ।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সবার উপরে ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তিনটি শক্তিকে যথাক্রমে 'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা' এবং 'তটস্থা' বলা হয়। তার মধ্যে অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সর্বোত্তম।

শ্লোক ১৫৩

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫৩ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; পরা—চিন্ময়; প্রোক্তা—উক্ত হয়; ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; তথা—তেমনই; পরা—চিন্ময়; অবিদ্যা—অজ্ঞান; কর্ম—সকাম কর্ম; সংজ্ঞা—পরিচিত; অন্যা—অন্য; তৃতীয়া—তৃতীয়; শক্তিঃ—শক্তি; ইষ্যতে—এইভাবে পরিচিত।

অনুবাদ

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও অবিদ্যা; পরাশক্তি হচ্ছে 'চিৎশক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি হচ্ছে জীবশক্তি, যা পরাশক্তি সম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে। এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তি অর্থাৎ 'মায়াশক্তি'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণু-পুরাণ* (৬/৭/৬১) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৫৪

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়; তাই তাঁর স্বরূপশক্তি তিন প্রকার।

শ্লোক ১৫৫

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আনন্দাংশে—'হ্লাদিনী', সদংশে—'সন্ধিনী' এবং চিদংশে—'সম্বিৎ', যাকে আমরা জ্ঞান বলে জানি।

শ্লোক ১৫৬

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ১৫৬ ॥

হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী শক্তি; সন্ধিনী—সত্তা শক্তি; সম্বিৎ—জ্ঞান শক্তি; ত্বয়ি—আপনার মধ্যে; একা—একা; সর্ব-সংশ্রয়ে—সবকিছুর সম্যক আশ্রয়; হ্লাদ—আনন্দ; তাপ—বেদনা; করী—প্রদানকারী; মিশ্রা—দুয়ের মিশ্রণ; ত্বয়ি—আপনার মধ্যে; নো—না; গুণ-বর্জিত—যিনি জড় প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

"হে ভগবান, আপনি সবকিছুর আশ্রয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় এক অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে আপনার মধ্যে বিরাজ করে। জড় প্রকৃতির ত্রিগুণ, যা সুখ ও দুঃখ এই দুয়ের মিশ্রণ, তা আপনার মধ্যে বিরাজ করে না, কেননা আপনি জড় গুণ বর্জিত।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *বিষ্ণু-পুরাণ* (১/১২/৬৯) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৫৭

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তা'তে নাম—'হ্লাদিনী'।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। এই শক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১৫৮

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী'—কারণ ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বয়ং আনন্দঘন বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সর্বপ্রকার চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন এবং তাঁর 'হ্লাদিনী শক্তি' তাঁর ভক্তদের তা আস্বাদন করান।

শ্লোক ১৫৯

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ হচ্ছে 'প্রেম'। 'প্রেম' কথাটির অর্থ হল আনন্দচিন্ময় রস বিশেষ।

শ্লোক ১৬০

প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' এবং সেই মহাভাবস্বরূপা হলেন শ্রীমতী রাধারাণী।

শ্লোক ১৬১

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১৬১ ॥

তয়োঃ—তাঁদের মধ্যে; অপি—ও; উভয়োঃ—উভয়ের (চন্দ্রাবলী এবং রাধারাণী); মধ্যে—মধ্যে; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী; সর্বথা—সর্বতোভাবে; অধিকা—শ্রেষ্ঠা; মহাভাব স্বরূপ—মহাভাব স্বরূপ; ইয়ম্—ইনি; গুণৈঃ—সমস্ত গুণ সমন্বিত; অতি বরীয়সী—সর্বশ্রেষ্ঠা।

অনুবাদ

"(রাধারাণী এবং চন্দ্রাবলী) এই দুজন গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা! তিনি মহাভাব স্বরূপিনী এবং সমস্ত গুণে বরীয়সী।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচিত *উজ্জ্বল নীলমণি* (৪/৩) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৬২

প্রেমের 'স্বরূপ-দেহ'—প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর দেহ যথার্থই কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে রচিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী; সেই কথা সারা জগতে বিদিত।

শ্লোক ১৬৩

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬৩ ॥

আনন্দ—আনন্দ; চিৎ—জ্ঞান; ময়—পূর্ণ; রস—রস; প্রতি—প্রতিক্ষণ; ভাবিতাভিঃ—ভাবিতদের; তাভিঃ—তাদের; যঃ—যিনি; এব—অবশ্যই; নিজরূপতয়া—তাঁর স্বরূপ দ্বারা; কলাভিঃ—যাঁরা তার আনন্দদায়িনী শক্তির বিভিন্ন অংশ; গোলোক—গোলোক বৃন্দাবন; এব—অবশ্যই; নিবসতি—বাস করেন; অখিল আত্ম—সকলের আত্মা; ভূতঃ—বিরাজমান; গোবিন্দম্—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; আদি পুরুষম্—আদি পুরুষকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

"পরম আনন্দ বিধায়ক হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে যিনি স্বীয় ধাম গোলোকে অবস্থান করেন এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অংশপ্রকাশ, চিন্ময় রসের আনন্দে পরিপূর্ণ ব্রজগোপীরা যাঁর নিত্য লীলা-সঙ্গিনী, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৩৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬৪

সেই মহাভাব হয় 'চিন্তামণি-সার' ।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তাঁর ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর সেই মহাভাব চিৎ-তত্ত্বের সারাতিসার। তাঁর একমাত্র কাজ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করা।

শ্লোক ১৬৫

'মহাভাব-চিন্তামণি' রাধার স্বরূপ ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাভাবরূপ চিন্তামণি শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ। ললিতা, বিশাখা আদি সখীগণ তাঁর কায়ব্যূহ স্বরূপ।"

শ্লোক ১৬৬

রাধাপ্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ—সুগন্ধি উদ্বর্তন ।
তা'তে অতি সুগন্ধি দেহ—উজ্জ্বল-বরণ ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ 'সুগন্ধি উদ্বর্তন'-এর মতো। তারফলে তাঁর দেহ অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত এবং উজ্জ্বলবর্ণ।

তাৎপর্য

'সুগন্ধি উদ্বর্তন' হল নানা প্রকার সুগন্ধযুক্ত তেল ও আতর দিয়ে তৈরি এক প্রকার আবাটা (লেই), যা দিয়ে অঙ্গের ময়লা পরিষ্কার করা হয়। শ্রীমতী রাধারাণীর দেহ এমনিতেই সৌগন্ধপূর্ণ, আবার তার ওপর তাঁর শ্রীঅঙ্গ যখন কৃষ্ণস্নেহরূপ 'সুগন্ধি উদ্বর্তন' দ্বারা মাখান হয়, তখন তা আরও সৌগন্ধযুক্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইভাবে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমতী রাধারাণীর অপ্রাকৃত দেহের বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি এই বর্ণনাটি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী রচিত *প্রেমাম্ভোজমকরন্দ* নামক স্তবটি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এই অধ্যায়ের ১৬৫ থেকে ১৮১ শ্লোক পর্যন্ত উক্ত স্তবটি অবলম্বনে রচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* এই সংস্কৃত স্তবটির বঙ্গানুবাদ করেছেন—

"কৃষ্ণের প্রতি সখীর যে প্রণয়, তাই সদ্‌গন্ধকুমকুমাদি দ্বারা সুন্দর কান্তি প্রাপ্ত ॥ ১ ॥ পূর্বাহ্নে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁর বিগ্রহ ॥ ২ ॥ লজ্জারূপপট্টবস্ত্র পরিধান, সৌন্দর্যরূপ কুমকুম শোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গাররস রূপ কস্তুরী দ্বারা চিত্র কলেবর ॥ ৩ ॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্‌গদ স্বর, রস, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টি রত্নে অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥ সৌন্দর্যমাধুর্যাদি গুণসমূহ পুষ্প মালারূপে যাঁর শরীরে বিরাজমান; ধীর ও অধীরা ভাবকে যিনি পটবাস অর্থাৎ কর্পূরাদি দ্বারা পরিষ্কৃত করেছেন ॥ ৫ ॥ প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁর ধম্মিল্ল অর্থাৎ বদ্ধ কেশপাশ (খোঁপা), সৌভাগ্যরূপ তিলকে যাঁর কপাল উজ্জ্বল, কৃষ্ণনাম ও যশ শ্রবণই যাঁর কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥ অনুরাগ রূপ-তাম্বূল দ্বারা যাঁর ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত প্রেম-কৌটিল্যকে যিনি কাজলরূপে ধারণ করেছেন, নর্ম অর্থাৎ উপহাস হেতু মৃদুহাসিরূপ-কর্পূর দ্বারা যিনি সুবাসিত ॥ ৭ ॥ সৌরভরূপ-অন্তঃপুরে যিনি গর্বরূপ পর্যঙ্কে শায়িত হলে বিপ্রলম্ভরূপ-হার প্রেম বৈচিত্ররূপ তরলরূপে দোলায়িত ॥ ৮ ॥ প্রণয় ও ক্রোধরূপ কাঁচুলীর দ্বারা যার স্তনযুগল আবৃত; সপত্নীগণের মুখবক্ষঃ শোষণকারী যশঃ শ্রীই যাঁর কচ্ছপীবীণা ॥ ৯ ॥ যৌবনরূপ সখীর স্কন্ধে যিনি স্বীয় লীলারূপ করকমল রেখেছেন, যিনি বহুগুণযুক্তা হয়েও কৃষ্ণকন্দর্পানন্দি মধু পরিবেশন করছেন ॥ ১০ ॥ এবম্ভূত শ্রীরাধাকে দন্তে তৃণ ধারণ

পূর্বক প্রার্থনা করি—এই সুদুঃখিত জনকে স্বীয় শ্রীদাস্যরূপ অমৃতদানে জীবিত করুন ॥ ১১ ॥ হে গান্ধর্বিকে, দয়াময় কৃষ্ণ শরণাগত জনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না, তুমিও সেরকম আশ্রিত জনকে ত্যাগ করো না ॥ ১২ ॥"

শ্লোক ১৬৭

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম ।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"কারুণ্যরূপ অমৃতের ধারায় শ্রীমতী রাধারাণী প্রথম স্নান করেন, তারপর তিনি তারুণ্যরূপ অমৃত ধারায় মধ্যাহ্ন স্নান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণস্নেহের আবাটা (লেই) সারা অঙ্গে মেখে, কারুণ্যামৃতের ধারায় পূর্বাহ্নে স্নান করেন। পৌগণ্ড (পাঁচ থেকে দশ বছর) অতিক্রম করে শ্রীমতী রাধারাণী প্রথম কৈশোরে করুণা বিশিষ্টা নব-যৌবনা। তারপর মধ্যাহ্নে তিনি তারুণ্যামৃতের ধারায় স্নান করেন, সেটি ব্যক্ত-যৌবন।

শ্লোক ১৬৮

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান ।
নিজ-লজ্জা-শ্যাম-পট্টসাটি-পরিধান ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"মধ্যাহ্নের স্নানের পর শ্রীমতী রাধারাণী পুনরায় লাবণ্যামৃতের ধারায় স্নান করেন এবং লজ্জারূপ বস্ত্র পরিধান করেন, যা শ্যামবর্ণ পট্টবস্ত্রের মতো।

তাৎপর্য

সায়াহ্নে শ্রীমতী রাধারাণী লাবণ্যামৃতের ধারায় স্নান করেন। এইভাবে তিনি তিন তিনবার তিন প্রকার জলে স্নান করেন। তারপর রাধারাণী তাঁর বসন পরিধান করেন। এই বসন দ্বিবিধ—(১) অধোবসন ও (২) উত্তরীয়। ১) অধোবসন,—লজ্জারূপা, তা শ্যামপট্টসূত্র-দ্বারা নির্মিত নীল-সাটী; দ্বিতীয় বসন অরুণবর্ণ—তাই কৃষ্ণানুরাগ।

শ্লোক ১৬৯

কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ-বসন ।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ রাধারাণীর উত্তরীয়। এই উত্তরীয় অরুণবর্ণ। তারপর তিনি কৃষ্ণপ্রণয়মানরূপ কাঁচুলীর দ্বারা তাঁর বক্ষদেশ আবৃত করেন।

শ্লোক ১৭০

সৌন্দর্য—কুঙ্কুম, সখী-প্রণয় চন্দন ।
স্মিতকান্তি—কর্পূর, তিনে—অঙ্গে বিলেপন ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর কায়িক গুণের সৌন্দর্যই 'কুমকুম', তাঁর সখীদের প্রতি তাঁর প্রণয়—'চন্দন' এবং তাঁর স্মিত হাস্যের কান্তিরূপ 'কর্পূর'—এই তিন বস্তু তাঁর অঙ্গের লেপন অর্থাৎ তাঁর অঙ্গ—সৌন্দর্য, অভিরূপতা ও মাধুর্যভূষিত।

শ্লোক ১৭১

কৃষ্ণের-উজ্জ্বল রস—মৃগমদ-ভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসই মৃগমদ্ কস্তুরী। সেই মৃগমদের দ্বারা তাঁর কলেবর বিচিত্রিত।

শ্লোক ১৭২

প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য—ধম্মিল্ল-বিন্যাস ।
'ধীরাধীরাত্মক' গুণ—অঙ্গে পটবাস ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রচ্ছন্ন-মান ও বাম্যভাব তাঁর খোঁপার বিন্যাস। ধীরাধীরাত্মক গুণ তাঁর অঙ্গের পট্টবাস।

শ্লোক ১৭৩

রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেমকৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগরূপ তাম্বূলের রাগে তাঁর অধর উজ্জ্বল। তাঁর প্রেমকৌটিল্য—তাঁর চোখের কাজল।

শ্লোক ১৭৪

'সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক' ভাব, হর্ষাদি 'সঞ্চারী' ।
এই সব ভাব-ভূষণ সব-অঙ্গে ভরি' ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক' ভাব, হর্ষ আদি হল 'সঞ্চারী' ভাব, এই সমস্ত ভাব তাঁর সারা অঙ্গেই ভূষণের মতো বিরাজমান।

শ্লোক ১৭৫

'কিলকিঞ্চিতাদি'-ভাব-বিংশতি-ভূষিত ।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কিলকিঞ্চিত' আদি কুড়িটি ভাব তাঁর অঙ্গকে ভূষিত করেছে; তাঁর গুণরাজী পুষ্পমালার মতো তাঁর সারা অঙ্গে শোভা পাচ্ছে।

তাৎপর্য

'কিলকিঞ্চিত' আদি ভাব কুড়িটি—১) অঙ্গজ—ভাব, হাব, হেলা; ২) আত্মজ—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য; ৩) স্বভাবজ—কিলকিঞ্চিত, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা—শ্রীমতী রাধারাণীর গুণ তিন প্রকার; মানসিক, বাচিক ও শারীরিক। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, কারুণ্য ইত্যাদি মানসিক; কর্ণের আনন্দদায়ক বাক্ প্রয়োগ আদি—বাচিক এবং গুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য প্রভৃতি কায়িক গুণ।

শ্লোক ১৭৬

সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেম-বৈচিত্ত্য—রত্ন, হৃদয়—তরল ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সৌভাগ্যরূপ 'তিলক' তাঁর সুন্দর ললাটে উজ্জ্বলরূপে শোভা পায়। তাঁর প্রেমবৈচিত্ত্য—'রত্ন', এবং তাঁর হৃদয় 'তরল'।

শ্লোক ১৭৭

মধ্যবয়স, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যবয়সের কিশোরী ভাবই সখী-স্কন্ধে করন্যাস এবং নিকটবর্তিনী সখীরা কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তিরূপা।

তাৎপর্য

কৃষ্ণলীলানন্দরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর অষ্টমনোবৃত্তি অষ্টসখী এবং তাঁর অনুবৃত্তি সমূহ গোপীদের সহকারী অন্যান্য মঞ্জরীগণ।

শ্লোক ১৭৮

নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব-পর্যঙ্ক ।
তা'তে বসি' আছে, সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"নিজাঙ্গরূপ সৌরভালয়ে গর্বরূপ পর্যঙ্কে বসে তিনি সর্বদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করেন।

শ্লোক ১৭৯

কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—অবতংস কানে ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ-বচনে ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, যশ—তাঁর কানের অলঙ্কার; এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, যশ—সর্বক্ষণ তাঁর মুখ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৮০

কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী শৃঙ্গাররসরূপ মধু শ্রীকৃষ্ণকে পান করান। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন।

শ্লোক ১৮১

কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর ।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণের নির্মল প্রেমরূপ রত্নের আকর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মূর্ত বিগ্রহ; এবং শ্রীরাধিকার দেহ—অতুলনীয় গুণ সমূহে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ১৮২

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা ।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥ ১৮২ ॥

কা—কে; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; প্রণয়জনিভূঃ—কৃষ্ণপ্রেমের জন্মভূমি; শ্রীমতী রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী; একা—একা; কা—কে; অস্য—তাঁর; প্রেয়সী—প্রিয়তমা; অনুপমগুণা—অনুপম গুণসম্পন্না; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী; একা—একা; ন—না; চ—ও; অন্যা—অন্য কেউ; জৈহ্ম্যম্—কৌটিল্য; কেশে—তাঁর কেশে; দৃশি—তাঁর চক্ষে; তরলতা—

চঞ্চলতা; নিষ্ঠুরত্বম্—কাঠিন্য; কুচে—স্তনযুগলে; অস্যা—তার; বাঞ্ছা—বাসনা সমূহের; পূর্ত্যৈ—পূর্ণ করতে; প্রভবতি—সক্ষম; হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণী; একা—একা; ন—নয়; চ অন্যা—অন্য কেউ।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুপম গুণ সম্পন্ন প্রিয়তমা কে? একা শ্রীরাধিকা, অন্য কেউ নয়। কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাধিকারই আছে। একা শ্রীমতী রাধারাণীই হরির বাঞ্ছাপূর্তির জন্য সমর্থা, অন্য কেউই নয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত *শ্রীগোবিন্দলীলামৃত* (১১/১২২) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকে প্রশ্ন-উত্তরক্রমে শ্রীমতী রাধারাণীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৮৩-১৮৪

যাঁর সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজ-রামা ॥ ১৮৩ ॥
যাঁর সৌন্দর্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী ।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা পর্যন্ত যাঁর সৌভাগ্যগুণ ঐকান্তিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করেন। সমস্ত ব্রজগোপীরা যাঁর কাছে কলাবিলাস শিক্ষা করেন। লক্ষ্মী এবং পার্বতী যাঁর সৌন্দর্যাদি গুণ মনে করেন। বশিষ্ঠ পত্নী সতী অরুন্ধতী যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাসনা করেন।

শ্লোক ১৮৫

যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার ।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাঁর গুণ গণনা করতে পারেন না, সাধারণ জীব কিভাবে তাঁর গুণ গণনা করবে?"

শ্লোক ১৮৬

প্রভু কহে, জানিলুঁ কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব ।
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"আমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব জানতে পারলাম। এখন আমি তাদের বিলাস মহত্ত্ব জানতে চাই।"

শ্লোক ১৮৭

রায় কহে,—কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত' ।
নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ 'ধীর-ললিত' নায়ক, কেন না তিনি সর্বদাই তাঁর প্রেয়সীদের প্রেমের দ্বারা বশীভূত। নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

তাৎপর্য

আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের 'কামক্রীড়া' এবং জড় জগতের কামক্রীড়া একবস্তু নয়। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ঠিক সোনার মতো আর সেই প্রেমের বিকৃত প্রতিবিম্ব এই জড় জগতের কাম, তা' ঠিক লোহার মতো। সুতরাং এই দুয়ের কোন তুলনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ নন। তিনি সমস্ত বাসনায় পূর্ণ। এই অপ্রাকৃত বাসনা বিকৃত প্রতিফলনের ফলে জড় জগতের অন্তহীন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু, গুণগতভাবে তারা ভিন্ন, তার একটি চিন্ময় এবং অপরটি জড়। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে রকম পার্থক্য রয়েছে, চিন্ময় কামক্রীড়া এবং জড় কামক্রীড়ার পার্থক্যও তেমনই।

শ্লোক ১৮৮

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ১৮৮ ॥

বিদগ্ধঃ—চতুর; নবতারুণ্যঃ—নবযৌবন যুক্ত; পরিহাস-বিশারদঃ—রহস্য নিপুণ; নিশ্চিন্তঃ—উদ্বেগ রহিত; ধীর-ললিতঃ—ধীর ললিত নায়ক; স্যাৎ—হয়; প্রায়ঃ—সর্বদাই; প্রেয়সীবশঃ—প্রেয়সীদের প্রেমের দ্বারা বশীভূত।

অনুবাদ

"যে পুরুষ চতুর, নবতরুণ, পরিহাস বিশারদ, চিন্তাশূন্য ও প্রেয়সীর বশ, তিনি 'ধীরললিত'।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/১/২৩০) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৮৯

রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে ।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"রাত্রি-দিন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জে শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর কৈশোর বয়স সফল করেছিলেন—শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে বিবিধ লীলাবিলাস করার মাধ্যমে।

শ্লোক ১৯০

বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১৯০ ॥

বাচা—বাক্যের দ্বারা; সূচিত—প্রকাশ করে; শর্বরী—রাত্রি; রতি—রতিবিলাস; কলা—অংশের; প্রাগল্‌ভ্যয়া—প্রণয় চাতুর্য; রাধিকাম্—শ্রীমতী রাধারাণী; ব্রীড়া—লজ্জাবশত; কুঞ্চিত-লোচনাম্—মুদ্রিত নয়না; বিরচয়ন্—করেছিলেন; অগ্রে—সম্মুখে; সখীনাম্—তাঁর সখীরা; অসৌ—সেই; তৎ—তাঁর; বক্ষ-রুহ—বক্ষে; চিত্র-কেলি—বৈচিত্রপূর্ণ লীলা সমূহের দ্বারা; মকরী—মকরের; পাণ্ডিত্য—চাতুর্য; পারম্—সীমা; গতঃ—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন; কৈশোরম্—কৈশোর; স-ফলী-করোতি—সফল করেন; কলয়ন্—করে; কুঞ্জে—কুঞ্জে; বিহারম্—বিহার; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

"এই কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা সহকারে সখীদের সামনে পূর্ব রজনীর প্রণয় ক্রীড়ার বর্ণনা করলে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর নয়নদ্বয় মুদ্রিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর বক্ষোপরে মকরাদি চিত্র অঙ্কন করে বিশেষ চাতুর্য প্রকাশ করেছিলেন। এইরকম রসক্রীড়ার দ্বারা কুঞ্জে বিহার করে হরি তাঁর কৈশোর বয়স সার্থক করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/১/১১৯) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৯১

প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর ।
রায় কহে,—ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"তুমি যে 'সাধ্য' নির্ণয় করলে তা ঠিকই। কিন্তু তার পরে কি আছে, তা বল।" তখন রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—"এর ঊর্ধ্বে যাওয়ার ক্ষমতা ও বুদ্ধি আমার নেই।"

শ্লোক ১৯২

যেবা 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত' এক হয় ।
তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কি না হয় ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—" 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত' বলে একটি ভাব আছে, তা বলছি; তা শুনে আপনার সুখ হবে কি হবে না, তা আমি জানি না।"

তাৎপর্য

এই আলোচনাটি, আমাদের বোধগম্য করার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' বিশদভাবে আলোচনা করেছেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বললেন, 'হে রামানন্দ, তুমি যে 'সাধ্য' নির্ণয় করলে, রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা করলে এবং উভয়ের বিলাস মহত্ত্ব বর্ণনা করলে, তা সবই সত্য। কিন্তু তারপর আর যে কিছু আছে, তা বল।' তখন রামানন্দ রায় বললেন—"এর পরে বুদ্ধির আর গতি দেখতে পাই না। তবে মাত্র *প্রেমবিলাস-বিবর্ত* বলে একটি ভাব আছে, তা বলছি, তা শুনে আপনার সুখ হয় কিনা বলতে পারি না।"

শ্লোক ১৯৩

এত বলি' আপন-কৃত গীত এক গাহিল ।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে, রামানন্দ রায় নিজের রচিত একটি গান শুরু করতে না করতেই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমে অভিভূত হয়ে তাঁর হাত দিয়ে তিনি রামানন্দ রায়ের মুখ আচ্ছাদিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের যে আলোচনাটি এখানে হবে তা জড় পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তা অথবা জড় অনুভূতির দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের উজ্জ্বলতাময় চিত্তেই চিন্ময় 'রস' আস্বাদিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব জড় জগতের অতীত, *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং*—তাই তা জড় ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। আমাদের স্থূল দেহে এবং সূক্ষ্ম মনে যে 'আত্মবুদ্ধি', চিন্ময় উপলব্ধি

তা থেকে ভিন্ন। যেহেতু মন এবং বুদ্ধি জড় পদার্থ, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা তাদের অনুভূতির অতীত। (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)—"সব রকমের জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন নির্মল হয়, তখনই কেবল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" (*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*)।

চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলি জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত। জড়বাদীদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গণ্ডি কেবল পরে বৈচিত্র্যে অস্বীকার করা পর্যন্ত; তারা কখনও চিদ্বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা মনে করে যে চিৎ-বৈচিত্র জড়-বৈচিত্রের বিপরীত অবস্থা, অতএব তা নির্বিশেষ বা শূন্য, কিন্তু এই ধারণা চিন্ময় উপলব্ধির সান্নিধ্য লাভে অসমর্থ। স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনের ধর্মে যে চমৎকারিতা রয়েছে, তা অসম্পূর্ণ লঘু ও নশ্বর। তাই তা চিন্ময় উপলব্ধির অনেক নীচের বিষয়। চিন্ময় রস শুদ্ধ নবনবায়মান এবং তা নিত্য শুদ্ধ, চিন্ময় ব্যাপার। জড় জগতে ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যাঘাত হেতু যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাই জড় প্রীতির 'বিবর্ত'। কিন্তু চিৎ-জগতে কোন দুঃখ, অভাব বা অপূর্ণতা নেই। অপ্রাকৃত রস—রসিক শ্রীরামানন্দ রায় স্বরচিত যে গীতি কীর্তন করেছেন, তা শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক অনুমোদিত কিনা, এইরূপ লীলা অভিনয় করতে গিয়ে তিনি *প্রেমবিলাস-বিবর্তের* বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৯৪

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী ।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥
এ সখি, সে-সব প্রেমকাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি' ॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্ ।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্য ত পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী ।
সু-পুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি ॥ ১৯৪ ॥

পহিলেহি—প্রথমে; **রাগ**—পূর্বরাগ; **নয়নভঙ্গে**—পরস্পরের দর্শনের বিনিময়ে; **ভেল**—হয়েছিল; **অনুদিন**—দিন দিন; **বাঢ়ল**—বৃদ্ধি পেতে লাগল; **অবধি না গেল**—সীমা রহিল না; **না**—না; **সো**—সে; **রমণ**—ভোক্তা; **না**—না; **হাম**—আমি; **রমণী**—ভোগ্যা; **দুঁহু-মন**—উভয়ের মনকে; **মনোভব**—মনোভাব; **পেষল**—পেষণ করেছিল; **জানি**—জেনে; **এ**—এই; **সখি**—সখী; **সে-সব**—সেই সমস্ত; **প্রেমকাহিনী**—প্রেমবিলাস সমূহ; **কানুঠামে**—কৃষ্ণের কাছে; **কহবি**—তুমি বলবে; **বিছুরল**—বিস্মৃত হয়েছে; **জানি**—জেনে; **না**—না; **খোঁজলু**—খুঁজলাম; **দূতী**—দূতী; **না**—না; **খোঁজলু**—খুঁজলাম; **আন্**—অন্য কাউকে; **দুঁহুকেরি**—আমাদের দুজনের; **মিলনে**—মিলনে; **মধ্য**—মধ্যে; **ত**—যথার্থ; **পাঁচবাণ**—মদনের পঞ্চশর; **অব**—এখন; **সোহি**—সেই; **বিরাগ**—বিপ্রলম্ভ; **তুঁহু**—তুমি; **ভেলি**—হয়ে গেল; **দূতী**—দূতী; **সুপুরুখ**—উত্তম নায়কের; **প্রেমকি**—প্রেমের; **ঐছন**—ঐ প্রকার; **রীতি**—রীতি।

অনুবাদ

" 'আহা। মিলনের পূর্বরাগ-সময়ে পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় থেকে 'রাগ' বলে একটি ভাবের উদয় হয়; এই রাগ বাড়তে বাড়তে 'অবধি' বা সীমাপ্রাপ্ত হল না। এই রাগ—আমাদের উভয়ের স্বভাব জনিত। রমণ স্বরূপ কৃষ্ণই যে তার কারণ, তা নয়, বা রমণীস্বরূপা আমিই যে তার কারণ, তাও নয়। পরস্পর দর্শনে যে 'রাগ' উদিত হল, তাই 'মনোভব' অর্থাৎ মদন হয়ে আমাদের মনকে পেষণ করে একত্র করেছিল। এখন বিচ্ছেদের সময়, সেই সব প্রেম কাহিনী, হে সখি, কৃষ্ণ যদি ভুলে গিয়েও থাকে, এরূপ বুঝতে পার, তবে তাঁকে বল—'মিলনের সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করিনি অথবা অন্য কাউকেও কোন অনুরোধ করিনি; অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার, এখন বিচ্ছেদের সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায়, অর্থাৎ বিশিষ্টরাগ বা বিচ্ছেদ-গত রাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কাজ করছ। সুপুরুষের প্রেমের রীতি-নীতি এই রকম।"

তাৎপর্য

এই গীতটি রামানন্দ রায়ের রচিত এবং তিনি নিজেই এটি গেয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্যে বলেছেন যে সম্ভোগকালে 'রাগ' যেমন অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ থাকে, বিপ্রলম্ভকালে তা অধিরূঢ়ভাবসম্পন্না দূতী হয়ে, *প্রেমবিলাস-বিবর্তে* অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগস্ফূর্তি কার্যে দূতীস্বরূপ হলে তাকে শ্রীমতী 'সখী' সম্বোধন করে এই কথাটি বলেছেন। মূল তাৎপর্য এই, প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেমন আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেরূপ বলে শ্রীমতী রাধারাণী যখন কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি একটি তমাল বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ বলে ভুল করে আলিঙ্গন করেছিলেন। বিশেষত বিপ্রলম্ভে সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ় মহাভাবরূপ এক প্রকার সম্ভোগের উদয় হয়।

শ্লোক ১৯৫

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্ ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নব-রাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারুঃ কৃতী ॥ ১৯৫ ॥

রাধায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণী; ভবতঃ চ—এবং তোমার; চিত্তজতুনী—জতু বা লাক্ষার মতো দুইটি মন; স্বৈদৈঃ—স্বেদের দ্বারা; বিলাপ্য—দ্রবীভূত হয়ে; ক্রমাৎ—ক্রমে ক্রমে; যুঞ্জন্—করেছে; অদ্রি—গোবর্ধন পর্বতে; নিকুঞ্জ—নির্জন কেলি কুঞ্জে; কুঞ্জর-পতে—হে গজরাজ; নির্ধূত—সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে; ভেদ-ভ্রমম্—ভেদরূপ ভ্রম; চিত্রায়—বিস্ময় বর্ধন করার জন্য; স্বয়ম্—স্বয়ং; অন্বরঞ্জয়ৎ—অনুরঞ্জিত; ইহ—এই জগতে; ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের; হর্ম্য-উদরে—প্রাসাদে; ভূয়োভিঃ—নানাবিধ; নব-রাগ—নব অনুরাগের; হিঙ্গুলভরৈঃ—সিঁদুরের দ্বারা; শৃঙ্গার—শৃঙ্গার রসের; কারুঃ—কারিগর; কৃতী—অত্যন্ত দক্ষ।

অনুবাদ

" 'হে প্রভু, আপনি গোবর্ধন পর্বতের নিকুঞ্জে নিবাস করেন এবং গজরাজের মতো আপনি শৃঙ্গার রসে অত্যন্ত দক্ষ। শৃঙ্গার-শিল্প-শাস্ত্রে নিপুণ বিধাতা রাধিকা ও আপনার চিত্তলাক্ষাকে বিকাররূপ ধর্মদ্বারা দ্রবীভূত করেছেন। তাই আপনার এবং রাধারাণীর মধ্যে ভেদ নিরূপণ করা যায় না। এখন আপনি ছাড়া সারা জগতের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল প্রাসাদে, আপনার নব অনুরাগরূপ সিঁদুরের দ্বারা উভয়ের হৃদয়কে রঞ্জিত করেছেন।' "

তাৎপর্য

শ্রীরামানন্দ রায়ের এই শ্লোকটি রূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে (১৪/১৫৫) সংযোজন করেছেন।

শ্লোক ১৯৬

প্রভু কহে,—'সাধ্যবস্তুর অবধি' এই হয় ।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায় রচিত এই গীতটি অনুমোদন করে বললেন, "সাধ্য বস্তুর অবধি, কেবল তোমার কৃপার প্রভাবে আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম।

শ্লোক ১৯৭

'সাধ্যবস্তু' 'সাধন' বিনু কেহ নাহি পায় ।
কৃপা করি' কহ, রায়, পাবার উপায় ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সাধন' ছাড়া কখনও 'সাধ্যবস্তু' পাওয়া যায় না। এখন কৃপা করে আমাকে তা পাবার উপায় বল।"

শ্লোক ১৯৮

রায় কহে,—যেই কহাও, সেই কহি বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, আপনি আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন, আমি তাই বলছি। যা বলছি তা ভাল না মন্দ সেই ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না।

শ্লোক ১৯৯

ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর ।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ত্রিভুবনে এমন কোন ধীর ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি আপনার মায়ানাটে স্থির থাকতে পারেন?

শ্লোক ২০০

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা ।
অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রকৃতপক্ষে আমার মুখ দিয়ে আপনি বলাচ্ছেন, এবং তা আপনি নিজেই আবার শুনছেন। কি এক গভীর রহস্য! এখন তাহলে আপনি সেই সাধনের কথা শুনুন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বিশেষত অবৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণকথা না শুনতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

অবৈষ্ণব মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্ট যথা পয়ঃ ॥

পদ্মপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অবৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণকথা না শুনতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা তিনি যতবড় পণ্ডিতই হোন না কেন। সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিষ, তেমনই অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথাও বিষবৎ। কিন্তু বৈষ্ণব যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত, তাই তাঁর কথায়, ভগবানের কৃপা স্বরূপ চিন্ময় শক্তি রয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যে সর্বদা প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে, আমি তাকে বুদ্ধিযোগ দান করি, যার প্রভাবে সে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।" শুদ্ধ বৈষ্ণব যখন কৃষ্ণকথা বলেন, তখন তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন। কি করে সম্ভব? তা হল, তাঁর হৃদয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিয়ে বলান। শ্রীল রামানন্দ রায় এইভাবে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি যা বলছেন তা তাঁর নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রসূত কথা নয়। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

"আমি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছি, আমি স্মৃতিদান করি। সমস্ত বেদের মধ্যে কেবল আমিই জ্ঞাতব্য। আমি বেদান্তের প্রণেতা এবং আমিই বেদবেত্তা।"

সমস্ত জ্ঞান আসছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে, যিনি পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। অভক্তেরা ভগবানের কাছে ইন্দ্রিয়-সুখ চায়; তাই অভক্তেরা ভগবানের মোহময়ী মায়াশক্তির বশীভূত হয়। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অনুগত থাকেন, এবং তাই তিনি যোগমায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই ভক্ত এবং অভক্তের মনোভাবে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

শ্লোক ২০১

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

"রাধাকৃষ্ণের লীলা অত্যন্ত গূঢ়। দাস্য, সখ্য অথবা বাৎসল্য রসে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

শ্লোক ২০২

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"একমাত্র সখীগণের এই লীলায় অধিকার রয়েছে, এবং এই সখীদের থেকেই এই লীলার বিস্তার হয়।

শ্লোক ২০৩

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয় ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট হয় না। সখীরা এই লীলা বিস্তার করে তাঁরা নিজেরাই তা আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২০৪-২০৫

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ॥ ২০৪ ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সখী ছাড়া এই লীলায় অন্য কারও প্রবেশের অধিকার নেই। সখীভাবে, সখীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি তাঁদের অনুগত হন, তিনি কেবল বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করতে পারেন। এছাড়া তা লাভ করার আর কোন উপায়ই নেই।

তাৎপর্য

ভগবৎ-ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। কিন্তু বিভিন্ন ভক্তের রস বিভিন্ন। কেউ দাস্যরসে ভগবানের সেবা করেন, কেউ সখ্যরসে, আবার কেউ বাৎসল্য রসে—কিন্তু এই সমস্ত ভাবের দ্বারা বৃন্দাবনে মাধুর্য রসে ভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। সেই সেবা লাভ করতে হলে, গোপীভাব অবলম্বন করে সখীদের পদাঙ্ক-অনুসরণ করতে হয়। তাহলেই কেবল মাধুর্য রসের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন—

প্রেমলীলা বিহারাণাং
সম্যগ্ বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বিভাবাদির সম্যকরূপে বিস্তারকারিণীকে 'সখী' বলে। তাঁরা মাধুর্য রসাশ্রিত অন্তরঙ্গা গোপী। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসরূপ রত্ন মঞ্জুষা স্বরূপ। *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে সখীদের প্রকৃত কার্য বর্ণনা করা হয়েছে—

মিথঃ প্রেম গুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তি কারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্ ॥
নর্মাশ্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্।
ছিদ্র সংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ॥
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকা-প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য লীলায়, শ্রীকৃষ্ণ নায়ক এবং শ্রীমতী রাধারাণী নায়িকা। সখীদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রেম গুণাগুণোৎকীর্তন করা, (২) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আসক্তি বিবর্ধন করা, (৩) উভয়ের অভিসার করান, (৪) কৃষ্ণে

সখী সমর্পণ, (৫) পরিহাস, (৬) আশ্বাস-প্রদান, (৭) নায়ক-নায়িকাকে বেশ ও অলঙ্কার দিয়ে সাজানো, (৮) মনোগত ভাব-প্রকাশ করণে নিপুণতা, (৯) নায়িকার দোষ গোপন, (১০) পতি প্রভৃতির বঞ্চনা, (১১) শিক্ষা, (১২) যথোচিত কালে নায়ক-নায়িকার সম্মিলন করান, (১৩) চামরাদি-ব্যজন, (১৪) উভয়ের প্রতি তিরস্কার, (১৫) সংবাদ প্রেরণ, (১৬) নায়িকার প্রাণ রক্ষার জন্য যত্ন।

কিছু প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় আছে, যারা রাধাকৃষ্ণের লীলার মর্ম বুঝতে না পেরে তাদের মনগড়া কতগুলি পন্থার সৃষ্টি করে। এই ধরনের সহজিয়াদের বলা হয় 'সখীভেকী' এবং 'গৌরনাগরী'। তারা মনে করে যে, কুকুর এবং শিয়ালের ভক্ষ্য তাদের জড় শরীরটি শ্রীকৃষ্ণের উপভোগের বস্তু। তারা নিজেদের সখী বলে কল্পনা করে এবং তারা তাদের জড় শরীরটিকে কৃত্রিমভাবে সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ কখনও জড়দেহের সাজ-সজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হন না। চিন্ময়ী শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সখীদের দেহ, গেহ, বেশভূষা প্রভৃতি যাবতীয় ক্রীড়া বা চেষ্টা সমস্তই চিন্ময়। সেই সবই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনকারী। প্রকৃতপক্ষে তারা শ্রীকৃষ্ণের এতই প্রীতিকর যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সখীদের বশীভূত হন। তা এই দেবীধামের অন্তর্গত চৌদ্দ-ভুবনের কোন ব্যাপার বা বস্তু নয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক হলেও, তিনি শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁর সখীদের দ্বারা আকৃষ্ট। ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করেন বলে তাদের নাম ভুবনমোহন-মনোমোহিনী।

কখনই মনোধর্মের বশবর্তী হয়ে নিজের কাল্পনিক সিদ্ধদেহে নিজেকে 'সখী' বলে মনে করা উচিত নয়। এটি একপ্রকার অহংগ্রহোপাসনা, অর্থাৎ, মায়াবাদীদের নিজেদের দেহটিকে ভগবান বলে মনে করে তার উপাসনা করার মতো। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রাকৃত জীবকে এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রজ-গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, নিজেকে ভগবৎপার্ষদ বলে মনে করা, নিজেকে ভগবান বলে মনে করার মতোই গর্হিত অপরাধ। বৃন্দাবনে বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজ-গোপিকাদের লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করতে হবে। তাহলেই ধীরে ধীরে জড় কলুষ মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনও নিজেকে গোপী বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তা একটি মস্ত বড় অপরাধ।

শ্লোক ২০৬

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ২০৬ ॥

বিভুঃ—সর্বশক্তিমান; অপি—যদিও; সুখ-রূপঃ—সচ্চিদানন্দময়; স্ব-প্রকাশঃ—স্বয়ং

প্রকাশরূপ; অপি—যদিও; ভাবঃ—চিদ্বিলাস; ক্ষণম্-অপি—ক্ষণিকের জন্য; ন—কখনও না; হি—অবশ্যই; রাধা-কৃষ্ণয়োঃ—রাধাকৃষ্ণ; যাঃ—যাকে; ঋতে—ব্যতীত; স্বাঃ—তাঁর কায়ব্যূহ স্বরূপিনী সখীরা; প্রবহতি—পরিচালিত করা; রস-পুষ্টিং—সর্বোচ্চ রসের পূর্ণতা; চিৎ-বিভূতীঃ—চিন্ময় ঐশ্বর্য; ইব—মতো; ঈশঃ—পরমেশ্বর ভগবান; শ্রয়তি—আশ্রয় গ্রহণ করেন; ন—না; পদম্—পদ; আসাম্—তাদের; কঃ—কে; সখীনাম্—সখীদের; রস-জ্ঞঃ—কৃষ্ণভক্তিরস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

" 'রাধাকৃষ্ণ হচ্ছেন চিদ্বিলাস—স্বপ্রকাশ আনন্দময় এবং বিভু অর্থাৎ অনন্ত হলেও, সখীগণ ব্যতীত ক্ষণিকের জন্যও তা সর্বোচ্চ রসের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, যেমন পরমেশ্বর ভগবানের চিদ্বিভূতি ব্যতীত ঈশ্বরত্ব পুষ্টিলাভ করে না তেমনই। তাই, তৎপ্রবিষ্ট কোন রসজ্ঞ সখীর পদাশ্রয় গ্রহণ না করলে, রাধাকৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করা যায় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* (১০/১৭) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২০৭

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন ।
কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সখীদের স্বভাবে এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে—তারা নিজেরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে চান না।

শ্লোক ২০৮

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায় ।
নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার লীলা সম্পাদন করিয়ে তারা নিজ সুখ থেকে কোটি গুণ বেশী সুখ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২০৯

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা ।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা-স্বরূপ, এবং সখীরা সেই লতার পল্লব, পুষ্প এবং পাতা।

শ্লোক ২১০

কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ-সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি-সুখ হয় ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত যখন সেই লতায় সিঞ্চন করা হয়, তখন পল্লবাদির নিজ সুখ থেকে কোটিগুণ বেশি সুখ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন—শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতাস্বরূপ এবং সখীগণই ঐ লতার পল্লব, পুষ্প এবং পাতা। লতারূপ রাধিকার পদাশ্রয়পূর্বক লতাকে জল সেচন করলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদিতে জল সেচন করলে যেমন পল্লবাদির প্রফুল্লতা হয় না, তেমনই গোপীদের কৃষ্ণ-মিলন-সুখ থেকেও রাধাকৃষ্ণ মিলনের দ্বারাই অধিক সুখ হয়।"

শ্লোক ২১১

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী-নামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥ ২১১ ॥

সখ্যঃ—ললিতা, বিশাখা আদি প্রিয় নর্মসখীরা; শ্রীরাধিকায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণী; ব্রজ-কুমুদ—কুমুদ সদৃশ ব্রজবাসীদের; বিধোঃ—কৃষ্ণরূপ চন্দ্রের; হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী; নাম—নামক; শক্তেঃ—শক্তি; সারাংশ—সারাংশ; প্রেমবল্ল্যাঃ—ভগবৎ-প্রেমরূপ লতার; কিসলয়—নবীন; দল—পত্র; পুষ্প—কুসুম; আদি—ইত্যাদি; তুল্যাঃ—সমান; স্ব-তুল্যাঃ—সমতুল্যা; সিক্তায়াম্—যখন সিঞ্চন করা হয়; কৃষ্ণলীলামৃত—কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত; রসনিচয়ৈঃ—রস সমূহের দ্বারা; উল্লসন্ত্যাম্—উল্লসিত হয়ে; অমুষ্যাম্—তাঁর, শ্রীমতী রাধারাণীর; জাতোল্লাসাঃ—হর্ষান্বিতা; স্বসেকাৎ—নিজের সিঞ্চন থেকে; শত-গুণম্—শতগুণ; অধিকম্—অধিক; সন্তি—হয়; যৎ—যা; তৎ—তা; ন—না; চিত্রম্—বিস্ময়কর।

অনুবাদ

'ব্রজসখীরা শ্রীরাধার তুল্যা এবং ব্রজ কুমুদচন্দ্রের হ্লাদিনী-নাম্নী শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশ প্রেমবল্লীর নবীন পত্রপুষ্পাদি স্বরূপ। কৃষ্ণলীলামৃতরস সমূহের দ্বারা পরম উল্লাসময়ী রাধিকা সিক্তা হলেই, সখীরা নিজেদের সেচন থেকেও শতগুণ অধিক হর্ষান্বিতা হন। প্রকৃতপক্ষে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *গোবিন্দ-লীলামৃত* (১০/১৬) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২১২

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও সখীদের কৃষ্ণ সঙ্গমে কোন বাসনা নেই, তবুও শ্রীমতী রাধারাণী যত্ন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখীদের সঙ্গম করান।

শ্লোক ২১৩

নানা-চ্ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায় ।
আত্মকৃষ্ণ-সঙ্গ হৈতে কোটি-সুখ পায় ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

নানা-ছলে সখীদের কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সঙ্গম করান। তখন শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ থেকেও কোটিগুণ বেশি সুখ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২১৪

অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট ।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি' কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমে রস পুষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন, 'গোপীরা কিভাবে তাঁর প্রতি শুদ্ধপ্রেম পরায়ণ হয়েছেন' তখন তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাঁর সখীরা কৃষ্ণসঙ্গ প্রভাবে তাদের নিজেদের সুখের জন্য লালায়িতা নন। পক্ষান্তরে, তারা পরস্পরকে কৃষ্ণসঙ্গ করতে দেখে আনন্দিত হন। এইভাবে তাদের কৃষ্ণপ্রেম বর্ধিত হয়, এবং তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ২১৫

সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম ।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম'-নাম ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদের কৃষ্ণকে ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এই প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু জড় কামক্রীড়ার সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে বলে, তাকে কখনও কখনও 'কাম' বলে বর্ণনা করা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—'কাম'—সম্বিৎ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরা বৃত্তি নয়; পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুর সুখ-তাৎপর্য বিশিষ্ট। 'প্রেম'—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য ও কৃষ্ণ-সেবাময়। গোপীর কামের নামই 'প্রেম', যেহেতু গোপীরা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের সুখের আকাঙ্ক্ষিণী নন, কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য স্বজাতীয় সখীর দ্বারা সেবা করিয়ে, এবং তাদৃশী সখীর দ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্তা হয়ে কৃষ্ণ-কাম স্বীকার করেন মাত্র। জড় 'কাম' এবং 'ভগবৎ-প্রেম'-এর মধ্যে এই পার্থক্য।

শ্লোক ২১৬

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২১৬ ॥

প্রেমা—প্রেম; এব—কেবল; গোপ-রামাণাম্—ব্রজগোপিকাদের; কামঃ—কাম; ইতি—মতন; অগমৎ—গমন করেছিলেন; প্রথাম্—প্রথা; ইতি—এইভাবে; উদ্ধব-আদয়ঃ—শ্রীউদ্ধব আদি ভক্ত; অপি—এমন কি; এতম্—এই; বাঞ্ছন্তি—বাসনা করেন; ভগবৎ-প্রিয়াঃ—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত।

অনুবাদ

"ব্রজগোপিকাদের শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমই 'কাম' বলে আখ্যা দেওয়ার প্রথা হয়েছে। শ্রীউদ্ধব আদি শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তেরাও সেই প্রেমের পিপাসু।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/২৮৫) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২১৭

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য ।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য গোপীভাব-বর্য ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ সম্পাদন কামের তাৎপর্য। কিন্তু গোপিকাদের মনোভাব সেরকম ছিল না। তাদের একমাত্র বাসনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা।

শ্লোক ২১৮

নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার ।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"নিজেদের ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের কোনরকম বাসনা গোপিকাদের ছিল না। কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গম এবং বিহার করেছিলেন।

শ্লোক ২১৯

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ২১৯ ॥

যৎ—যার; তে—তোমার; সুজাত—সুকুমার; চরণ-অম্বু-রুহম্—চরণকমল; স্তনেষু—স্তনে; ভীতাঃ—ভীতা; শনৈঃ—মৃদুভাবে; প্রিয়—হে প্রিয়; দধীমহি—আমরা স্থাপন করি; কর্কশেষু—কর্কশ; তেন—তাদের দ্বারা; অটবীম্—পথ; অটসি—তুমি ভ্রমণ করে; তৎ—তারা; ব্যথতে—ব্যথিত হয়; ন—না; কিম্ স্বিৎ—আমরা মনে মনে ভাবি; কূর্প-আদিভিঃ—ছোট ছোট পাথরকুচি ইত্যাদির দ্বারা; ভ্রমতি—চঞ্চলভাবে গমন করে; ধীঃ—মন; ভবৎ-আয়ুষাম্—তুমি যাদের জীবন, তাদের; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

"হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বন ভ্রমণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/১৯) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২২০

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয় ।
বেদধর্মলোক ত্যজি' সে কৃষ্ণে ভজয় ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই গোপীভাবরূপ অমৃতে যার লোভ হয়, তিনি বেদধর্ম, লোক-ধর্ম আদি পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন এবং তাঁর সেবা করেন।

শ্লোক ২২১

রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি রাগানুগ-মার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির ৬৪টি ভজনাঙ্গ রয়েছে। শাস্ত্রে এই সমস্ত বিধির দ্বারা গুরুদেবের আদেশে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হয়। নির্মল শ্রদ্ধা থাকলেই তাতে অধিকার জন্মায়। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক রাগ (প্রেম), তা দর্শন করে সেই পথে যাদের লোভ হয়, তাদের সেই গোপীভাবামৃত-লোভই রাগানুগমার্গে অধিকার দান করে। ব্রজভূমিতে কৃষ্ণসেবায় কোন বিধি-নিষেধের বাধ্যবাধকতা নেই। পক্ষান্তরে, সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে কৃষ্ণসেবা করেন। সেখানে বৈদিক বিধি অনুসরণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই জড় জগতে কেবল বৈদিক বিধির অনুসরণ করতে হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জড় স্তরে থাকি, ততক্ষণ সেই সমস্ত বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা কর্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম অপ্রাকৃত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই রাগানুগা প্রেমে যেন বেদবিধির লঙ্ঘন করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্ত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে, বেদবিধি লঙ্ঘন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে এই সেবাকে বলা হয় গুণাতীত বা নির্গুণ, কেননা তা জড়প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত নয়।

শ্লোক ২২২

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে ।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভক্তির উন্নত অবস্থায় ভক্ত কোন বিশেষ ভাব নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। ভাবযোগ্য দেহ পেয়ে তিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন।

শ্লোক ২২৩

তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—বেদ এবং উপনিষদ-বেত্তাগণ, যারা রাগমার্গে ভজনা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রজে রক্তক-পত্রক আদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদাম-সুবলাদি কৃষ্ণসখা, নন্দ-যশোদা আদি কৃষ্ণের পিতামাতা, তাঁরা নিজের নিজের রস অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। ব্রজরসভজনে প্রবৃত্তি হলে উক্ত কোন রসে যার লোভ হয়, তিনি সেই ভাবযোগ্য চিৎ-স্বরূপ লাভ করে সিদ্ধিকালে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন; উপনিষদ বা শ্রুতিগণই তার দৃষ্টান্ত। সিদ্ধগণ দেখলেন—গোপীদের আনুগত্য না করলে ব্রজে কৃষ্ণ-ভজনের অধিকার পাওয়া যায় না, তখন তারা গোপীর আনুগত্য গ্রহণ করে রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করেছিলেন।

শ্লোক ২২৪

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২২৪ ॥

নিভৃত—নিয়ন্ত্রিত; **মরুৎ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **দৃঢ়**—কঠিনভাবে; **যোগ**—যোগের পন্থায়; **যুজঃ**—যারা যুক্ত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **যৎ**—যে; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **উপাসতে**—আরাধনা করেন; **তৎ**—এই; **অরয়ঃ**—শত্রুরা; **অপি**—ও; **যযুঃ**—লাভ করেন; **স্মরণাৎ**—স্মরণ করার ফলে; **স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজগোপিকারা; **উরগেন্দ্র**—সর্পে; **ভোগ**—দেহের মতো; **ভুজ**—বাহু; **দণ্ড**—দণ্ড সদৃশ; **বিষক্ত**—সংলগ্ন; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **বয়ম্-অপি**—আমাদেরও; **তে**—আপনার; **সমাঃ**—সমতুল্যা; **সমদৃশঃ**—সমভাব সম্পন্ন; **অঙ্ঘ্রি-সরোজঃ**—শ্রীপাদপদ্মের; **সুধাঃ**—অমৃত।

অনুবাদ

" 'মুনিগণ প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস জয় করে মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করে হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেছিলেন, ভগবানের শত্রুরাও কেবলমাত্র তাঁকে অনুধ্যান বলে (ভয়ে ব্যাকুল হয়ে মনে মনে চিন্তা করে) সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করেছিল। ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পশরীর-তুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য দ্বারা বিমোহিত হয়ে তাঁর পাদপদ্মের সুধা লাভ করেছিলেন, আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করে—গোপীভাবে তাঁর পাদপদ্মসুধা পান করেছি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৭/২৩) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি মূর্তিমান বেদ বা শ্রুতিগণের উক্তি।

শ্লোক ২২৫

'সমদৃশঃ'-শব্দে কহে 'সেই ভাবে অনুগতি' ।
'সমাঃ'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

'সমদৃশঃ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'গোপীদের ভাবের অনুগত হয়ে'। 'সমাঃ'—শব্দে শ্রুতিগণের 'গোপী-দেহ প্রাপ্তি' বুঝায়।

শ্লোক ২২৬

'অঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা'য় কহে 'কৃষ্ণসঙ্গানন্দ'।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' হল 'কৃষ্ণের সঙ্গসুখরূপ আনন্দ'। রাগানুগা ভক্তির প্রভাবেই কেবল এই সিদ্ধি লাভ হয়। বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে কখনও ব্রজের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায় না।

শ্লোক ২২৭

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২২৭ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই শ্রীকৃষ্ণ; **সুখ-আপঃ**—সহজ লভ্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেহিনাম্**—দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়াসক্ত মানুষ; **গোপিকাসুতঃ**—মা যশোদার পুত্র; **জ্ঞানিনাম্**—মনোধর্মী জ্ঞানীদের; **চ**—এবং; **আত্ম-ভূতানাম্**—তপঃ-ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিগণ; **যথা**—যেমন; **ভক্তিমতাম্**—রাগমার্গের ভজনকারী ভক্তদের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান যশোদা-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগভক্তি-পরায়ণ ভক্তদের কাছেই সুলভ। মনোধর্মী জ্ঞানী, ব্রত ও তপস্যা-পরায়ণ আত্মারামদের কাছে তেমন সুলভ নন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত (১০/৯/২১) এই শ্লোকটি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উক্তি। মা যশোদার কৃষ্ণের বশকারিতা গুণ দর্শন করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে ব্রজ-ললনাদের অপ্রাকৃত সহজ রাগানুগা ভক্তির বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ২২৮

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই গোপীভাব অঙ্গীকার করে সর্বক্ষণ রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা চিন্তা করা উচিত।

শ্লোক ২২৯

সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা চিন্তা করার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সিদ্ধদেহ লাভ করা যায়, এবং সখীভাব প্রাপ্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণসেবা লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে 'সিদ্ধদেহ' বলতে, বর্তমান জড়দেহ ও মানস-সূক্ষ্ম দেহের অতিরিক্ত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণের সেবার উপযোগী দেহকে বোঝায়। অর্থাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হলে জীব রাধাকৃষ্ণের সেবার উপযোগী চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়—*সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্মলম্।*

কেউ যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়দেহের অতীত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার যোগ্যতা লাভ করেন। সেই দেহকে বলা হয় সিদ্ধদেহ। জীব তার পূর্বকৃত কর্মফল এবং মনোবৃত্তি অনুসারে বিশেষ স্থূল জড়দেহ লাভ করে। এই জন্মে কর্ম অনুসারে মনোবৃত্তির যখন পরিবর্তন হয়, তখন তার বাসনা অনুসারে পরবর্তী জীবনে সে আর একটি দেহ লাভ করে। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সর্বদা জড় জগৎকে ভোগ করার চেষ্টায় ব্যস্ত। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম-শরীর অনুসারে জীব জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনাক্রমে স্থূল জড়দেহ প্রাপ্ত হয়। বর্তমান জড় শরীরের কার্যকলাপ অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের পরিবর্তন হয়, এবং সেই সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে আর একটি স্থূল শরীর লাভ হয়। এইভাবে জীব একদেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। কিন্তু জীব যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন সে তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীর থেকে মুক্ত হয়ে তার চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।*

চিন্ময় দেহে অধিষ্ঠিত হলে জীব চিৎ-জগতে—গোলোক-বৃন্দাবন অথবা বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়। চিন্ময় দেহে কোনরকম জড় বাসনা থাকে না, এবং তখন রাধাকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা যায়। এইটিই ভগবদ্ভক্তির স্তর *(হৃষিকেণ হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে)।* চিন্ময় দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয় যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্য সহচরীর সেবা সম্পাদন করা যায়—বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর এবং গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর। জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত চিন্ময় দেহে, রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করা যায়। এইভাবে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হলে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির আর কোন বাসনা থাকে না। এই চিন্ময় দেহকে বলা হয় সিদ্ধদেহ—যে দেহের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের চিন্ময়

সেবা সম্পাদন করা যায়। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করাই এই সিদ্ধদেহ প্রাপ্তির পন্থা। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—'সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ'—তার মানে হল, চিন্ময় স্তরে ব্রজগোপিকাদের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৩০

গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে ।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজগোপিকাদের আনুগত্য বিনা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা লাভ করা যায় না। ভগবানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যারা অত্যধিক সচেতন, তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকলেও, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করতে পারেন না।

তাৎপর্য

বিধিমার্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করা যায়। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের সেবা কেবল রাগমার্গেই সম্ভব। রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যপর লীলায় লক্ষ্মী-নারায়ণের ঐশ্বর্যের স্থান নেই। তাই বিধিমার্গের ঊর্ধ্বে, ব্রজগোপিকাদের আনুগত্যে, রাগানুগা ভক্তির মাধ্যমে কেবল রাধা-কৃষ্ণের ভজন হয়। ঐশ্বর্যপর আরাধনায় এই উন্নত স্তর লাভ করা যায় না। যারা রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যপ্রেমে আকৃষ্ট হয়েছেন, তাদের অবশ্যই ব্রজগোপিকাদের আনুগত্য বরণ করতে হবে। তাহলেই কেবল গোলোক-বৃন্দাবনে প্রবেশ করে সরাসরি ভাবে রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করা সম্ভব হবে।

শ্লোক ২৩১

তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন ।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—লক্ষ্মীদেবী ব্রজলীলায় প্রবেশ করার বাসনায় কৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ঐশ্বর্যপর ভাবের জন্য তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পান নি।

শ্লোক ২৩২

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২৩২ ॥

ন—না; অয়ম্—এই; শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবীর; অঙ্গে—বক্ষে; উ—হায়; নিতান্ত-রতেঃ—যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত; প্রসাদঃ—অনুগ্রহ; স্বঃ—স্বর্গের; যোষিতাম্—ললনাগণ; নলিন—পদ্মফুলের; গন্ধ—সৌরভ; রুচাম্—অঙ্গকান্তি; কুতঃ—অনেক কম; অন্যাঃ—অন্যেরা; রাস-উৎসবে—রাসনৃত্যের উৎসবে; অস্য—শ্রীকৃষ্ণের; ভুজ-দণ্ড—বাহু যুগলের দ্বারা; গৃহীত—আলিঙ্গিতা হয়ে; কণ্ঠ—কণ্ঠ; লব্ধ আশিষাম্—যারা এই ধরনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যঃ—যা; উদগাৎ—প্রকাশিত হয়েছিলেন; ব্রজ-সুন্দরীণাম্—বৃন্দাবনের সুন্দরী গোপ-রমণীদের।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে রাসোৎসবে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন ব্রজগোপিকারা তাঁর বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অনুগ্রহ তাঁর বক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি চিদ্-জগতের নিতান্ত অনুগত শক্তিদেরও লাভ হয়নি। পদ্মগন্ধা স্বর্গীয় রমণীদেরও যখন তা লাভ হয় নি, তখন এই জড় জগতের স্ত্রীলোকদের কথা আর কি বলব?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪৭/৬০) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২৩৩

এত শুনি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন পূর্বক দুজনে গলাগলি করে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩৪

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা ।
প্রাতঃকালে নিজ-নিজ-কার্যে দুঁহে গেলা ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে তাঁরা দুজন সেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সকাল বেলায় তাঁরা দুজনে নিজ নিজ কাজে গেলেন।

শ্লোক ২৩৫-২৩৭

বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া ॥ ২৩৫ ॥

'মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন ।
দিন দশ রহি' শোধ মোর দুষ্ট মন ॥ ২৩৬ ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে ।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥' ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

বিদায়কালে রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, "আমাকে কৃপা করার জন্য আপনি এখানে এসেছেন। অতএব অন্তত দিন দশেক এখানে থেকে আমার দুষ্ট মনকে আপনি সংশোধন করুন। আপনি ছাড়া জীবকে উদ্ধার করার আর কেউ নেই। আপনি ছাড়া অন্য কেউই কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে পারেন না।"

শ্লোক ২৩৮-২৩৯

প্রভু কহে,—আইলাঙ শুনি' তোমার গুণ ।
কৃষ্ণকথা শুনি, শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ২৩৮ ॥
যৈছে শুনিলুঁ, তৈছে দেখিলুঁ তোমার মহিমা ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "তোমার গুণের কথা শুনে, তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনে আমার মনকে শুদ্ধ করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। তোমার সম্বন্ধে যে রকম আমি শুনেছিলাম, সেইভাবেই আমি তোমার মহিমা দর্শন করলাম; তুমি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমরস-তত্ত্বজ্ঞানের সীমা।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখেছিলেন যে, রামানন্দ রায় রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম ও রসতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী। তাই এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন, রামানন্দ রায়ই সেই জ্ঞানের সীমা।

শ্লোক ২৪০-২৪১

দশ দিনের কা-কথা যাবৎ আমি জীব' ।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ২৪০ ॥
নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব এক-সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "দশ দিনের কি কথা, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারব না। নীলাচলে তুমি আর আমি একসঙ্গেই থাকব এবং কৃষ্ণকথা আলোচনা করে সুখে কাল যাপন করব।"

শ্লোক ২৪২

এত বলি' দুঁহে নিজ-নিজ কার্যে গেলা ।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে তাঁরা নিজের নিজের কাজে চলে গেলেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় রামানন্দ রায় আবার এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২৪৩-২৪৪

অন্যোন্যে মিলি' দুঁহে নিভৃতে বসিয়া ।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২৪৩ ॥
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর ।
এই মত সেই রাত্রে কথা পরস্পর ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই রূপে তাঁরা নিভৃতে মিলিত হয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মহানন্দে পরস্পরের সঙ্গ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রশ্ন করতেন, আর রামানন্দ রায় উত্তর দিতেন।

শ্লোক ২৪৫

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥" ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন বিদ্যা নেই।"

তাৎপর্য

২৪৫ থেকে ২৫৭ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের প্রশ্নোত্তরের বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চিন্ময় অস্তিত্বের সঙ্গে জড় অস্তিত্বের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা চিন্ময়, এবং তা সর্বোত্তম শিক্ষা। জড় জগতের শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টাগুলি বৃদ্ধি করা। ভোগময় জড় জ্ঞানের উর্ধ্বে ঠিক ত্যাগময় জ্ঞান রয়েছে, যাকে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু এই ব্রহ্মবিদ্যা বা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উর্ধ্বে বিষ্ণুসেবার বিদ্যা। তারও উর্ধ্বে কৃষ্ণভক্তির বিদ্যা, যা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/২৯/৪৯) বলা হয়েছে—

তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ।

"যে কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান হয় তা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যে বিদ্যা কৃষ্ণভাবনা প্রদান করে তা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/২৩-২৪) আরও বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

এটি পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—"বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা, তাঁর অর্চন, তাঁর বন্দন, তাঁর দাস্য, তাঁর সখ্য এবং তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন—এই নয়টি ভগবদ্ভক্তি-সাধনের পন্থা। যিনি এই কার্যে যুক্ত হয়েছেন, বুঝতে হবে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা অর্জন করেছেন।"

শ্লোক ২৪৬

'কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?'
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥' ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত কীর্তির মধ্যে কোন কীর্তি শ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণভক্ত বলে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনিই সবচাইতে বড় কীর্তিমান।"

তাৎপর্য

জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল কৃষ্ণভক্ত হওয়া এবং কৃষ্ণভাবনাময় কার্য করা। জড় জগতে সকলেই ধন-সম্পদ আহরণ করার মাধ্যমে যশস্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। সমাজে জড় উন্নতি লাভের জন্য কর্মীরা নিরন্তর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। এই প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে সারা পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, এই ধরনের নাম ও খ্যাতি অনিত্য, কেননা তা ততদিনই থাকে যতদিন এই অনিত্য জড় দেহটি থাকে। কেউ জড় ঐশ্বর্যশালী বলে খ্যাতি অর্জন করুন, অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বলে খ্যাতি অর্জন করুন, তা 'কৃষ্ণভক্ত' বলে খ্যাতির থেকে অনেক নিকৃষ্ট। *গরুড়-পুরাণে* বলা হয়েছে—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈবলভ্যতে ।
ব্রহ্মরুদ্র পদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥

"কলিযুগে 'ভাগবত' নামক খ্যাতি অত্যন্ত দুর্লভ। অথচ, এই পদটি ব্রহ্মা, রুদ্র আদি মহান দেবতাদের পদের থেকেও উৎকৃষ্ট। আমার গুরুগণ এই কথা আমাকে বলেছেন।"

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে নারদমুনি পুণ্ডরীককে বলছেন—

জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ।
'দাসোঽহং বাসুদেবস্য' সর্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥

"বহু জন্ম জন্মান্তরের পর কেউ যখন উপলব্ধি করেন যে, তিনি বাসুদেবের নিত্যসেবক, তিনি তখন সারা জগৎ উদ্ধার করতে পারেন।"

আদি-পুরাণে কৃষ্ণ-অর্জুন সংলাপে বলা হয়েছে—

ভক্তানাম্ অনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥

"শ্রুতিসহ মুক্তপুরুষেরা ভক্তদের অনুগমন করেন।" তেমনই, *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে—

অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মা আদি দেবতারা ভগবদ্ভক্তের প্রভাব অবগত হতে পারেন নি।" তেমনই, আবার *গরুড়-পুরাণে* বলা হয়েছে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে ।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥

"হাজার হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা সম্পন্ন হন এবং এইরকম হাজার হাজার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন সর্ববেদান্ত-পারগ হন। এই রকম কোটি কোটি বেদান্তবিদের মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন বিষ্ণুভক্ত পাওয়া যায় এবং এই রকম হাজার হাজার বিষ্ণুভক্তের মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত দেখা যায়, যারা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। এইভাবে দেখা যায় যে, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তের স্থান সকলের উপরে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৩/১৩/৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥

"কঠোর পরিশ্রম করে যিনি গভীর বৈদিক জ্ঞানলাভ করেছেন, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত যশস্বী। কিন্তু, যিনি সর্বক্ষণ তাঁর হৃদয়ে মুকুন্দ-পদারবিন্দের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করেছেন, তিনি অবশ্যই তার থেকেও শ্রেষ্ঠ।"

নারায়ণব্যূহ-স্তবে বলা হয়েছে—

নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে ।
ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু ॥

"আমি ব্রহ্মার জন্ম আকাঙ্ক্ষা করি না, যদি সেই ব্রহ্মা ভগবদ্ভক্ত না হয়। পক্ষান্তরে, আমি একটি কীটরূপে জন্মগ্রহণ করেও সন্তুষ্ট থাকব যদি আমি ভক্তের গৃহে থাকতে পারি।"

এরকম বহু শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে, বিশেষ করে ৩/২৫/৩৮, ৪/২৪/২৯, ৪/৩১/২২, ৭/৯/২৪ এবং ১০/১৪/৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মহাদেব বলেছেন—"আমি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি না, কৃষ্ণভক্তই কেবল সমস্ত তত্ত্ব জানেন। সমস্ত হরিভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদ মহারাজ মহোত্তম।"

প্রহ্লাদ মহারাজের থেকে পাণ্ডবেরা আরও উত্তম ভক্ত। পাণ্ডবদের থেকে যদুরা আরও উত্তম। যদুদের মধ্যে উদ্ধব সর্বোত্তম, এবং উদ্ধবের থেকেও ব্রজগোপিকারা শ্রেষ্ঠা। *বৃহৎ-বামন-পুরাণে* ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে ব্রহ্মা বলছেন—

ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা ।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে ॥
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ ॥

"ব্রজগোপিকাদের চরণরেণু উপলব্ধি করার জন্য আমি ষাটহাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলাম, কিন্তু তবুও আমি তাঁদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। আমার কি কথা—শিব, শেষ এবং লক্ষ্মীদেবীও তাঁদের মহিমা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেননি।"

আদি পুরাণে ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মারুদ্রশ্চ পার্থিব ।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজন মম ॥

"ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী, এমনকি আমার নিজের থেকেও গোপীগণ আমার অধিক প্রিয়।" সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয়তম সেবকেরা, শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর যারা একান্ত অনুগত, তারাই 'রূপানুগ'-নামে খ্যাত, তাদের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে* বলা হয়েছে—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যান কোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যারা যুক্ত হয়েছেন, তাদের শম, দম, ক্ষান্তি, মৈত্রী, তপশ্চর্যা, জ্ঞান আদি গুণের কোন তুলনা হয় না। নিরন্তর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত ভক্তদের এমনই মহিমা।

শ্লোক ২৪৭

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?'
'রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥' ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "জীবের সম্পত্তির মধ্যে কোন্ সম্পত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "রাধাকৃষ্ণে যাঁর প্রেম, তিনিই সবচাইতে ধনী।"

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনের জন্য ধন-সম্পদ আহরণের চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে ধন-সম্পদ আহরণ এবং সেগুলি আগলে রাখার চেষ্টা ছাড়া মানুষ অন্য কোন ব্যাপারেই তেমন আগ্রহী নয়। এই জড় জগতে সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমরা যখন জড় জগতের ধনী ব্যক্তির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে ধনী ভক্তের তুলনা করি, তখন দেখি যে, ভগবদ্ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩৯/২) বলা হয়েছে—

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে ।
তথাপি তৎপরা রাজন্নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥

"লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবানকে যিনি প্রসন্ন করেছেন, সেই ভক্তের অলভ্য আর কি থাকতে পারে? যদিও সেই ভক্ত সবকিছু পেতে পারেন, তবুও—হে রাজন, তারা কোন কিছুর বাসনা করেন না।"

শ্লোক ২৪৮

'দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?'
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥' ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত দুঃখের মধ্যে কোন্ দুঃখ সবচাইতে গুরুতর?" শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ থেকে অধিক গুরুতর দুঃখ আমি আর দেখি না।"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩০/৬) বলা হয়েছে—

মামনারাধ্য দুঃখার্ত কুটুম্বাসক্ত মানসঃ ।
সৎসঙ্গ-রহিতো মর্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ ॥

"যে মানুষ আমার আরাধনা করে না, যে তার আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবার পরিজনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং যে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত, সে সবচাইতে অসুখী ব্যক্তি।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে (১/৫/৪৪) বলা হয়েছে—

স্ব জীবনাধিকং প্রার্থ্যং শ্রীবিষ্ণুজনসঙ্গতঃ ।
বিচ্ছেদেন ক্ষণং চাত্র ন সুখাংশং লভামহে ॥

"জীবের সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তের ক্ষণিক বিচ্ছেদে সমস্ত সুখ অন্তর্হিত হয়ে যায়।"

শ্লোক ২৪৯

'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?'
'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥' ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত মুক্তদের মধ্যে কোন্ জীব মুক্তশ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় তখন উত্তর দিলেন, "যিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন, তিনিই মুক্ত-শিরোমণি।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৪/৫) বলা হয়েছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

"হে মহামুনি, কোটি কোটি মুক্ত এবং সিদ্ধদের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা দুর্লভ।"

শ্লোক ২৫০

'গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম?'
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'—যেই গীতের মর্ম ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত গানের মধ্যে কোন্ গান জীবের প্রকৃত ধর্ম?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "যে গান রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলী বর্ণনা করে, সেই গানই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩৬) বলা হয়েছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

"জীবদের কৃপা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ আশ্রয় করে তাঁর লীলা প্রদর্শন করেন, যাতে বদ্ধজীবেরা সেই লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।" রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা যেখানে গাওয়া হয়, সেখানে অভক্তদের প্রবেশ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ভক্ত না হলে, জয়দেব গোস্বামী, চণ্ডীদাস আদি মহান ভক্তদের রচিত রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা শ্রবণ অত্যন্ত বিপদজনক। মহাদেব হলাহল পান করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত হতে হবে। তাহলেই কেবল জয়দেব আদি কবিদের গান শুনে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করা যায়। মহাদেবের অনুকরণ করে কেউ যদি বিষ পান করে, তাহলে নির্ঘাত তার মৃত্যু হবে।

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন কেবল উত্তম অধিকারী ভক্তদের জন্য, বিষয়াসক্ত অভক্তেরা, যারা পি-এইচ.ডি উপাধি পাওয়ার জন্য এই বিষয়ে থিসিস্ লেখে, তারা কখনও এই বিষয়ের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তা তাদের উপর বিষের মতো ক্রিয়া করে।

শ্লোক ২৫১

'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'
'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥' ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত মঙ্গলজনক এবং শুভকার্যের মধ্যে কোনটি জীবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "জীবের একমাত্র শ্রেয় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করা, এছাড়া আর কোন শ্রেয় নেই।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩০) বলা হয়েছে—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥

"আমরা আপনার কাছে সবচাইতে মঙ্গলজনক কার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। আমার মনে হয় এই জড় জগতে ক্ষণার্ধের জন্যও কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ করা সবচাইতে পরম মঙ্গলজনক।"

শ্লোক ২৫২

'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?'
'কৃষ্ণ'-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥' ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "জীব সর্বক্ষণ কার কথা স্মরণ করবে?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি স্মরণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/২/৩৬) বলা হয়েছে—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"জীবের কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ সর্ব অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা, কীর্তন করা এবং স্মরণ করা প্রতিটি মানুষেরই পরম কর্তব্য।"

শ্লোক ২৫৩

'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?'
'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ॥' ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সব রকমের ধ্যানের মধ্যে কিসের ধ্যান করা জীবের কর্তব্য?" শ্রীল রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "রাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করাই জীবের প্রধান কর্তব্য।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৪) বর্ণনা করা হয়েছে—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥

"শৌনকাদি ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"একাগ্রচিত্তে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সর্বক্ষণ শ্রবণ করা, কীর্তন করা, ধ্যান করা ও পূজা করা কর্তব্য।"

শ্লোক ২৫৪

'সর্ব ত্যজি' জীবের কর্তব্য কাহাঁ বাস?'
'ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহাঁ লীলারাস ॥' ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সবকিছু ত্যাগ করে কোথায় বাস করা জীবের কর্তব্য?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যেখানে ভগবান তাঁর রাসলীলা-বিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৭/৬১) বর্ণনা করা হয়েছে—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

"বৃন্দাবনের যে গোপিকারা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার জন্য আত্মীয়-স্বজন এবং সমস্ত সামাজিক বন্ধন পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের চরণরেণু লাভের আশায় আমি বৃন্দাবনে একটি লতা বা গুল্ম বা ঔষধি হতে চাই।"

শ্লোক ২৫৫

'শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?'
'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥' ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়টি জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি শ্রবণই কর্ণের সবচাইতে আনন্দদায়ক বিষয়।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩৯) বলা হয়েছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা শ্রবণ করেন এবং যিনি তা বর্ণনা করেন, তারা ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করে অচিরেই কামরূপ হৃদ্‌রোগ থেকে মুক্ত হন।"

কেউ যখন জড় আসক্তিরহিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ের কামরূপ কলুষ সর্বতোভাবে বিদূরিত হয়। এক পাষণ্ডী একসময় বলেছিল বৈষ্ণবেরা যখন "রাধা, রাধা"—নাম উচ্চারণ করে তখন তার রাধা নামক এক নাপিত পত্নীর কথা স্মরণ হয়। এটি একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে, রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস শ্রবণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। জড় বন্ধন থেকে মুক্ত না হয়ে কেউ যদি রাসলীলার বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহলে তার কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে, যার নাম হয়তো রাধা—অবৈধ কাম ক্রীড়ার কথা স্মরণ হতে পারে। বদ্ধ-অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলার স্মরণ করারও চেষ্টা করা উচিত নয়। বৈধীভক্তি অনুশীলনের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের উদয় হয়। তখনই কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করা উচিত। এই সমস্ত লীলাবিলাস যদিও বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই কাছে আনন্দদায়ক; তবুও বদ্ধজীবদের তা শ্রবণ করা উচিত নয়। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথোপকথন মুক্তস্তরে সম্পাদিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫৬

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?'
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ॥' ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত উপাস্য বস্তুর মধ্যে কোন্ উপাস্য বস্তুটি প্রধান?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, " 'রাধাকৃষ্ণ' নাম, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শ্রেষ্ঠ উপাস্য।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩/২২) বর্ণনা করা হয়েছে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

"এই জড় জগতে জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা এবং ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করা।"

শ্লোক ২৫৭

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি?'
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥' ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "যারা মুক্তিলাভের বাসনা করে এবং যারা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ বাসনা করে, তাদের কি গতি হয়?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "যারা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভের চেষ্টা করে, তারা বৃক্ষ আদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়; আর যারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা করে তারা দেবদেহ প্রাপ্ত হয়।"

তাৎপর্য

যারা এই জড় জগৎকে দুঃখময় জেনে ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তিলাভের বাসনা করেন, তাদের ভগবানের চিন্ময় সেবা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তাই তারা বৃক্ষ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে শত শত বছর ধরে নিষ্ক্রিয়-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃক্ষ যদিও জীব, কিন্তু তারা স্থাবর। যারা ব্রহ্মের জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে, তাদের অবস্থা বৃক্ষের থেকে কোন অংশে শ্রেয় নয়। বৃক্ষ ভগবানের শক্তিতেই দাঁড়িয়ে থাকে, কেননা এই জড়শক্তি এবং ভগবানের চিৎ-শক্তি উভয়ই ভগবানেরই শক্তি। ব্রহ্মজ্যোতিও ভগবানেরই শক্তি। কেউ ব্রহ্মজ্যোতিতে থাকুন অথবা জড়া-প্রকৃতিতে থাকুন, একই কথা, কেননা উভয় অবস্থাতেই চিন্ময় ক্রিয়া নেই। যারা ভুক্তিকামী অর্থাৎ যারা জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তাদের অবস্থা মুক্তিকামীদের থেকে ভাল। এই ধরনের জীবেরা চরমে দেবতাদের মতো নন্দনকাননে স্বর্গসুখ ভোগ করতে চায়। তারা ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করার জন্য অন্তত তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা, যারা স্বেচ্ছায় তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে ফেলতে চায়, তারা জড় এবং চিন্ময় উভয় প্রকার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। একটি পাথর স্থাবর এবং তার জড় অথবা চিন্ময় কোন ক্রিয়াই

নেই। কর্মীদের সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১০/২৩) বলা হয়েছে—

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ॥

"বহু যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর, ভুক্তিকামী কর্মীরা, তাদের পুণ্যফলের প্রভাবে স্বর্গলোকে গিয়ে দেবতাদের মতো দিব্যসুখ ভোগ করে।"

ভগবদ্গীতায় (৯/২০-২১) বলা হয়েছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি
দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

'যারা স্বর্গলোক লাভের আশায় বেদপাঠ করে এবং সোমরস পান করে, তারা পরোক্ষভাবে আমার আরাধনা করে। তারা ইন্দ্রলোকে উন্নীত হয়ে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে। স্বর্গলোকে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করার পর, তাদের অর্জিত পুণ্য ক্ষীণ হয়ে এলে তারা পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। এইভাবে, বেদ-বিধি অনুসরণ করে তারা কেবল অনিত্য সুখ লাভ করে।"

তাই তাদের পুণ্যকর্ম শেষ হয়ে গেলে কর্মীরা আবার বৃষ্টির ধারায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসে, এবং ঘাস বা তৃণগুল্মরূপে জীবন শুরু করে।

শ্লোক ২৫৮

অরসজ্ঞ কাক চূযে জ্ঞান-নিম্বফলে ।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "মুক্তিকামী জ্ঞানীরা অরসজ্ঞ, তারা কর্কশ তর্কনিষ্ঠ কাকের মতো; কাক যেমন তিক্ত নিম্বফল খায়, তারাও তেমনই শুষ্ক নীরস জ্ঞানের চর্চা করে। কিন্তু যারা রসজ্ঞ, তারা কোকিলের মতো; তারা কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্র-মুকুলের প্রিয় ও সুমিষ্ট রস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

'জ্ঞান'-এর পন্থা নিম্বফলের মতো তিক্ত। এই ফল কর্কশ তর্কনিষ্ঠ কাকেরাই খায়। অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানের পন্থা কাকসদৃশ মানুষেরাই গ্রহণ করে। কিন্তু কোকিলের মতো মানুষেরা,

যারা মধুর স্বরে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তারা অত্যন্ত সুমিষ্ট কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্রমুকুল আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২৫৯

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান ।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "দুর্ভাগা জ্ঞানীরা শুষ্ক জ্ঞান আস্বাদন করে, আর কৃষ্ণভক্তরা সর্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করেন। তাই তারা সব চাইতে ভাগ্যবান।"

শ্লোক ২৬০

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা-রসে ।
নৃত্য-গীত-রোদনে হৈল রাত্রি-শেষে ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তারা দুইজন কৃষ্ণকথারসে মগ্ন হয়ে কখনও নৃত্য করে, কখনও গান করে, এবং কখনও ক্রন্দন করে রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২৬১

দোঁহে নিজ-নিজ-কার্যে চলিলা বিহানে ।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি' মিলিলা আর দিনে ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সকালবেলা তারা নিজ নিজ কাজে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় রামানন্দ রায় আবার এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২৬২-২৬৪

ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি' কতক্ষণ ।
প্রভুপদ ধরি' রায় করে নিবেদন ॥ ২৬২ ॥
'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্বসার' ।
'রসতত্ত্ব' 'লীলাতত্ত্ব' বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৩ ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরদিন সন্ধ্যাবেলায়, কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা আলোচনা করার পর, রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধরে বললেন—"কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্বসার', 'রসতত্ত্ব', 'লীলাতত্ত্ব' এই সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব কৃপা করে আমার হৃদয়ে আপনি প্রকাশ করেছেন। এ যেন ঠিক নারায়ণের ব্রহ্মাকে বেদের জ্ঞান দান করার মতো।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান দান করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/১৮) বলা হয়েছে—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

"যিনি প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেছিলেন, যাঁর থেকে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আশায় আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই।" *শ্রীমদ্ভাগবতেও* ২/৯/৩০-৩৫, ১১/১৪/৩, ১২/৪/৪০ এবং ১২/১৩/১৯—এই শ্লোকগুলিতে সেই কথা বলা হয়েছে।

শ্লোক ২৬৫

অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে ।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "অন্তর্যামী ভগবানের কার্যকলাপ এরকমই, তিনি বাইরে কিছু না বলে অন্তরে তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ করেন।"

তাৎপর্য

এখানে শ্রীরামানন্দ রায় ঘোষণা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমাত্মা ভক্তকে দিব্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত করেন; তাই তিনিই হচ্ছেন গায়ত্রীমন্ত্রের উৎস। গায়ত্রীমন্ত্রে বলা হয়েছে—*ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।* এখানে রামানন্দ রায় প্রকাশ করছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্তক ভর্গোদেব। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/২২) বলা হয়েছে—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি ।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষিণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥

"যিনি কল্পের আদিতে ব্রহ্মার অন্তঃকরণে সৃষ্টি বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি সঞ্চারিত করেন এবং যাঁর ইচ্ছায় শিক্ষাদিযুক্ত বেদবাণী সেই ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গতা হয়েছিলেন—সেই জ্ঞানপ্রদ ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।" পরীক্ষিত মহারাজকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শোনাবার প্রাক্কালে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

শ্লোক ২৬৬

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২৬৬ ॥

জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; **অস্য**—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; **যতঃ**—যার থেকে; **অন্বয়াৎ**—সরাসরিভাবে; **ইতরতঃ**—ব্যতিরেক ভাবে; **চ**—এবং; **অর্থেষু**—অর্থ সমূহ; **অভিজ্ঞঃ**—সম্পূর্ণরূপে অবগত; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **তেনে**—প্রকাশ করেছিলেন; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **হৃদা**—হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি; **যঃ**—যিনি; **আদি-কবয়ে**—ব্রহ্মাকে; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন; **যৎ**—যার সম্বন্ধে; **সূরয়ঃ**—মহান ঋষিরা এবং দেবতারা; **তেজঃ**—অগ্নি; **বারি**—জল; **মৃদাম্**—মাটি; **যথা**—যেভাবে; **বিনিময়ঃ**—পরস্পর মিশ্রণ; **যত্র**—যার ফলে; **ত্রিসর্গঃ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ; **অমৃষা**—সত্যবৎ; **ধাম্না**—সমস্ত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যসহ; **স্বেন**—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; **সদা**—সবসময়; **নিরস্ত**—নিবৃত্ত; **কুহকম্**—কুহক; **সত্যম্**—সত্য; **পরম্**—পরম; **ধীমহি**—আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ

"আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কারণ তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক বলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/১/) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৬৭-২৬৯

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২৬৭ ॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥ ২৬৮ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "আমার হৃদয়ে একটি সংশয় উদিত হয়েছে, কৃপা করে সেই সংশয়টি আপনি দূর করুন। প্রথমে আমি আপনাকে সন্ন্যাসীরূপে দর্শন করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনাকে শ্যামসুন্দর গোপবালকরূপে দর্শন করছি। আপনার সামনে দেখছি একটি সুবর্ণ প্রতিমা, এবং তার উজ্জ্বল গৌরকান্তি দিয়ে আপনার সর্বঅঙ্গ ঢাকা।

তাৎপর্য

শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ঘন শ্যামবর্ণ, কিন্তু এখানে রামানন্দ রায় বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করলেও, তাঁর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ। তার কারণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ শ্রীমতী রাধারাণীর কান্তির দ্বারা আচ্ছাদিত।

শ্লোক ২৭০

তাহাতে প্রকট দেখোঁ স-বংশী বদন ।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর সেই রূপে তাঁর মুখে বাঁশী এবং নানাভাবের আবেশে তাঁর কমল-সদৃশ নয়ন যুগল চঞ্চল।

শ্লোক ২৭১

এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার ।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে আপনাকে দর্শন করে আমার হৃদয় চমৎকৃত হয়েছে। হে প্রভু, অকপটে আপনি আমাকে তার কারণ বলুন।"

শ্লোক ২৭২

প্রভু কহে,—কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয় ।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন উত্তর দিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার গভীর প্রেম বর্তমান এবং নিশ্চিতভাবে জেনো যে, প্রেমের স্বভাবই এরকম।

শ্লোক ২৭৩

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"স্থাবর-জঙ্গম সবকিছুতেই মহাভাগবত পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। তিনি সবকিছুকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপে দর্শন করেন।

শ্লোক ২৭৪

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাভাগবত স্থাবর-জঙ্গম দর্শন করেন, কিন্তু তিনি তাদের রূপ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন।"

তাৎপর্য

তাঁর গভীর কৃষ্ণানুরাগবশত মহাভাগবত সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।

ভক্ত যখনই কোন কিছু দর্শন করেন—তা স্থাবর হোক অথবা জঙ্গমই হোক—তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন। উন্নততরের ভক্ত উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন। এই জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই তার কাছে প্রকাশিত হয়। কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, কিভাবে কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৮) বলা হয়েছে—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ ।
প্রণব সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

"হে কৌন্তেয়, আমি জলের স্বাদ, সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভা, সমস্ত বেদের মধ্যে 'প্রণব' (ওঁকার); আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।"

এইভাবে ভক্ত যখন জল বা অন্য কোন পানীয় পান করেন, তৎক্ষণাৎ তার কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে যায়। ভক্তের পক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা মোটেই কঠিন নয়। তাই বলা হয়েছে—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥"

মহাভাগবত দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তিনি অন্য কিছুই দর্শন করেন না। স্থাবর এবং জঙ্গম সবকিছুই ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিকাররূপে দর্শন করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার এই ভিন্না প্রকৃতি বা জড় জগৎ রচিত হয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নয়। ভক্ত যখন একটি বৃক্ষকে দেখেন, তিনি জানেন সেই বৃক্ষটি দুটি শক্তির সমন্বয়—জড় এবং চেতন। নিকৃষ্ট জড় শক্তি দিয়ে সেই বৃক্ষটির দেহ রচিত হয়েছে ; কিন্তু সেই জড় শরীরের ভিতরে রয়েছে একটি চিৎ-স্ফুলিঙ্গ—জীবাত্মা, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। এটি শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টা শক্তি। যা কিছু আমরা দর্শন করি তা সবই এই দুটি শক্তির সমন্বয়। কোন উন্নত ভক্ত যখন এই সমস্ত শক্তির কথা চিন্তা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারেন যে, সেগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রকাশ। সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কার্যে ব্যস্ত হই। তেমনই, ভক্ত যখনই ভগবানের শক্তিকে দেখেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন।

"সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি", এই শ্লোকটিতে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে ভক্ত ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে নির্মল হয়েছেন, তিনি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকেই কেবল দর্শন করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে উদ্ধৃত (১১/২/৪৫) পরবর্তী শ্লোকটিতেও তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭৫

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৭৫ ॥

সর্বভূতেষু—চেতন এবং অচেতন সমস্ত বস্তুতে; **যঃ**—যিনি; **পশ্যেৎ**—দর্শন করেন; **ভগবদ্ভাবম্**—ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা; **আত্মনঃ**—জড়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে; **আত্মনি**—সমস্ত অস্তিত্বের মূলতত্ত্ব; **এষঃ**—এই; **ভাগবত-উত্তমঃ**—উত্তম ভাগবত।

অনুবাদ

"যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মারও আত্মাস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত জীবকে দেখেন।"

শ্লোক ২৭৬

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২৭৬ ॥

বনলতাঃ—বনের লতাগুল্ম; **তরবঃ**—বৃক্ষরাজি; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **বিষ্ণুম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ**—প্রকাশ করে; **ইব**—মতন; **পুষ্প-ফল-আঢ্যাঃ**—ফল, ফুল ইত্যাদিতে পূর্ণ; **প্রণত-ভার**—ভারাবনত; **বিটপা**—তরুরাজি; **মধুধারাঃ**—মধুধারা; **প্রেমহৃষ্ট**—ভগবৎপ্রেমে উৎফুল্ল হয়ে; **তনবঃ**—যাদের দেহ; **ববৃষুঃ**—নিরন্তর বর্ষণ করেছেন; **স্ম**—অবশ্যই।

অনুবাদ

"কৃষ্ণপ্রেমে হরষিত হয়ে বনের বৃক্ষরাজি এবং লতা ফলে-ফুলে পূর্ণ হয়ে ভারাবনত হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত হয়ে তারা মধুধারা বর্ষণ করেছিল।' "

তাৎপর্য

দিনের বেলায় কৃষ্ণ বনে গমন করলে বিরহ-সন্তপ্ত গোপীরা এইভাবে গান করেছিলেন। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে গোপীরা নিরন্তর তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তেমনই ভক্তেরা সবকিছুকে কৃষ্ণের সেবার উপযোগী বলে দর্শন করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ব ২/১২৬) বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

উত্তম ভক্ত বা ভাগবত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত কোন কিছু দর্শন করেন না। মায়াবাদীদের মতো ভগবদ্ভক্ত এই জড় জগৎকে মিথ্যা বলে দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি এই জড় জগতের সবকিছুই কৃষ্ণ সম্বন্ধে দর্শন করেন। ভক্ত জানেন কিভাবে সবকিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করতে হয়, এবং সেইটিই মহাভাগবতের বৈশিষ্ট্য। গোপীরা দেখেছিলেন, বনের তরুলতা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে প্রস্তুত হয়েছিল। এইভাবে তারা তাদের পরম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে তখন স্মরণ করেছিলেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা যেভাবে গাছপালা দেখে, তারা সেইভাবে তাদের দর্শন করেননি।

শ্লোক ২৭৭

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "রাধাকৃষ্ণে তোমার গভীর প্রেম, তাই তুমি সর্বত্রই রাধাকৃষ্ণকেই দর্শন কর।"

শ্লোক ২৭৮

রায় কহে,—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভূরি ।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "হে প্রভু, দয়া করে কথার ছলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না এবং আপনার স্বরূপ আমার কাছে লুকোবেন না।

শ্লোক ২৭৯

রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার ।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি নিয়ে আপনি আপনার নিজের রস আস্বাদন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ২৮০

নিজ-গূঢ়কার্য তোমার—প্রেম আস্বাদন ।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার একটি নিগূঢ় কারণ রয়েছে—সেই কারণটি হচ্ছে আপনার নিজের প্রেম-আস্বাদন করা। আর তার আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনি সারা জগৎকে প্রেমময় করেছেন।

শ্লোক ২৮১

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ।
এবে কপট কর,—তোমার কোন্ ব্যবহার ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আপনি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছেন। এখন কপটতা করে আপনি আপনার স্বরূপ লুকাচ্ছেন। এ আপনার কি রকম ব্যবহার?"

শ্লোক ২৮২

তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন মৃদু হেসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর স্বরূপ দেখালেন।

তাৎপর্য

এই রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে *রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্*—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে এসেছেন। তাঁর সেই রূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। উত্তম ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রাধাকৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ, তাই তিনি রাধাকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী লিখেছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

(চৈঃচৈঃ আঃ-১/৫)

রাধাকৃষ্ণ এক তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ হচ্ছেন—কৃষ্ণ এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর হ্লাদিনী শক্তি প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দুজন বলে মনে হয়—রাধা এবং কৃষ্ণ। তা না হলে, রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েই এক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় মহাভাগবতেরা এই একত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। রামানন্দ রায়ের সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। *মহাভাগবত*-স্তরে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, কিন্তু তা বলে কোন অবস্থাতেই তাদের অনুকরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৮৩

দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে ।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রূপ দর্শন করে রামানন্দ রায় আনন্দে মূর্ছিত হলেন এবং স্থির থাকতে না পেরে তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন।

শ্লোক ২৮৪

প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি' করাইলা চেতন ।
সন্ন্যাসীর বেষ দেখি' বিস্মিত হৈল মন ॥ ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর হস্ত স্পর্শ করে—তার চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীর বেশ দেখে রামানন্দ রায় বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ২৮৫

আলিঙ্গন করি' প্রভু কৈল আশ্বাসন ।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে অন্যজন ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুমি ছাড়া আর কেউ এই 'রূপ' দেখেনি।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, কেন না আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। যারা মূর্খ এবং নির্বোধ তারা তাই অজ এবং অব্যয়রূপে আমাকে জানতে পারে না।"

ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। কিন্তু ভক্তরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। তারা তাদের জিহ্বা দিয়ে ভগবানের নাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন এবং মহাপ্রসাদ আস্বাদন করেন। তাই ভক্তের সেবায় তুষ্ট হয়ে ভগবান নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করেন। ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা কখনও ভগবানকে দেখা যায় না। কিন্তু ভগবান যখন ভক্তের সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ২৮৬

মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে ।
অতএব এইরূপ দেখাইলুঁ তোমারে ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমার লীলার তত্ত্ব, আমার রসের তত্ত্ব, সবই তুমি জান। তাই আমি তোমাকে আমার এই রূপ দেখালাম।

শ্লোক ২৮৭

গৌর অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন ।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার অঙ্গ গৌর নয়; শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গের স্পর্শে তা এই বর্ণ ধারণ করেছে। ব্রজেন্দ্রনন্দন ছাড়া তিনি অন্য কাউকে স্পর্শ করেন না।

শ্লোক ২৮৮

তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন ।
তবে নিজ-মাধুর্য করি আস্বাদন ॥ ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর ভাবে আমার আত্মা এবং মনকে ভাবিত করে আমি এইভাবে আমার মাধুর্য আস্বাদন করছি।"

তাৎপর্য

শ্রীগৌরসুন্দর এখানে রামানন্দ রায়কে বললেন, "প্রিয় রামানন্দ, তুমি যে আমাকে পৃথক একজন 'গৌর পুরুষ' বলে দর্শন করছ,—আমি তা নই; আমি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আমার অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম, কিন্তু যখন আমি রাধারাণীর অঙ্গস্পর্শ লাভ করি, তখন আমার অঙ্গ গৌর হয়ে যায়। আমার এই গৌরভাবই নিত্য। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাউকে স্পর্শ করেন না। রাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করে আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্যরস আস্বাদন করি।"

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—"প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় 'গৌর অঙ্গ নহে' কথার দ্বারা গৌর ও কৃষ্ণকে পৃথক বলে মনে করে; বস্তুত উভয়েই স্বয়ংরূপ বিগ্রহ। অর্থাৎ গৌরই 'কৃষ্ণ স্বরূপে' সম্ভোগ রসে নাগর ও বিষয়-বিগ্রহ; আবার কৃষ্ণই 'গৌর স্বরূপে' বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়-বিগ্রহ-শ্রীরাধাভাব-কান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ ধীরললিত নায়ক স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন বিষ্ণুবিগ্রহই কৃষ্ণের পূর্ণ চিৎ-শক্তি বা স্বরূপশক্তি মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধিকার ভোক্তা হতে পারেন না; যেহেতু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর সমস্ত বিষ্ণুবিগ্রহে শৃঙ্গার-রস ও ধীরললিত-নায়ক ভাবের অভাব এবং ঐশ্বর্যভাবের প্রাবল্য, সেইজন্যই শ্রীমতী রাধারাণীর নাম, "গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ-সর্বস্ব; সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥'

শ্লোক ২৮৯

তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম ।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্বমর্ম ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর শুদ্ধভক্ত রামানন্দ রায়ের কাছে স্বীকার করলেন, "তোমার কাছে আমার কোন কিছুই গোপনীয় নয়। যদিও আমি আমার কার্যকলাপ লুকোতে চাই, তবুও তোমার প্রেমের বলে তুমি সবকিছু জেনে ফেল।

শ্লোক ২৯০

গুপ্তে রাখিহ, কাহাঁ না করিও প্রকাশ ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত কথা গোপন রেখ, কারও কাছে প্রকাশ কর না। যেহেতু আমার সমস্ত কার্যকলাপ লোকের কাছে উন্মাদের মতো বলে মনে হয়, তাই লোকে উপহাস করতে পারে।

শ্লোক ২৯১

আমি—এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয়—বাতুল ।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ ২৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি এক উন্মাদ, আর তুমি দ্বিতীয় উন্মাদ। তাই আমরা দুজনেই সমান।"

তাৎপর্য

রামানন্দ রায় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আলোচনা অভক্ত জনসাধারণের কাছে হাস্যকর বলে মনে হতে পারে। সমস্ত জগৎ জড় আসক্তিতে পূর্ণ এবং জড় চিন্তার দ্বারা বিকৃত-বুদ্ধি হওয়ার ফলে তারা এই সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। যারা জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত, তারা কখনও রামানন্দ রায় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অপ্রাকৃত আলোচনার মর্ম বুঝতে পারবে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন, জনসাধারণের কাছে তা প্রকাশ না করতে। কেউ যখন ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করেন তখন তিনি এই নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; তা না হলে 'বাতুলতা' বলে মনে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই রামানন্দ রায়কে বলেছিলেন, "আমি—এক বাতুল, তুমি—দ্বিতীয় বাতুল, অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।" *ভগবদ্গীতায়ও* (২/৬৯) বলা হয়েছে—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

"সমস্ত জীবের কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমী সেই সময় জেগে থাকেন; আর অন্য সমস্ত জীবের যা জেগে থাকার সময়, আত্মজ্ঞানী মুনি তা রাত্রি বলে মনে করেন।"

কখনও কখনও বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃষ্ণভক্তির পন্থা এক প্রকার উন্মাদনা বলে মনে হয়; তেমনই আবার, কৃষ্ণভক্তের কাছেও বিষয়াসক্ত মানুষদের কার্যকলাপ উন্মত্ততা মাত্র।

শ্লোক ২৯২

এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে দশরাত্রি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা-আনন্দে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করলেন।

শ্লোক ২৯৩

নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার ।
অনেক কহিল, তার না পাইল পার ॥ ২৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব বিচার করলেন। যদিও তাঁরা অনেক আলোচনা করলেন, তবুও তার অন্ত খুঁজে পেলেন না।

শ্লোক ২৯৪-২৯৫

তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি ।
কেহ যদি কাহাঁ পোতা পায় একখানি ॥ ২৯৪ ॥
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্তু পায় ।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায় ॥ ২৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই আলোচনা তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা এবং চিন্তামণির খনির মতো। কেউ যদি কোথাও পোতা অবস্থায় তার একটিও পায়, তাহলে ক্রমে ক্রমে সেগুলি উঠাতে থাকলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর বস্তু লাভ করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের প্রশ্নোত্তর ঠিক তেমনই হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথনের সারাংশ বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—"শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশ্নে প্রথমে পাঁচটি (এই পরিচ্ছেদের ৫৭ সংখ্যা থেকে ৬৭ সংখ্যা পর্যন্ত) উত্তর দিয়েছেন। তার প্রথমটি

তামার মতো সাধারণ ধাতু; দ্বিতীয়টি—কাঁসার মতো তার থেকে উৎকৃষ্ট ধাতু; তৃতীয়টি—রূপোর মতো তার থেকে উৎকৃষ্ট ধাতু; চতুর্থটি সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণধাতু। কিন্তু পঞ্চমটি—জ্ঞানশূন্য ভক্তি; সেটি রত্নচিন্তামণি বা সাধ্য বস্তু—যার প্রভাবে অন্য চারটি ধাতুত্ব লাভ করে।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন—"ব্রজে যমুনা সলিল, পুলিন বালুকা, কদম্ব বৃক্ষাদি, গো-বেত্র-বেণু প্রভৃতি শান্ত রসের বিগ্রহ সমূহ; চিত্রক, পত্রক, রক্তক আদি দাস্যরসের বিগ্রহ সমূহ; শ্রীদাম, সুদাম আদি সখ্যরসের বিগ্রহ সমূহ; নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য রসের বিগ্রহ সমূহ এবং সর্বোপরি শ্রীমতী রাধিকা, ললিতা বিশাখাদি সখীগণ নিজ নিজ রসে ধনী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পাঁচটি রস পর পর তামা, কাঁসা, রূপা ও রত্ন চিন্তামণির খনিতুল্য।

শ্লোক ২৯৬-২৯৯

আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা ।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥ ২৯৬ ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥ ২৯৭ ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে ।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৯৮ ॥
এত বলি' রামানন্দে করি' আলিঙ্গন ।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥ ২৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের কাছে বিদায় চাইলেন, এবং বিদায়ের সময় তাকে নির্দেশ দিলেন, "সমস্ত বৈষয়িক ক্রিয়াকর্ম ছেড়ে দিয়ে তুমি নীলাচলে যাও। কিছুদিন পরে তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে আমি সেখানে ফিরে যাব। তখন আমরা দুজনে একসঙ্গে নীলাচলে থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে মহা আনন্দে দিন কাটাব। এই বলে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে তাকে ঘরে যেতে বলে তিনি শয়ন করলেন।

শ্লোক ৩০০

প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু দেখি' হনুমান্ ।
তাঁরে নমস্করি' প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ ॥ ৩০০ ॥

শ্লোকার্থ

সকাল বেলা উঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিকটবর্তী হনুমান মন্দিরে গেলেন, এবং সেখানে হনুমান বিগ্রহকে নমস্কার করে তিনি দক্ষিণে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শহরে শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যসেবক হনুমানজীর মন্দির রয়েছে। পূর্বে এই মন্দিরটি গোপালজীর মন্দিরের সামনে ছিল, কিন্তু গোপালজী বিগ্রহ সাক্ষী দেওয়ার জন্য উড়িষ্যায় চলে যান। সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যসেবক হনুমানজী হাজার বছর ধরে পূজিত হচ্ছেন। এখানেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখালেন, কিভাবে হনুমানজীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়।

শ্লোক ৩০১

'বিদ্যাপুরে' নানা-মত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল ছাড়ি' নিজমত ॥ ৩০১ ॥

শ্লোকার্থ

বিদ্যানগরে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে তারা সকলে তাদের নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করে 'বৈষ্ণব' হলেন।

শ্লোক ৩০২

রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ৩০২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে বিহ্বল হয়ে, রামানন্দ রায় সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন।

শ্লোক ৩০৩

সংক্ষেপে কহিলুঁ রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি' বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন ॥ ৩০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সংক্ষেপে আমি রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলনের কাহিনী বর্ণনা করলাম। বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করার ক্ষমতা কারোরই নেই। এমন কি সহস্রবদন অনন্তদেবও তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৩০৪-৩০৫

সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ ৩০৪ ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥ ৩০৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র ঘন দুধের মতো, আর রামানন্দ রায়ের চরিত্র মিশ্রির মতো তাতে মিষ্টতা প্রদান করেছে। তাতে আবার রাধাকৃষ্ণের লীলারূপ কর্পূরের মিশ্রণ হয়েছে। যারা ভাগ্যবান, তারাই সেই অমৃত আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ৩০৬

যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ ৩০৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই অপূর্ব বস্তুটি যিনি একবার তার কর্ণ দ্বারা পান করেছেন, তার কর্ণ বারবার সেই অমৃত আস্বাদনের লোভে উন্মত্ত হয়ে তা আর ছাড়তে পারে না।

শ্লোক ৩০৭

'রসতত্ত্ব-জ্ঞান' হয় ইহার শ্রবণে।
'প্রেমভক্তি' হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ৩০৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আলোচনা শ্রবণ করলে রসতত্ত্বের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং রাধা-কৃষ্ণের চরণে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

শ্লোক ৩০৮

চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি' শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥ ৩০৮ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রন্থকার সমস্ত পাঠকদের অনুরোধ করেছেন, তর্ক না করে বিশ্বাস সহকারে এই আলোচনা পাঠ করতে, তারফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গূঢ়তত্ত্ব জানতে পারা যাবে।

শ্লোক ৩০৯

অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥ ৩০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অলৌকিক লীলা অত্যন্ত গোপনীয়। বিশ্বাসের দ্বারা তার মর্ম উপলব্ধি করা যায়, তা না হলে তর্ক করে তা কখনও বোঝা যাবে না।

শ্লোক ৩১০

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ ।
যাঁহার সর্বস্ব, তাঁরে মিলে এই ধন ॥ ৩১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণকমল, যিনি তার যথাসর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন, তিনিই এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর'। তেমনই, সুদৃঢ় বিশ্বাস-পরায়ণ ব্যক্তি রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথোপকথনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। যারা সদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব বরণ করেনি, যারা অশ্রৌতপন্থী; তারা এই আলোচনায় শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। তারা সর্বদা সংশয়শীল এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম-পরায়ণ। সেই সমস্ত 'খেয়ালী' মানুষেরা কখনও এই আলোচনার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। যারা তর্কপরায়ণ এবং জড় ভোগপরায়ণ, তাদের কাছ থেকে এই চিন্ময় বিষয় বহু দূরে থাকে। সেই সম্পর্কে *কঠোপনিষদে* (১/২/৯) বলা হয়েছে—*নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।* *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/২/৩) বলা হয়েছে—*নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম ॥* এবং *ব্রহ্মসূত্রে* (২/১/১১) বলা হয়েছে—*তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ*।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা কখনও চিন্ময় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। চিন্ময় জ্ঞান গবেষণালব্ধ লৌকিক জ্ঞানের বহু উর্ধ্বে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে আগ্রহী হন, তাহলে কেবল কৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন। কেউ যদি তার জড় জ্ঞান বা জড় বুদ্ধি দিয়ে এই অপ্রাকৃত বিষয় উপলব্ধি করতে চান, তাহলে তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই প্রাকৃত সহজিয়া এবং সুবিধাবাদী জড় সাহিত্যিকদের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অতএব সব রকম জড় প্রচেষ্টাই পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হবার চেষ্টা করা উচিত। ভক্ত যখন নিষ্ঠা সহকারে বৈধীভক্তি অনুশীলন করেন, তখন এই আলোচনার তত্ত্ব তার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/২৩৪) গ্রন্থে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর আদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড় কলুষ থেকে মুক্ত

হয়, তখন তারা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।" সেই সম্বন্ধে *মুণ্ডক-উপনিষদে* বলা হয়েছে—*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।* কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেন তখনই কেবল তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৩১১

রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার ।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রামানন্দ রায়ের শ্রীপাদপদ্মে আমি কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর শ্রীমুখ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিরসের বিস্তার করেছেন।

শ্লোক ৩১২

দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারে ।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥ ৩১২ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদরের কড়চা-অনুসারে আমি রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন-লীলা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

তাৎপর্য

গ্রন্থকার প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এইভাবে গুরুদেবের প্রতি অচলা নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি কখনও দাবী করেননি যে, তিনি গবেষণা করে এই অপ্রাকৃত গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি কেবল স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী আদি মহাপ্রভুর পার্ষদদের লিখিত বিবরণের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। অপ্রাকৃত গ্রন্থ রচনায় এইটিই পন্থা। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—"নিষ্ঠা সহকারে মহাজন এবং আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়।" *আচার্যবান্ পুরুষো বেদঃ*—"যিনি আচার্যের কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই সমস্ত তত্ত্ব জানেন।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই বিবৃতি সমস্ত শুদ্ধভক্তের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনও কখনও প্রাকৃত সহজিয়ারা দাবী করে যে, তারা তাদের গুরুর কাছে তত্ত্ব শ্রবণ করেছে। কিন্তু যে গুরু সদ্‌গুরু নয়, তার কথা শ্রবণ করে চিন্ময় জ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরুকে অবশ্যই সদ্‌গুরু হতে হবে, অর্থাৎ পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর শিষ্য হয়ে তাঁর শ্রীমুখ থেকে দিব্যজ্ঞান শ্রবণ করতে হবে। তা হলেই সেই জ্ঞান প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

শ্রীভগবান্ উবাচ—
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"ভগবান বললেন—এই অব্যয় জ্ঞান আমি বিবস্বানকে দান করেছিলাম। বিবস্বান তা মনুকে দান করেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।"

এইভাবে পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গুরুবর্গ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ গোস্বামিগণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রদর্শন করে প্রতিটি পরিচ্ছেদের রচনা শেষ করেছেন। এইভাবে তিনি অপ্রাকৃত গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত* বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩১৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক-অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের কথোপকথন' বর্ণনা করে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটন

নবম পরিচ্ছেদের *কথাসারে* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—"এই পরিচ্ছেদে বিদ্যানগর থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌতমী-গঙ্গা, মল্লিকার্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানা-নৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, তারপরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়ে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টকে সপরিবারে কৃষ্ণভক্ত করেন।

শ্রীরঙ্গম থেকে ঋষভপর্বতে গিয়ে পরমানন্দপুরী গোসাঞির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীপুরী-গোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। এবং মহাপ্রভু সেতুবন্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শ্রীশৈলপর্বতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরূপে বিরাজমান শিব-দুর্গার সঙ্গে আলাপন করেন। সেখান থেকে কামকোষ্ঠীপুরী ছাড়িয়ে দক্ষিণ মথুরায় পৌঁছান। সেখানে রামভক্ত বিরক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়। পরে কৃতমালায় স্নান করে মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করেন। সেখান থেকে মহাপ্রভু সেতুবন্ধে গিয়ে ধনুস্তীর্থে স্নান ও শ্রীরামেশ্বর দর্শন করে *কূর্ম-পুরাণের* মায়াসীতা-সম্বন্ধীয় পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করে পূর্বোক্ত রামদাস-বিপ্রকে এনে দেন। তারপর পাণ্ডুদেশে তাম্রপর্ণী, পরে নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তলা, তিলকাঞ্চি, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ী, চাম্‌তাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্বত, ধনুস্তীর্থ, কন্যাকুমারী হয়ে মল্লার দেশে ভট্টথারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের হাত থেকে কালাকৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করেন। পরে পয়স্বিনী তীরে *ব্রহ্ম-সংহিতা* (পঞ্চম অধ্যায়) সংগ্রহ করেন। সেখান থেকে পয়স্বিনী, শৃংগবের-পুরীমঠ, মৎস্যতীর্থ হয়ে উড়ুপী গ্রামে মধ্বাচার্যের গোপাল দর্শন করেন। তত্ত্ববাদীদের বিচারে পরাস্ত করে ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর হয়ে পাণ্ডেরপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর কাছে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সংবাদ পান। কৃষ্ণবেণ্বাতীরে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদের সমাজে শ্রীবিল্বমঙ্গল রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সেখান থেকে তাপ্তী, মাহিষ্মতীপুর, নর্মদা-তীর, ঋষ্যমূকপর্বত হয়ে দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করেন। সেখান থেকে পম্পা-সরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করে বিদ্যানগরে উপস্থিত হন। বিদ্যানগর থেকে পূর্বপথ দিয়ে আলালনাথ দর্শন করে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হন।"

শ্লোক ১

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১ ॥

নানা মত—ত্রিবিধ দার্শনিক মতবাদ; **গ্রাহ**—কুমীর; **গ্রস্তান্**—কবলিত; **দাক্ষিণাত্য-জন**—দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের; **দ্বিপান্**—গজেন্দ্রের মতো; **কৃপারিণা**—কৃপারূপ চক্রের

দ্বারা; বিমুচ্য—বিমুক্ত করে; এতান্—সমস্ত; গৌরঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; চক্রে—রূপান্তরিত করেছিলেন; স—তিনি; বৈষ্ণবান্—বৈষ্ণবে।

অনুবাদ

বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদ আদি বহুবিধ মতরূপ কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্ররূপ দাক্ষিণাত্যবাসীদের তাঁর কৃপাচক্র দ্বারা উদ্ধার করে শ্রীগৌরচন্দ্র তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভক্তিবিরোধী দার্শনিক মতবাদের দ্বারা আক্রান্ত দাক্ষিণাত্যবাসীদের উদ্ধার করার সঙ্গে, কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধারের তুলনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ-ভারতে যান, তখন সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরা বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ, মায়াবাদ আদি বিভিন্ন ভক্তিবিরোধী মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, যদিও এই সমস্ত মানুষেরা হস্তীর মতো বলশালী ছিলেন, তবুও তারা কুমীররূপী এই সমস্ত কুমতবাদের কবলিত হয়ে মরণ-উন্মুখ হয়েছিলেন এবং তাঁর কৃপারূপ চক্রে সেই কুমীরকে সংহার করে তিনি গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত গমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা তিনি সেখানে সহস্র সহস্র তীর্থ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

সেই সব তীর্থ স্পর্শি' মহাতীর্থ কৈল ।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পাদস্পর্শের দ্বারা তিনি সেই সমস্ত তীর্থকে মহাতীর্থে পরিণত করেছিলেন। সেই ছলে তিনি সেই দেশের সমস্ত মানুষদেরও উদ্ধার করেছিলেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি।* মহাত্মারা তীর্থে ভ্রমণ করেন অথবা বসবাস করেন। যদিও সেই সমস্ত পবিত্র স্থান ইতিমধ্যেই তীর্থ ছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণের ফলে সেই স্থানগুলি মহাতীর্থে পরিণত হল। বহু মানুষ তীর্থস্থানে গিয়ে তাদের পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়; কিন্তু সেই সমস্ত পাপের ফলগুলি সেখানে সঞ্চিত হতে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের গমনের ফলে সেই সমস্ত পাপ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। নানারকমের রোগী রোগমুক্ত হওয়ার জন্য হাসপাতালে আসে। তাই হাসপাতাল সবসময়ই দূষিত, কিন্তু সুদক্ষ চিকিৎসক তার উপস্থিতি এবং সুদক্ষ পরিচালনার দ্বারা হাসপাতালকে রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত রাখে। তেমনই তীর্থস্থান সবসময় পাপীদের ফেলে যাওয়া পাপের প্রভাবে দূষিত হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগত ভক্তেরা যখন সেই সমস্ত স্থানে যান, তখন সেই স্থান সমস্ত পাপের কলুষ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ৫

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি ।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রম অনুসারে সেই সমস্ত তীর্থের বর্ণনা আমি করতে পারব না। কারণ এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে যাওয়ার পথে মহাপ্রভু দক্ষিণে এবং বামে অন্যান্য বহু তীর্থে গমনাগমন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

অতএব নাম-মাত্র করিয়ে গণন ।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রম অনুসারে সেই সমস্ত তীর্থের বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তাই আমি কেবল মুখ্য মুখ্য তীর্থগুলির নাম উল্লেখ করছি।

শ্লোক ৭-৮

পূর্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন ।
যেই গ্রামে যায়, সে গ্রামের যত জন ॥ ৭ ॥
সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই 'বৈষ্ণব' করি' ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বের মতো, যে সমস্ত গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, সেই সমস্ত গ্রামের সমস্ত অধিবাসিরা বৈষ্ণব হয়ে নিরন্তর হরিনাম এবং কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তারা সকলে বৈষ্ণব হয়েছিলেন, এবং তারা আবার অন্যান্য গ্রামে গিয়ে সেই সমস্ত গ্রামের অধিবাসিদের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন।

তাৎপর্য

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র এমনই মহিমা যে, আজও আমাদের প্রচারকেরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভগবানের নাম প্রচার করতে যায়, তখন সেখানকার লোকেরা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে শুরু করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তাঁর শক্তির সঙ্গে কারোরই ক্ষমতার তুলনা করা চলে না। কিন্তু, যেহেতু আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করছি, তাই তার প্রভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারের প্রভাবের মতো। আমাদের প্রচারকেরা অধিকাংশই ইউরোপীয় এবং আমেরিকান, কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারা যেখানেই গেছে সেখানেই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র অগণিত মানুষ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করছে।

শ্লোক ৯

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

দক্ষিণ-ভারতে বিভিন্নপ্রকার মানুষ ছিল। তাদের কেউ জ্ঞানী, কেউ সকাম কর্মী, এইরকম অগণিত পাষণ্ডী সেখানে ছিল।

শ্লোক ১০

সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে ।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের প্রভাবে সেই সমস্ত লোকেরা তাদের নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হলেন।

শ্লোক ১১-১২

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব ।
কেহ 'তত্ত্ববাদী', কেহ হয় 'শ্রীবৈষ্ণব' ॥ ১১ ॥

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ ছিলেন রাম-উপাসক, কেউ তত্ত্ববাদী, কেউ শ্রী-বৈষ্ণব। সেই সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে কৃষ্ণোপাসক হলেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—"তত্ত্ববাদী বলতে শ্রীল মধ্বাচার্যের অনুগত বৈষ্ণবদের বোঝায়। শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীদের থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে মাধ্ব-বৈষ্ণবদের 'তত্ত্ববাদী' বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কুযুক্তি-পুষ্ট নির্বিশেষ-পরব্রহ্মবাদ তত্ত্ববাদী আচার্যগণ নিরসন করে 'ভগবত্তত্ত্ব' স্থাপন করেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণ-ব্রহ্মবৈষ্ণব (ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত), সেইজন্য তারা দশম স্কন্ধে আদিগুরু ব্রহ্মার মোহিত অবস্থা স্বীকার করেন না, যেহেতু শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর *ভাগবত-তাৎপর্য* টীকায় ঐ 'ব্রহ্মমোহন' লীলা-পরিত্যাগ করেছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মাধ্ববৈষ্ণবদের অন্যতম হয়ে 'তত্ত্ববাদের' চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি প্রচার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব হলেও 'তত্ত্ববাদী' সংজ্ঞা লাভ করেননি।

যারা শুদ্ধভক্তির বিরোধী তাদের বলা হয় 'পাষণ্ডী'। বিশেষ করে নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীদের পাষণ্ডী বলা হয়। *হরিভক্তি-বিলাসে* (১/৭৩) পাষণ্ডীর সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বিক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে ব্রহ্মা, রুদ্র আদি দেবতাদের সমান বলে মনে করে, সে পাষণ্ডী।" ভক্ত কখনই ভগবান নারায়ণকে ব্রহ্মা অথবা শিবের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন না।

তত্ত্ববাদীরা শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক হলেও এবং শ্রীবৈষ্ণবেরা লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক হলেও উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার প্রবলতা দেখা যায়।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরাম-সীতার মূর্তির কাহিনী এইভাবে লিখিত আছে—'কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করে তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করবেন না। এক সময় শ্রীরামচন্দ্র কার্যগতিকে সপ্তাহ কাল প্রজা সমক্ষে আসতে সমর্থ হননি, সেইজন্য রামদর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই এক সপ্তাহ একবিন্দু জল পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। অবশেষে আটদিন পর নবম দিবসে ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণের নিষ্ঠার কথা শুনে তাঁর প্রাসাদে রক্ষিত রামসীতার মূর্তিযুগল

সেই প্রকৃত ভক্ত ব্রাহ্মণকে দিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দেন। ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের কাছ থেকে তা প্রাপ্ত হয়ে, যতদিন জীবিত ছিলেন সেই বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন, এবং মৃত্যুকালে হনুমানকে তা দিয়ে যান। শ্রীহনুমান সেই বিগ্রহদ্বয় বহুকাল বক্ষে ধারণ করে সেবা করেন। বহুকাল পরে ভীমসেন গন্ধমাদনপর্বতে গমন করলে, সেখান থেকে বিদায় গ্রহণের সময় ঐ বিগ্রহদ্বয় হনুমান ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীম রাজপ্রাসাদে তা যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেন। পাণ্ডব-বংশীয় শেষ রাজা 'ক্ষেমাকান্তে'র কাল পর্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় রাজ প্রাসাদে সেবিত হন, পরে তা উড়িষ্যার গজপতি রাজাদের কাছে আসেন এবং তাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য তাঁর শিষ্য শ্রীনরহরি তীর্থপাদকে রাজকোষ থেকে সেই মূল রামসীতার বিগ্রহ সংগ্রহ করে সেবা করার অনুমতি দেন।

এই রামসীতা বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু রাজার সময় থেকে সূর্য-বংশীয় রাজাদের প্রাসাদে রক্ষিত হয়ে, রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব থেকে দশরথ কর্তৃক সেবিত হতেন। পরে লক্ষ্মণ তাদের সেবা করতেন। তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ উক্ত ব্রাহ্মণকে তা অর্পণ করেন। শ্রীমধ্বাচার্য তার তিরোভাবের তিন মাস ষোল দিন পূর্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হয়ে উডুপীগ্রামের মূল মঠ উত্তর রাঢ়ী মঠে স্থাপন করেন, সেই থেকে শ্রীমাধ্ব-আচার্যগণ তাঁর অধিকারী আছেন। শ্রীরামানুজাচার্যের অনুগামী শ্রীবৈষ্ণবেরা সীতারামের উপাসনা করেন। তিরুপতি এবং অন্যান্য স্থানে শ্রীরামমূর্তি রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। রামানুজীয় সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত 'রামানন্দী' 'রামাৎ' বা 'জিমায়েৎ' সম্প্রদায়ে শ্রীরামসীতার উপাসনা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। রামানুজীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের অধিক অনুগত।

শ্লোক ১৩-১৪

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্ ।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্ ॥ ১৩ ॥
এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈল গঙ্গাস্নান ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"হে রামচন্দ্র, হে রঘুকুলতিলক, দয়া করে তুমি আমাকে পালন কর। হে কৃষ্ণ, হে কেশব, দয়া করে তুমি আমাকে রক্ষা কর।" পথ চলতে চলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকটি কীর্তন করতেন। এইভাবে কীর্তন করতে করতে তিনি গৌতমী-গঙ্গায় উপস্থিত হয়ে গঙ্গাস্নান করলেন।

তাৎপর্য

গৌতমী-গঙ্গা গোদাবরী-নদীর ধারা। রাজমহেন্দ্রির অপর তটে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল বলে গোদাবরীর নাম 'গৌতমী-গঙ্গা'।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে তীর্থ-দর্শন বর্ণনা করেছেন তাতে ভৌগোলিক ক্রম নেই, তা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। গোবিন্দ-দাসের কড়চায় যে ক্রম পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ভৌগোলিক বিবরণের সামঞ্জস্য রয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাঠকদের সেই গ্রন্থের ক্রম দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছেন। গোবিন্দ-দাসের মতে রাজমহেন্দ্রি থেকে মহাপ্রভু ত্রিমন্দে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ঢুণ্ডিরাম-তীর্থে যান। এই গ্রন্থের মতে রাজমহেন্দ্রি থেকে মহাপ্রভু 'গৌতমী গঙ্গা' হয়ে মল্লিকার্জুন-তীর্থে গমন করেন।

শ্লোক ১৫

মল্লিকার্জুন-তীর্থে যাই' মহেশ দেখিল ।
তাহাঁ সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মল্লিকার্জুন-তীর্থে গিয়ে মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করেন। সেখানে তিনি সমস্ত মানুষদের 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করেন।

তাৎপর্য

মল্লিকার্জুন—শ্রীশৈল নামেও পরিচিত। এই তীর্থস্থানটি কর্ণুলের সত্তর মাইল দক্ষিণে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। এই গ্রামটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং দুইয়ের মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা 'মল্লিকার্জুন' শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলে প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ১৬

রামদাস মহাদেবে করিল দরশন ।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস নামক মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অহোবল নামক স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দিরে যান।

শ্লোক ১৭

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি ।
সিদ্ধবট গেলা যাহাঁ মূর্তি সীতাপতি ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

অহোবল-নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বহু প্রণতি এবং স্তুতি করলেন। তারপর সিদ্ধবট নামক স্থানে সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

এই সিদ্ধবট কুডাপা-নগরের দশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই স্থানটি 'সিধৌট'-নামে পরিচিত। পূর্বে এই স্থানটি 'দক্ষিণ কাশী' নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। 'আশ্রম-বটবৃক্ষ' থেকে এই নামের উৎপত্তি।

শ্লোক ১৮

রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন ।
তাহাঁ এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে তাঁকে প্রণতি এবং স্তব করলেন। তখন এক বিপ্র মধ্যাহ্নে তার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ১৯

সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয় ।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণটি নিরন্তর রামচন্দ্রের দিব্যনাম উচ্চারণ করতেন। রামনাম ছাড়া তিনি অন্য কোন নাম বলতেন না।

শ্লোক ২০

সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি' ।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

সেইদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার ঘরে রইলেন এবং তার কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করলেন। এইভাবে তাকে কৃপা করে শ্রীগৌরহরি এগিয়ে চললেন।

শ্লোক ২১

স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্ধ দরশন ।
ত্রিমঠ আইলা, তাঁহা দেখি' ত্রিবিক্রম ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

স্কন্দক্ষেত্র নামক তীর্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্কন্দদেবের মন্দির দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ত্রিমঠে যান এবং সেখানে ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করেন।

শ্লোক ২২

পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে ।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সিদ্ধবটে সেই বিপ্রের ঘরে আবার ফিরে এলেন। তখন সেখানে তিনি দেখলেন যে, সেই বিপ্র নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করছেন।

শ্লোক ২৩-২৪

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল ।
"কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥ ২৩ ॥
পূর্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম ।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥" ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বিপ্র, তোমার এই দশা কিভাবে হল? আগে তো তুমি সবসময় রামনাম নিতে, এখন কেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করছ?"

শ্লোক ২৫-২৭

বিপ্র বলে,—এই তোমার দর্শন-প্রভাবে ।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥ ২৫ ॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৬ ॥
সেই হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা ।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বিপ্র তখন উত্তর দিলেন, "তোমার দর্শনের প্রভাবেই তা হয়েছে। তোমাকে দেখামাত্র আমার আজন্মের স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাল্যকাল থেকেই আমি রামনাম গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মুখে একবার কৃষ্ণনাম এল। সেই থেকে আমার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম হতে লাগল এবং রামনাম দূরে গেল।

শ্লোক ২৮

বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয় ।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ছোটবেলা থেকেই আমার একটা স্বভাব এই যে, আমি নামের মহিমা-শাস্ত্র সংগ্রহ করি।

শ্লোক ২৯

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

রমন্তে—আনন্দ আস্বাদন করেন; যোগিনঃ—যোগীগণ; অনন্তে—জড়াতীতে; সত্য-আনন্দ—প্রকৃত আনন্দ; চিৎ-আত্মনি—চিন্ময় অস্তিত্বে; ইতি—এইভাবে; রাম—রাম; পদেন—পদের দ্বারা; অসৌ—তিনি; পরম-ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম; অভিধীয়তে—অভিহিত হন।

অনুবাদ

" 'অনন্ত সত্যানন্দ—চিদাত্মাস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগীরা আনন্দ লাভ করেন। এই জন্যই পরম ব্রহ্ম-বস্তুকে রাম নামে অভিহিত করা হয়।'

তাৎপর্য

এইটি *পদ্ম-পুরাণে* 'রামচন্দ্রের শতনাম-স্তোত্রে'র অষ্টম শ্লোক।

শ্লোক ৩০

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

কৃষিঃ—'কৃষ্' ধাতু; ভূ—আকর্ষণীয় অস্তিত্ব; বাচকঃ—বাচক; শব্দঃ—শব্দ; ণঃ—'ণ' পদ; চ—এবং; নির্বৃতি—পরমানন্দ; বাচকঃ—বাচক; তয়োঃ—সেই উভয়ের; ঐক্যম্—ঐক্য; পরং-ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; ইতি—এইভাবে; অভিধীয়তে—অভিহিত হয়।

অনুবাদ

" 'কৃষ্' ধাতু—'ভূ' অর্থাৎ আকর্ষক-সত্তা-বাচক, 'ণ' শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। 'কৃষ্' ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয় করে উভয়ের ঐক্যের ফলে 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহাভারতের* উদ্যোগ-পর্ব (৭১/৪) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

পরংব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল ।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুই নামই পরম ব্রহ্ম; তাতে সমতা বর্তমান। কিন্তু শাস্ত্রে এই নাম-পরমব্রহ্মদ্বয়ের রসের তারতম্য বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি আরও বিশেষ কিছু বুঝলাম।

শ্লোক ৩২

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে ।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৩২ ॥

রাম—রাম; রাম—রাম; ইতি—এইভাবে; রাম—রাম; ইতি—এইভাবে; রমে—আমি আনন্দ উপভোগ করি; রামে—রাম নামে; মনোরমে—সব চাইতে মনোহর; সহস্র-নামভিঃ—সহস্র বিষ্ণু নামে; তুল্যম্—সমান; রাম-নাম—রামনাম; বরাননে—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

মহাদেব পার্বতীকে বললেন, "হে বরাননে, 'রাম' 'রাম' বলে মনোরম যে নাম, তাতে আমি রমণ (আনন্দলাভ) করি। একটি রামনাম সহস্র বিষ্ণু নামের তুল্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্ম-পুরাণের* উত্তর খণ্ডের 'বৃহৎবিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্র' (৭২/৩৩৫) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

সহস্র-নাম্নাম্—সহস্র বিষ্ণুনামের; পুণ্যানাম্—পুণ্য ফলের; ত্রিঃ-আবৃত্ত্যা—তিনবার উচ্চারণের দ্বারা; তু—কিন্তু; যৎ—যা; ফলম্—ফল; এক-আবৃত্ত্যাঃ—একবার মাত্র উচ্চারণের ফলে; তু—কিন্তু; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; নাম—নাম; একম্—একবার মাত্র; তৎ—সেই ফল; প্রযচ্ছতি—প্রদান করে।

অনুবাদ

" 'বিষ্ণুর পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করলে যে ফল হয় একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলে সেই ফল লাভ হয়।'

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *লঘুভাগবতামৃতে* (১/৫/৩৪৫) পাওয়া যায়। এক রাম নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রাম নামের ফল, একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

শ্লোক ৩৪-৩৫

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার ।
তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥ ৩৪ ॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই ।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রিদিন গাই ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে কৃষ্ণনামের অপার মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সেই নাম নিতে পারি না, তার কারণ হল শ্রীরামচন্দ্র আমার ইষ্টদেব, তহি তাঁর নামগ্রহণে আমি আনন্দ আস্বাদন করতাম। আর সেই আনন্দ আস্বাদন করে আমি রাত্রিদিন রামনাম কীর্তন করতাম।

শ্লোক ৩৬

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল ।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমাকে দর্শন করে যখন আমার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হল, তখন আমার হৃদয়ে কৃষ্ণনামের মহিমা প্রকাশিত হল।

শ্লোক ৩৭

সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ—ইহা নির্ধারিল ।
এত কহি' বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি।" এই বলে সেই ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে পতিত হলেন।

শ্লোক ৩৮

তাঁরে কৃপা করি' প্রভু চলিলা আর দিনে ।
বৃদ্ধকাশী আসি' কৈল শিব-দরশনে ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণকে কৃপা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপরের দিন সেখান থেকে বিদায় নিলেন, এবং বৃদ্ধকাশীতে এসে মহাদেবের দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

বৃদ্ধকাশীর বর্তমান নাম 'বৃদ্ধাচলম্'। তা আর্কট জেলায় ভেলার-নদীর উপনদী মণিমুখের তীরে অবস্থিত। কেউ কেউ 'কালহস্তিপুর'কে 'বৃদ্ধকাশী' বলেন। রামানুজাচার্যের মাসীর পুত্র গোবিন্দ অনেকদিন পর্যন্ত এই শিবের সেবা করেন।

শ্লোক ৩৯

তাহাঁ হৈতে চলি' আগে গেলা এক গ্রামে ।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহা, করিল বিশ্রামে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'বৃদ্ধকাশী' ত্যাগ করে এগিয়ে চললেন। এক গ্রামে তিনি দেখলেন যে, সেখানে অধিকাংশ অধিবাসীরাই ব্রাহ্মণ। তিনি সেখানে বিশ্রাম করার জন্য থামলেন।

শ্লোক ৪০

প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে ।
লক্ষার্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তখন এত লোক সমাগম হয়েছিল যে, তা গণনা করা সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ৪১

গোসাঞির সৌন্দর্য দেখি' তাতে প্রেমাবেশ ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, 'বৈষ্ণব' হৈল সর্বদেশ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সৌন্দর্য এবং তাতে ভগবৎ-প্রেমের আবেশ, তা দেখে সকলেই 'কৃষ্ণ নাম' উচ্চারণ করতে লাগলেন। এইভাবে সকলে বৈষ্ণবে পরিণত হলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগমন ॥ ৪২ ॥
নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড ।
সর্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে নানারকম দার্শনিক ছিলেন। সেখানে, তাদের কেউ তার্কিক—গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক, কেউ জৈমিনীর অনুগামী ও মীমাংসক। কেউ শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদী। কেউ কপিলের অনুগামী সাংখ্য দার্শনিক; কেউ পতঞ্জলীর অনুগামী অষ্টাঙ্গযোগী। কেউ স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুগামী, এবং পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনুগামী। এইভাবে সেখানে বিভিন্ন রকমের দার্শনিক ছিলেন। তারা সকলেই তাদের নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্ত মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করে তাদের সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করলেন।

শ্লোক ৪৪

সর্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্ম-সূত্র এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত কেউ খণ্ডন করতে পারল না।

শ্লোক ৪৫

হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ ।
এই মতে 'বৈষ্ণব' প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্তৃক পরাজিত হয়ে এই সমস্ত দার্শনিক এবং তাদের অনুগামীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র দক্ষিণ-ভারতকে বৈষ্ণবে পরিণত করলেন।

শ্লোক ৪৬

পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ।
গর্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে পাষণ্ডীরা তাদের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে সেখানে এলেন।

শ্লোক ৪৭

বৌদ্ধাচার্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে ।
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ-আচার্য। তাদের 'নবমত' প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তারা তর্কের অবতারণা করলেন।

শ্লোক ৪৮

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে ।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও বৌদ্ধরা বেদ-বিরোধী বলে সম্ভাষণের যোগ্য নয়, এবং তারা নিরীশ্বরবাদী বলে তাদের দর্শন করা উচিত নয়, তবুও তাদের মত খণ্ডন করার জন্য মহাপ্রভু তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

শ্লোক ৪৯

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে' ।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

বৌদ্ধ-শাস্ত্র তর্ক-প্রধান এবং তার 'নবমত' নামক নয়টি সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের যুক্তির দ্বারাই তাদের মত খণ্ডন করলেন। তারা আর তাদের মত স্থাপন করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন—"বৌদ্ধ মতে 'হিনায়ন' (হীনযান) ও 'মহায়ন' (মহাযান) দুই প্রকার পন্থা রয়েছে। সেই পন্থায় গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টি সিদ্ধান্ত; যথা—১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য; ২) জগৎ অসত্য; ৩) অহংতত্ত্ব, ৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, ৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, ৬) নির্বাণই পরম তত্ত্ব, ৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, ৮) *বেদ*—মানব-রচিত, ৯) দয়া আদি স্বধর্ম আচরণই বৌদ্ধ-জীবন।"

তর্কের দ্বারা কেউ কখনও পরম তত্ত্বকে জানতে পারে না। কেউ তর্কে অত্যন্ত দক্ষ হতে পারেন, এবং তর্কের দ্বারা তার মত স্থাপন করতে পারেন; কিন্তু তার থেকেও অধিক পারদর্শী তার্কিক এসে আবার তার সেই মতকে খণ্ডন করে অন্য কোন মত স্থাপন করতে পারেন। এইভাবে তর্কের দ্বারা বিভিন্ন মত স্থাপন এবং খণ্ডন হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানা যায় না। যারা বেদের অনুগামী তারা তা জানেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তর্কের দ্বারা বৌদ্ধদর্শন খণ্ডন করেছিলেন। যারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারক, তাদের অবশ্যই এরকম অনেক মানুষের সম্মুখীন হতে হবে, যারা যুক্তিতর্কে বিশ্বাসী। এদের অধিকাংশই বেদের প্রামাণিকতা বিশ্বাস করে না। তবে তারা যুক্তি তর্কে বিশ্বাস করে। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারকদের ঠিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো তাদের তর্কের দ্বারা পরাস্ত করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'তর্কেই খণ্ডিল প্রভু'—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সামনে এমন সমস্ত যুক্তি খাড়া করে দিলেন যে, তারা সেই সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে তাদের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

তাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে—'বিশ্ব অনাদি'। কিন্তু তা যদি হয় তাহলে লয় কিম্বা বিনাশের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে লয় বা ধ্বংস হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য।

সৃষ্টি যদি নিত্যকাল বর্তমান থাকে তাহলে লয় কিম্বা বিনাশের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাদের এই যুক্তিটি খুব একটা বলবান নয়, কেননা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা দেখি যে, জড় জগতে সবকিছুরই আদি আছে, মধ্য আছে, এবং অন্ত্য আছে। *বৌদ্ধ-দর্শনে* চরম লক্ষ্য হচ্ছে যে দেহটির লয় সাধন করা। দেহটির আদি আছে বলেই দেহটির বিনাশ সম্ভব। তেমনই, এই বিশ্ব একটি বিশাল দেহের মতো, কিন্তু, যদি স্বীকার করা হয় যে এই বিশ্ব অনাদি, তাহলে তার লয় হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং সবকিছুর লয় সাধন করার চেষ্টা করার মাধ্যমে শূন্য হওয়ার প্রচেষ্টা অসম্ভব। আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় সৃষ্টির আদি স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, এবং আমরা যখন আদি স্বীকার করি তখন আমাদের অবশ্যই একজন স্রষ্টাকে স্বীকার করতে হবে। এই স্রষ্টার নিশ্চয়ই সর্বব্যাপক শরীর রয়েছে, যা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/১৪) বর্ণিত হয়েছে—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

"তাঁর হাত-পা সর্বত্র, তাঁর চক্ষু-মুখ সর্বত্র, এবং তিনি সব কিছু শুনতে পান। এইভাবে পরমাত্মা বিরাজ করেন?

সেই পরম পুরুষ নিশ্চয়ই সর্বত্র বর্তমান। তাঁর দেহ সৃষ্টির আগেও বর্তমান ছিল; তা না হলে তিনি স্রষ্টা হবেন কি করে। সেই পরম পুরুষ যদি সৃষ্ট জীব হন, তাহলে তার স্রষ্টা হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তার ফলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এক বিশেষ সময়ে এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পূর্বেও স্রষ্টা ছিলেন; তাই স্রষ্টা কোন সৃষ্ট জীব নন। স্রষ্টা হচ্ছেন পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা। জড় পদার্থ কেবল আত্মার থেকে নিকৃষ্টই নয়, তা প্রকৃতপক্ষে আত্মার ভিত্তিতেই সৃষ্ট হয়েছে। জীবাত্মা যখন মাতৃজঠরে প্রবেশ করে, তখন মায়ের দেওয়া জড় উপাদানগুলি দিয়ে তার দেহ সৃষ্ট হয়। এই জড় জগতে সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে, অতএব একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন জড় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরম-আত্মা। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জড়া-প্রকৃতি নিকৃষ্ট এবং জীব হচ্ছে পরাপ্রকৃতি সম্ভূত। সুতরাং নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট উভয় শক্তিই পরম পুরুষের।

বৌদ্ধরা বলে যে, জগৎ অসত্য। কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্তটিও অর্থহীন। জগৎ অনিত্য, কিন্তু তা বলে অসত্য নয়। যদিও আমরা আমাদের দেহ নই, তবুও যতক্ষণ আমাদের দেহটি রয়েছে, ততক্ষণ আমাদের দেহের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে হয়। আমরা সেই সুখ-দুঃখগুলিকে খুব একটা গুরুত্ব না-ও দিতে পারি, কিন্তু তাহলেও তা বাস্তব। আমরা বলতে পারি না তা মিথ্যা। দেহের সুখ-দুঃখগুলি যদি মিথ্যা হত, তাহলে এই জগতও মিথ্যা হত এবং তাহলে কেউই তার কোন গুরুত্ব দিত না। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে—এই জড় জগৎ অসত্য বা কল্পনা নয়, তা অস্থায়ী।

বৌদ্ধমতে অহং হচ্ছে চরম তত্ত্ব। কিন্তু তাহলে 'আমি' এবং 'তুমি'র স্বাতন্ত্র্য থাকে

না। যদি 'আমি' না থাকি এবং 'তুমি' না থাক, অর্থাৎ যদি আমাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব না থাকে, তাহলে তর্কের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বৌদ্ধেরা তর্কের উপর নির্ভর করে, কিন্তু অহং যদি একমাত্র তত্ত্ব হয় তাহলে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তর্ক করতে হলে 'তুমি' বা অন্য আর একজন ব্যক্তি অনস্বীকার্য। দ্বৈত দর্শনে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে। *ভগবদ্গীতায়* দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২/১২) ভগবান তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

নং ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥

"এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি ছিলাম না অথবা তুমি ছিলে না অথবা এই সমস্ত রাজারা ছিল না; ভবিষ্যতেও এমন কোন সময় থাকবে না যখন আমরা থাকব না।"

অতীতে বিভিন্ন শরীরে আমরা ছিলাম, এবং এই দেহের বিনাশের পরেও অন্য আর একটি দেহে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে। আত্মা নিত্য এবং এই দেহে অথবা অন্য দেহে তার অস্তিত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জীবনেও আমরা একটি শিশুর দেহ, একটি বালকের দেহ, একটি যুবকের দেহ এবং একটি বৃদ্ধের দেহ লাভ করার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করি। এই দেহটির বিনাশের পর আমরা আর একটি দেহ প্রাপ্ত হই। বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা যথাযথভাবে পরবর্তী জন্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে না। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের জীবদেহ রয়েছে, এবং পরবর্তী জীবনে আমরা তার মধ্যে থেকে যে-কোন একটি দেহ প্রাপ্ত হতে পারি। তাই মনুষ্য-শরীর লাভের নিশ্চয়তা নেই।

বৌদ্ধদের পঞ্চম সিদ্ধান্ত—'বুদ্ধই তত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়'। এই সিদ্ধান্তটিও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা বুদ্ধদেব বেদ মানেন নি। পরমতত্ত্ব মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা ও অনুমানের বিষয় নয়। তা বাস্তব বস্তু এবং তার সম্বন্ধীয় জ্ঞান বাস্তব জ্ঞান। সকলেই যদি অধিকারী হয়, অথবা সকলেই যদি তার নিজের বুদ্ধিকে চরম মাপকাঠি বলে মনে করে—যা আজ একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাহলে নানামতের সৃষ্টি হবে এবং সকলেই দাবী করবে যে তার মতটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি আজ একটি মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সকলেই তার নিজের মনমতো শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে এক একটা মত সৃষ্টি করছে। এখন সকলেই এক একটি মত খাড়া করে সেটিকে পরমতত্ত্ব বলে চালাবার চেষ্টা করছে।

বৌদ্ধদের ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত 'নির্বাণই পরম তত্ত্ব'। নির্বাণ বা লয় জড় দেহটির বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। তা যদি না হত তাহলে বিভিন্ন প্রকারের এত দেহের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব? পরবর্তী জন্ম যদি সত্য হয়, তাহলে পরবর্তী দেহটিও সত্য। যখনই আমরা একটি জড়দেহ ধারণ করি, তখন আমাদের আর একটি দেহ ধারণ করতে হবে। সমস্ত জড়দেহের চরম গতি যদি 'বিলুপ্তি' হয় তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই অজড় বা চিন্ময় দেহ লাভ করতে হবে, যদি

না আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনকে মিথ্যা বলে গ্রহণ করতে চাই। চিন্ময় দেহ কিভাবে লাভ করা যায় সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন যথাযথভাবে যিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, তাকে এই দেহত্যাগ করার পর আর এই জড় জগতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধামে ফিরে আসেন।"

এইটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, যার দ্বারা জড় দেহের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। এমন নয় যে আমাদের অস্তিত্ব শূন্য হয়ে যায়। অস্তিত্ব থাকে, তবে আমরা যদি আমাদেরই এই জড়দেহটির প্রকৃত নির্বাণ চাই, তাহলে আমাদের একটি চিন্ময় দেহ ধারণ করতে হবে; তা না হলে আত্মার নিত্যত্ব সম্ভব নয়।

বৌদ্ধদের সপ্তম সিদ্ধান্ত—'বৌদ্ধ-দর্শনই একমাত্র দর্শন।' তা-ও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা সেই দর্শনে অনেক ভ্রান্তি রয়েছে। পূর্ণ দর্শন হচ্ছে সেই দর্শন, যাতে কোন ভ্রান্তি নেই এবং তা হচ্ছে *বেদান্ত-দর্শন*। *বেদান্ত-দর্শনে* কোন ভ্রান্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমরা স্বীকার করি যে, পরম সত্যকে জানার জন্য বেদান্তই হচ্ছে চরম দর্শন।

বৌদ্ধদের অষ্টম সিদ্ধান্ত—'বেদ মানব-রচিত'। তা যদি হত, তাহলে তা প্রামাণিক হত না। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সৃষ্টির অল্পকাল পরেই ব্রহ্মা বেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এমন নয় যে ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টি করেছিলেন, যদিও ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম পুরুষ। ব্রহ্মা যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হন, অথচ তিনি যদি বেদ সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে বৈদিক জ্ঞান ব্রহ্মার কাছে এল কি করে? স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, বেদ এই জড় জগতের কোন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসেনি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে, *তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে*—"সৃষ্টির পর পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন।" সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, অথচ তিনি বেদ রচনা করেন নি; সুতরাং বেদ কোন সৃষ্ট জীবের রচিত গ্রন্থ নয়। পরমেশ্বর ভগবান, যিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন। সেই কথা শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন, যদিও শঙ্করাচার্যের মত বৈষ্ণব মত নয়।

বৌদ্ধদের নবম সিদ্ধান্ত—'দয়া আদি সৎ-ধর্ম আচরণই বৌদ্ধ-জীবন'। কিন্তু দয়া আদি ধর্ম আপেক্ষিক। আমরা দয়া তাকেই প্রদর্শন করি যে আমাদের থেকে নিকৃষ্ট অথবা যে আমাদের থেকে বেশী দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের থেকে উৎকৃষ্ট যদি কোন ব্যক্তি থাকেন, তাহলে তিনি আমাদের দয়ার পাত্র হতে পারেন না। পক্ষান্তরে আমরা তার দয়ার পাত্র। অতএব দয়া প্রদর্শন একটি আপেক্ষিক ক্রিয়া। এটি পরমতত্ত্ব নয়। আর তা ছাড়া, আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে প্রকৃত দয়া কি? অসুস্থ ব্যক্তিকে

নিষিদ্ধ বস্তু আহার করতে দেওয়া, দয়া নয়। পক্ষান্তরে তা হিংসা। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারছি যে, প্রকৃত দয়া কি, ততক্ষণ আমরা কেবল দয়ার নামে উৎপাতেরই সৃষ্টি করি। আমরা যদি প্রকৃত দয়া প্রদর্শন করতে চাই, তাহলে আমাদের কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করতে হবে, যাতে জীব তার সুপ্ত চেতনা পুনরুদ্ধার করে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে। *বৌদ্ধ-দর্শন* যেহেতু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাই বৌদ্ধদের তথাকথিত দয়া জীবের চরম মঙ্গল সাধনে সমর্থ নয়।

শ্লোক ৫০

বৌদ্ধাচার্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল ।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

বৌদ্ধাচার্য 'নব প্রশ্ন'-এর সবকটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ় যুক্তির দ্বারা সেগুলি খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললেন।

শ্লোক ৫১

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় ।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিক এবং পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পরাজিত হলেন। তা দেখে লোকেরা হাসতে লাগল এবং বৌদ্ধরা লজ্জিত হল ও ভয় পেল।

তাৎপর্য

সেই সমস্ত দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন নাস্তিক, কেননা তারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। নাস্তিকেরা মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা-কল্পনায় খুব পারদর্শী হতে পারে এবং তথাকথিত দার্শনিক হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-বিশ্বাসী বৈষ্ণবেরা তাদের অনায়াসে পরাজিত করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যুক্ত সমস্ত প্রচারকদের দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে সবরকমের নাস্তিকদের পরাজিত করতে অত্যন্ত সুদক্ষ হতে হবে।

শ্লোক ৫২

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল ।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৌদ্ধরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন বৈষ্ণব। তারা সকলে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে ঘরে ফিরে গেলেন, এবং সেখানে সকলে মিলে তারা এক কুমন্ত্রণা করলেন।

শ্লোক ৫৩

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া ।
প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

একটি থালায় অপবিত্র অন্ন নিয়ে তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে, মহাপ্রসাদ বলে সেটি তাঁকে দিলেন।

তাৎপর্য

'অপবিত্র অন্ন' বলতে এখানে বৈষ্ণবের গ্রহণের অযোগ্য অন্ন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অবৈষ্ণবের দেওয়া তথাকথিত 'মহাপ্রসাদও বৈষ্ণব গ্রহণ করতে পারেন না। এটি সমস্ত বৈষ্ণবদের অনুসরণীয় বিধি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন বৈষ্ণব-আচার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন—"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/৮৭)। 'অসৎ' বলতে এখানে অবৈষ্ণবকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ অবৈষ্ণবের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে। এই বিষয়ে বৈষ্ণবকে খুব কঠোর হতে হবে। কোন অবস্থাতেই তার অবৈষ্ণবের সহযোগিতা করা উচিত নয়। মহাপ্রসাদের নাম করে কোন অবৈষ্ণব যদি কিছু খেতে দেয়, তা গ্রহণ করা উচিত নয়। এই অন্ন কখনই প্রসাদ নয়, কেননা অবৈষ্ণব কখনও ভগবানকে কিছু নিবেদন করতে পারে না। অনেক সময় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের অবৈষ্ণবের গৃহে আহার করতে হয়; কিন্তু তা যদি ভগবানকে নিবেদিত হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণত অবৈষ্ণবের প্রস্তুত খাবার বৈষ্ণবদের গ্রহণ করা উচিত নয়। অবৈষ্ণব যদি ত্রুটিহীনভাবেও সে খাদ্য প্রস্তুত করেন, তা কিন্তু তিনি বিষ্ণুকে নিবেদন করতে পারেন না, তাই তা মহাপ্রসাদ বলে গ্রহণ করা যায় না। *ভগবদ্গীতার* (৯/২৬) বর্ণনা অনুসারে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"(ভগবান বলেছেন) কেউ যদি ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল অথবা একটু জল দেয়, তাহলেও আমি তা গ্রহণ করি।"

ভক্তি সহকারে ভক্ত তাঁকে যা দেন ভগবান তা-ই গ্রহণ করতে পারেন। অবৈষ্ণব নিরামিশাষী হতে পারেন এবং অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারেন, কিন্তু বিষ্ণুবিমুখতাহেতু তার প্রদত্ত অন্ন বিষ্ণু কখনও গ্রহণ করেন না। তাই বৈষ্ণবের পক্ষে সেই অন্ন গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

শ্লোক ৫৪

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল ।
ঠোঁটে করি' অন্নসহ থালি লঞা গেল ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় এক বিশালকায় পক্ষী সেখানে এসে ঠোঁটে করে অন্নসহ সেই থালিটি নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

শ্লোক ৫৫

বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হৈয়া ।
বৌদ্ধাচার্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অমেধ্য অন্ন সমস্ত বৌদ্ধদের মাথার উপরে পড়ল, এবং সেই থালাটি বৌদ্ধাচার্যের মাথার উপরে পড়ল। তার মাথার উপরে থালাটি পড়ায় এক প্রচণ্ড শব্দ হল।

শ্লোক ৫৬

তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি' গেল ।
মূর্ছিত হঞা আচার্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তেরছাভাবে সেই থালাটি বৌদ্ধাচার্যের মাথার উপরে পড়ল, এবং তার ফলে তার মাথা কেটে গেল। বৌদ্ধাচার্য মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন।

শ্লোক ৫৭

হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

বৌদ্ধাচার্যের সমস্ত শিষ্যেরা তখন হাহাকার করে ক্রন্দন করতে লাগলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলেন।

শ্লোক ৫৮

তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাদের সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। কৃপা করে আপনি আমাদের গুরুকে পুনরুজ্জীবিত করুন।"

শ্লোক ৫৯

প্রভু কহে,—সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি' ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাদের বললেন, "তোমরা সকলে বল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' এবং উচ্চৈঃস্বরে তোমাদের গুরুর কর্ণেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর।

শ্লোক ৬০

তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন ।
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

'তাহলে তোমাদের 'গুরু' চেতনা ফিরে পাবেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে তখন সমস্ত বৌদ্ধরা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬১

গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি' ।
চেতন পাঞা আচার্য বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৌদ্ধাচার্যের শিষ্যরা তখন তার কর্ণে কৃষ্ণ, রাম, হরি, ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, এবং তার ফলে তাদের আচার্য চেতনা ফিরে পেয়ে 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, বৌদ্ধরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম-দীক্ষালাভ করেছিলেন, এবং তারা যখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছিলেন, তখন তারা ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তখন আর তারা পাষণ্ডবৎ আচরণকারী বৌদ্ধ ছিলেন না। তাই তারা তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। তাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রেমের পুনর্জাগরণ হয়েছিল, এবং তারা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে এবং শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গুরুই শিষ্যকে মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন, অর্থাৎ অচৈতন্য শিষ্যের চৈতন্য সম্পাদন করে বিষ্ণুপূজায় অনুপ্রাণিত ও নিযুক্ত করেন—তারই নাম 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অচেতন বৌদ্ধাচার্যের পূর্বে শিষ্যরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনামে চৈতন্য লাভ করে তাদের তথাকথিত বৌদ্ধ গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে আচার্যের কাজ করলেন। এইটিই পরম্পরার পন্থা। আচার্য এই ক্ষেত্রে শিষ্যে পরিণত হলেন,

এবং তাঁর শিষ্যরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হলেন, তখন তারা আচার্যরূপে কার্য করলেন। তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ বৌদ্ধাচার্যের শিষ্যরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন। পরম্পরার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ না করলে, আচার্যের কার্য করা যায় না। জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আমাদের জানতে হবে কিভাবে 'গুরু' এবং 'শিষ্য' হতে হয়।

শ্লোক ৬২

কৃষ্ণ বলি' আচার্য প্রভুরে করেন বিনয় ।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বৌদ্ধ আচার্য তখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হলেন, এবং তা দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৬৩

এইরূপে কৌতুক করি' শচীর নন্দন ।
অন্তর্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৌতুক করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন, এবং কেউ আর তাঁকে দেখতে পেলেন না।

শ্লোক ৬৪

মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতি-ত্রিমল্লে ।
চতুর্ভুজ মূর্তি দেখি' ব্যেঙ্কটাদ্রে চলে ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিরুপতি-তিরুমল্লে চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ব্যেঙ্কট-পর্বতে গেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভৌগোলিক ক্রম অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণ বর্ণনা করেছেন। তিরুপতি মন্দিরকে কখনও কখনও তিরুপটুর বলা হয়। তা উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কটগিরি বা ব্যেঙ্কটাদ্রি পর্বতের উপর আট মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ' শক্তিদ্বয় সহ চতুর্ভুজ 'বালাজী' বা ব্যেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণু-বিগ্রহ আছেন। এই স্থানটিকে 'ব্যেঙ্কটক্ষেত্র' বলা হয়। দক্ষিণ-ভারতে

বহু ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দির রয়েছে, কিন্তু এই বালাজী মন্দির বিশেষ ঐশ্বর্যপূর্ণ ও সম্পদশালী মন্দির। আশ্বিনমাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এখানে একটি অতি বৃহৎ মেলা হয়। এখানে দক্ষিণ রেলওয়ের তিরুপতি নামক স্টেশন আছে। ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় 'নিম্ন তিরুপতি' অবস্থিত। সেখানে কয়েকটি মন্দির বর্তমান। এখানে শ্রীগোবিন্দরাজ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ আছেন। 'তিরুমল্ল'—সম্ভবত 'উর্ধ্ব তিরুপতি'র প্রাচীন কালের নাম।

শ্লোক ৬৫

ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম দরশন ।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিরুপতিতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন। সেখানে তিনি রঘুনাথের প্রণাম এবং স্তব করেন।

শ্লোক ৬৬

স্বপ্রভাবে লোক-সবার করাঞা বিস্ময় ।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁর প্রভাব দর্শন করে লোকেরা বিস্মিত হয়েছেন। এইভাবে দয়াময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানা-নৃসিংহ মন্দিরে এলেন।

তাৎপর্য

পানা-নৃসিংহ বা পানাকল-নৃসিংহ কৃষ্ণা জেলায় বেজাওয়াদা-শহরের সাত মাইল দূরে 'মঙ্গল গিরি'র মধ্যে অবস্থিত। এখানে ছয়শো সোপান অতিক্রম করে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। চিনির পানা অর্থাৎ সরবৎ ভোগ দেওয়া হয় বলে এই বিগ্রহের নাম পানা-নৃসিংহ। কথিত আছে যে, নৃসিংহদেবকে সরবৎ ভোগ দিলে, ইনি সরবতের অর্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব মহারাজা 'কৃষ্ণের ব্যবহৃত বলে কথিত' একটি শঙ্খ দান করেন। মার্চ মাসে এখানে একটি অতি বৃহৎ মেলা হয়।

শ্লোক ৬৭

নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল ।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃসিংহদেবকে প্রণতি এবং স্তুতি করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শন করে লোকেরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৬৮

শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব দরশন ।
প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল সব শৈবগণ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শিবকাঞ্চীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবের বিগ্রহ দর্শন করলেন। তাঁর প্রভাবে তিনি সমস্ত শৈবদের বৈষ্ণবে পরিণত করলেন।

তাৎপর্য

শিবকাঞ্চী 'কাঞ্চীপুরম্' বা 'দক্ষিণ কাশী' নামেও পরিচিত। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন, তার মধ্যে 'একাম্বর কৈলাসনাথ'-এর মন্দিরটি অত্যন্ত প্রাচীন।

শ্লোক ৬৯

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিষ্ণুকাঞ্চীতে এসে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ দর্শন করলেন এবং তাঁদের প্রণাম করে বহু স্তব করলেন।

তাৎপর্য

কাঞ্চীপুরম্ থেকে বিষ্ণুকাঞ্চী প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে 'বরদরাজ' বিষ্ণু-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। এখানে 'অনন্ত সরোবর' নামক একটি বৃহৎ সরোবর আছে।

শ্লোক ৭০

প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল ।
দিন-দুই রহি' লোকে 'কৃষ্ণভক্ত' কৈল ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বহু নৃত্যগীত করলেন, এবং দুইদিন সেখানে থেকে সেখানকার সমস্ত মানুষদের 'কৃষ্ণভক্ত' করলেন।

শ্লোক ৭১

ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তি-স্থানে ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিমলয় দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিকালহস্তি নামক স্থানে গেলেন। সেখানে মহাদেবকে দর্শন করে তিনি তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

ত্রিকালহস্তি, তিরুপতি থেকে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এই স্থানটি 'শ্রীকালহস্তি' বা প্রচলিত ভাষায় 'কালহস্তি'-নামেও পরিচিত। এই স্থানটি 'বায়ুলিঙ্গশিব'-এর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

শ্লোক ৭২

পক্ষিতীর্থ দেখি' কৈল শিব দরশন ।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

পক্ষিতীর্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবের মন্দির দর্শন করলেন। তারপর তিনি বৃদ্ধকোল-তীর্থে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই পক্ষিতীর্থ 'তিরুকাড়ি-কুণ্ডম' নামেও পরিচিত এবং তা চিংলিপটের নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সমতল ভূমি থেকে পাঁচশো ফুট উচ্চ গিরিমালার উপর একটি শিবমন্দির। ঐ গিরির নাম বেদ-গিরি বা বেদাচলম্ এবং মূর্তির নাম বেদগিরীশ্বর। প্রতিদিন দুইটি বাজপাখি এসে সেবায়েত পূজারীর কাছ থেকে আহার প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে যে, আবহমান কাল থেকে এভাবেই তা চলে আসছে।

শ্লোক ৭৩

শ্বেতবরাহ দেখি, তাঁরে নমস্করি' ।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

বৃদ্ধকোলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্বেতবরাহ মন্দিরে যান। সেখানে শ্বেতবরাহ-দেবকে প্রণতি নিবেদন করে তিনি পীতাম্বর-শিব দর্শন করতে যান।

তাৎপর্য

শ্বেতবরাহদেবের মন্দির বৃদ্ধকোলে (শ্রীমুষ্ণম্) অবস্থিত। এই মন্দিরটি একটি মাত্র প্রস্তরে নির্মিত এবং 'মহাবলী পুরম্' বা 'বলীপীঠম্' থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে বরাহরূপী বিষ্ণু-বিগ্রহের উপরে শেষনাগ ছত্র ধারণ করে আছেন। পীতাম্বর-শিবের আর একটি নাম চিদাম্বরম্। এই মন্দিরটি 'কুড্ডালোর' শহর থেকে ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণে। এই বিগ্রহের নাম—'আকাশ লিঙ্গ শিব'। এই সুবৃহৎ মন্দিরটি উনচল্লিশ একর জমির উপর অবস্থিত এবং চতুর্দিকে ষাট ফুট পথে পরিবেষ্টিত।

শ্লোক ৭৪

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি' দরশন ।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শিয়ালী ভৈরবী দেবী দর্শন করে শচীনন্দন গৌরহরি কাবেরীর তীরে এসে পৌছলেন।

তাৎপর্য

শিয়ালী ভৈরবী তাঞ্জোর জেলায়, তাঞ্জোর শহর থেকে আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। সেখানে একটি বিখ্যাত শৈব মন্দির ও প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ঐ মন্দিরটি 'তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর' নামক এক শৈবের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রবাদ আছে যে, ঐ শিবভক্ত শিশুরূপে মন্দিরে আগমন করলে ভৈরবী তাকে স্তন্য পান করাতেন। সেখান থেকে শ্রীচৈতন্য ত্রিচিনপল্লী জেলায় কোলিরন বা কাবেরী-নদীতীরে গমন করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪০) এই কাবেরী-নদীকে মহাপুণ্যা বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ৭৫

গো-সমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর মহাপ্রভু গো-সমাজ নামক শৈব-তীর্থে শিব-বিগ্রহ দর্শন করেন, এবং সেখান থেকে বেদাবনে গিয়ে মহাদেবকে দর্শন করে তাঁর বন্দনা করেন।

তাৎপর্য

গো-সমাজ স্থানটি শৈবদের তীর্থ। বেদাবন,—তাঞ্জোর জেলার তিরুত্তুরাইপ্পুণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং পয়েন্ট কলিমিয়ারের পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেখানকার ব্রাহ্মণদের মতে তীর্থ হিসেবে রামেশ্বরের পরেই এর স্থান।

শ্লোক ৭৬

অমৃতলিঙ্গ-শিব দেখি' বন্দন করিল ।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

অমৃত-লিঙ্গ নামক শিব বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বন্দনা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রভাবে সেই সমস্ত শিব মন্দিরের শৈবরা বৈষ্ণব হলেন।

শ্লোক ৭৭

দেবস্থানে আসি' কৈল বিষ্ণু দরশন ।
শ্রী-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাহাঁ গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

দেবস্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ দর্শন করেন, এবং বহুক্ষণ রামানুজাচার্যের অনুগামী শ্রী-বৈষ্ণবদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শ্লোক ৭৮

কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি' সরোবর ।
শিব-ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

কুম্ভকর্ণ-কপালে সরোবর দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিব-ক্ষেত্র নামক স্থানে শিব দর্শন করেন।

তাৎপর্য

রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের নাম অনুসারে এই স্থানটির নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে এটি তাঞ্জোর শহরের চব্বিশ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে কুম্ভকোণম্ নগর। এখানে বারোটি শিবমন্দির, চারটি বিষ্ণুমন্দির ও একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে। তাঞ্জোর নগরে শিবগঙ্গা নামক সরোবরের তীরে শিবক্ষেত্র নামক স্থান। সেখানে বৃহতীশ্বর-শিবমন্দির নামক একটি বিশাল শিবমন্দির আছে।

শ্লোক ৭৯

পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন ।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শিব-ক্ষেত্র থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাপনাশন তীর্থে গমন করেন এবং সেখানে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ দর্শন করেন। তারপর তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করেন।

তাৎপর্য

কারো কারো মতে এই পাপনাশন নামক স্থান কুম্ভকোণম্ থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। অন্য কারো মতে তিনেভেলি জেলার অন্তর্গত পালমকোটা নগর থেকে বিশ মাইল পশ্চিমে পাপনাশন নামক একটি নগর আছে। এখানেই একটি মন্দিরের নিকটে তাম্রপর্ণী-নদী পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে এসে পড়েছে।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (শ্রীরঙ্গম) একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ত্রিচিনপল্লীর কাছে কাবেরী বা কোলিরন নামক একটি নদী আছে। শ্রীরঙ্গম তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্ থেকে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে এই কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটি ভারতের বৃহত্তম মন্দির। এই মন্দিরটির চতুর্দিকে সাতটি প্রাকার রয়েছে। শ্রীরঙ্গমের সাতটি রাস্তার প্রাচীন নাম— ১) ধর্মের পথ, ২) রাজমহেন্দ্রের পথ, ৩) কুলশেখরের পথ, ৪) আলিনাড়নের পথ, ৫) তিরুবিক্রমের পথ, ৬) মাড়মাড়ি-গাইসের তিরুবিড়ি পথ, এবং ৭) অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্বে রাজমহেন্দ্র রাজত্ব করেন; তার পূর্বে ধর্মবর্ম; তারও পূর্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন এবং আলবন্দারু শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে বাস করেছিলেন। যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য, সুদর্শনাচার্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন।

লক্ষ্মীর অবতার 'গোদাদেবী' যিনি বারো জন সিদ্ধ দিব্যসুরির মধ্যে অন্যতমা, তিনি রঙ্গনাথের সঙ্গে পরিণীতা হন। পরে তিনি শ্রীরঙ্গনাথের দেহে প্রবেশ করেন। কারমুক্-অবতার তিরুমঙ্গই আলোবার দস্যুবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত ধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্মাণ করেন। কথিত আছে—দুশো উননবুই কল্যব্দে তোণ্ডরডিপ্পডি আলোবার জন্মগ্রহণ করে ভক্তি যাজন করতে করতে কোন বারবনিতার প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ তাঁর সেবকের দুর্দশা দর্শন করে তাকে উদ্ধার করার জন্য নিজের একটি স্বর্ণপাত্র কোন সেবকের দ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠিয়ে দেন। মন্দিরে স্বর্ণপাত্র নেই দেখে বহু অনুসন্ধানের পর সেটি সেই বারবনিতার গৃহে পাওয়া যায়। রঙ্গনাথের কৃপা দর্শন করে ভক্তের ভ্রম দূর হয়। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাবের পূর্বে রঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে তিনি তুলসী-কানন রচনা করেছিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্যের কূরেশ নামক এক বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র— শ্রীরামপিল্লাই, তার পুত্র—বাগবিজয়ভট্ট, তার পুত্র—বেদব্যাসভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য। এই মহাত্মার বার্ধক্য-কালে মুসলমানেরা রঙ্গনাথের মন্দির আক্রমণ করে এবং বার হাজার শ্রী-বৈষ্ণবকে হত্যা করে। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে গিঙ্গির শাসনকর্তা শ্রী-বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদয়ের' বা 'গোপ্পণার্য' শ্রী-বৈষ্ণবদের প্রার্থনায় শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতি থেকে 'সিংহব্রহ্মে' আনয়ন করে তিন বৎসর রাখেন এবং পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুন প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রাকারের পূর্বগাত্রে শ্রীল বেদান্তদেশিক রচিত শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা খোদিত আছে।

শ্লোক ৮০

কাবেরীতে স্নান করি' দেখি' রঙ্গনাথ ।
স্তুতি-প্রণতি করি' মানিলা কৃতার্থ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

কাবেরী নদীতে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঙ্গনাথজীকে দর্শন করেন এবং তাঁকে স্তুতি ও প্রণতি নিবেদন করে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করেন।

শ্লোক ৮১

প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করলেন। তা দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৮২

শ্রী-বৈষ্ণব এক,—'ব্যেঙ্কট ভট্ট' নাম ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যেঙ্কট ভট্ট নামক একজন শ্রী-বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গভীর শ্রদ্ধাসহকারে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

তাৎপর্য

ব্যেঙ্কট ভট্ট ছিলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী একজন শ্রী-সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গ তামিল দেশের অন্তর্ভুক্ত, তাই সেখনকার অধিবাসীদের 'ব্যেঙ্কট' নাম বর্তমানকালে হয় না। তাই অনুমান করা হয় যে ব্যেঙ্কট ভট্ট সেখানকার অধিবাসী ছিলেন না। হয়তো তাদের বংশ কিছুদিন আগে থেকে শ্রীরঙ্গমে বাস করেছিলেন। ব্যেঙ্কট ভট্ট ছিলেন 'বড়-গলই'-শাখাস্থ রামানুজীয়-বৈষ্ণব। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন তাঁর ভ্রাতা। ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্রই পরবর্তীকালে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী নামে পরিচিত হন এবং বৃন্দাবনে রাধারমণ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত *ভক্তিরত্নাকর* (প্রথম তরঙ্গ) গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্লোক ৮৩

নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন ।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করে সেই পাদোদক সবংশে পান করলেন।

শ্লোক ৮৪-৮৫

ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন ।
চাতুর্মাস্য আসি' প্রভু, হৈল উপসন্ন ॥ ৮৪ ॥
চাতুর্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে ।
কৃষ্ণকথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিয়ে, তারপর বললেন, "প্রভু, চাতুর্মাস্যের সময় উপস্থিত, কৃপা করে যদি আপনি এই চারমাস আমার গৃহে থাকেন এবং কৃষ্ণকথা বলে আমাদের উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা কৃতার্থ হব।"

শ্লোক ৮৬

তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে ।
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যেঙ্কট ভট্টের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চাতুর্মাস্যের চারমাস তার গৃহে অবস্থান করেন, এবং তার সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে মহা-আনন্দে তিনি চারমাস অতিবাহিত করেন।

শ্লোক ৮৭

কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ দর্শন ।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান করে শ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করতেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করতেন।

শ্লোক ৮৮

সৌন্দর্যাদি প্রেমাবেশ দেখি, সর্বলোক ।
দেখিবারে আইসে, দেখে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে সমস্ত লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সৌন্দর্য এবং ভগবৎপ্রেমের আবেশ দেখতে আসতেন এবং তা দেখে তাদের সমস্ত দুঃখ ও শোক দূর হত।

শ্লোক ৮৯

লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা-দেশ হৈতে ।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুকে দেখিতে ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

নানাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে এসেছিলেন। মহাপ্রভুকে দেখামাত্রই তারা সকলে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতেন।

শ্লোক ৯০

কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল,—লোকে চমৎকার ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কেউ কিছু বলত না। এইভাবে সকলেই কৃষ্ণভক্ত হলেন এবং তা দেখে লোকেরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৯১

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বাস করতেন তারা সকলে একদিন একদিন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯২

এক এক দিনে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল ।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এক একদিন করে নিমন্ত্রণ করে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হল, কিন্তু কয়েকজন ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে পারলেন না।

শ্লোক ৯৩

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্তন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি প্রতিদিন দেবালয়ে এসে ভগবদ্‌গীতা পাঠ করতেন।

শ্লোক ৯৪

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে ।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভগবৎ-প্রেমানন্দে আবিষ্ট হয়ে ভগবদ্‌গীতার আঠারোটি অধ্যায় পাঠ করতেন, কিন্তু তিনি অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে তা পাঠ করতেন, এবং লোকেরা তা শুনে হাসত।

শ্লোক ৯৫

কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি অশুদ্ধভাবে পাঠ করতেন বলে কেউ হাসত, কেউ তা নিন্দা করত, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করতেন না; প্রেমাবিষ্ট হয়ে আনন্দিত অন্তরে তিনি গীতা পড়ে যেতেন।

শ্লোক ৯৬

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ,—যাবৎ পঠন ।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবদ্‌গীতা পাঠ করার সময় সেই ব্রাহ্মণের দেহে পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ আদি সাত্ত্বিক বিকার দেখা যেত; এবং তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

মূর্খতাবশতঃ যদিও সেই ব্রাহ্মণ যথাযথভাবে *ভগবদ্‌গীতার* শ্লোক উচ্চারণ করতে পারতেন না, কিন্তু তবুও *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করার সময় তিনি অপ্রাকৃত আনন্দে বিহ্বল হতেন এবং তার অঙ্গে সমস্ত সাত্ত্বিক বিকারগুলি দেখা যেত। ভাবের সেই সমস্ত লক্ষণগুলি দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে পরমেশ্বর ভগবান ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন, পাণ্ডিত্যে নয়। যদিও তিনি *ভগবদ্‌গীতার* শ্লোকগুলি অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি তার বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নি। পক্ষান্তরে, তিনি তার ভাব (ভক্তি) দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১১) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥

"পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মলচিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন।"

এ ব্যাপারে আরও অধিক তথ্যের জন্য এই শ্লোকের তাৎপর্যটি আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্লোক ৯৭

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে, শুন মহাশয় ।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়, ভগবদ্গীতার কোন্ অর্থ উপলব্ধি করে আপনার এত আনন্দ হচ্ছে?"

শ্লোক ৯৮

বিপ্র কহে,—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি ।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি' ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "আমি মূর্খ, তাই শ্লোকের অর্থ আমি বুঝি না। কিন্তু যেহেতু আমার গুরুদেব আমাকে প্রতিদিন ভগবদ্গীতা পাঠ করতে আদেশ দিয়েছেন, তাই কখনও শুদ্ধভাবে এবং কখনও অশুদ্ধভাবে আমি গীতাপাঠ করি।"

তাৎপর্য

সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভের এটি একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। সেই ব্রাহ্মণ এত সাফল্য লাভ করেছিলেন যে, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও তিনি অশুদ্ধভাবে গীতাপাঠ করেছিলেন। তার ভক্তি-অনুশীলন শুদ্ধ উচ্চারণ আদি জড় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল না। পক্ষান্তরে, তার সাফল্য নির্ভর করছিল যথাযথভাবে তার গুরুদেবের আদেশ পালন করার উপর।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(*শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ* ৬/২৩)

"পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি যিনি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত বেদের মর্মার্থ সেই মহাত্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।"

প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব তাঁরই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, যিনি নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করেন। পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরুদেব উভয়ের প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। অর্থাৎ, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব, উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই পারমার্থিক জীবনে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়।

শ্লোক ৯৯-১০১

অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর ।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥ ৯৯ ॥
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন ।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ বললেন, "যখনই আমি ভগবদ্গীতা পাঠ করি তখনই আমি দেখি, অর্জুনের রথের সারথি হয়ে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ হাতে ঘোড়ার রশি নিয়ে বসে আছেন এবং অর্জুনকে হিতোপদেশ দান করছেন। তাঁকে দেখা মাত্রই আমি আনন্দে আবিষ্ট হই, এবং যখনই আমি গীতা পড়ি, তখনই আমি তাঁকে দর্শন করি। সেই জন্যই আমার মন গীতা-পাঠ করার অভ্যাস ছাড়তে পারে না।"

শ্লোক ১০২

প্রভু কহে,—গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার ।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, "গীতাপাঠে তোমার যথার্থই অধিকার রয়েছে, এবং তুমিই গীতার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছ।"

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে—*ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।* *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* মর্ম উপলব্ধি করতে হয় ভক্তভাগবতের কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে। বুদ্ধি অথবা পাণ্ডিত্যের দ্বারা তা বোঝা যায় না। সেই সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে *ভগবদ্গীতা* পাঠ করেন তার কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। *শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের* (৬/২৩) বর্ণনা অনুসারে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করতে হয় শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মাধ্যমে, পাণ্ডিত্যের দ্বারা নয়। তাই আমরা *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রদান করেছি। বহু পণ্ডিত এবং দার্শনিক তাঁদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা *ভগবদ্গীতা* পাঠ করেন। তাঁরা কেবল তাঁদের সময়েরই অপচয় করেন এবং যারা তাঁদের ভাষ্য পাঠ করে তারাও বিপথগামী হয়।

শ্লোক ১০৩

এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন ।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে সেই ব্রাহ্মণ তখন ক্রন্দন করতে থাকেন।

শ্লোক ১০৪

তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয় ।
সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয় ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ বললেন, "তোমাকে দেখে আমার তার থেকেও দ্বিগুণ আনন্দ বেশী হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যেন তুমিই সেই কৃষ্ণ।

শ্লোক ১০৫

কৃষ্ণস্ফূর্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্মল ।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর মন নির্মল হয়েছিল এবং সেইজন্যই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০৬

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ ।
এই বাত্ কাহাঁ না করিহ প্রকাশন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দান করেছিলেন, এবং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই কথা কারোর কাছে প্রকাশ না করতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১০৭

সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল ।
চারি মাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, এবং যে চারমাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ওখানে ছিলেন, সেই সময় তিনি কখনও মহাপ্রভুর সঙ্গ ছাড়েননি।

শ্লোক ১০৮

এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র ।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে গৌরচন্দ্র ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করেছিলেন এবং নিরন্তর তার সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করে আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০৯

'শ্রী-বৈষ্ণব' ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানুজ-সম্প্রদায়ের 'শ্রীবৈষ্ণব' হওয়ার ফলে ব্যেঙ্কটভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করতেন। তার শুদ্ধভক্তি দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১০

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব ।
হাস্য-পরিহাসে দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

নিরন্তর পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গ করার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং ব্যেঙ্কট ভট্টের মধ্যে ধীরে ধীরে সখ্যভাবের উদয় হয়েছিল। সখ্যভাবের স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করতেন।

শ্লোক ১১১

প্রভু কহে, ভট্ট,—তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যেঙ্কটভট্টকে বললেন, "ব্যেঙ্কটভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সর্বদাই নারায়ণের বক্ষস্থিতা এবং তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত পতিব্রতাদের শিরোমণি।

শ্লোক ১১২

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"আর আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপবালক, তিনি সারাদিন মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়ান। সাধ্বী হয়ে লক্ষ্মীদেবী কেন তাঁর সঙ্গ করতে চান?

শ্লোক ১১৩

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল ।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী তাঁর বৈকুণ্ঠের সুখ পরিত্যাগ করে দীর্ঘকাল অন্তহীন ব্রত পালন এবং তপশ্চর্যা করেছিলেন।"

শ্লোক ১১৪

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১১৪ ॥

কস্য—কার; অনুভাবঃ—ফল; অস্য—এই (কালীয়) সর্পের; ন—না; দেব—হে দেব; বিদ্মহে—আমরা জানি; তব-অঙ্ঘ্রি—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; রেণু—ধূলি কণা; স্পর্শ-অধিকারঃ—স্পর্শ করার যোগ্যতা; যৎ—যা; বাঞ্ছয়া—বাসনা করে; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; ললনা—সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী; অচরৎ—আচরণ করেছিলেন; তপঃ—তপশ্চর্যা; বিহায়—পরিত্যাগ করে; কামান্—সমস্ত কামনা-বাসনা; সু-চিরম্—দীর্ঘকাল; ধৃতব্রতা—ব্রতনিষ্ঠ তপস্বিনী সতী।

অনুবাদ

"হে দেব, আপনার চরণরেণু লাভ করার বাসনায় লক্ষ্মীদেবী দীর্ঘকাল সমস্ত কাম পরিত্যাগ করে ধৃতব্রতা হয়ে তপস্যা করেছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়-সর্প যে কি সুকৃতির দ্বারা লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করল, তা আমরা জানি না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৬/৩৬) থেকে উদ্ধৃত কালীয়পত্নীদের উক্তি।

শ্লোক ১১৫

ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার উত্তরে ব্যেঙ্কটভট্ট বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণ এক এবং অভিন্ন, কিন্তু বৈদগ্ধ্যাদি ভাব থাকায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধিক আস্বাদনীয়।

শ্লোক ১১৬

তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম ।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণ যেহেতু একই পরম পুরুষ, তাই শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে লক্ষ্মীর পতিব্রতা-ধর্ম নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, কৌতুকের ছলে লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চেয়েছিলেন।"

তাৎপর্য

ব্যেঙ্কটভট্টের এই উত্তর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন যে, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস-মূর্তি। যদিও শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ এবং নারায়ণ চতুর্ভুজ, তবুও তাঁরা পৃথক নন। তাঁরা এক এবং অভিন্ন। নারায়ণে কৃষ্ণের মতো লালিত্য থাকলেও কৃষ্ণের মতো বৈদগ্ধ্য-আদি লীলা নেই। শ্রীকৃষ্ণই যখন বিলাস-মূর্তিতে নারায়ণ, তখন নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণের সঙ্গমে কৌতুক হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্লোক ১১৭

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১১৭ ॥

সিদ্ধান্ততঃ—বাস্তবিকভাবে; তু—কিন্তু; অভেদে—ভেদ বিহীন; অপি—যদিও; শ্রী-ঈশ—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; স্বরূপয়োঃ—রূপের মধ্যে; রসেন—অপ্রাকৃত রসের দ্বারা; উৎকৃষ্যতে—উৎকৃষ্ট হয়; কৃষ্ণ-রূপম্—শ্রীকৃষ্ণের রূপ; এষা—এই; রসস্থিতিঃ—রসের স্বভাব।

অনুবাদ

ব্যেঙ্কটভট্ট বললেন,—'সিদ্ধান্ততঃ 'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণের' স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তবুও শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করেছে। এইটিই রসতত্ত্বের সিদ্ধান্ত।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/৫৯) পাওয়া যায়।

শ্লোক ১১৮

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবী বিবেচনা করেছিলেন, "কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নাশ হয় না। অধিকন্তু, কৃষ্ণের সঙ্গ হলে রাসলীলা আস্বাদন করা যায়।"

শ্লোক ১১৯

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যেঙ্কটভট্ট আরও বললেন, "লক্ষ্মীদেবী সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী, তিনিও অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন; তাই তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে অভিলাষী হন, তাতে কি দোষ? কেন তুমি তা নিয়ে পরিহাস করছ?"

শ্লোক ১২০

প্রভু কহে,—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তাতে দোষ নেই, তা আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্রের বর্ণনায় আমি শুনেছি, লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি।

শ্লোক ১২১

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্‌ ॥ ১২১ ॥

ন—না; অয়ম্—এই; শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবীর; অঙ্গে—বক্ষে; উ—হায়; নিতান্ত-রতেঃ—যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত; প্রসাদঃ—অনুগ্রহ; স্বঃ—স্বর্গের; যোষিতাম্—ললনাগণ; নলিন—পদ্মফুলের; গন্ধ—সৌরভ; রুচাম্—অঙ্গকান্তি; কুতোঃ—অনেক কম; অন্যাঃ—অন্যেরা; রাসোৎসবে—রাস নৃত্যের উৎসবে; অস্য—শ্রীকৃষ্ণের; ভুজ-দণ্ড—বাহুযুগলের দ্বারা; গৃহীত—আলিঙ্গিত হয়ে; কণ্ঠ—কণ্ঠ; লব্ধ-আশিষাম্—যারা এই ধরনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; উদগাৎ—প্রকাশিত হয়েছিলেন; ব্রজ-সুন্দরীনাম্—বৃন্দাবনের সুন্দরী গোপ রমণীদের।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের রাসোৎসবে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন ব্রজগোপিকারা তাঁর বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অনুগ্রহ তাঁর বক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি চিৎ-জগতের নিতান্ত অনুগত শক্তিদেরও লাভ হয়নি। পদ্মগন্ধা স্বর্গীয় রমণীদেরও যখন তা লাভ হয়নি, তখন এই জড় জগতের স্ত্রীলোকদের কথা আর কি বলব?'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৪৭/৬০) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১২২

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবী কেন রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন না? অথচ মূর্তিমান শ্রুতিগণ তো তপশ্চর্যা করে রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন? তার কারণ কি আপনি বলতে পারেন?

শ্লোক ১২৩

নিভৃতমরুন্মনোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১২৩ ॥

নিভৃত—নিয়ন্ত্রিত; মরুৎ—প্রাণবায়ু; মনঃ—মন; অক্ষ—ইন্দ্রিয়সমূহ; দৃঢ়—কঠিনভাবে; যোগ—যোগের পন্থায়; যুজঃ—যারা যুক্ত; হৃদি—হৃদয়ে; যৎ—যে; মুনয়ঃ—মুনিগণ; উপাসতে—আরাধনা করেন; তৎ—এই; অরয়ঃ—শত্রুরা; অপি—ও; যযুঃ—লাভ করেন; স্মরণাৎ—স্মরণ করার ফলে; স্ত্রিয়ঃ—ব্রজ-গোপিকারা; উরগেন্দ্র—সর্পের; ভোগ—দেহের মতো; ভুজঃ—বাহু; দণ্ড—দণ্ড সদৃশ; বিষক্ত—সংলগ্ন; ধিয়ঃ—যাদের মনে; বয়ম্-অপি—আমাদেরও; তে—আপনার; সমাঃ—সমতুল্য; সমদৃশঃ—সমভাব সম্পন্ন; অঙ্ঘ্রি-সরোজ—শ্রীপাদপদ্মের; সুধাঃ—অমৃত।

অনুবাদ

'মুনিগণ প্রাণায়ামের দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস জয় করে মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করে হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেছিলেন, ভগবানের শত্রুরাও কেবল মাত্র তাঁকে অনুধ্যান করে (ভয়ে ব্যাকুল হয়ে মনে মনে চিন্তা করে) সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করেছিল। ব্রজ-স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্প-শরীর তুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁর পাদপদ্মের সুধা লাভ করেছিলেন, আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করে গোপীভাবে তাঁর পাদপদ্ম-সুধা পান করেছি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৭/২৩) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১২৪

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।
ভট্ট কহে,—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্রুতিগণ রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন অথচ লক্ষ্মীদেবী পারলেন না, এর কি কারণ?" তখন ব্যেঙ্কটভট্ট বললেন—"সেই অচিন্ত্য রহস্য বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

শ্লোক ১২৫

আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যেঙ্কটভট্ট তখন স্বীকার করলেন, "আমি একটি ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জীব, এবং স্বাভাবিকভাবে অস্থির। আর ভগবানের লীলা কোটিসমুদ্রের মতো গম্ভীর।

শ্লোক ১২৬

তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজকর্ম ।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলামর্ম ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তুমি সাক্ষাৎ সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নিজের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য তুমি জান, এবং যাকে তুমি জানাও সে কেবল তোমার লীলার মর্ম বুঝতে পারে।"

তাৎপর্য

ভগবানের লীলা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝা যায় না। ভগবানের সেবা করার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড়-কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভগবানের কৃপার প্রভাবে ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি স্বয়ং প্রকাশিত হন। সেই তত্ত্ব *কঠোপনিষদে* (৩/২/৩) এবং *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/২/৩)প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে—*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌।* "যিনি পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন তিনিই ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।"

শ্লোক ১২৭

প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্বমাধুর্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ স্বভাব হচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাধুর্যের দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

শ্লোক ১২৮

ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদদের আনুগত্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করা যায়। সেই সমস্ত ব্রজবাসীরা জানেন না—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১২৯

কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

'সেখানে কেউ তাঁকে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁধেন, আবার কেউ সখা-জ্ঞানে, তাঁর সঙ্গে খেলায় জিতে, তাঁর কাঁধে চড়েন।

শ্লোক ১৩০

'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজজনেরা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দমহারাজের পুত্র বলে জানেন, ঐশ্বর্যজ্ঞানে তাঁর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ১৩১

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজবাসীদের ভাব অনুসারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পান।"

তাৎপর্য

ব্রজভূমি বা গোলোক-বৃন্দাবনের অধিবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দমহারাজের পুত্ররূপে জানেন।

তারা তাঁকে পরম ঐশ্বর্যশালী 'পরমেশ্বর' বলে জানেন না। ব্রজবাসীদের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চার প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করে যিনি পরমতত্ত্বকে ভজনা করেন, তিনি চরম অবস্থায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১৩২

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৩২ ॥

না—না; অয়ম্—এই শ্রীকৃষ্ণ; সুখ আপঃ—সহজলভ্য; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; দেহিনাম্—দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়াসক্ত মানুষ; গোপিকা-সুতঃ—মা যশোদার পুত্র; জ্ঞানিনাম্—মনোধর্মী জ্ঞানীদের; চ—এবং; আত্ম-ভূতানাম্—তপঃ ব্রত পরায়ণ ব্যক্তিগণ; যথা—যেমন; ভক্তি-মতাম্—রাগমার্গের ভজনকারী ভক্তদের; ইহ—এই জগতে।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান যশোদা-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগ ভক্তিপরায়ণ ভক্তদের কাছেই সুলভ। মনোধর্মী জ্ঞানী, ব্রত ও তপস্যাপরায়ণ আত্মারামের কাছে তেমন সুলভ নন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯/২১) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের ২২৭ শ্লোকেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩৩

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা ।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রুতিগণ গোপীদের অনুগত হয়ে গোপীভাব অবলম্বন করে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন।"

তাৎপর্য

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে যখন সফল হলেন না, এবং হৃদগত গোপীভাব নিয়েও যখন প্রবেশ করতে পারলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করে গোপীদের অনুগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩৪

বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রুতিগণ যখন ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করে বাহ্যে গোপীদেহ এবং অন্তরে গোপীভাব প্রাপ্ত হলেন, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১৩৫

গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার ।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ জাতিতে গোপ এবং গোপীরা হচ্ছেন তাঁর প্রেয়সী। শ্রীকৃষ্ণ কখনও স্বর্গের দেবী বা অন্য কোন স্ত্রীর সঙ্গ করেন না।

শ্লোক ১৩৬

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেই চিন্ময় দেহ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গোপিকাদের অনুগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেননি।

শ্লোক ১৩৭

অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসবিলাস করা যায় না; তাই বেদব্যাস 'নায়ং সুখাপো ভগবান্' শ্লোকটির মাধ্যমে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভগবদ্গীতার* একটি শ্লোকের (৯/২৫) মর্মার্থও প্রতিপন্ন করে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা স্বর্গের দেবদেবীদের পূজা করে, তারা সেই সমস্ত দেবদেবীর লোক প্রাপ্ত হয়; যারা পিতৃপুরুষদের পূজা করে, তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়; যারা ভূত-প্রেত পূজা করে, তারা প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যারা আমার পূজা করে তারা আমার কাছে ফিরে আসে।"

চিন্ময় স্বরূপ লাভ হলেই কেবল চিৎ-জগতে প্রবেশ করা যায়। এই জড় জগতে ভগবানের রাসলীলার অনুকরণ করা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। রাসলীলায় প্রবেশ করতে

হলে গোপীদের মতো চিন্ময়দেহ প্রাপ্ত হতে হবে। *নায়ং সুখাপো ভগবান্* শ্লোকটিকে ভক্তদের দ্বারা ভক্তিমৎ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ, তারা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত। কৃত্রিমভাবে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অনুকরণ করে, অথবা নিজেকে কৃষ্ণ বলে মনে করে, অথবা সখী সেজে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত। এই কলুষিত জড় জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, তাই কোন জড় উপায় অবলম্বন করে তাঁর রাসলীলায় প্রবেশ করা যায় না। সেই তত্ত্বই এই শ্লোকে নির্দেশিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৮

পূর্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান ।
'শ্রীনারায়ণ' হয়েন স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে ব্যেঙ্কটভট্টের মনে একটি অভিমান ছিল যে, 'শ্রীনারায়ণ' হলেন স্বয়ং ভগবান।

শ্লোক ১৩৯

তাঁহার ভজন সর্বোপরি-কক্ষা হয় ।
'শ্রী-বৈষ্ণবে'র ভজন এই সর্বোপরি হয় ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাই তিনি মনে করতেন যে নারায়ণের ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন, অতএব শ্রী-বৈষ্ণবের ভজন সর্বোত্তম।

শ্লোক ১৪০

এই তাঁর গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

তার এই গর্ব খণ্ডন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরিহাসের ছলে তাকে এই সমস্ত কথা বললেন।

শ্লোক ১৪১

প্রভু কহে,—ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয় ।
'স্বয়ং-ভগবান্' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, 'ব্যেঙ্কটভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান সেই সম্বন্ধে মনে কোন সংশয় রেখো না।

শ্লোক ১৪২

কৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি—শ্রীনারায়ণ ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি। তাই তিনি লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁর অনুগামীদের চিত্ত হরণ করেন।

শ্লোক ১৪৩

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৪৩ ॥

এতে—এই সমস্ত; চ—এবং; অংশ—অংশ; কলাঃ—অংশের অংশ; পুংসঃ—পুরুষাবতারদের; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; তু—কিন্তু; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; ইন্দ্র-অরি—দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রু অসুরেরা; ব্যাকুলম্—পূর্ণ; লোকম্—লোক; মৃড়য়ন্তি—সুখী করে; যুগে যুগে—প্রতিযুগে।

অনুবাদ

"ভগবানের এই সমস্ত অবতারেরা পুরুষাবতারদের অংশ অথবা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। যুগে যুগে তিনি অসুরদের অত্যাচার থেকে জগতকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/২৮) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৪৪

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের চারটি অসাধারণ গুণ রয়েছে, যা নারায়ণে নেই, তাই লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা সতৃষ্ণ থাকেন।

তাৎপর্য

নারায়ণের যাটটি দিব্য গুণ রয়েছে। সেই যাটটি গুণের উপরে আরও চারটি অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণের আছে, তা নারায়ণে নেই। যথা—১) অতি অদ্ভুত চমৎকার লীলা সমূহ, যা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়; ২) অতুলনীয় মাধুর্যপ্রেম সমন্বিত সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের দ্বারা (ব্রজগোপিকাদের দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণ পরিবেষ্টিত; ৩) শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বংশীধ্বনির দ্বারা ত্রিজগৎকে আকৃষ্ট করেন; ৪) শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মাধুর্য, যা বিশ্ব-চরাচরকে মুগ্ধ করে। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য।

শ্লোক ১৪৫

তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ ।
সেই শ্লোকে আইসে 'কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্' ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যে শ্লোকটির উল্লেখ করেছিলে, সেই শ্লোকটিতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।

শ্লোক ১৪৬

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৪৬ ॥

সিদ্ধান্ততঃ—বাস্তবিকভাবে; তু—কিন্তু; অভেদে—ভেদ বিহীন; অপি—যদিও; শ্রীশ—লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; স্বরূপয়োঃ—রূপের মধ্যে; রসেন—অপ্রাকৃত রসের দ্বারা; উৎকৃষ্যতে—উৎকৃষ্ট হয়; কৃষ্ণরূপম্—শ্রীকৃষ্ণের রূপ; এষা—এই; রসস্থিতিঃ—রসের স্বভাব।

অনুবাদ

ব্যেঙ্কটভট্ট বললেন, "সিদ্ধান্ততঃ 'নারায়ণ' ও কৃষ্ণের' স্বরূপদ্বয়ের কোন ভেদ নেই, তবুও শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করেছে। এইটিই রসতত্ত্বের সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/৫৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* থেকে উদ্ধৃত *সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি* শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোকটি ব্যেঙ্কটভট্টকে বলেছিলেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* রচনা হওয়ার বহু পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছিলেন, এবং সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* রচনা হওয়ার বহু পূর্বে এই সমস্ত শ্লোকগুলি প্রচলিত ছিল এবং ভক্তরা সেগুলির উল্লেখ করতেন।

শ্লোক ১৪৭

স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন ।
গোপিকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ' ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করেন, কিন্তু নারায়ণ গোপিকাদের মন হরণ করতে পারেন না। তা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়।

শ্লোক ১৪৮-১৪৯

নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় 'নারায়ণে' ॥ ১৪৮ ॥
'চতুর্ভুজ-মূর্তি' দেখায় গোপীগণের আগে ।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীনারায়ণের কি কথা! শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপিকাদের সঙ্গে পরিহাসের ছলে নারায়ণের রূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখে তাঁর প্রতি গোপিকাদের অনুরাগ হয়নি।

শ্লোক ১৫০

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ।
আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ১৫০ ॥

গোপীনাম্—গোপীদের; পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ—গোপরাজ নন্দমহারাজের পুত্রের সেবা; ভাবস্য—ভাবের; কঃ—কি; তাম্—তা; কৃতী—জ্ঞানী পুরুষ; বিজ্ঞাতুম্—হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; ক্ষমতে—সক্ষম; দুরূহ—দুর্বোধ্য; পদবী—পদ; সঞ্চারিণঃ—উদ্দীপক; প্রক্রিয়াম্—ক্রিয়াকলাপ; আবিষ্কুর্বতি—তিনি প্রকাশ করেছিলেন; বৈষ্ণবীম্—শ্রীবিষ্ণুর; অপি—অবশ্যই; তনুম্—রূপ; তস্মিন্—তাতে; ভুজৈঃ—বাহু; জিষ্ণুভিঃ—অত্যন্ত সুন্দর; যাসাম্—যাদের (গোপিকাদের); হন্ত—হায়; চতুর্ভিঃ—চার; অদ্ভুত—অপূর্ব সুন্দরভাবে; রুচিম্—সুন্দর; রাগ-উদয়ঃ—প্রেমভাবের উদয়; কুঞ্চতি—সঙ্কুচিত।

অনুবাদ

" একসময় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক সহকারে তাঁর অপূর্ব সুন্দর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি প্রকাশ করেন। অত্যন্ত সুন্দর সেই রূপ দর্শন করে কিন্তু গোপিকাদের অনুরাগ সঙ্কুচিত হয়। তাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভাবযুক্ত গোপিকাদের প্রেমের মহিমা বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম রস সমন্বিত গোপিকাদের ভাব সবচাইতে নিগূঢ় পারমার্থিক রহস্য।"

তাৎপর্য

এটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ললিত মাধব* নাটকে (৬/১৪) নারদ মুনির উক্তি।

শ্লোক ১৫১-১৫২

এত কহি' প্রভু তাঁর গর্ব চূর্ণ করিয়া ।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥ ১৫১ ॥

দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস ।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ব্যেঙ্কটভট্টের গর্ব খর্ব করে তাকে সুখ দেওয়ার জন্য সেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে তিনি ব্যেঙ্কটভট্টকে বললেন, "তুমি মনে দুঃখ পেয়ো না, এ সমস্ত কথা আমি তোমাকে পরিহাসছলে বললাম। এখন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শোন, যাতে বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন।

শ্লোক ১৫৩

কৃষ্ণ-নারায়ণ, যৈছে একই স্বরূপ ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণে কোন ভেদ নেই, কেন না তাঁরা একই স্বরূপ। তেমনই, গোপী এবং লক্ষ্মীতে কোন ভেদ নেই, কেন না তাঁরাও একরূপ।

শ্লোক ১৫৪

গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীদের মাধ্যমে লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করেন। ভগবানের বিভিন্নরূপে ভেদবুদ্ধি করলে অপরাধ হয়।

শ্লোক ১৫৫

এর ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের অপ্রাকৃত রূপে কোন ভেদ নেই। ভক্তের আসক্তি অনুসারে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান একই, কিন্তু তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্
আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনং চ

"ভগবান অদ্বৈত, অর্থাৎ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ এবং বিষ্ণুর রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা সকলেই এক। কখনও কখনও মূর্খ লোকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে' আমরা যে 'রাম' উচ্চারণ করি, তার দ্বারা কি আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করি, না বলরামকে সম্বোধন করি? কোন ভক্ত যদি বলে যে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে' রাম বলতে আমরা বলরামকে বুঝি, তখন সেই মূর্খ লোকেরা রেগে যায়। কেন না তাদের কাছে 'রাম' হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের নাম। প্রকৃতপক্ষে বলরাম এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হরে রাম বলতে বলরামকে সম্বোধন করা হোক অথবা রামচন্দ্রকেই সম্বোধন করা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না, কেননা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বলরামকে রামচন্দ্র থেকে শ্রেয় বলে মনে করা, অথবা রামচন্দ্রকে বলরাম থেকে শ্রেয় বলে মনে করা অপরাধ। কনিষ্ঠ ভক্তরা এই সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বোঝে না। তাই তারা একটি অপরাধজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেই তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—'ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ'। কিন্তু তাই বলে, ভগবানের রূপ এবং দেব-দেবীদের রূপ এক বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি অবশ্যই একটি মস্ত বড় অপরাধ। সেই সম্বন্ধে *বৈষ্ণব-তন্ত্রে* বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা এবং রুদ্র আদি দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী। অতএব, ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করা উচিত নয়। কিন্তু ভগবানকে দেব-দেবী অথবা মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়। যেমন, কখনও কখনও কিছু তত্ত্বজ্ঞানহীন সন্ন্যাসী 'দরিদ্র নারায়ণ' এবং 'লক্ষ্মীপতি নারায়ণ'কে সমপর্যায় ভুক্ত করে, তা অবশ্যই একটি অপরাধ। ভগবানের চিন্ময় রূপকে জড় বলে মনে করাও অপরাধ। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা না পেলে এই সমস্ত রূপের পার্থক্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *ব্রহ্মসংহিতায়* তাই বলা হয়েছে—*বেদেষু দুর্লভম্ অদুর্লভম্ আত্মভক্তৌ*। গ্রন্থাদি পাঠ করে, এমনকি বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেও ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না; তা কেবল তত্ত্বদ্রষ্টা ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে জানা যায়। তখনই কেবল ভগবানের রূপের সঙ্গে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এর সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু ভগবানের রূপের সঙ্গে বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপের পার্থক্য রয়েছে।

শ্লোক ১৫৬

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৫৬ ॥

মণিঃ—মণি, বিশেষ করে বৈদূর্যমণি; যথা—যেমন; বিভাগেন—ভিন্নভাবে; নীল—নীল; পীত—হলুদ; আদিভিঃ—ইত্যাদি অন্যান্য বর্ণ; যুতঃ—যুক্ত; রূপ-ভেদম্—বিভিন্নরূপ; অবাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়; ধ্যান-ভেদাৎ—উপাসনা ভেদে; তথা—তেমনই; অচ্যুতঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

" 'বৈদূর্যমণি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্পর্শে নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণ ধারণ করে, তেমনই ভক্তের ভাবনা অনুসারে উপাসনা ভেদে এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানও পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *নারদ-পঞ্চরাত্র* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৫৭-১৫৮

ভট্ট কহে,—কাঁহা আমি জীব পামর ।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ১৫৭ ॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যেঙ্কটভট্ট তখন বললেন, "কোথায় আমি এক অধঃপতিত জীব, আর তুমি শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত, তার কিছুই আমি জানি না। তুমি যা বল, তাই আমি সত্য বলে মানি।

তাৎপর্য

এইভাবেই ভগবত্তত্ত্ব জানতে হয়। *ভগবদ্গীতা* (১০-১৪) শোনার পর অর্জুনও প্রায় এইভাবেই বলেছিলেন—

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥

"হে কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা সবই আমি সত্য বলে গ্রহণ করি। দেব অথবা দানব কেউই তোমাকে যথাযথভাবে জানে না।"

ব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন। আমাদের যুক্তি-তর্ক বা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অর্জুন যেভাবে *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করেছিলেন, আমাদেরও তেমনভাবেই ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করতে হবে। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এই বৈদিক শাস্ত্রই জ্ঞানের উৎস। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরমতত্ত্বকে কখনও জানা যায় না।

শ্লোক ১৫৯

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে পূর্ণরূপে কৃপা করেছেন। তাঁদের কৃপার প্রভাবেই আমি তোমার শ্রীচরণকমল দর্শন করতে পেরেছি।

শ্লোক ১৬০

কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা ।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃপা করে তুমি আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেছ, যাঁর রূপ, গুণ, ঐশ্বর্যের সীমা কেউ খুঁজে পায় না।

শ্লোক ১৬১

এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি ।
কৃতার্থ করিলে, মোরে কহিলে কৃপা করি' ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আমি জানতে পারলাম যে, কৃষ্ণভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। সেই তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ করে তুমি আমাকে কৃতার্থ করলে।"

শ্লোক ১৬২

এত বলি' ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে ।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে ব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৬৩

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্ট-আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলে ব্যেঙ্কটভট্টের অনুমতি নিয়ে, শ্রীরঙ্গ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৬৪

সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট, না যায় ভবনে ।
তাঁরে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চললেন, তিনি তাঁর গৃহে ফিরে যেতে চাইলেন না। অনেক যত্ন করে বুঝিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বিদায় দিলেন।

শ্লোক ১৬৫

প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন ।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে ব্যেঙ্কটভট্ট অচেতন হয়ে পড়লেন। এইভাবে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৬

ঋষভ-পর্বতে চলি' আইলা গৌরহরি ।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি' ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

ঋষভ-পর্বতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের দর্শন করেছিলেন এবং প্রণতি নিবেদন করে ভগবানের স্তুতি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষভ-পর্বত (আনাগড়মলয়-পর্বত)—দক্ষিণ তামিলনাড়ুর মাদুরা জেলায় মাদুরা শহরের বারো মাইল উত্তরে অবস্থিত। কুটকাচলের উপবনে যেখানে ঋষভদেব দাবানল দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তা এখন 'পাল্‌নি হিল' নামে খ্যাত।

শ্লোক ১৬৭

পরমানন্দপুরী তাহাঁ রহে চতুর্মাস ।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে পরমানন্দপুরী ঋষভ-পর্বতে অবস্থান করছেন শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

শ্লোক ১৬৮

পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন ।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরীকে দর্শন করা মাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর চরণ-বন্দনা করলেন এবং পুরী গোসাঞি তাঁকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৬৯

তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে-একসঙ্গে ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

এক ব্রাহ্মণের গৃহে পরমানন্দপুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একত্রে তিনদিন ছিলেন, এবং কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণকথা আলোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭০

পুরী-গোসাঞি বলে,—আমি যাব পুরুষোত্তমে ।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য তিনি পুরুষোত্তমে যাবেন এবং তারপর গঙ্গাস্নান করার জন্য গৌড়ে যাবেন।

শ্লোক ১৭১

প্রভু কহে,—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে ।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বলেন, "আপনি পুনরায় নীলাচলে ফিরে আসবেন; আমিও শীঘ্রই রামেশ্বর (সেতুবন্ধ) থেকে সেখানে ফিরে যাব।

শ্লোক ১৭২

তোমার নিকটে রহি,—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয় ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার কাছে থাকতে আমার খুব ইচ্ছা করে। তাই আমার প্রতি দয়া করে নীলাচলে আপনি আসবেন।"

শ্লোক ১৭৩

এত বলি' তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরষিত হয়ে দক্ষিণে চললেন।

শ্লোক ১৭৪

পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে ।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী নীলাচলে চললেন আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে শ্রীশৈলে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—"এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কোন্ শ্রীশৈলের কথা বলেছেন তা বোঝা যায় না। এটি মল্লিকার্জুনের মন্দির নয়, যেহেতু ধারবাড়-জেলায় অবস্থিত শ্রীশৈল এটি নাও হতে পারে, তা বেলগ্রামের দক্ষিণে, সেখানে অনাদিলিঙ্গ 'মল্লিকার্জুন' (মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ, পনের শ্লোক) বিরাজমান; কথিত আছে যে সেই পর্বতে দেবীসহ মহাদেব বাস করতেন। সমস্ত দেবতাসহ ব্রহ্মাও সেখানে বাস করতেন।"

শ্লোক ১৭৫

শিব-দুর্গা রহে তাহাঁ ব্রাহ্মণের বেশে ।
মহাপ্রভু দেখি' দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে শিব এবং দুর্গা ব্রাহ্মণের বেশে বাস করতেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭৬

তিন দিন ভিক্ষা দিল করি' নিমন্ত্রণ ।
নিভৃতে বসি' গুপ্তবার্তা কহে দুই জন ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনদিন তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভিক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিভৃতে বসে তাঁরা দুইজন তাঁর সঙ্গে গোপনীয় বিষয় আলোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭৭

তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী ।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহাদেবের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামকোষ্ঠী পুরী গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭৮

দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে ।
তাহাঁ দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

কামকোষ্ঠী থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-মথুরায় গেলেন, এবং সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

তাৎপর্য

এই দক্ষিণ-মথুরা বর্তমানে মাদুরা নামে পরিচিত। তা ভাগাই-নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটি বিশেষ করে শৈবদের তীর্থ স্থান। এই স্থান পর্বত ও বনে পূর্ণ। এখানে 'রামেশ্বর' 'সুন্দরেশ্বর' ও 'মীনাক্ষীদেবী' আছেন। এই মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরটি সুবৃহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এই নগরী বহুকাল পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। মুসলমানদের আক্রমণে 'সুন্দরেশ্বর' মন্দিরের অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে কম্পন্ন উদৈর মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহু পূর্বের রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্মাণ করে এখানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনন্তগুণ পাণ্ড্য—সম্রাট কুলশেখরের একাদশ অধস্তন।

শ্লোক ১৭৯

সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ।
রামভক্ত সেই বিপ্র—বিরক্ত মহাজন ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বিপ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান রামভক্ত এবং বিষয়ে বিরক্ত মহাজন।

শ্লোক ১৮০

কৃতমালায় স্নান করি' আইলা তাঁর ঘরে ।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র,—পাক নাহি করে ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃতমালা নদীতে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, কিন্তু তিনি কি ভিক্ষা করবেন, তিনি গিয়ে দেখলেন যে সেই ব্রাহ্মণ রন্ধন পর্যন্ত করেননি।

শ্লোক ১৮১

মহাপ্রভু কহে তাঁরে,—শুন মহাশয় ।
মধ্যাহ্ন হৈল, কেনে পাক নাহি হয় ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, "মহাশয়, মধ্যাহ্ন হয়ে গেল অথচ আপনি এখনও পাক করেননি কেন?"

শ্লোক ১৮২

বিপ্র কহে,—প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি ।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ তখন উত্তর দিলেন, "প্রভু আমরা অরণ্যে বাস করি। আজকাল বনে রন্ধনের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্লোক ১৮৩

বন্য শাক-ফল-মূল আনিবে লক্ষ্মণ ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মণ যখন বনের শাক, ফল, মূল নিয়ে আসবে, তখন সীতাদেবী রন্ধন করবেন।"

শ্লোক ১৮৪

তাঁর উপাসনা শুনি' প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণের আন্তরিক উপাসনার পদ্ধতি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হলেন। অবশেষে সেই বিপ্র তাড়াতাড়ি রন্ধন করলেন।

শ্লোক ১৮৫

প্রভু ভিক্ষা কৈল দিনের তৃতীয়প্রহরে ।
নির্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

দিনের তৃতীয় প্রহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে সেই ব্রাহ্মণ উপবাসী রইলেন।

শ্লোক ১৮৬

প্রভু কহে,—বিপ্র কাঁহে কর উপবাস ।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেন উপবাস করছেন? আপনি কেন এত দুঃখ করছেন? আপনি কেন এভাবে হা-হুতাশ করছেন?"

শ্লোক ১৮৭

বিপ্র কহে,—জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন ।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ তখন উত্তর দিলেন, "আমার বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। অগ্নিতে অথবা জলে প্রবেশ করে আমি এ জীবন ত্যাগ করব।

শ্লোক ১৮৮

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী ।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে,—ইহা কানে শুনি ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সীতাদেবী সমগ্র জগতের মাতা, তিনি মহালক্ষ্মী, অথচ রাক্ষস রাবণ তাঁকে স্পর্শ করল এবং সেই কথা আমাকে কানে শুনতে হল।

শ্লোক ১৮৯

এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দুঃখে আমার জীবন ধারণ করার কোন বাসনা নেই। এই দুঃখে আমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে, অথচ এই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে না!"

শ্লোক ১৯০

প্রভু কহে,—এ ভাবনা না করিহ আর ।
পণ্ডিত হঞা কেনে না করহ বিচার ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, "দয়া করে এইভাবে আর দুঃখ করবেন না। আপনি পণ্ডিত, আপনি কেন যথাযথভাবে বিচার করছেন না?"

শ্লোক ১৯১

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্তি ।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, "সীতাদেবী, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রেয়সী, তাঁর মূর্তি সচ্চিদানন্দময়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে কেউ দর্শন করতে পর্যন্ত পারে না।

শ্লোক ১৯২

স্পর্শিবার কার্য আছুক, না পায় দর্শন ।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁকে স্পর্শ করা তো দূরে থাকুক, তাঁকে দর্শন পর্যন্ত কেউ করতে পারে না। সীতার মায়াময়ী আকৃতি রাবণ হরণ করেছিল।

শ্লোক ১৯৩

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্ধান কৈল ।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"রাবণ আসা মাত্রই সীতাদেবী অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে রাবণকে প্রতারণা করার জন্য তিনি তাঁর মায়াময়ী রূপ প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯৪

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়। সমস্ত বেদ এবং পুরাণে নিরন্তর এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে।"

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে (২/৩/৯,১২) বর্ণনা করা হয়েছে—

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্লিপ্তো য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

"চিন্ময় বস্তু জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। জড় চক্ষুর দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় না, জড় মনের দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না, জড় কলুষিত হৃদয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৪/১৩) বলা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে ব্যক্তি কফ-পিত্ত-বায়ু বিশিষ্ট শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পরিবার আদিতে মমত্ববুদ্ধি, জন্মভূমিকে পূজ্যবুদ্ধি করে, তীর্থে স্নান করতে যায়, অথচ চিন্ময় জ্ঞান সম্পন্ন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে না, সে গাধার মতো অতিশয় নির্বোধ।"

নির্বোধ মানুষেরা চিন্ময় বস্তু দর্শন করতে পারে না, কেননা তাদের চিন্ময় বস্তুর দর্শন করার চক্ষু নেই অথবা মনোবৃত্তি নেই। তাই তারা মনে করে আত্মা বলে কিছু নেই। কিন্তু, বেদের অনুগামী বুদ্ধিমান মানুষেরা বেদ থেকে তাদের তথ্য সংগ্রহ করেন। যেভাবে তা এখানে *কঠোপনিষদ* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* শ্লোকে বিশ্লেষিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯৫

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে ।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে বললেন, "আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন এবং আর কখনও এভাবে দুর্ভাবনা করবেন না।"

তাৎপর্য

এইটিই চিন্ময় পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা। *অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।* "যা আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত, তর্কের দ্বারা কখনও তা জানা যায় না।" *মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ*—মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার একমাত্র পন্থা। ভগবত্তত্ত্ববেত্তা পূর্বতন আচার্যেরাই হচ্ছেন মহাজন। যথার্থ আচার্যের শরণাগত হয়ে তাঁর বাণীতে বিশ্বাস পরায়ণ হয়ে, তাঁর অনুগামী হলেই সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১৯৬

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস ।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় সেই ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হল। তিনি তখন ভোজন করলেন এবং জীবন ত্যাগ করার বাসনা পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে তার জীবন রক্ষা পেল।

শ্লোক ১৯৭

তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্বশন ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করলেন, এবং কৃতমালায় স্নান করে দুর্বশন নামক তীর্থে এলেন।

তাৎপর্য

বর্তমানে কৃতমালা-নদী বৈগাই বা ভাগাই নদীর একটি অববাহিকা; সুরুলী, বরাহ-নদী ও বট্টিল্ল-গুণ্ডু—এই তিনটি ধারা ভাগাই নদীতে এসে পড়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩৯) কৃতমালা-নদীর উল্লেখ করে করভাজন মুনি বলেছেন—*তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।*

শ্লোক ১৯৮

দুর্বশনে রঘুনাথে কৈল দরশন ।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

দুর্বশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামচন্দ্রের মন্দির দর্শন করলেন এবং মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামের বন্দনা করলেন।

তাৎপর্য

দুর্বশন বা দর্ভশয়নের বর্তমান নাম তিরুপুল্লনি। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মন্দির আছে। রামনাদ থেকে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রের উপকূলে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মহেন্দ্র-শৈল নামক পর্বত তিরুনেভেলি বা তিনেভেলির নিকট অবস্থিত। এই পর্বতের প্রান্তে ত্রিচিনগুড়ি বা তিরুচেণ্ডুর নামক নগর রয়েছে। তার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য। *রামায়ণে* মহেন্দ্র-শৈলের উল্লেখ আছে।

শ্লোক ১৯৯

সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান ।
রামেশ্বর দেখি' তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামেশ্বর সেতুবন্ধে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধনুস্তীর্থে স্নান করলেন। সেখানে রামেশ্বর মন্দির দর্শন করে তিনি বিশ্রাম করলেন।

তাৎপর্য

মণ্ডপম ও পম্বম দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময় এবং কতকাংশ জলমগ্ন পথ রয়েছে। পম্বম দ্বীপ দৈর্ঘ্যে এগারো মাইল ও প্রস্থে ছয় মাইল। পম্বম বন্দর থেকে চার মাইল উত্তরে রামেশ্বর মন্দির। নির্দেশ আছে—*দেবীপত্তনমারভ্য গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্*—"দুর্গাদেবীর মন্দির দর্শন করে রামেশ্বর মন্দিরে যাওয়া উচিত।"

এই স্থানে চব্বিশটি তীর্থ আছে; তার মধ্যে ধনুষকোটি তীর্থ বা ধনুষতীর্থ অন্যতম। তা রামেশ্বর থেকে বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। দক্ষিণ রেলওয়ে লাইনের শেষ স্টেশন রামনাদের সন্নিকটে এই স্থান অবস্থিত। কথিত আছে যে, এখানে বিভীষণের অনুরোধে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকের কোটি দ্বারা সেতুভঙ্গ করেন। এই ধনুস্তীর্থ দর্শন করলে পুনর্জন্ম হয় না, ধনুস্তীর্থে স্নান করলে অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞের থেকে অধিক ফল লাভ হয়। পম্বম তটস্থ সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিবমূর্তি, অর্থাৎ 'রাম যার ঈশ্বর'—এইরূপ ভক্তাবতার শিবের মূর্তি আছে।

শ্লোক ২০০

বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম-পুরাণ ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে ব্রাহ্মণদের সভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কূর্ম-পুরাণ শ্রবণ করলেন। তার মধ্যে পতিব্রতা উপাখ্যান শুনলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান কালে *কূর্ম-পুরাণের* কেবলমাত্র পূর্ব ও উত্তর এই দুটি খণ্ড পাওয়া যায়। বর্তমান *কূর্ম-পুরাণে* কেবল ছয় হাজার শ্লোক রয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *কূর্ম-পুরাণে* সতের হাজার শ্লোক ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে—

তৎ সপ্তদশসাহস্রং চতুঃসংহিতং শুভম্ ।
সপ্তদশসহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্ ॥

এই *কূর্ম-পুরাণ* অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম পঞ্চদশ পুরাণ, তাতে এরকম সতের হাজার শ্লোক রয়েছে।

শ্লোক ২০১

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী ।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

সীতাদেবী, জগতের মাতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের গৃহিণী। তিনি পতিব্রতাদের শিরোমণি এবং মহারাজ জনকের দুহিতা।

শ্লোক ২০২

রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

রাবণ যখন সীতাদেবীকে হরণ করতে আসে, তখন রাবণকে দেখে তিনি অগ্নিদেবের শরণ গ্রহণ করেন। অগ্নিদেব তখন সীতাদেবীকে আবৃত করেন, এবং এইভাবে তিনি রাবণের হাত থেকে সীতাদেবীকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২০৩

'মায়াসীতা' রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে ।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

কূর্ম পুরাণে রাবণের এইভাবে 'মায়াসীতা' হরণের উপাখ্যান শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ২০৪

সীতা লঞা রাখিলেন পার্বতীর স্থানে ।
'মায়াসীতা' দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

অগ্নিদেব সীতাদেবীকে নিয়ে পার্বতীর কাছে রাখলেন এবং 'মায়াসীতা' দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করলেন।

শ্লোক ২০৫-২০৬

রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল ।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ২০৫ ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্ধান ।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামচন্দ্র এসে যখন রাবণকে বধ করলেন এবং অগ্নি-পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সীতাদেবীকে আনা হল, তখন মায়াসীতাকে অন্তর্হিত করে অগ্নিদেব রামচন্দ্রের কাছে প্রকৃত সীতাকে এনে দিলেন।

শ্লোক ২০৭

শুনিঞা প্রভুর আনন্দিত হৈল মন ।
রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আখ্যান শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহা আনন্দ হল, এবং তখন তাঁর রামদাস বিপ্রের কথা মনে পড়ল।

শ্লোক ২০৮

এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আনন্দ হল এবং সেই ব্রাহ্মণের কাছে তিনি পুঁথিটি চেয়ে নিলেন।

শ্লোক ২০৯

নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল ।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পুঁথিটি লিখিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতিলিপিটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুরাতন পুঁথিটি তিনি চেয়ে নিলেন, যাতে রামদাস বিপ্রের মনে কোন সংশয় না থাকে।

শ্লোক ২১০

পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা ।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস বিপ্রকে সেই পুঁথিটি দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার দক্ষিণ মথুরায় ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২১১-২১২

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ ২১১ ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা ।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ ২১২ ॥

সীতয়া—সীতাদেবীর দ্বারা; আরাধিতঃ—আরাধিত হয়ে; বহ্নিঃ—অগ্নিদেব; ছায়া-সীতাম্—সীতাদেবীর মতো মায়াময়ী মূর্তি ; অজীজনৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; তাম্—তাকে; জহার—হরণ করেছিল; দশগ্রীবঃ—দশমুখ রাবণ; সীতা—সীতাদেবী; বহ্নি-পুরম্—বহ্নিদেবের আলয়ে; গতা—গমন করেছিলেন; পরীক্ষা-সময়ে—অগ্নি-পরীক্ষার সময়; বহ্নিম্—অগ্নিতে; ছায়াসীতা—মায়াসীতা; বিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন; সা—তিনি; বহ্নিঃ—অগ্নিদেব; সীতাম্—মূল সীতাদেবীকে; সমানীয়—নিয়ে এসে; তৎ-পুরস্তাৎ—তার সামনে; অনীনয়ৎ—নিয়ে এসেছিলেন।

অনুবাদ

"সীতাদেবী কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে অগ্নিদেব 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করেছিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করেছিলেন; মূলসীতা বহ্নিপুরে রইলেন। অগ্নি-পরীক্ষার সময় ছায়াসীতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং অগ্নিদেব মূল সীতাকে নিয়ে এসে রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটি *কূর্ম-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২১৩

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পুঁথি পেয়ে রামদাস বিপ্রের মনে মহা আনন্দ হল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২১৪

বিপ্র কহে,—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দরশন ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন, "তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে আমাকে দর্শন দিলে।

শ্লোক ২১৫

মহা-দুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মহা-দুঃখ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। আজ তুমি আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ কর।

শ্লোক ২১৬

মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে ।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলুঁ দরশনে ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মনোদুঃখে আমি সেদিন তোমাকে ভালভাবে ভিক্ষা দিতে পারিনি। আজ আমার মহা সৌভাগ্যের ফলে, পুনরায় তোমার দর্শন পেলাম।"

শ্লোক ২১৭

এত বলি' সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল ।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে সেই ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে রন্ধন করলেন, এবং মহাপ্রভুকে উত্তমভাবে ভিক্ষা করালেন।

শ্লোক ২১৮

সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' তাঁরে কৃপা করি' ।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করলেন। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে কৃপা করে গৌরহরি পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণীতে গেলেন।

তাৎপর্য

পাণ্ড্যদেশ—দক্ষিণ ভারতের 'কেরল' ও 'চোল' রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি 'পাণ্ড্য' উপাধিধারী রাজা মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজত্ব করেন। *রামায়ণে* তাম্রপর্ণীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রপর্ণীর আর এক নাম 'পুরুণৈ' এবং তা তিনেভেলি নদীর বাম তটে অবস্থিত। এই নদীটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে নির্গত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১১/৫/৩৯) তাম্রপর্ণীর উল্লেখ রয়েছে।

শ্লোক ২১৯

তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী-তীরে ।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাম্রপর্ণী নদীর তীরে 'নয় ত্রিপতি' নামক একটি বিষ্ণুমন্দির রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীতে স্নান করে সেই বিগ্রহ দর্শন করে গভীর কৌতূহল সহকারে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

নয় ত্রিপতি (নব তিরুপতি) 'আলোবর তিরু নগরী' নামেও পরিচিত। এই নগরটি তিনেভেলি থেকে সতের মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এর চতুর্দিকে নয়টি শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির রয়েছে। নয়টি বিগ্রহই পর্ব উপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন।

শ্লোক ২২০

চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
তিলকাঞ্চী আসি' কৈল শিব দরশন ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

চিয়ড়তলা তীর্থে শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিলকাঞ্চীতে এসে শিবের দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

চিয়ড়তলাকে কখনও কখনও ছেরতলা বলা হয়। এই স্থানটি কৈল শহরের নিকটে এবং সেখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মন্দির আছে। তিলকাঞ্চী (তেনকাসি) তিনেভেলি শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

শ্লোক ২২১

গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি ।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি' দেখিল সীতাপতি ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানাগড়ি-তীর্থে এসে সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

গজেন্দ্রমোক্ষণ মন্দিরকে ভুল করে কেউ কেউ শিবমন্দির বলে মনে করেন। এই মন্দিরটি কৈবের (নাগেরকৈল) শহর থেকে প্রায় দুমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এই বিগ্রহ শিব-বিগ্রহ নয়, বিষ্ণু-বিগ্রহ। পানাগড়ী (পানাকুড়ি) তিনেভেলি শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্বে এই মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ ছিল। পরে শৈবগণ তাকে 'রামলিঙ্গ শিব' বলে পূজা করে আসছেন।

শ্লোক ২২২

চাম্‌তাপুরে আসি' দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি' কৈল বিষ্ণু দরশন ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

চাম্‌তাপুরে এসে তিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণের-বিগ্রহ দর্শন করেন। তারপর শ্রীবৈকুণ্ঠে এসে তিনি বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

এই চাম্‌তাপুর ত্রিবাঙ্কুর (কেরালা) রাজ্যের অন্তর্গত 'চেঙ্গানুর'। এখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মন্দির আছে। শ্রীবৈকুণ্ঠ—আলোয়ার তিরুনগরী থেকে চার মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলি থেকে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর বামতটে অবস্থিত।

শ্লোক ২২৩

মলয়-পর্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন ।
কন্যাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর মলয়-পর্বতে যান এবং সেখানে অগস্ত্যমুনির বন্দনা করেন। তারপর সেখান থেকে কন্যাকুমারীতে যান।

তাৎপর্য

মলয়-পর্বত—দাক্ষিণাত্যের কেরল থেকে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা। 'অগস্ত্য' সম্বন্ধে চারটি মত আছে—১) তাঞ্জোর জেলায় কলিমিয়ার পয়েন্টে বেদারণ্যমের কাছে অগস্ত্যম্‌পল্লী-গ্রামে একটি অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে; ২) মাদুরা জেলায় শিবগিরি পর্বতের শিখরে অগস্ত্য মুনির নির্মিত একটি সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের)

মন্দির আছে। ৩) কেউ কেউ কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী পঠিয়া পর্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন; ৪) তাম্রপর্ণীর উভয় পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটি 'অগস্ত্য-মলয়' নামে কথিত। কন্যাকুমারী—কুমারিকা অন্তরীপ।

শ্লোক ২২৪

আম্‌লিতলায় দেখি' শ্রীরাম গৌরহরি ।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

কন্যাকুমারী দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আম্‌লিতলায় শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন। তারপর তিনি মল্লার দেশে যান, সেখানে ভট্টথারি নামক এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকেরা বাস করত।

তাৎপর্য

মল্লার দেশের বর্তমান নাম মালাবার দেশ। তার উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া, পূর্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর। ভট্টথারি একপ্রকার যাযাবর সম্প্রদায়, এদের ঘর-দোর নেই। এদের ইচ্ছামতো যেখানে যখন থাকে, সেখানে 'সিরকি' অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। এরা বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করে, কিন্তু এদের আসল ব্যবসা হল চুরি করা এবং প্রতারণা করা। তারা অনেক অনেক স্ত্রীলোককে প্রতারণা করে তাদের সিরকিতে রাখে এবং অন্য লোককে স্ত্রীলোক দেখিয়ে ভুলিয়ে তাদের দল বাড়ায়। বঙ্গদেশেও এরকম সম্প্রদায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই যাযাবর সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের প্রকৃত ব্যবসা হচ্ছে প্রতারণা করা, লোক ভোলান এবং স্ত্রীলোক চুরি করা।

শ্লোক ২২৫

তমাল-কার্তিক দেখি' আইল বেতাপনি ।
রঘুনাথ দেখি' তাহাঁ বঞ্চিলা রজনী ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তমাল-কার্তিক দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বেতাপনি নামক স্থানে এলেন এবং সেখানে রামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করে রাত্রি যাপন করলেন।

তাৎপর্য

তমাল-কার্তিক—তিনেভেলির চুয়াল্লিশ মাইল দক্ষিণে এবং অরমবল্লী পর্বত থেকে দুই মাইল দক্ষিণে, তোবল-তালুকে অবস্থিত সুব্রহ্মণ্য বা কার্তিকের একটি মন্দির। বেতাপনি বা 'বাতাপাণী' ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, নগর কৈলের উত্তরে তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্বে শ্রীমন্দিরে রামচন্দ্র-বিগ্রহ ছিলেন। পরে বোধ হয় রামেশ্বর বা ভূতনাথ শিবলিঙ্গ নামে পূজিত হচ্ছেন।

শ্লোক ২২৬

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ।
ভট্টথারি-সহ তাহাঁ হৈল দরশন ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ-ভৃত্য ছিলেন। ভট্টথারিদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।

শ্লোক ২২৭

স্ত্রীধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল ।
আর্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভট্টথারিরা স্ত্রীধন দেখিয়ে সরল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের চিত্তে লোভ জন্মিয়ে তার বুদ্ধিনাশ করল।

শ্লোক ২২৮

প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে ।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ভট্টথারিদের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে প্রাতঃকালে কৃষ্ণদাস তাদের কাছে আসে। তাকে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শীঘ্র সেখানে এসে উপস্থিত হন।

শ্লোক ২২৯

আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে ।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভট্টথারিদের কাছে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বলেন, "তোমরা কেন আমার ব্রাহ্মণ সহকারীকে তোমাদের কাছে রেখে দিয়েছ?

শ্লোক ২৩০

আমিহ সন্ন্যাসী দেখ, তুমিহ সন্ন্যাসী ।
মোরে দুঃখ দেহ,—তোমার 'ন্যায়' নাহি বাসি' ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

আমিও সন্ন্যাসী এবং তোমরাও সন্ন্যাসী। কিন্তু তথাপি তোমরা আমাকে দুঃখ দিচ্ছ, এর কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আমি দেখি না।"

শ্লোক ২৩১

শুনি সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা ।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথা শুনে সমস্ত ভট্টথারিরা অস্ত্র নিয়ে তাঁকে মারবার জন্য চারদিক থেকে ধেয়ে এল।

শ্লোক ২৩২

তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে ।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু তাদের অস্ত্র তাদের হাত থেকে পড়ে তাদেরই দেহকে আঘাত করতে লাগল। এইভাবে যখন কয়েকটি ভট্টথারির দেহ খণ্ড খণ্ড হল, তখন অন্য সকলে চারদিকে পালাতে শুরু করল।

শ্লোক ২৩৩

ভট্টথারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন ।
কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা করিল গমন ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন ভট্টথারিদের ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চুলে ধরে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ২৩৪

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে ।
স্নান করি' গেল আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেইদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পয়স্বিনী-নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন, এবং নদীতে স্নান করে আদিকেশবের মন্দিরে গেলেন।

শ্লোক ২৩৫

কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা ।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত, বহুত করিলা ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

আদিকেশবের বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন, এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে, স্তুতি করে, বহু নৃত্য-গীত করলেন।

শ্লোক ২৩৬

প্রেম দেখি' লোকে হৈল মহা-চমৎকার ।
সর্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবৎ-প্রেম দর্শন করে সেখানে সমবেত সমস্ত মানুষেরা অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন, এবং সকলে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

শ্লোক ২৩৭

মহাভক্তগণসহ তাহাঁ গোষ্ঠী কৈল ।
'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি তাহাঁ পাইল ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

আদিকেশবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহান ভক্তদের সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করলেন এবং সেখানে তিনি ব্রহ্ম-সংহিতার একটি অধ্যায় পেলেন।

শ্লোক ২৩৮

পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ।
কম্পাশ্রু-স্বেদ-স্তম্ভ-পুলক বিকার ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই পুঁথিটি পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হল এবং কম্প, অশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ, পুলক আদি ভগবৎ-প্রেমের সাত্ত্বিক বিকারসমূহ তাঁর শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হল।

শ্লোক ২৩৯-২৪০

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম ।
গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ ॥ ২৩৯ ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্ম-সংহিতার মতো সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আর নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই শাস্ত্রটি গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের চরম প্রকাশ; কারণ তাতে অতি অল্প কথায় পরমতত্ত্ব সর্বোত্তমরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু সমস্ত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে ব্রহ্ম-সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে, তাই তা সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাতিসার।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *ব্রহ্ম-সংহিতার* পঞ্চম অধ্যায় আদিকেশব মন্দির থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এই পঞ্চম অধ্যায়ে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, পরমাত্মা, সকাম কর্ম, কাম গায়ত্রী, কামবীজ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, কৃষ্ণধামের চিৎ-বৈশিষ্ট্য, গণেশ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, গায়ত্রীর উৎপত্তি, গোকুল, গোবিন্দের রূপ, স্বরূপতত্ত্ব ও ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্য স্বরূপ, দুর্গা, তপঃ, পঞ্চভূত, প্রেম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তিচক্ষু, ভক্তিসোপান, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্তি, রামাদি অবতার, শ্রীবিগ্রহ, বদ্ধজীব, তার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, বেদসার স্তব, শম্ভু, বৈদিক শাস্ত্র, স্বকীয়, পারকীয়, সদাচার, সূর্য ও হৈমাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৪১

বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া ।
'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হরষিত হঞা ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

বহু যত্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্ম-সংহিতার প্রতিলিপি লিখিয়ে নিলেন, তারপর হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তিনি 'অনন্ত-পদ্মনাভ' নামক পীঠস্থানে গেলেন।

তাৎপর্য

অনন্ত-পদ্মনাভ সম্বন্ধে মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের একশ পনের শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ২৪২

দিন-দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন ।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দন ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু-তিনদিন এখানে থেকে অনন্ত-পদ্মনাভের দর্শন করলেন, এবং তারপর মহা আনন্দে তিনি শ্রীজনার্দন মন্দির দর্শন করতে গেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীজনার্দন মন্দির ত্রিবান্দ্রমের ছাব্বিশ মাইল উত্তরে, বর্কালা রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত।

শ্লোক ২৪৩

দিন-দুই তাহাঁ করি' কীর্তন-নর্তন ।
পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে দিন দুই নৃত্য কীর্তন করে তিনি পয়স্বিনী নদীর তীরে শঙ্কর-নারায়ণ মন্দির দর্শন করলেন।

শ্লোক ২৪৪

শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে ।
মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে তিনি শঙ্করাচার্যের স্থান শৃঙ্গেরি মঠে এলেন। তারপর মৎস্যতীর্থ দর্শন করে তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান করলেন।

তাৎপর্য

শৃঙ্গেরি মঠ, মহীশূরের (কর্ণাটক রাজ্যের) অন্তর্গত শিমোগা (চিকমাগালুর) জেলায়, তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম তটে এবং হরিহরপুরের সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানের প্রকৃত নাম (ঋষ্য) শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এখানে দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য তার চারজন শিষ্যের দ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকাশ্রমে জ্যোতির মঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্ধন বা গোবর্ধন মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ এবং দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরী মঠে 'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী'—এই ত্রিবিধ সন্ন্যাস উপাধি দেওয়া হয়। এরা সকলে একদণ্ড সন্ন্যাসী। এই মঠের আম্নায় অর্থাৎ মঠের নাম—শৃঙ্গেরি, দিক্—দক্ষিণ; দেশ—অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি; সম্প্রদায়—ভূরিবার, গোত্র—ভুর্ভুবঃ; ক্ষেত্র—রামেশ্বর; মহাবাক্য বা বোধ—'অহং ব্রহ্মাস্মি'; দেব—বরাহ; শক্তি—কামাক্ষী; আচার্য—হস্তামূলক; সন্ন্যাসপদবী—'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী'; ব্রহ্মচারী—চৈতন্য; তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা; বেদ—যজুর্বেদ।

শৃঙ্গেরি মঠের গুরু ও সন্ন্যাসগ্রহণ-কাল-পরম্পরা,—যথা, ১) শঙ্করাচার্য—৬২২ শকাব্দ, ২) সুরেশ্বরাচার্য,—৬৩০ শকাব্দ, ৩) বোধনাচার্য—৬৮০ শকাব্দ, ৪) জ্ঞানধনাচার্য,—৭৬৮ শকাব্দ, ৫) জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য,—৮২৭ শকাব্দ, ৬) জ্ঞানগিরি আচার্য—৮৭১ শকাব্দ, ৭) সিংহগিরি আচার্য—৯৫৮ শকাব্দ, ৮) ঈশ্বর তীর্থ—১০১৯ শকাব্দ, ৯) নরসিংহ তীর্থ—১০৬৭ শকাব্দ, ১০) বিদ্যাতীর্থ বিদ্যাশঙ্কর—১১৫০ শকাব্দ, ১১) ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ—১২৫০ শকাব্দ, ১২) বিদ্যারণ্য ভারতী—১২৫৩ শকাব্দ, ১৩) চন্দ্রশেখর ভারতী—১২৯০ শকাব্দ, ১৪) নরসিংহ ভারতী—১৩০৯ শকাব্দ, ১৫) পুরুষোত্তম ভারতী—১৩২৮ শকাব্দ, ১৬) শঙ্করানন্দ—১৩৫০ শকাব্দ, ১৭) চন্দ্রশেখর ভারতী—১৩৭১ শকাব্দ,

১৮) নরসিংহ ভারতী—১৩৮৬ শকাব্দ, ১৯) পুরুষোত্তম ভারতী—১৩৯৮ শকাব্দ, ২০) রামচন্দ্র ভারতী—১৪৩০ শকাব্দ, ২১) নরসিংহ ভারতী—১৪৭৯ শকাব্দ, ২২) নরসিংহ ভারতী—১৪৮৫ শকাব্দ, ২৩) ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী—১৪৯৮ শকাব্দ, ২৪) অভিনব নরসিংহ ভারতী—১৫২১ শকাব্দ, ২৫) সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৫৪৪ শকাব্দ, ২৬) নরসিংহ ভারতী—১৫৮৫ শকাব্দ, ২৭) সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬২৭ শকাব্দ, ২৮) অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৬৩ শকাব্দ, ২৯) নৃসিংহ ভারতী—১৬৮৯ শকাব্দ, ৩০) সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৯২ শকাব্দ, ৩১) অভিনব সচিদানন্দ ভারতী—১৭৩০ শকাব্দ, ৩২) নরসিংহ ভারতী—১৭৩৯ শকাব্দ, ৩৩) সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব বিদ্যা নরসিংহ ভারতী—১৭৮৮ শকাব্দ।

দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশে 'কালাডি' নামক গ্রামে ৬০৮ শকাব্দে বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়ায় শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম 'শিবগুরু'। শৈশবকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। আট বছর বয়স উত্তীর্ণ হতে না হতেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করে নর্মদা তীরে 'গোবিন্দের' কাছে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে কিছুদিন গোবিন্দের কাছে থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি বারাণসী গমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি বদরিকাশ্রমে গিয়ে বারো বছর বয়সে *ব্রহ্ম-সূত্রের* একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে দশটি *উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা, সনৎসুজাতীয়* ও *নৃসিংহতাপনী* প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষ্য রচনা করেন।

শঙ্করাচার্যের শিষ্যদের মধ্যে 'পদ্মপাদ', 'সুরেশ্বর', 'হস্তামলক' ও 'ত্রোটক'—এই চারজন প্রধান। শঙ্করাচার্য বারাণসী থেকে প্রয়াগে গমন করে কুমারিল ভট্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুমারিল ভট্ট মুমূর্ষু থাকাকালে, তাদের সঙ্গে নিজে বিচার না করে তার প্রধান শিষ্য 'মণ্ডন মিশ্রের' কাছে মাহিষ্মতী-নগরে তাকে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্মিনী 'সরস্বতী' বা উভয়ভারতী, তাদের বিচারের সময় মধ্যস্থা ছিলেন। কথিত আছে, তিনি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে কামশাস্ত্র বিষয়ক বিচার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শঙ্করাচার্য আকুমার ব্রহ্মচারী, সুতরাং কামশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি উভয়ভারতীর কাছে একমাস সময় নিয়ে যোগবলে একটি সদ্য মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করে অভীপ্সিত বিষয়ে অনুধাবন করেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে উভয়ভারতীর কাছে এসে বিচার প্রার্থনা করেন। তিনি আর বিচার না করে শঙ্করাচার্যের প্রার্থনা অনুসারে, তাঁর শৃঙ্গেরি মঠে অচলা থাকবেন, এই বর দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নেন। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বর নামে খ্যাত হন। শঙ্করাচার্য ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিভ্রমণ করে নানা মতাবলম্বী লোকদের বিচারে পরাস্ত করে স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি তেত্রিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৎসতীর্থ সম্ভবতঃ মালাবার জেলার সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত বর্তমান 'মাহে' নগর।

শ্লোক ২৪৫

মধ্বাচার্য-স্থানে আইলা যাঁহা 'তত্ত্ববাদী'।
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি, তাহাঁ হৈল প্রেমোন্মাদী ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উড়ুপীতে শ্রীমধ্বাচার্যের স্থানে এলেন, যেখানে 'তত্ত্ববাদী' দার্শনিকেরা বাস করতেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন করে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর, তার উত্তরে উড়ুপী। উড়ুপী গ্রামে পাজকা-ক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণ-কুলে 'মধ্যগেহ' ভট্ট এবং 'বেদবিদ্যার' পুত্ররূপে ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে শ্রীমধ্বাচার্য জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে মধ্বাচার্য 'বাসুদেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি অলৌকিক আখ্যায়িকা রয়েছে। কথিত আছে যে, তাঁর পিতার বেশ কিছু ঋণ হয় এবং মধ্বাচার্য তেঁতুল বীজকে মুদ্রায় পরিণত করে, তা দিয়ে তার পিতার ঋণ শোধ করেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। *মহাভারতে* কথিত 'মণিমান' নামক অসুর সর্পের আকার ধারণ করে সেখানে বাস করত। উপনয়নের পরেই 'বাসুদেব' তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের দ্বারা সেই সর্পটিকে সংহার করেন। তাঁর মা যখন তাঁর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্না হতেন, তখন তিনি যেখানেই থাকতেন সেখান থেকে এক লাফ দিয়ে তিনি তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত হতেন। সেই সময় বিদ্যা অর্জনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি 'অচ্যুতপ্রেক্ষে'র কাছে বারো বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ'—নাম লাভ করেন। দক্ষিণ ভারতের নানা দেশ পর্যটনের পর শৃঙ্গেরী মঠাধীপ বিদ্যাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্কর মধ্বাচার্যের কাছে পরাজিত হন এবং তাঁর অতি উচ্চস্থান মধ্বাচার্যের কাছে অবনত হয়। 'সত্যতীর্থ' নামক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মধ্বাচার্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি শ্রীল ব্যাসদেবকে *গীতার-ভাষ্য* শ্রবণ করিয়ে তাঁর সম্মতি গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

বদরিকাশ্রম থেকে আনন্দ-মঠে প্রত্যাবর্তন করার সময়ে শ্রীমধ্বাচার্যের সূত্রের ভাষ্য রচনা শেষ হয়; সত্যতীর্থ তা লিখে দেন। শ্রীমধ্বাচার্য বদরিকাশ্রম থেকে গঞ্জামে গোদাবরী-প্রদেশে গমন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে 'শোভন ভট্ট' ও 'স্বামী-শাস্ত্রী' নামক দুইজন পণ্ডিতের মিলন হয়। তারাই শ্রীমধ্ব-পরম্পরায় 'পদ্মনাভ তীর্থ' ও 'নরহরি তীর্থ' নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে ফিরে এসে তিনি একদিন সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার সময় পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হয়ে বালুর উপরে বসে দেখলেন, দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একটি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হয়েছে। নৌকাটিকে বালুকায় প্রোথিত হতে দেখে নৌকা ভাসাবার উদ্দেশ্যে তিনি মুদ্রা প্রদর্শন করেন, তাতে নৌকাখানি তীরে আসতে সমর্থ হয়। নাবিকেরা তাঁকে কিছু দিতে চাইলে, তিনি নৌকা থেকে কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড গ্রহণ করে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন 'বড় বন্দেশ্বর'-নামক স্থানে সেটি

ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর মধ্যে একটি সুন্দর 'বালকৃষ্ণ'-মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তির এক হাতে একটি দধি-মন্থন দণ্ড, অপর হাতে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণ লাভ হলে তার দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সাতটি অধ্যায় সেই দিনই রচিত হয়। ত্রিশজন বলবান লোক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিটিকে তুলতে অক্ষম হওয়ায় মধ্বাচার্য স্বয়ং মাধবকে তুলে উড়ুপীতে—তাঁর মঠে নিয়ে যান। তাঁর আটজন প্রধান শিষ্য-সন্ন্যাসী উড়ুপীর অষ্টম মঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দাবনের অষ্টসখীরা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, ঠিক সেইভাবে শ্রীমধ্বাচার্য স্বয়ং এই বালকৃষ্ণের সেবা করেন, তারপর উত্তর রাঢ়ী মঠের অষ্ট-মঠাধিপ সন্ন্যাসীগণ ঐ সেবাকার্য একইভাবে পর পর চালিয়েছিলেন—তা আজও চলছে।

শ্রীমধ্বাচার্য দ্বিতীয়বার বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেছিলেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার 'মহাদেব'-নামক রাজা জনসাধারণের উপকারার্থে একটি বিরাট দিঘি খনন করিয়েছিলেন। রাজার আদেশে শ্রীমধ্বাচার্য তার শিষ্যসহ সেই মৃত্তিকা খনন-কার্যে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর মধ্বাচার্য সেই রাজাকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করিয়ে তাঁর শিষ্য সহ তিনি সেখান থেকে চলে যান।

গাঙ্গ প্রদেশের একপারে হিন্দু রাজ্য এবং অপর পারে মুসলমান রাজ্যের মধ্যে বিবাদ এত প্রবল হয়েছিল যে, পারে যাওয়ার নৌকা পাওয়া গেল না, কেননা সেই বিশাল নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনারা সর্বদা বাধা দিচ্ছিল। শ্রীমধ্বাচার্য সেই সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে সাঁতার কেটে নদী পার হন। কিন্তু তীরে উঠলে মুসলমান সৈন্য কর্তৃক নিপীড়িত হন। রাজার আদেশ অমান্য করায় তিনি স্বয়ং রাজার কাছে উপস্থিত হন। তখন সেই মুসলমান রাজা তাঁর প্রতি এতই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে অর্ধরাজ্য দান করতে চান। কিন্তু মধ্বাচার্য তা প্রত্যাখ্যান করেন। পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন দস্যু তাঁকে আক্রমণ করে, কিন্তু ভীমবলে মধ্বাচার্য তাদের সকলকে সংহার করেন। 'সত্যতীর্থ' বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হলে মধ্বাচার্য সেই বাঘটিকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করে বিদূরিত করেন। ব্যাসদেবের সঙ্গে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর কাছ থেকে অষ্টমূর্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। তার পরেই তিনি *মহাভারতের* তাৎপর্য রচনা করেন।

শ্রীল মধ্বাচার্যের অনেক পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তির কথা ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হল। তখন শৃঙ্গেরি মঠের অধিপতি শঙ্করাচার্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বীরা তাদের মাহাত্ম্য খর্ব হতে দেখে মধ্বাচার্য ও তাঁর অনুগামীদের নির্যাতন করতে শুরু করেন। মাধ্ব-মতাবলম্বীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল এবং মাধ্ব-মত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলে প্রতিপাদন করার চেষ্টা শুরু করল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীক পুরী নামক জনৈক শাঙ্কর-মতবাদী পণ্ডিতকে নিয়ে তারা মধ্বাচার্যের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কথিত আছে যে, তারা মধ্বাচার্যের সংগৃহীত ও রচিত সমস্ত গ্রন্থ অপহরণ করেন। কিন্তু পরে কুম্লাধিপতি জয়সিংহের সহযোগিতায় মধ্বাচার্য সেই গ্রন্থগুলি ফিরে পান। পুণ্ডরীক মধ্বাচার্যের কাছে পরাজিত হন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য তাঁর শিষ্য হলেন। তারই পুত্র শ্রীনারায়ণ আচার্য *শ্রীমধ্ববিজয়ের* রচয়িতা। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিষ্ণুতীর্থ নামে অভিহিত হন।

মধ্বাচার্যের শারীরিক বলের সীমা ছিল না, 'কড়ঞ্জরি'—নামক এক বলবান পুরুষ ত্রিশ জন পুরুষের বলধারী বলে নিজে আস্ফালন করতেন। মধ্বাচার্য তাঁর পায়ের আঙ্গুল মাটিতে রেখে তাকে তা বিচ্ছিন্ন করতে আদেশ করলে সেই অসামান্য বলশালী তার অমিত বল প্রয়োগ করেও কৃতকার্য হল না।

মাঘমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে *'ঐতরেয়-উপনিষদের'* ভাষ্য ব্যাখ্যা করতে করতে আশি বছর বয়সে শ্রীল মধ্বাচার্য পরলোক গমন করেন। মধ্বাচার্য সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ জানতে হলে নারায়ণ পণ্ডিতের *'শ্রীমধ্ববিজয়'* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমাধ্বতত্ত্ববাদ সম্প্রদায়ের আচার্যেরা উড়ুপী গ্রামের মূল মাধ্বমঠকে 'উত্তররাঢ়ী মঠ' বলেন। উড়ুপী অষ্ট-মঠের-মূল-পুরুষ ও মঠসমূহের নাম—১) বিষ্ণুতীর্থ—শোদ মঠ, ২) জনার্দন তীর্থ—কৃষ্ণপুর মঠ, ৩) বামন তীর্থ—কনুর মঠ, ৪) নরসিংহ তীর্থ—অদমর মঠ, ৫) উপেন্দ্র তীর্থ—পুত্তুগী মঠ, ৬) রামতীর্থ—শিরুর মঠ, ৭) হৃষীকেশ তীর্থ—পলিমর মঠ এবং ৮) অক্ষোভ্য তীর্থ—পেজাবর মঠ।

মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা—১) হংস পরমাত্মা; ২) চতুর্মুখ ব্রহ্মা; ৩) সনকাদি ৪) দুর্বাসা; ৫) জ্ঞাননিধি; ৬) গরুড়বাহন; ৬) কৈবল্য তীর্থ; ৮) জ্ঞানেশ তীর্থ; ৯) পর তীর্থ; ১০) সত্যপ্রজ্ঞ তীর্থ; ১১) প্রাজ্ঞ তীর্থ; ১২) অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য তীর্থ; ১৩) শ্রীমধ্বাচার্য—১০৪০ শকাব্দ; ১৪) পদ্মনাভ—১১২০ শকাব্দ; নরহরি—১১২৭; মাধব—১১৩৬; এবং অক্ষোভ্য—১১৫৯ শকাব্দ; ১৫) জয়তীর্থ—১১৬৭ শকাব্দ; ১৬) বিদ্যাধিরাজ—১১৯০ শকাব্দ; ১৭) কবীন্দ্র—১২৫৫ শকাব্দ; ১৮) বাগীশ—১২৬১ শকাব্দ; ১৯) রামচন্দ্র—১২৬৯ শকাব্দ; ২০) বিদ্যানিধি—১২৯৮ শকাব্দ; ২১) শ্রীরঘুনাথ—১৩৬৬ শকাব্দ; ২২) রঘুবর্য (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যার আলোচনা হয়েছিল)—১৪২৪ শকাব্দ; ২৩) রঘূত্তম—১৪৭১ শকাব্দ; ২৪) বেদব্যাস—১৫১৭ শকাব্দ; ২৫) বিদ্যাধীশ—১৫৪১ শকাব্দ; ২৬) বেদনিধি—১৫৫৩ শকাব্দ; ২৭) সত্যব্রত—১৫৫৭ শকাব্দ; ২৮) সত্যনিধি—১৫৬০ শকাব্দ; ২৯) সত্যনাথ—১৫৮২ শকাব্দ; ৩০) সত্যাভিনব—১৫৯৫ শকাব্দ; ৩১) সত্যপূর্ণ—১৬২৮ শকাব্দ; ৩২) সত্যবিজয়—১৬৪৮ শকাব্দ; ৩৩) সত্যপ্রিয়—১৬৫৯ শকাব্দ; ৩৪) সত্যবোধ—১৬৬৬ শকাব্দ; ৩৫) সত্যসন্ধ—১৭০৫ শকাব্দ; ৩৬) সত্যবর—১৭১৬ শকাব্দ; ৩৭) সত্যধর্ম—১৭১৯ শকাব্দ; ৩৮) সত্যসঙ্কল্প—১৭৫২ শকাব্দ; ৩৯) সত্যসন্তুষ্ট—১৭৬৩ শকাব্দ; ৪০) সত্যপরায়ণ—১৭৬৩ শকাব্দ; ৪১) সত্যকাম—১৭৮৫ শকাব্দ; ৪২) সত্যেষ্ট—১৭৯৩ শকাব্দ; ৪৩) সত্যপরাক্রম—১৭৯৪ শকাব্দ; ৪৪) সত্যধীর—১৮০১ শকাব্দ; ৪৫) সত্যধীর তীর্থ—১৮০৮ শকাব্দ।

ষোড়শতম আচার্য বিদ্যাধিরাজ তীর্থ থেকে আর একটি শিষ্য ধারা—১৭) রাজেন্দ্র তীর্থ—১২৫৪ শকাব্দ; ১৮) বিজয়ধ্বজ; ১৯) পুরুষোত্তম; ২০) সুব্রহ্মণ্য; ২১) ব্যাস রায়—১৪৭০ থেকে ১৫২০ শকাব্দ।

উনবিংশতিতম আচার্য রামচন্দ্র তীর্থের অপর শিষ্য ধারা—২০) বিবুধেন্দ্র—১২১৮ শকাব্দ, ২১) জিতামিত্র—১৩৪৮ শকাব্দ; ২২) রঘুনন্দন, ২৩) সুরেন্দ্র, ২৪) বিজেন্দ্র, ২৫) সুধীন্দ্র, ২৬) রাঘবেন্দ্র তীর্থ—১৫৪৫ শকাব্দ।

এই 'পর-মঠে' আজ পর্যন্ত আরও ১৪ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ সন্ন্যাসী হয়েছেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উড়ুপী দক্ষিণ-কানাড়া জেলায়, ম্যাঙ্গালোর থেকে ছত্রিশ মাইল উত্তরে সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত।

এই তথ্য *দক্ষিণ কানাড়া ম্যানুয়েল* এবং *বোম্বাই গেজেটিয়ারে* পাওয়া যায়।

শ্লোক ২৪৬

নর্তক গোপাল দেখে পরম-মোহনে ।
মধ্বাচার্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

উড়ুপীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম সুন্দর 'নর্তক গোপাল' বিগ্রহ দর্শন করেন। এই বিগ্রহটি স্বপ্নে দেখা দিয়ে মধ্বাচার্যের কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ২৪৭

গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে ।
মধ্বাচার্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোনমতে ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্রীবিগ্রহটি গোপীচন্দনে আবৃত হয়ে নৌকাতে ছিলেন এবং মধ্বাচার্য তাঁকে প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২৪৮

মধ্বাচার্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন ।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্বাচার্য এই 'নর্তক গোপাল' বিগ্রহ উড়ুপীতে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববাদী নামক মধ্বাচার্যের অনুগামীরা আজও তাঁর সেবা করে আসছেন।

শ্লোক ২৪৯

কৃষ্ণমূর্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল ।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈল ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

গোপালের সেই অপূর্ব বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দ অনুভব করেছিলেন। বহুক্ষণ ধরে প্রেমাবেশে তিনি নৃত্যগীত করেছিলেন।

শ্লোক ২৫০-২৫১

তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে 'মায়াবাদী' জ্ঞানে ।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৫০ ॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন। তাই তারা প্রথম দর্শনে তাঁকে সম্ভাষণ করেন নি। কিন্তু পরে তাঁর প্রেমাবেশ দর্শন করে তারা চমৎকৃত হলেন, এবং তাঁকে বৈষ্ণব জেনে গভীর প্রীতি সহকারে অভ্যর্থনা করলেন।

শ্লোক ২৫২

'বৈষ্ণবতা' সবার অন্তরে গর্ব জানি' ।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন যে তত্ত্ববাদীরা তাদের বৈষ্ণবতার গর্বে গর্বিত। তাই তিনি মৃদু হেসে তাদের কিছু বললেন।

শ্লোক ২৫৩

তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব জানি গৌরচন্দ্র ।
তাঁ-সবা-সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সকলের অন্তরের গর্বভাব অনুভব করে গৌরচন্দ্র তাদের সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনা শুরু করলেন।

শ্লোক ২৫৪

তত্ত্ববাদী আচার্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তত্ত্ববাদী আচার্য সমস্ত শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন অত্যন্ত দীনভাবে তার কাছে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫৫

সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে ।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য (সাধ্যতত্ত্ব) এবং কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায় (সাধনতত্ত্ব) আমি ভালমতে জানি না। দয়া করে সেই সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন।

শ্লোক ২৫৬

আচার্য কহে,—'বর্ণাশ্রম-ধর্ম, কৃষ্ণে সমর্পণ' ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন' ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্য তখন বললেন, "বর্ণাশ্রমধর্ম অনুশীলন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে কর্মার্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন'।

শ্লোক ২৫৭

'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন ।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পাঁচ প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করাই 'শ্রেষ্ঠ সাধ্য'—এই তত্ত্বই শাস্ত্রে নিরূপিত হয়েছে?"

শ্লোক ২৫৮

প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্তন ।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম সাধন' ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু বলা হয়েছে যে শ্রবণ-কীর্তন আদি ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের 'পরম সাধন'।

তাৎপর্য

তত্ত্ববাদীদের মতে শ্রেষ্ঠ সাধন, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন। এই জড় জগতে গুণ এবং কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণের কোন একটিতে যথাযথভাবে স্থিত না হলে, সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সেই সঙ্গে জীবনের চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস পালন করাও নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তত্ত্ববাদীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে

বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বা জীবনের পরম উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে বললেন যে, শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা জীবনের পরম উদ্দেশ্য। জড় জগতে তার অনুশীলন হয় শাস্ত্র বিধির অনুসরণ করার মাধ্যমে এবং চিৎ-জগতে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত।

শ্লোক ২৫৯-২৬০

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৫৯ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৬০ ॥

শ্রবণম্—ভগবানের পবিত্র নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলা শ্রবণ; **কীর্তনম্**—ভগবানের নাম, রূপ, লীলা আদি কীর্তন এবং সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **স্মরণম্**—ভগবানের পবিত্র নাম, রূপ, লীলা আদি স্মরণ; **পাদ-সেবনম্**—স্থান, কাল এবং অবস্থা অনুসারে ভগবানের পরিচর্যা করা; **অর্চনম্**—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করা; **বন্দনম্**—ভগবানের বন্দনা করা; **দাস্যম্**—সর্বদা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের দাস বলে অভিমান করা; **সখ্যম্**—ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা; **আত্ম-নিবেদনম্**—ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করা; **ইতি**—এইভাবে; **পুংসা**—মানুষের দ্বারা; **অর্পিতা**—উৎসর্গীকৃত; **বিষ্ণৌ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **চেৎ**—যদি; **নব-লক্ষণা**—পূর্বোক্ত নয়টি লক্ষণযুক্ত; **ক্রিয়েত**—সাধন করা উচিত; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে (অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নয়); **তৎ**—তা; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অধীতম্**—অধ্যয়ন করা হয়েছে; **উত্তমম্**—সর্বোত্তমভাবে।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নব লক্ষণসম্পন্ন ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়ে সাধিত হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এইটিই শাস্ত্রের নির্দেশ।'

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোক দুটি *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে (৭/৫/২৩-২৪) উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ২৬১

শ্রবণ-কীর্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা' ।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রবণ-কীর্তন আদি নবধা ভক্তি অনুশীলন করার ফলে যে 'কৃষ্ণপ্রেম' উদিত হয় সেইটিই হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ এবং জীবনের পরম প্রাপ্তি।

তাৎপর্য

সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া-রূপ মুক্তি, এই চারটি পুরুষার্থ সাধনে ব্যস্ত। কিন্তু এই চারটি পুরুষার্থের অতীত 'পঞ্চম' পুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম', সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ-কীর্তন থেকে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/২) বলা হয়েছে—

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্‌ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

"জড় বাসনাযুক্ত সবরকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই *ভাগবত-মহাপুরাণ* পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনতচিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।"

শ্রীধর স্বামীর মতে, মোক্ষ তারাই কামনা করেন যারা জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা যেহেতু জড়াতীত স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই তারা মোক্ষ কামনা করেন না।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত, কেননা তিনি সর্বদাই শ্রবণ, কীর্তন আদি ভগবদ্ভক্তির নয়টি অঙ্গের মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন অনুসারে কৃষ্ণভক্তি সকলের হৃদয়েই বিরাজমান—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়" (*চৈঃ চঃ মধ্যঃ* ২২/১০৪)। শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্তি অনুশীলনের প্রভাবে হৃদয়ের কলুষ যখন মুক্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিত হয়। কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—জাগরিত হয়।

শ্লোক ২৬২

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬২ ॥

এবংব্রতঃ—এইভাবে যখন কেউ নৃত্য-কীর্তনে ব্রত-পরায়ণ হন; **স্ব**—নিজে; **প্রিয়**—অত্যন্ত প্রিয়; **নাম**—ভগবানের দিব্যনাম; **কীর্ত্যা**—কীর্তন করে; **জাত**—এইভাবে বিকশিত হয়; **অনুরাগঃ**—অনুরাগ; **দ্রুতচিত্ত**—অত্যন্ত আগ্রহ ভরে; **উচ্চৈঃ**—জোরে জোরে; **হসতি**—হাসে; **অথো**—ও; **রোদিতি**—ক্রন্দন করে; **রৌতি**—উদ্দীপ্ত হয়; **গায়তি**—গান করে; **উন্মাদবৎ**—উন্মাদের মতো; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে; **লোকবাহ্যঃ**—কে কি বলে তার অপেক্ষা না করে।

অনুবাদ

কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থই উন্নতি সাধন করেন এবং তার অতি প্রিয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে আনন্দমগ্ন হন, তখন তিনি অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাইরের লোকেরা কে কি বলে সে সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান থাকে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২/৪০) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২৬৩

কর্মনিন্দা, কর্মত্যাগ, সর্বশাস্ত্রে কহে ।
কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত শাস্ত্রে সকাম কর্মের নিন্দা করা হয়েছে তাই সকাম কর্ম ত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ, কর্ম থেকে কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

বেদে তিনটি কাণ্ড বা বিভাগ রয়েছে—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যদিও সকাম কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তবুও চরমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরিত্যাগ করে কেবল উপাসনাকাণ্ড বা ভক্তিকাণ্ড অবলম্বন করতে। কর্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। তবে, কর্ম ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমে অন্তরের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেউ যখন অন্তরের কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তাকে অবশ্যই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হবে। তখনই শুদ্ধভক্তের সঙ্গের প্রয়োজন, কেননা শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভ করা যায়। কেউ যখন শুদ্ধভক্তির স্তরে উন্নীত হন তখন শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রবণ-কীর্তন আদি নবধা ভক্তির পন্থা অনুশীলন করার ফলে পূর্ণরূপে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, *অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্‌* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*—১/১/১২)। তখনই কেবল শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালনের যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
(ভঃ গীঃ ১৮/৬৫)

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে তুমি নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসবে। এইটিই আমার প্রতিজ্ঞা, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু।"

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তাহলে তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" (*ভঃ গীঃ* ১৮/৬৬) এইভাবে জীব তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে।

কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবের ফলে কেবল শুদ্ধভক্তি হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং লাভ করা যায়। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কর্ম দুই প্রকার—সৎকর্ম এবং অসৎকর্ম। সৎকর্ম অসৎকর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সৎকর্মের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায় না। সৎকর্ম এবং অসৎকর্মের ফলে যথাক্রমে জড় সুখ এবং জড় দুঃখ ভোগ হয়, কিন্তু জীবের সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির ফলে ভক্তির উদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। শ্রীকৃষ্ণের সুখ প্রাপ্তির জন্য সেবাই—ভক্তি। সমস্ত শাস্ত্রে নিজের ভোগ তাৎপর্যের নিন্দা এবং তা ত্যাগ করবার বিধান রয়েছে, এমনকি জ্ঞান শাস্ত্রেও রয়েছে। বৈদিক জ্ঞানের পরিপক্ক ফল—*শ্রীমদ্ভাগবত*, সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি। সেই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১২) বলা হয়েছে—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥

"আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সবরকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও, তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণন না করে—তাহলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তাহলে তার কি প্রয়োজন?" অর্থাৎ, সকাম কর্ম থেকে শ্রেয় জ্ঞান, আবার জ্ঞান যদি ভগবদ্ভক্তিবিহীন হয়, তাহলে তা সার্থক হয় না। সমস্ত শাস্ত্রে—আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে—কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের নিন্দা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/২) বলা হয়েছে—*ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র*—তা *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১১/৩২) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে এবং *ভগবদ্‌গীতা* (১৮/৬৬) থেকে উদ্ধৃত তার পরবর্তী শ্লোকটিতে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬৪

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ২৬৪ ॥

আজ্ঞায়—সম্যকরূপে জেনে; এবং—এইভাবে; গুণান্—গুণসমূহ; দোষান্—দোষসমূহ; ময়া—আমার দ্বারা; আদিষ্টান্—আদিষ্ট হয়ে; অপি—যদিও; স্বকান্—স্বীয়; ধর্মান্—বর্ণাশ্রম ধর্ম; সংত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; যঃ—যিনি; সর্বান্—সমস্ত; মাম্—আমাকে; ভজেৎ—সেবা করতে; স—তিনি; চ—এবং; সত্তমঃ—সাধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

"(শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের উক্তি) 'ধর্মশাস্ত্রে আমি যা 'ধর্ম' বলে আদেশ করেছি, তার গুণ দোষ বিচারপূর্বক সেই সমস্ত ধর্মপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সাধু।' "

শ্লোক ২৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ২৬৫ ॥

সর্বধর্মান্—জাগতিক সমস্ত ধর্ম; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; মাম্ একম্—কেবল আমার; শরণম্—শরণ; ব্রজ—যাও; অহম্—আমি; ত্বাম্—তোমাকে; সর্ব-পাপেভ্যো—সমস্ত পাপ থেকে; মোক্ষয়িষ্যামি—মুক্তিদান করব; মা—করো না; শুচঃ—শোক।

অনুবাদ

"(ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের বাণী) 'সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহলে আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি সেজন্য শোক করো না।'

শ্লোক ২৬৬

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; কর্মাণি—সকাম কর্ম সমূহ; কুর্বীত—করা উচিত; ন নির্বিদ্যেত—পরিতৃপ্ত না হয়; যাবতা—যতক্ষণ পর্যন্ত; মৎকথা—আমার সম্বন্ধে আলোচনা; শ্রবণাদৌ—শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি বিষয়ে; বা—অথবা; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; ন—না; জায়তে—জন্মায়।

অনুবাদ

"যে পর্যন্ত কর্মমার্গে নির্বেদ উদিত না হয় অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মায়, সেই পর্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম আদি কৃত হোক।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২০/৯) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২৬৭

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধভক্তরা পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগ করেন; প্রকৃতপক্ষে, তাদের কাছে মুক্তি অত্যন্ত তুচ্ছ কেননা তারা মুক্তিকে নরকের মতো বলে মনে করেন।

শ্লোক ২৬৮

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৬৮ ॥

সালোক্য—ভগবদ্ধামে অবস্থান করা; **সার্ষ্টি**—ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা; **সারূপ্য**—ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া; **সামীপ্য**—ভগবানের সঙ্গলাভ করা; **একত্বম্**—ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; **অপি**—তাও; **উত**—অথবা; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ন**—না; **গৃহ্নন্তি**—গ্রহণ করা; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎসেবনম্**—আমার সেবাপরায়ণ; **জনাঃ**—ভক্তবৃন্দ।

অনুবাদ

"আমার ভক্তদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তি দান করা হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না, কেননা আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁদের আর কোন বাসনা নেই।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৯/১৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৬৯

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৬৯ ॥

যঃ—যিনি; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **ক্ষিতি**—ভূ-সম্পত্তি; **সুত**—পুত্র; **স্বজন**—আত্মীয় স্বজন; **অর্থ**—ধনসম্পদ; **দারান্**—পত্নী; **প্রার্থ্যাম্**—প্রার্থনীয়; **শ্রিয়ম্**—সৌভাগ্য; **সুরবরৈঃ**—শ্রেষ্ঠ দেবতাদের; **সদয়া**—কৃপাপূর্ণ; **অবলোকাম্**—যার দৃষ্টিপাত;

ন ঐচ্ছৎ—বাসনা করেন না; **নৃপঃ**—রাজা (মহারাজ ভরত); **তৎ**—তা; **উচিতম্**—প্রযুক্ত; **মহতাম্**—মহাত্মাগণ; **মধুদ্বিট্**—মধু নামক দৈত্য সংহারকারী; **সেবানুরক্ত**—সেবার প্রতি অনুরক্ত; **মনসাম্**—যাদের মন; **অভবঃ**—জন্মমৃত্যুর নিবৃত্তি; **অপি**—এমনকি; **ফল্গুঃ**—তুচ্ছ।

অনুবাদ

"অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, ধন-সম্পদ, পত্নী এবং দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যশ্রীকে ভরত মহারাজ যে অভিলাষ করেননি, তা তাঁর পক্ষে উপযুক্তই হয়েছে। যেহেতু, তাঁর মতো কৃষ্ণসেবানুরক্ত সাধুর পক্ষে যখন নির্বাণ মুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত কথাই নেই।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৪/৪৪) মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শুকদেব গোস্বামী মহাভাগবত ভরত মহারাজের ভগবদ্ভক্তির মহিমা কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ২৭০

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৭০ ॥

নারায়ণপরাঃ—যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের ভক্ত; **সর্বে**—সমস্ত; **ন**—কখনই নয়; **কুতশ্চন**—কোথাও; **বিভ্যতি**—ভীত হন; **স্বর্গ**—স্বর্গলোক; **অপবর্গ**—মুক্তিলাভের পথে; **নরকেষু**—নরকেরও; **অপি**—এমন কি; **তুল্য**—সমান; **অর্থ**—মূল্য; **দর্শিনঃ**—দর্শন করেন।

অনুবাদ

"যারা নারায়ণ ভক্ত তাঁরা কখনও কোন কিছুতে ভীত হন না; কেননা তাঁরা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে (৬/১৭/২৮) বিষ্ণুভক্ত চিত্রকেতুর চরিত্রের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এক সময় চিত্রকেতু দেখেন যে পার্বতী দেবী শম্ভুর কোলে বসেছিলেন, তা দেখে একটু লজ্জিত হয়ে তিনি শম্ভুর সমালোচনা করেন, কারণ তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। এইভাবে শম্ভুকে অবজ্ঞা করার ফলে পার্বতীদেবী চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেন যে, তিনি বৃত্র নামক অসুররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। মহারাজ চিত্রকেতু ছিলেন একজন মহান বিষ্ণুভক্ত, তাই তিনি শিবের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি পার্বতীর এই অভিশাপ অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন। তখন পরম বৈষ্ণব শম্ভু পার্বতীর কাছে কৃষ্ণভক্তের আচরণ ও স্বভাব বর্ণনা করে বলেন, বিষ্ণুভক্তগণ ভগবৎসেবার সুযোগ থাকলে যে-কোনও কুলে জন্মগ্রহণ করতে ভীত হন না—এটাই *নারায়ণপরা সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* কথাটির প্রকৃত অর্থ।

শ্লোক ২৭১

মুক্তি, কর্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন' ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"মুক্তি এবং কর্ম, এই দুটি বস্তুই ভক্তেরা পরিত্যাগ করেন। আপনি সেই দুটিকে 'সাধ্য' এবং 'সাধন' বলে স্থাপন করার চেষ্টা করছেন?"

শ্লোক ২৭২

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ববাদী আচার্যকে বললেন, "আমি সন্ন্যাসী বলে আপনি আমাকে বঞ্চনা করছেন, এবং তাই প্রকৃত সাধ্য-সাধনের লক্ষণ আপনি আমাকে বলছেন না।"

শ্লোক ২৭৩

শুনি' তত্ত্বাচার্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি, হইলা বিস্মিত ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শুনে তত্ত্ববাদী আচার্য লজ্জিত হলেন; এবং তাঁর বৈষ্ণবতা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ২৭৪

আচার্য কহে,—তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয় ।
সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তত্ত্ববাদী আচার্য উত্তর দিলেন, "আপনি যা বললেন তা অবশ্যই সত্য। সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্তই সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।"

শ্লোক ২৭৫

তথাপি মধ্বাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তবুও শ্রীল মধ্বাচার্য যে পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন, আমরা সম্প্রদায় সম্বন্ধে তা আচরণ করছি।"

শ্লোক ২৭৬

প্রভু কহে,—কর্মী, জ্ঞানী,—দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "কর্মী এবং জ্ঞানী, উভয়ই ভক্তিহীন। অথচ আপনাদের সম্প্রদায়ে সেই বৈচিত্র্যই বর্তমান দেখছি।

শ্লোক ২৭৭

সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ।
সত্যবিগ্রহ করি' ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনাদের সম্প্রদায়ে আমি কেবল একটি গুণ দেখছি; তা হচ্ছে আপনারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সত্য বলে স্বীকার করেন।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের তত্ত্ববাদী আচার্যকে দেখালেন যে, তাদের আচরণ শুদ্ধ-ভক্তির অনুকূল নয়, কেননা শুদ্ধভক্তি—কর্ম এবং জ্ঞানের সবরকম কলুষ থেকে মুক্ত। সকাম কর্মের কলুষ হচ্ছে উচ্চতর ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ এবং জ্ঞানের কলুষ হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের তত্ত্ববাদীরা বর্ণাশ্রম-এর অনুশীলনকে তাদের সাধন-প্রণালী বলে মনে করে, যা হচ্ছে সকাম কর্ম এবং তাদের সাধ্য হচ্ছে মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধভক্ত কখনও মুক্তি কামনা করেন না। তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চান। কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, কেননা তারা পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপকে স্বীকার করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এটি একটি মহৎ গুণ।

মায়াবাদী সম্প্রদায়ের অনুগামীরা ভগবানের চিন্ময় রূপ স্বীকার করেন না। যদি কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও নির্বিশেষবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে সেই সম্প্রদায়ের কোন মর্যাদা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, অনেক তথাকথিত বৈষ্ণব আছে, যাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া। সহজিয়া বৈষ্ণবদের দর্শন হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে দেখালেন যে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সেই সম্প্রদায় ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ স্বীকার করেন।

শ্লোক ২৭৮

এইমত তাঁর ঘরে গর্ব চূর্ণ করি' ।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তত্ত্ববাদীদের গর্ব চূর্ণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ফল্গুতীর্থ নামক স্থানে গমন করলেন।

শ্লোক ২৭৯

ত্রিতকূপে বিশালার করি' দরশন ।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিতকূপে বিশালাদেবীর বিগ্রহ দর্শন করেন; এবং তারপর পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে গমন করেন।

তাৎপর্য

স্বর্গের অপ্সরারা অপূর্ব সুন্দরী। যখন কোন মেয়ের সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়, তখন বলা হয় যে সে অপ্সরার মতো সুন্দরী। স্বর্গে লতা, বুদবুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা নামে পাঁচজন অপ্সরা ছিল। অচ্যুত ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র এই পাঁচজন অপ্সরাকে পাঠিয়েছিলেন। ইন্দ্র যখনই দেখেন যে কেউ কঠোর তপস্যা করছেন, তখন ইন্দ্র এই মনে করে ভীত হন যে, তপস্যার বলে তাঁর থেকেও শক্তিমান হয়ে হয়তো তিনি তাঁর ইন্দ্রত্ব অধিকার করে নেবেন। এইভাবে ইন্দ্র সবসময়ই তাঁর ইন্দ্রপদ বজায় রাখার জন্য সন্ত্রস্ত থাকেন। তাই যখনই তিনি কোন ঋষিকে কঠোর তপস্যা করতে দেখেন, তখন তিনি তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যাও ভঙ্গ করেছিলেন।

পাঁচটি অপ্সরা যখন অচ্যুত ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করতে যান, তখন ঋষির অভিশাপে তারা কুমীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র এই সরোবর দেখেন। নারদমুনির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, অর্জুন তীর্থযাত্রা করার সময় কুমীর যোনি থেকে এই পাঁচটি অপ্সরাকে মোচন করেন। সেই থেকে এই সরোবরটি তীর্থরূপে পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ২৮০

গোকর্ণে শিব দেখি' আইলা দ্বৈপায়নি ।
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোকর্ণে শিব মন্দির দর্শন করেন এবং সেখান থেকে দ্বৈপায়নিতে যান। তারপর সন্ন্যাসী শিরোমণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সূর্পারক-তীর্থে যান।

তাৎপর্য

গোকর্ণ, কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর-কানাড়ায় কারোয়ারের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং মহাবলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মন্দির দর্শন করতে আসেন।

সূর্পারক মহারাষ্ট্র প্রদেশের মুম্বাই থেকে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জেলায় 'সোপারা' নামক স্থান। *মহাভারতে* (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৪১, শ্লোক ৬৬-৬৭) সূর্পারকের নাম উল্লেখ আছে।

শ্লোক ২৮১

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি' দেখেন ক্ষীর-ভগবতী ।
লাঙ্গ-গণেশ দেখি' দেখেন চোর-পার্বতী ॥ ২৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর কোলাপুরে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ দর্শন করে ক্ষীর ভগবতী দর্শন করেন। তারপর লাঙ্গ-গণেশ দর্শন করে চোর-পার্বতী দর্শন করেন।

তাৎপর্য

কোলাপুর শহর মহারাষ্ট্র প্রদেশে, পূর্বে যা বোম্বাই প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে এটি একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। এর উত্তরে সাঁতারা, পূর্বে ও দক্ষিণে—বেলগ্রাম, পশ্চিমে রত্নগিরি। এখানে 'উরণা' নামক একটি নদী আছে। কোলাপুরে পূর্বে প্রায় দুশো পঞ্চাশটি মন্দির ছিল, তার মধ্যে ছটি মন্দির বিখ্যাত—১) অম্বাবাই মহালক্ষ্মী মন্দির, ২) বিঠোবা মন্দির, ৩) তেম্বালাই মন্দির, ৪) মহাকালী মন্দির, ৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরা মন্দির এবং ৬) য়্যাল্লাম্মা মন্দির।

শ্লোক ২৮২

তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র ।
বিঠ্‌ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সেখান থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাণ্ডরপুরে যান, এবং সেখানে বিঠ্‌ঠল-ঠাকুর দর্শন করে মহা আনন্দিত হন।

তাৎপর্য

পাণ্ডরপুর শহর মহারাষ্ট্র প্রদেশে শোলাপুর জেলায় ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে বিঠ্‌ঠল বা বিঠোবাদেব নামক নারায়ণ বিগ্রহ রয়েছেন। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পাণ্ডরপুরে আসেন তখন সেখানে তিনি তুকারামকে দীক্ষা দেন। এই তুকারাম আচার্য মহারাষ্ট্র জেলায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং তিনি পশ্চিম ভারতে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন। তুকারামের সংকীর্তন দল মুম্বাইয়ে এখনও খুব প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম *অভঙ্গ*। তাঁর সংকীর্তনের দল ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংকীর্তন দলের মতো, কেননা তার দলেও মৃদঙ্গ এবং করতাল সহকারে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা হয়।

শ্লোক ২৮৩

প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্তন-নর্তন ।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-কীর্তন করলেন, এবং সেখানে এক বিপ্র তাঁকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্লোক ২৮৪-২৮৫

বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্তা পাইল ॥ ২৮৪ ॥
মাধব-পুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গ-পুরী' নাম ।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ বহু যত্ন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করালেন। ভিক্ষা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে একটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ পেলেন—'শ্রীরঙ্গপুরী' নামক মাধবেন্দ্রপুরীর এক শিষ্য সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করছেন।"

শ্লোক ২৮৬

শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে ।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংবাদ পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীরঙ্গ-পুরীকে দর্শন করতে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন যে তিনি বসে রয়েছেন।

শ্লোক ২৮৭

প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম ।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গ-পুরীকে দর্শন করা মাত্র প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন এবং তাঁর অঙ্গে অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ আদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখা দিল।

শ্লোক ২৮৮

দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গ-পুরীর মন ।
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি' বলিলা বচন ॥ ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখে শ্রীরঙ্গ-পুরী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে মাটি থেকে উঠতে বললেন।

শ্লোক ২৮৯

শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—"শ্রীপাদ, আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তা না হলে এই ধরনের ভগবৎ-প্রেম তো অন্য কোথাও দেখা যায় না।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—মাধ্ব-সম্প্রদায়ে মধ্বাচার্য থেকে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্যন্ত একলা শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী থেকে জগতে ঐকান্তিক শ্রীরাধাদাস্যমূলে বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণপ্রেম অবতীর্ণ হয়েছেন, কেননা 'ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর' (*আদি* ৯/১০) মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হলে, এই প্রকার ভগবৎ-প্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে 'গোসাঞি' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে সদ্‌গুরু সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং ভগবানের সেবা ব্যতীত যাঁর আর কোন কিছু করণীয় নেই, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ পরমহংস। পরমহংসের ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের কোনরকম চেষ্টা থাকে না; তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করতে তৎপর। এইভাবে যিনি তাঁর ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন তাঁকে বলা হয় গোসাঞি বা গোস্বামী; অর্থাৎ যিনি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে দমন করেছেন। ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করা যায় না। তাই যথার্থ সদ্‌গুরু, যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণরূপে দমন করেছেন, তিনি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তাই তাঁকে গোসাঞি বা গোস্বামী বলে সম্বোধন করা যায়। বংশানুক্রমে 'গোস্বামী' উপাধি লাভ করা যায় না, তা কেবল সদ্‌গুরুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়।

বৃন্দাবনে ছজন গোস্বামী ছিলেন—রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী—এঁদের কেউই বংশানুক্রমে গোস্বামী উপাধি লাভ করেননি। বৃন্দাবনের এই সমস্ত গোস্বামীরাই

ছিলেন ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ সদ্‌গুরু এবং তাই তাঁদের বলা হত গোস্বামী। এঁরা সকলে বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমেই বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঐসকল মন্দিরের পূজার ভার তাঁদের কয়েকজন গৃহস্থ শিষ্যের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সেই থেকে তারা বংশানুক্রমিকভাবে গোস্বামী উপাধি ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করছেন এবং যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত, তিনিই কেবল গোস্বামী উপাধিতে অভিহিত হতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত জাতি গোস্বামীর পন্থা, বা বংশানুক্রমিকভাবে গোস্বামী উপাধি গ্রহণের প্রথা, আজও চলে আসছে; তাই বর্তমানে মানুষের অজ্ঞতার ফলে এই উপাধিটির ভ্রান্ত প্রয়োগ হচ্ছে।

শ্লোক ২৯০

এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ।
গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীরঙ্গপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মাটি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং গলাগলি করে দুজনেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯১

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহার ধৈর্য হৈল ।
ঈশ্বর-পুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইল ॥ ২৯১ ॥

শ্লোকার্থ

তার কিছুক্ষণ পরে, প্রেমাবিষ্ট অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা দুজন ধৈর্য ধারণ করলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গপুরীকে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিজ সম্পর্কের কথা বললেন।

শ্লোক ২৯২

অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল ।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥ ২৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা উভয়েই এক অদ্ভুত প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে তাঁরা পরস্পরকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে বসলেন।

শ্লোক ২৯৩

দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ২৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তাঁরা দিন-রাত কৃষ্ণকথা আলোচনা করে পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২৯৪

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান ।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম ॥ ২৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৌতূহলী হয়ে শ্রীরঙ্গপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর জন্মস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, এবং মহাপ্রভু তখন তাঁকে বললেন যে নবদ্বীপ হচ্ছে তাঁর জন্মস্থান।

শ্লোক ২৯৫

শ্রীমাধব-পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ-পুরী ।
পূর্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া-নগরী ॥ ২৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী পূর্বে নদীয়া নগরীতে এসেছিলেন, এবং সে সময়কার সমস্ত কথা তাঁর মনে পড়ে গেল।

শ্লোক ২৯৬

জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল ।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল ॥ ২৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা করেছিলেন এবং অপূর্ব মোচার ঘণ্ট খেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯৭

জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ—মহা-পতিব্রতা ।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ ২৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্রের মহা পতিব্রতা গৃহিণীর কথা শ্রীরঙ্গপুরীর মনে পড়ল। বাৎসল্য-স্নেহে তিনি যেন ঠিক জগন্মাতার মতো।

শ্লোক ২৯৮

রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে ।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসি-ভোজনে ॥ ২৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

রন্ধনে তাঁর মতো সুনিপুণা ত্রিভুবনে আর কেউ নেই, এবং পুত্রের মতো স্নেহ করে তিনি সন্ন্যাসীদের ভোজন করাতেন।

শ্লোক ২৯৯

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস ।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স ॥ ২৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর এক যোগ্য পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম 'শঙ্করারণ্য' এবং তাঁর বয়স অল্প।

শ্লোক ৩০০

এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গ-পুরী এতেক কহিল ॥ ৩০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন যে, এই পাণ্ডরপুর তীর্থে শঙ্করারণ্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল বিশ্বরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পূর্বেই তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় 'শঙ্করারণ্য স্বামী'। তিনি দেশ ভ্রমণ করতে করতে 'পাণ্ডরপুর'-তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ চিন্ময়ধামে প্রবেশ করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা শ্রীরঙ্গপুরী এই সংবাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দিলেন।

শ্লোক ৩০১

প্রভু কহে,—পূর্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা ।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্বাশ্রমে মোর পিতা ॥ ৩০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এই শঙ্করারণ্য পূর্বাশ্রমে আমার ভ্রাতা, এবং জগন্নাথ মিশ্র আমার পিতা।"

শ্লোক ৩০২

এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি'।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ৩০২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ইষ্টগোষ্ঠী করার পর শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা দর্শন করতে চললেন।

শ্লোক ৩০৩

দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ ।
ভীমানদী স্নান করি' করেন বিঠ্ঠল দর্শন ॥ ৩০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকায় চলে যাওয়ার পর সেই ব্রাহ্মণের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও চারদিন পাণ্ডরপুরে রইলেন, এবং প্রতিদিন ভীমানদীতে স্নান করে তিনি বিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করতেন।

শ্লোক ৩০৪

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাহাঁ দেবতা-মন্দিরে ॥ ৩০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে গেলেন এবং সেখানে তিনি নানা তীর্থ এবং বহু মন্দির দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

এই নদীটি কৃষ্ণনদীর আর একটি শাখা। কথিত আছে যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই নদীর তীরে বাস করতেন। এই নদীটিকে কখনও কখনও বীণা, বেণী, সিনা এবং ভীমা বলা হয়।

শ্লোক ৩০৫

ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত ।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ॥ ৩০৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজের সকলে ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত এবং তারা সকলে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পাঠ করতেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত একশ বারোটি শ্লোক-সমন্বিত গীতিগ্রন্থ। এই নামে দু-তিনটি ভিন্ন গ্রন্থ এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের গ্রন্থের দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য দাস গোস্বামী এই গ্রন্থটির টীকা রচনা করেছেন।

শ্লোক ৩০৬

কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥ ৩০৬ ॥

শ্লোকার্থ

'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দিত হলেন এবং গভীর আগ্রহে তিনি সেই গ্রন্থটি লিখিয়ে নিলেন।

শ্লোক ৩০৭

'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥ ৩০৭ ॥

শ্লোকার্থ

'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র মতো গ্রন্থ ত্রিভুবনে আর নেই। এই গ্রন্থটি পাঠ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেম লাভ হয়।

শ্লোক ৩০৮

সৌন্দর্য-মাধুর্য-কৃষ্ণলীলার অবধি ।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥ ৩০৮ ॥

শ্লোকার্থ

যিনি নিরন্তর 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' পাঠ করেন, তিনি কৃষ্ণলীলার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৩০৯

'ব্রহ্মসংহিতা', 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা ।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা ॥ ৩০৯ ॥

শ্লোকার্থ

'ব্রহ্ম-সংহিতা' এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই দুইটি গ্রন্থকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবচাইতে দুর্লভ দুটি রত্ন বলে মনে করেছিলেন, তাই তিনি সেই দুটি গ্রন্থ তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩১০

তাপী স্নান করি' আইলা মাহিষ্মতীপুরে ।
নানা তীর্থ দেখি তাহাঁ নর্মদার তীরে ॥ ৩১০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাপী নদীর তীরে এলেন এবং তাপী নদীতে স্নান করে

মাহিষ্মতীপুরে গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি নর্মদা নদীর তীরে বহু তীর্থ দর্শন করেন।

তাৎপর্য

তাপী নদী বর্তমানে তাপ্তী নামে পরিচিত। মধ্য ভারতের মূলতাইগিরি থেকে উদ্ভূত হয়ে সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে এসে আরব সাগরে পতিত হয়েছে। *মহাভারতে* সহদেবের মাহিষ্মতীপুর (মহেশ্বর) বিজয়ের বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ ।
তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ ॥

"বহু রত্ন সংগ্রহ করে সহদেব মাহিষ্মতী নগরে গমন করেন এবং সেখানে নীল নামক রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়।"

শ্লোক ৩১১

ধনুস্তীর্থ দেখি করিলা নির্বিন্ধ্যাতে স্নানে ।
ঋষ্যমূক-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকার্থ

ধনুস্তীর্থ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্বিন্ধ্যাতে স্নান করলেন, এবং তারপর ঋষ্যমূক-পর্বত থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন।

তাৎপর্য

কেউ কেউ বলেন যে, ঋষ্যমূক-পর্বত বেলারী জেলায় হামপিগ্রামে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরিপথটির পার্শ্ববর্তী যে পর্বতটি নিজাম (হায়দ্রাবাদ) রাজ্যে গিয়ে পড়েছে, তাই ঋষ্যমূক পর্বত। অন্য কারও মতে ঋষ্যমূক পর্বত মধ্য-প্রদেশে অবস্থিত এবং বর্তমান নাম 'রাম্প'। আর কারও মতে ঋষ্যমূক পর্বত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে 'অনমলয়' এবং কারো মতে ঋষ্যমূক পর্বত থেকেই পম্পা নদী উদ্ভূত হয়ে অনাগুণ্ডির কাছে তুঙ্গভদ্রায় এসে মিলিত হয়েছে। উত্তরে 'খানদেশ' থেকে দক্ষিণে আহম্মদ-নগর এবং মধ্যে নাসিক ও ঔরঙ্গাবাদ পর্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগটিতে 'দণ্ডকারণ্য' নামক বিস্তৃত বন ছিল।

শ্লোক ৩১২

'সপ্ততাল-বৃক্ষ' দেখে কানন-ভিতর ।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ॥ ৩১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অরণ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'সপ্ততাল বৃক্ষ' দর্শন করেন। এই সাতটি তাল বৃক্ষ অত্যন্ত প্রাচীন, অত্যন্ত স্থূল এবং অত্যন্ত উঁচু ছিল।

তাৎপর্য

রামায়ণের 'কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে' একাদশ-দ্বাদশ সর্গে সপ্ততাল বৃক্ষের উল্লেখ রয়েছে।

শ্লোক ৩১৩

সপ্ততাল দেখি' প্রভু আলিঙ্গন কৈল ।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥ ৩১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্ততাল দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তার ফলে সেই বৃক্ষগুলি সশরীরে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করল।

শ্লোক ৩১৪-৩১৫

শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার ।
লোকে কহে, এ সন্ন্যাসী—রাম-অবতার ॥ ৩১৪ ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম ॥ ৩১৫ ॥

শ্লোকার্থ

যেখানে সপ্ততাল বৃক্ষ ছিল, সেই স্থানটি শূন্য দেখে লোকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন, এবং তারা বলতে লাগলেন, "এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই শ্রীরামচন্দ্রের অবতার। যাঁর স্পর্শে তালবৃক্ষগুলি সশরীরে বৈকুণ্ঠধাম গমন করল। এক শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া এরকম শক্তি আর কার আছে?"

শ্লোক ৩১৬

প্রভু আসি' কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান ।
পঞ্চবটী আসি, তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥ ৩১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পম্পা সরোবরে স্নান করলেন; এবং সেখান থেকে পঞ্চবটীতে এসে তিনি বিশ্রাম করলেন।

তাৎপর্য

কারও কারও মতে, তুঙ্গভদ্রা নদীর প্রাচীন নাম 'পম্পা'। মতান্তরে, বিজয়নগরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী হামপি গ্রামটি প্রথমে পম্পাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কারও মতে, হায়দ্রাবাদের দিকে অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রার তীরবতী একটি সরোবরই 'পম্পা-সরোবর' নামে পরিচিত। এইভাবে পম্পা সরোবর সম্বন্ধে বহু মতভেদ রয়েছে।

পঞ্চবটী,—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটি বন। বর্তমানে নাসিক শহরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসাচ্ছেদন করেন। নাসিক শহরে ত্র্যম্বক নামক মহাদেব আছেন।

শ্লোক ৩১৭

নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি' গেলা ব্রহ্মগিরি ।
কুশাবর্তে আইলা যাহাঁ জন্মিলা গোদাবরী ॥ ৩১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাসিকে ত্র্যম্বক দর্শন করে ব্রহ্মগিরি গেলেন; এবং সেখান থেকে গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থল কুশাবর্তে গেলেন।

তাৎপর্য

কুশাবর্ত সহ্যাদ্রির পশ্চিম ঘাটে অবস্থিত। সহ্যাদ্রির কুশট্ট নামক প্রদেশ থেকে গোদাবরীর মূলধারা সমূহ উদ্ভূত হয়, তা নাসিকের কাছে অবস্থিত; কারও মতে বিন্ধ্যের পাদমূলে অবস্থিত।

শ্লোক ৩১৮

সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর ।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ ৩১৮ ॥

শ্লোকার্থ

বহু তীর্থ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপ্তগোদাবরীতে এলেন। তারপর সেখান থেকে বিদ্যানগরে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থান থেকে বর্তমান হায়দ্রাবাদের উত্তরাংশ দিয়ে বস্তার হয়ে কলিঙ্গ দেশে এসে পৌঁছলেন।

শ্লোক ৩১৯

রামানন্দ রায় শুনি' প্রভুর আগমন ।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন ॥ ৩১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ পেয়ে রামানন্দ রায় মহানন্দে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

শ্লোক ৩২০

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥ ৩২০ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং মহাপ্রভু তাকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৩২১

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন ॥ ৩২১ ॥

শ্লোকার্থ

দুজনে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে লাগলেন, এবং এইভাবে প্রেমানন্দে তাঁদের উভয়ের মন শিথিল হল।

শ্লোক ৩২২

কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হঞা ।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া ॥ ৩২২ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পরে সুস্থির হয়ে তাঁরা দুজনে একত্রে বসে নানা বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী করলেন।

শ্লোক ৩২৩

তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা ।
কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা,—দুই পুঁথি দিলা ॥ ৩২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে তাঁর তীর্থযাত্রার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন; এবং 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ দুখানি দিলেন।

শ্লোক ৩২৪

প্রভু কহে,—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে ।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥ ৩২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তুমি আমাকে বলেছিলে, সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত এই দুটি গ্রন্থে সমর্থন করা হয়েছে।"

শ্লোক ৩২৫

রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ।
প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ॥ ৩২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই দুটি গ্রন্থ পেয়ে রামানন্দ রায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তিনি সেই গ্রন্থ দুটি আস্বাদন করেছিলেন, এবং তার প্রতিলিপি লিখে রেখেছিলেন।

শ্লোক ৩২৬

'গোসাঞি আইলা' গ্রামে হইল কোলাহল ।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥ ৩২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ পেয়ে সকলে আনন্দে উদ্বেল হয়ে কোলাহল করতে লাগলেন; এবং তৎক্ষণাৎ সকলে তাঁকে দেখতে এলেন।

শ্লোক ৩২৭

লোক দেখি' রামানন্দ গেলা নিজ-ঘরে ।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ৩২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই লোক-সমাবেশ দেখে শ্রীরামানন্দ রায় তার গৃহে ফিরে গেলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য মহাপ্রভুও উঠলেন।

শ্লোক ৩২৮

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ।
দুই জনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ ॥ ৩২৮ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রিবেলা রামানন্দ রায় আবার এলেন, এবং দুজনে সারারাত জেগে কৃষ্ণকথা আলোচনা করলেন।

শ্লোক ৩২৯

দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ৩২৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিবা-রাত্র কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন, এবং এইভাবে পরম আনন্দে তাঁরা পাঁচ-সাতদিন কাটালেন।

শ্লোক ৩৩০-৩৩১

রামানন্দ কহে,—প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাঞা ।
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিয়া ॥ ৩৩০ ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ।
চলিবার উদ্যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ ৩৩১ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "প্রভু, আপনার আজ্ঞা অনুসারে, আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে রাজাকে পত্র লিখেছিলাম। মহারাজ আমাকে নীলাচলে যেতে আজ্ঞা দিয়েছেন, এবং আমি সেখানে যাওয়ার উদ্‌যোগ করছি।"

শ্লোক ৩৩২

প্রভু কহে,—এথা মোর এ-নিমিত্তে আগমন ।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এইজন্যই আমি এখানে এসেছি। আমি ঠিক করেছি যে তোমাকে নিয়ে একত্রে নীলাচলে যাব।"

শ্লোক ৩৩৩

রায় কহে,—প্রভু, আগে চল নীলাচলে ।
মোর সঙ্গে হাতী—ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহলে ॥ ৩৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন,—"প্রভু, আপনি আগে নীলাচলে যান। আমার সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, সৈন্য ইত্যাদির কোলাহল, তাতে আপনার অসুবিধা হবে।

শ্লোক ৩৩৪

দিন-দশে ইহা-সবার করি' সমাধান ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ ৩৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"দিন-দশেকের মধ্যে এই সবের সমাধান করে আমি আপনার পিছনে পিছনে নীলাচলে যাব।"

শ্লোক ৩৩৫

তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ ৩৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আসতে আজ্ঞা দিয়ে আনন্দিত-চিত্তে নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৩৩৬

যেই পথে পূর্বে প্রভু কৈলা আগমন ।
সেই পথে চলিলা দেখি, সর্ব বৈষ্ণবগণ ॥ ৩৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে পথ দিয়ে পূর্বে এসেছিলেন, সেই পথ দিয়েই নীলাচলের দিকে চললেন। পথে সমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল।

শ্লোক ৩৩৭

যাহাঁ যায়, লোক উঠে হরিধ্বনি করি' ।
দেখি' আনন্দিত-মন হৈলা গৌরহরি ॥ ৩৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানেই যেতেন, সেখানেই মানুষ হরিধ্বনি দিতেন, এবং তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতেন।

শ্লোক ৩৩৮

আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল ।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥ ৩৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

আলালনাথে পৌছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ আদি অন্তরঙ্গ পার্ষদদের ডাকবার জন্য কৃষ্ণদাসকে পাঠালেন।

শ্লোক ৩৩৯

প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ রায় ।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্রই নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটলেন—প্রেমে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪০

জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩৪০ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ, এঁরা সকলে নাচতে নাচতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চললেন। তখন তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরছিল না।

শ্লোক ৩৪১

গোপীনাথাচার্য চলিলা আনন্দিত হঞা ।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা ॥ ৩৪১ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য আনন্দে উদ্বেল হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটলেন। তাঁরা সকলে পথে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৩৪২

প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন ।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৩৪২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সকলকে আলিঙ্গন করলেন, এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁরা সকলে আনন্দ-ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৪৩

সার্বভৌম ভট্টাচার্য আনন্দে চলিলা ।
সমুদ্রের তীরে আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহা আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে চললেন এবং সমুদ্রের তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল।

শ্লোক ৩৪৪

সার্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে ।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে পতিত হলেন, মহাপ্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৩৪৫

প্রেমাবেশে সার্বভৌম করিলা রোদনে ।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৩৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর তাঁদের সকলকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন করতে গেলেন।

শ্লোক ৩৪৬

জগন্নাথ-দরশন প্রেমাবেশে কৈল ।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রুতে শরীর ভাসিল ॥ ৩৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন এবং কম্প, স্বেদ ও পুলকাশ্রুতে তাঁর শরীর ভাসতে লাগল।

শ্লোক ৩৪৭

বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
পাণ্ডাপাল আইল সবে মালা-প্রসাদ লঞা ॥ ৩৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু নৃত্য-গীত করলেন; এবং তখন সমস্ত পাণ্ডারা জগন্নাথদেবের মালা ও প্রসাদ নিয়ে সেখানে এলেন।

তাৎপর্য

জগন্নাথদেবের সেবকদের বলা হয় পাণ্ডা বা পণ্ডিত। তারা সকলে ব্রাহ্মণ। যারা মন্দিরের বাইরের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন, তাদের বলা হয় 'পাল'। এই দুই একত্রে 'পাণ্ডাপাল' হয়েছে।

শ্লোক ৩৪৮

মালা-প্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা ।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবের মালা প্রসাদ পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুস্থির হলেন। তখন জগন্নাথদেবের সমস্ত সেবকেরা মহা আনন্দে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৩৪৯

কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর পড়িলা চরণে ।
মান্য করি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর কাশীমিশ্র এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে পতিত হলেন, এবং মহাপ্রভু তখন তাকে শ্রদ্ধাসহকারে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৩৫০

প্রভু লঞা সার্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা ।
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি' নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ৩৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ আমার ঘরে তুমি ভিক্ষা গ্রহণ করবে"—বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে তার গৃহে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ৩৫১

দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল ।
পীঠা-পানা আদি জগন্নাথ যে খাইল ॥ ৩৫১ ॥

শ্লোকার্থ

পীঠা, পানা আদি যা কিছু জগন্নাথদেব খেয়েছিলেন, সেই সমস্ত মহাপ্রসাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রচুর পরিমাণে আনালেন।

শ্লোক ৩৫২

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা ।
সার্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া ॥ ৩৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ঘরে ভিক্ষা করলেন।

শ্লোক ৩৫৩

ভিক্ষা করাঞা তাঁরে করাইল শয়ন ।
আপনে সার্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥ ৩৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভিক্ষা করিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শয়ন করালেন এবং তিনি নিজে তাঁর পাদসম্বাহন করলেন।

শ্লোক ৩৫৪

প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে ।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে ভোজন করতে পাঠালেন এবং তাকে খুশী করার জন্য তিনি সেই রাত্রে সেখানে রইলেন।

শ্লোক ৩৫৫

সার্বভৌম-সঙ্গে আর লঞা নিজগণ ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি' কৈল জাগরণ ॥ ৩৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের তাঁর তীর্থ-যাত্রার কথা শোনালেন। এইভাবে তাঁরা সারারাত জেগে মহাপ্রভুর তীর্থ যাত্রার বর্ণনা শুনলেন।

শ্লোক ৩৫৬

প্রভু কহে,—এত তীর্থ কৈলুঁ পর্যটন ।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিলুঁ একজন ॥ ৩৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "আমি এত তীর্থ পর্যটন করলাম, কিন্তু কোথাও তোমার মতো একজন বৈষ্ণবকে আমি দেখলাম না।"

শ্লোক ৩৫৭

এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল ।
ভট্ট কহে,—এই লাগি' মিলিতে কহিল ॥ ৩৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এক রামানন্দ রায় আমাকে বহু আনন্দ দিয়েছে।" সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "সেইজন্যই আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলাম।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (অষ্টম অংক) ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সার্বভৌম, আমি বহু তীর্থে ভ্রমণ করলাম, কিন্তু কোথাও তোমার মতো একজন বৈষ্ণবও দেখলাম না। সে যাই হোক একমাত্র রামানন্দ রায়ের ব্যাপারটাই অলৌকিক।

সার্বভৌম তাই আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করেছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই সমস্ত তীর্থস্থানে অবশ্য বহু বৈষ্ণব রয়েছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই নারায়ণ উপাসক। অন্যরা যাদের তত্ত্ববাদী বলা হয়, তাঁরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক, কিন্তু তাঁরা কেউই শুদ্ধবৈষ্ণব নন। বহু শিব-উপাসক রয়েছে, এবং নাস্তিক রয়েছে। কিন্তু ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায় ও তাঁর মত আমার খুব ভাল লেগেছে।

শ্লোক ৩৫৮

তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈলুঁ সমাপন ।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ৩৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তীর্থযাত্রার কথা আমি এখানে শেষ করছি। আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম, কেননা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন—"এই পরিচ্ছেদের চুয়াত্তর শ্লোকে 'শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন' এটির পরিবর্তে 'শিয়ালীতে শ্রীভূ-বরাহ করি দরশন' হবে। শিয়ালী এবং চিদম্বরমের কাছে সুবিখ্যাত 'শ্রীমুষ্ণম্'-মন্দির। সেখানে শ্রীভূ-বরাহ-দেব বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম তালুকের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ আর্কট জেলায় শিয়ালীর কাছে 'শ্রীভূ-বরাহদেব'-ই বিরাজমান, 'ভৈরবীদেবী' নন।"

শ্লোক ৩৫৯

অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি ।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত। কেউই তা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে না, তবুও লোভের বশবর্তী হয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে, তা নিয়ে টানাটানি করি।

শ্লোক ৩৬০

প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন ।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রার কথা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গভীর প্রেমরূপ মহাসম্পদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন—"নির্বিশেষবাদীরা তাদের জড়-ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে পরমতত্ত্বের রূপ কল্পনা করে এবং তারা সেই কল্পিত রূপের উপাসনা করে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ধরনের ইন্দ্রিয়-তর্পণময় উপাসনাকে 'পরমার্থ' বলেন না।" মায়াবাদীরা কল্পনা করে যে, তারাই ভগবান। তারা অনুমান করে যে, ভগবানের কোন রূপ নেই এবং তার সমস্ত রূপই মানুষের আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। মায়াবাদী এবং ভগবানের রূপের কল্পনাকারী উভয়েই ভ্রান্ত। তাদের মতে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা অথবা ভগবানের যে কোন রূপ বদ্ধজীবের মোহ প্রসূত কল্পনামাত্র। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব দর্শনের মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই দর্শন অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদ এবং অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যুগপৎ বৈচিত্র ও

সাম্য বর্তমান। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকাম কর্মী, মনোধর্মী জ্ঞানী এবং অষ্টাঙ্গ যোগীর অনুভূতির অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করেছেন। এদের উপলব্ধি, সময় এবং শক্তির অপচয় মাত্র।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম প্রদর্শন করেছেন। বৈষ্ণব যখন কোন দেবদেবীর মন্দিরে যান, তখন তার সেই দেবদেবী দর্শন এবং মায়াবাদীদের দেবদেবী দর্শন,—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—শিবমন্দিরে বৈষ্ণবের শিব-বিগ্রহ দর্শন, অবৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন থেকে ভিন্ন। অবৈষ্ণবেরা মনে করে যে, প্রেমের বিগ্রহ একটি কল্পিত রূপ, কেননা তারা মনে করে যে পরমতত্ত্ব নিরাকার এবং নির্বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শনে শিব এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান। এই সম্পর্কে দুধ এবং দধির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। দধিও প্রকৃতপক্ষে দুধই কিন্তু সেই সঙ্গে তা ঠিক দুধ নয়। অর্থাৎ, দুধ ও দইয়ের মধ্যে নিত্য ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক বর্তমান। এইটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন, এবং তা *ভগবদ্গীতার* (৯/৪) নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে প্রতিপন্ন হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিত ॥

"আমার অব্যক্ত মূর্তিতে আমি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত, সমস্ত জীব আমার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নেই।"

পরমতত্ত্ব ভগবান হচ্ছেন সবকিছু, কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে সবকিছু ভগবান। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা সমস্ত দেব-দেবীর মন্দিরে যান, তারা এই সমস্ত দেবদেবীদের নির্বিশেষবাদীদের মতো দর্শন করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-অনুসরণ করে সকলেরই সমস্ত মন্দিরে যাওয়া উচিত। কখনও কখনও জড়বাদী সহজিয়ারা অনুমান করে যে, গোপীদের কাত্যায়ণী দেবীর পূজা এবং বিষয়াসক্ত মানুষদের কালীপূজা একই ব্যাপার। কিন্তু গোপীরা কাত্যায়ণী দেবীর কাছে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। জড়বাদীরা কালীমন্দিরে যায় কোন জড়বস্তু লাভের আশায়। এইটিই ভক্ত এবং অভক্তের উপাসনার পার্থক্য।

গুরু-পরম্পরার-ধারায় শ্রৌতপন্থার মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে তর্কপন্থীরা 'হেনোথিষ্ট' বা পঞ্চ-উপাসনার মতবাদ তৈরি করে। অর্থাৎ তারা মনে করে যে—বাহ্য জগতে ঐশ্বর্যের বিভিন্ন অনুভূতির অন্যতম বলে ধ্যান করে পাঁচটি উপাস্য দেবতার একটিকে 'পরমেশ্বর' বলে বিশ্বাস করে নিলেই হল, এই সমস্ত কেবল কল্পনা মাত্র; এবং চরমে ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় এই সমস্ত রূপ আর থাকবে না, তখন কেবল নিরাকার ব্রহ্মেরই দর্শন হবে। এই ধরনের দার্শনিক অনুমান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বৈষ্ণবেরা স্বীকার করেন না। নির্বিশেষবাদী নাস্তিকেরা অগণিত রূপের কল্পনা করতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকেই স্বীকার করেন। মায়াবাদীদের এই কল্পিত রূপের উপাসনা

পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা পূজা; তাই পরবর্তীকালে 'নির্বিশেষবাদে' পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণ দর্শনের অভাবের ফলে জীব অবৈষ্ণব হয়ে পঞ্চ উপাসক হয়, কখনও বা নাস্তিক হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে পরমার্থ-সাধনের পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন। সে সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (৮/২৭৪) বলা হয়েছে—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥

"মহাভাগবত অবশ্যই স্থাবর ও জঙ্গম, উভয় প্রকার জীবকেই দর্শন করেন, কিন্তু তিনি তাদের রূপ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, সর্বত্র তিনি পরমেশ্বর ভগবানকেই দর্শন করেন। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে দর্শন করে বৈষ্ণবেরা তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করেন।"

শ্লোক ৩৬১

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' ।
মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৩৬১ ॥

শ্লোকার্থ

দয়া করে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-লীলা শ্রবণ করুন এবং মাৎসর্য পরিত্যাগ করে মুখে 'হরি' 'হরি' বলুন।

শ্লোক ৩৬২

এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই কহে মর্ম ॥ ৩৬২ ॥

শ্লোকার্থ

বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অনুগমন করা ছাড়া কলিকালে আর কোন ধর্ম নেই। সমস্ত শাস্ত্রের এইটিই হচ্ছে মর্মকথা।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং ভক্তিশাস্ত্র, এই দুইয়ের প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। কেউ যদি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি মাৎসর্যশূন্য হতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* নির্মৎসরদের জন্য (*নির্মৎসরাণাং সতাম্*)। এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, সকলেরই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা উচিত। এটাই জীবের নিত্য ধর্মের সারমর্ম, যাকে বলা হয় সনাতন-ধর্ম। প্রকৃত বৈষ্ণব ভগবানের শুদ্ধভক্ত এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলতে বোঝায় শ্রুতি বা বেদ, যাকে বলা হয় শব্দ-প্রমাণ। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক শাস্ত্রের অনুগমন করে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তাহলে তিনি অপ্রাকৃত

পরম্পরায় অধিষ্ঠিত হন। যারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তাদের অবশ্যই এই পন্থা অনুসরণ করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৯/১৭) তাই বলা হয়েছে—

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥

"বৈদিক শাস্ত্রে,—প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, ইতিহাস এবং অনুমান এই চার প্রকার প্রমাণ রয়েছে। পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে, সকলকে এগুলির উপর নির্ভর করা উচিত।"

শ্লোক ৩৬৩

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ, গম্ভীর ।
প্রবেশ করিতে নারি,—স্পর্শি রহি' তীর ॥ ৩৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অন্তহীন এবং গভীর। তাতে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, তাই তীরে দাঁড়িয়ে আমি তা কেবল স্পর্শ করি।

শ্লোক ৩৬৪

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন ।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রদ্ধা-সহকারে যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা যতই শ্রবণ করেন এবং বিচার করেন, ততই তিনি ভগবৎ-প্রেমরূপ মহাসম্পদ লাভ করেন।

শ্লোক ৩৬৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় নিরন্তর কামনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

যথারীতি শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটন' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং বৈষ্ণবসহ মিলন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে তীর্থ পর্যটন করছিলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর সঙ্গে কোন প্রকারে মহারাজের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এসে কাশী মিশ্রের গৃহে বাস করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার জন্য তার আর এক পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে মহাপ্রভুর কাছে রাখেন। মহাপ্রভু কালা কৃষ্ণদাসের ভট্টথারির সম্বন্ধ-জনিত কলুষের কথা পার্ষদদের বলেন এবং তাকে বিদায় দেবার প্রস্তাব করলে নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তরা যুক্তি করে তাকে দিয়ে নবদ্বীপে এবং গৌড়দেশে সর্বত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের সংবাদ পাঠালেন। নবদ্বীপ-আদি স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তরা প্রভুর দর্শনে আসবার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। সেই সময় পরমানন্দপুরী নদীয়া নগরে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে পৌঁছানোর সংবাদ শ্রবণ করে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে পৌঁছান। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য বারাণসীতে 'চৈতন্যানন্দ' নামক গুরুর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, নিজেই 'স্বরূপ' নাম গ্রহণ করে নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে এসে উপস্থিত হন। শ্রীঈশ্বরপুরীর অপ্রকটের পর তাঁর সেবক 'গোবিন্দ' তাঁর আজ্ঞা অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছান। কেশবভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভারতী—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মান্য; তিনি উপস্থিত হলে মহাপ্রভু কৃপা করে তাঁর চর্মাম্বর ছাড়ালেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ তাঁর মাহাত্ম্য জানতে পেরে তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলে সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু সার্বভৌম যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করেন তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথাকে 'অতিস্তুতি' বলে অনাদর করেন। ইতিমধ্যে, কাশীশ্বর গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এই পরিচ্ছেদে সমুদ্রে নদ-নদীর মিলনের মতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে বহু দেশের ভক্তদের মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

তম্—তাঁকে; বন্দে—আমি বন্দনা করি; গৌর—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; জলদম্—জলভরা মেঘ; স্বস্য—তাঁর নিজের; যঃ—যিনি; দর্শন-অমৃতৈঃ—তাঁর দর্শনরূপ অমৃতের দ্বারা; বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদরূপ; অবগ্রহ—বৃষ্টির অভাব; ম্লান—মলিন; ভক্ত—ভক্ত; শস্যানি—শস্যসমূহ; অজীবয়ৎ—প্রাণ দান করে রক্ষা করেছিলেন।

অনুবাদ

যিনি তাঁর দর্শনরূপ অমৃত বর্ষণ করে বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিজনিত মলিন ভক্ত-শস্যদের জীবন দান করেছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

পূর্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্বভৌমে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে তীর্থ পর্যটন করতে গিয়েছিলেন, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তার প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন।

শ্লোক ৪

বসিতে আসন দিল করি' নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বসতে আসন দিলেন, এবং তাঁর কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৫

শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো মহা-কৃপাময় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "আমি শুনলাম যে, আপনার গৃহে গৌড়বঙ্গ থেকে এক মহাকৃপাময় মহাপুরুষ এসেছেন।

শ্লোক ৬

তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্বজন।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সকলেই বলছে যে তিনি আপনাকে বহু কৃপা করেছেন। কৃপা করে আপনি আমাকে তাঁর দর্শন করান।"

শ্লোক ৭

ভট্ট কহে,—যে শুনিলা সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "আপনি যা শুনেছেন তা সত্য, কিন্তু আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটানো খুবই কঠিন।

শ্লোক ৮

বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি একজন বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং তিনি নির্জনে থাকেন; স্বপ্নেও তিনি রাজ-দর্শন করেন না।

শ্লোক ৯

তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তবুও কোনপ্রকারে আমি আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার করাতাম। কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ-ভারতে গমন করেছেন।"

শ্লোক ১০-১১

রাজা কহে,—জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা।
ভট্ট কহে,—মহান্তের এই এক লীলা ॥ ১০ ॥

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি নীলাচল ছেড়ে কেন চলে গেলেন?" ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "মহাপুরুষদের লীলাই এইরকম। তীর্থ পবিত্র করার জন্য তাঁরা তীর্থ ভ্রমণ করেন, এবং সেই ছলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের উদ্ধার করেন।"

শ্লোক ১২

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১২ ॥

ভবৎ—আপনার; বিধাঃ—মতো; ভাগবতাঃ—ভগবদ্ভক্তগণ; তীর্থী—তীর্থসমূহ; ভূতাঃ—অবস্থিত; স্বয়ম্—নিজেরাই; বিভো—হে সর্বশক্তিমান; তীর্থী-কুর্বন্তি—তীর্থে পরিণত করেন; তীর্থানি—তীর্থসমূহকে; স্ব-অন্তঃ-স্থেন—তাঁদের স্বীয় হৃদয়স্থিত; গদাভৃতা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা।

অনুবাদ

'আপনার মতো ভাগবতেরা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। তাঁদের পবিত্রতার জন্য ভগবান সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাই তাঁরা পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্র করেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/১০) বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তি। এই শ্লোকটি আদিলীলায়ও (১/৬৩) রয়েছে।

শ্লোক ১৩

বৈষ্ণবের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল ।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তীর্থ পবিত্র করার জন্য তীর্থ ভ্রমণ এবং সেই ছলে জড়-আবদ্ধ মানুষদের উদ্ধার করা,—বৈষ্ণবের এই একটি নিশ্চল স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'জীব' নন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তবুও প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হয়ে তিনি বৈষ্ণবের মতো আচরণ করছেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন, "ভগবানের শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণ তীর্থ গমন করে তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিক মানুষদের সেই তীর্থগমন-

ছলে উদ্ধার করেন—এইটি পরদুঃখ-দুঃখী শুদ্ধভক্তের নিত্য স্বভাব। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরতন্ত্র-ভক্ত-বুদ্ধিতে লীলাবিলাস করলেও তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য-মুক্ত।"

শ্লোক ১৪

রাজা কহে,—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে ।
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "আপনি কেন তাঁকে যেতে দিলেন? কেন তাঁর পায়ে পড়ে যত্ন করে তাঁকে আপনি এখানে রাখলেন না?"

শ্লোক ১৫

ভট্টাচার্য কহে,—তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র—তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কারও অধীন নন।

শ্লোক ১৬

তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈলুঁ ।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, রাখিতে নারিলুঁ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তবুও তাঁকে এখানে রাখার বহু চেষ্টা আমি করেছি, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র, তাই আমি তাঁকে এখানে ধরে রাখতে পারলাম না।"

শ্লোক ১৭

রাজা কহে,—ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি ।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ, তাতে সত্য মানি ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "ভট্টাচার্য, আপনি বিজ্ঞশিরোমণি তাই আপনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলছেন, তখন আমি তা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি।

তাৎপর্য

এইভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হয়। পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে হলে আচার্য বা সদ্‌গুরুর বাক্য মেনে নিতে হয়। সেটিই সাফল্য লাভের প্রকৃত পন্থা। কিন্তু গুরুরূপে

তাঁকেই বরণ করতে হবে, যিনি ভগবানের অনন্য ভক্ত এবং নিষ্ঠা সহকারে যিনি পূর্বতন আচার্যদের নির্দেশ অনুসরণ করছেন। সেই রকম সদ্‌গুরুর বাক্য শিষ্যকে মানতে হবে; তাহলেই সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। সেইটিই বৈদিক পন্থা।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন একজন তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ, আর প্রতাপরুদ্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় রাজারা নিষ্ঠাভরে ব্রাহ্মণ ও সাধুদের নির্দেশ মেনে চলতেন এবং এইভাবে তারা তাদের রাজ্য শাসন করতেন। তেমনই বৈশ্যরা রাজার নির্দেশ মেনে চলতেন এবং শূদ্রেরা তিনটি উচ্চবর্ণের সেবা করতেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতেন। তার ফলে সমাজ শান্তিপূর্ণ ছিল, এবং মানুষেরা কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ ছিলেন। এইভাবে আনন্দময় জীবন যাপন করে জীবনান্তে তারা তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতেন।

শ্লোক ১৮

পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন ।
একবার দেখি করি' সফল নয়ন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আবার যদি তিনি এখানে আসেন, তাহলে একবার তাঁকে দর্শন করে আমি আমার নয়ন সার্থক করব।"

শ্লোক ১৯

ভট্টাচার্য কহে,—তেঁহো আসিবে অল্পকালে ।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আসবেন। তাঁর থাকার জন্য আমি একটি নির্জন স্থান চাই।

শ্লোক ২০

ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জনে ।
এমত নির্ণয় করি' দেহ এক স্থানে ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথদেবের মন্দিরের কাছে অথচ নির্জন, এরকম একটি স্থান আপনি আমাকে নির্ণয় করে দিন।"

শ্লোক ২১

রাজা কহে,—ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন ।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ উত্তর দিলেন, "কাশীমিশ্রের ভবন জগন্নাথদেবের মন্দিরের কাছেই, অথচ স্থানটি পরম নির্জন।"

শ্লোক ২২

এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ।
ভট্টাচার্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্র উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন কাশীমিশ্রকে গিয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সেই বাসনার কথা জানালেন।

শ্লোক ২৩

কাশীমিশ্র কহে,—আমি বড় ভাগ্যবান্ ।
মোর গৃহে 'প্রভুপাদের' হবে অবস্থান ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে কাশীমিশ্র বললেন, "আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, প্রভুপাদ (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) আমার গৃহে অবস্থান করবেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে 'প্রভুপাদ' শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সমস্ত অনুগত জনেরা তাঁকে প্রভুপাদ বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বহু প্রভু আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।" শুদ্ধ বৈষ্ণবকে প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়; এবং এই সম্বোধন করা একটা বিশেষ বৈষ্ণব-আচার। অনেক প্রভু যখন অন্য কোন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে 'প্রভুপাদ' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকেও 'প্রভুপাদ' বলে সম্বোধন করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, এঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব তাই তাঁরা সমস্ত জীবেরই নিত্য আশ্রয়। শ্রীবিষ্ণু সকলেরই নিত্য প্রভু, এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রতিনিধি তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক। সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুদেব তাঁর শিষ্যের কাছে সাক্ষাৎ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বা 'হরি'-স্বরূপ বলে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বা 'প্রভুপাদ'। তাছাড়া অপর শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধ বৈষ্ণব মাত্রই, সমগ্র শীর্ষস্থানীয় জীবের কাছে 'শ্রীপাদ' নামে অভিহিত। কিন্তু গুরুদেব বৈষ্ণব এবং তাদের অঙ্গীকৃত শিষ্য, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে পূজ্যতত্ত্ব 'প্রভু'-শব্দ বাচ্য। এই সৎ-সিদ্ধান্তের প্রচুর ব্যবহার *শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত* আদি গ্রন্থে ও শুদ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়।

প্রাকৃত সহজিয়ারা 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। তারা মনে করে যে, জাত-গোসাঞিরা কেবল প্রভুপাদ পদবাচ্য। এই ধরনের মূর্খ সহজিয়ারা মুখে 'বৈষ্ণবদাসানুদাস' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের দ্বারা দৈন্যের ছলনা বা কপটতা করে। কিন্তু, শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তারা 'প্রভুপাদ' বলে সম্বোধন করার বিরোধিতা করে। অর্থাৎ তারা যথার্থ 'প্রভুপাদ' বা সদ্‌গুরুর প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ। তারা সদ্‌গুরুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে অথবা সদ্‌গুরুতে জাতিবুদ্ধি করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ধরনের সহজিয়াদের সবচাইতে দুর্ভাগা বলে বর্ণনা করেছেন; কেননা তাদের এই অপরাধের ফলে তারা নরকগামী হয়।

শ্লোক ২৪

এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে জগন্নাথপুরীর সমস্ত অধিবাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন।

শ্লোক ২৫

সর্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল ।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহি আইল ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সকলের উৎকণ্ঠা যখন প্রবলভাবে বর্ধিত হল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত থেকে ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

শুনি' আনন্দিত হৈল সবাকার মন ।
সবে আসি' সার্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ ২৬ ॥
প্রভুর সহিত আমা-সবার করাহ মিলন ।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং তারা সকলে গিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে নিবেদন করলেন—"দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিন। আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল তাঁর চরণাশ্রয় লাভ করা যায়।"

শ্লোক ২৮

ভট্টাচার্য কহে,—কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ।
প্রভু যাইবেন, তাহাঁ মিলাব সবারে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাদের বললেন—"কাল শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যাবেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আপনাদের সকলের সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।"

শ্লোক ২৯

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্যের সঙ্গে ।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

পরদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহারঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করলেন।

শ্লোক ৩০

মহাপ্রসাদ দিয়া তাহাঁ মিলিলা সেবকগণ ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবের সমস্ত সেবকেরা জগন্নাথের মহাপ্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাদের সকলকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৩১-৩২

দর্শন করি' মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে ।
ভট্টাচার্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥ ৩১ ॥
কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে ।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে কাশীমিশ্রের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। কাশী মিশ্র তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তার গৃহসহ-আত্মা তাঁকে নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৩৩

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্তি তাঁরে দেখাইল ।
আত্মসাৎ করি' তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন কাশীমিশ্রকে তাঁর চতুর্ভুজ-রূপ দেখালেন। তারপর আত্মসাৎ করে তিনি তাকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৩৪

তবে মহাপ্রভু তাহাঁ বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে তাঁর আসনে বসলেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভু প্রমুখ ভক্তরা তাঁর চারপাশে বসলেন।

শ্লোক ৩৫

সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব-সমাধান ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই স্থানটি দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুখী হলেন। সেখানে তাঁর প্রয়োজনগুলির সমাধান হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

সার্বভৌম কহে,—প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর,—কাশীমিশ্রের আশা ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে তখন বললেন, "প্রভু, এই স্থানটি আপনার বাসের উপযোগী। আপনি দয়া করে এখানে থাকুন, সেটি কাশীমিশ্রের আশা।"

শ্লোক ৩৭

প্রভু কহে,—এই দেহ তোমা-সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই সম্মত আমার ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এই দেহটি তোমাদের সকলের। তাই তোমরা যা বলবে, তাতেই আমি সম্মত।"

শ্লোক ৩৮

তবে সার্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি'।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ডান পাশে বসে, সমস্ত পুরুষোত্তমবাসীদের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

এই সব লোক, প্রভু, বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৯ ॥
তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার।
তৈছে এই সব,—সবে কর অঙ্গীকার ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "প্রভু, এই সমস্ত নীলাচলবাসী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছে। তৃষ্ণার্ত চাতক যেভাবে হাহাকার করে, এরাও সেভাবে হাহাকার করছে! দয়া করে আপনি এদের অঙ্গীকার করুন!

শ্লোক ৪১

জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—জনার্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রথমে জনার্দনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,—"ইনি হচ্ছেন জনার্দন, ইনি জগন্নাথের সেবক। 'অনবসরে' ইনি জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গের সেবা করেন।"

তাৎপর্য

স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রার দিন পর্যন্ত পনের দিন জগন্নাথদেব মন্দিরে অনুপস্থিত থাকেন, সেই সময়টিকে বলা হয় 'অনবসর'। জনার্দন, যার সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গের সেবা করেন। সেই সময় জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ নতুন করে সাজান হয়, এবং এই উৎসবকে বলা হয় 'নব-যৌবন'।

শ্লোক ৪২

কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী।
শিখি মাহাতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সার্বভৌম ভট্টাচার্য কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে

বললেন, এর নাম কৃষ্ণদাস, ইনি জগন্নাথের সুবর্ণ-বেত্র ধারণ করেন। আর ইনি হচ্ছেন শিখি মাহাতি; ইনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে 'লিখনাধিকারী'।

তাৎপর্য

দেউলকরণ পদপ্রাপ্ত কর্মচারী, যিনি মাতৃলা-পাঁজি লিখে থাকেন, তাকে বলা হয় 'লিখন-অধিকারী'।

শ্লোক ৪৩

প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব প্রধান ।
জগন্নাথের মহা-সোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি হচ্ছেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র, একজন মহান বৈষ্ণব; ইনি জগন্নাথদেবের একজন মহান সেবক এবং এঁর নাম 'দাস'।

তাৎপর্য

উড়িষ্যার বহু ব্রাহ্মণের উপাধি 'দাস'। সাধারণত ব্রাহ্মণদের 'দাস' উপাধি হয় না, কিন্তু উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের দাস্যসূচক এই 'দাস' উপাধি। প্রকৃতপক্ষে সকলেই দাস, কেননা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। সেই সূত্রে দাস-উপাধিতে ব্রাহ্মণদেরই সর্বাগ্রে অধিকার। এই সিদ্ধান্তটি চুল্লি-ভট্ট-সম্মত।

শ্লোক ৪৪

মুরারি মাহাতি ইঁহ—শিখিমাহাতির ভাই ।
তোমার চরণ বিনু আর গতি নাই ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি হচ্ছেন শিখি মাহাতির ভাই মুরারি মাহাতি। তোমার চরণ ছাড়া এর আর কোন গতি নেই।

শ্লোক ৪৫

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ।
বিষ্ণুদাস,—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি চন্দনেশ্বর, ইনি সিংহেশ্বর, ইনি মুরারি ব্রাহ্মণ এবং ইনি বিষ্ণুদাস—এরা সকলেই নিরন্তর তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন।

শ্লোক ৪৬

প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি মহামতি প্রহররাজ মহাপাত্র, আর ইনি তার সঙ্গী পরমানন্দ মহাপাত্র।

তাৎপর্য

উড়িষ্যার রাজাদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টি কাল থেকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী সিংহাসনে আরোহণ বা অভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত এক প্রহর-কাল রাজ-পুরোহিত-বংশের কোন ব্যক্তি সিংহাসন আরোহণ করে রাজদণ্ড ধারণ করলেন, যাতে রাজ-সিংহাসন শূন্য অবস্থায় পড়ে না থাকে। সেই পুরোহিতদেরই বংশানুক্রমে 'প্রহররাজ' বলা হয়।

শ্লোক ৪৭

এ-সব বৈষ্ণব—এই ক্ষেত্রের ভূষণ ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত বৈষ্ণব জগন্নাথ পুরীর অলঙ্কার। এরা সকলেই একান্তভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন।"

শ্লোক ৪৮

তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর, তারা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৪৯

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায় ।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় চার পুত্র সঙ্গে নিয়ে ভবানন্দ রায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন।

তাৎপর্য

ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র, তাদের একজন হচ্ছেন মহান শ্রীরামানন্দ রায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ-ভারত থেকে জগন্নাথপুরীতে ফিরে এলেন তখন ভবানন্দ রায়ের

সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামানন্দ রায় তখনও রাজকার্যে যুক্ত ছিলেন; তাই ভবানন্দ রায় যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন তিনি তাঁর অন্য চার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের নাম—বাণীনাথ, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি। ভবানন্দ রায় এবং তাঁর পাঁচ পুত্রের বর্ণনা আদিলীলায় (১০/১৩৩-১৩৪) রয়েছে।

শ্লোক ৫০

সার্বভৌম কহে,—এই রায় ভবানন্দ ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "ইনি ভবানন্দ রায়। এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দ রায়।"

শ্লোক ৫১

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
স্তুতি করি' কহে রামানন্দ-বিবরণ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করলেন এবং অনেক প্রশংসা করে তিনি তাকে রামানন্দ রায়ের কথা বললেন।

শ্লোক ৫২

রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয় ।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায় ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়ের প্রতি স্তুতি করে বললেন, "রামানন্দের মতো রত্ন যার পুত্র, তার মহিমা এ জগতে বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ৫৩

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী ।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি সাক্ষাৎ মহারাজ পাণ্ডু, এবং আপনার পত্নীই হচ্ছেন কুন্তীদেবী। আপনার পাঁচটি মহামতি পুত্র হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব।"

শ্লোক ৫৪

রায় কহে,—আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম ।
তবু তুমি স্পর্শ,—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই স্তুতি-বাক্য শুনে ভবানন্দ বললেন, "আমি শূদ্র এবং বিষয়ী-অধম। এত অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে স্পর্শ করছেন। আপনার এই করুণাই প্রমাণ করে যে আপনি স্বয়ং ভগবান।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর এবং চণ্ডাল, এদের সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।"

পারমার্থিক মার্গে যারা অনেক উন্নত, তারা মানুষের জড়জাগতিক অবস্থার কোন গুরুত্ব দেন না। অতি উচ্চ চিন্ময়স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি চিন্ময় পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে দর্শন করেন, তাই তিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণ, কুকুর, চণ্ডাল, অথবা অন্য সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি জড় শরীরটি দর্শন করেন না, চিন্ময় আত্মাকে দর্শন করেন। তাই ভবানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করে বলেছিলেন, তিনি (ভবানন্দ রায়) শূদ্র ও বিষয়ী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে অবজ্ঞা করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাকে আলিঙ্গন দান করে ধন্য করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায় ও তার পুত্র রামানন্দ রায় প্রমুখদের অতি উন্নত পারমার্থিক স্থিতির কথাই বিচার করেছিলেন। ভগবানের সেবকদেরও মনোভাব এরকমই। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত জীবকে আশ্রয় দান করেন। সদ্গুরু সমস্ত মানুষকেই উদ্ধার করেন এবং পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে অনুপ্রাণিত করেন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলে জন্ম সার্থক হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) বলা হয়েছে—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা আভীর-শুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেহন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভা, যবন, খস ইত্যাদি জাতি এবং অন্য সকলে যারা নানারকম পাপকর্মে লিপ্ত, তারাও ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় গ্রহণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হতে পারে। সেই মহান ভক্তের শ্রীচরণে আমার প্রণতি নিবেদন করি।"

যিনি পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধভক্তের শরণ গ্রহণ করেন, তিনিই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, নীচ কুলোদ্ভূত স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি আমার শরণাগত হয়, তাহলে তারাও পরমগতি লাভ করে।"

শ্লোক ৫৫

নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে ।
আত্মা সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার স্বীকৃতি প্রদর্শন করে ভবানন্দ রায় বললেন, "আমার গৃহ, ধন-সম্পদ, বিত্ত এবং পঞ্চপুত্রসহ আমি নিজেকে তোমার চরণে সমর্পণ করলাম।

তাৎপর্য

এইটিই শরণাগতির পন্থা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

"মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর ॥"

কেউ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তখন তার যা আছে সেই সব কিছু দিয়ে—তার গৃহ, তার দেহ, তার মন সবকিছু তাঁর চরণে নিবেদন করে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন। ভগবানের শরণাগত হওয়ার পথে যা কিছু প্রতিবন্ধক অর্থাৎ যা কিছু আসক্তি তা সবই তৎক্ষণাৎ ভগবানের চরণে নিবেদন করতে হয়। কেউ যদি তার পরিবারের সকলকে নিয়ে ভগবানের শরণাগত হন, তাহলে তার সন্ন্যাস গ্রহণ করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তথাকথিত পরিবারের সদস্যরা যদি ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ তাদের ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ৫৬

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে ।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভবানন্দ রায় বললেন, "আমার এই পুত্র বাণীনাথকে আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলাম। আপনি যখন তাকে যা আদেশ করবেন, সেই অনুসারে সে সর্বক্ষণ আপনার সেবা করবে।"

শ্লোক ৫৭

আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে ।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আমাকে আপনার আত্মীয় বলে মনে করুন। আপনি নিঃসঙ্কোচে যখন যা ইচ্ছা হবে সেই আদেশ দেবেন।"

শ্লোক ৫৮

প্রভু কহে,—কি সঙ্কোচ, তুমি নহ পর ।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভবানন্দ রায়কে বললেন, "তোমার সঙ্গে আমার সঙ্কোচ কি? তুমি আমার পর নও। জন্মে জন্মে সবংশে তুমি আমার দাস।

শ্লোক ৫৯

দিন-পাঁচ-সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পাঁচ-সাত দিনের ভিতর রামানন্দ রায় এখানে আসবে; এবং সে এলে তার সঙ্গলাভে আমার আনন্দ পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।"

শ্লোক ৬০

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করলেন, এবং তার পুত্রদের মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করালেন।

শ্লোক ৬১

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল ।
বাণীনাথ-পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে তার গৃহে পাঠালেন, এবং বাণীনাথ পট্ট-নায়ককে তাঁর কাছে রাখলেন।

শ্লোক ৬২

ভট্টাচার্য সব লোকে বিদায় করাইল ।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন সকলকে বিদায় দিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসকে ডাকালেন।

শ্লোক ৬৩-৬৫

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য, শুনহ ইঁহার চরিত ৷
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥ ৬৩ ॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া ৷
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলুঁ উদ্ধারিয়া ॥ ৬৪ ॥
এবে আমি ইহাঁ আনি' করিলাঙ বিদায় ৷
যাহাঁ ইচ্ছা, যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "ভট্টাচার্য, এই লোকটির চরিত্র কেমন শোন—সে আমার সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে গিয়েছিল। কিন্তু সে যখন আমাকে ছেড়ে ভট্টথারিদের কাছে চলে যায়, তখন আমি একে ভট্টথারিদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। এখন আমি একে বিদায় দিতে চাই। তার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক। এর প্রতি আর আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই।"

তাৎপর্য

কালাকৃষ্ণদাসকে ভট্টথারি নামক যাযাবরেরা স্ত্রীলোকের প্রলোভন দেখিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। মায়া এত প্রবল যে—কালাকৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করে, যাযাবর রমণীদের সঙ্গ করতে গিয়েছিল। জীব তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের ফলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও মায়ার দ্বারা প্রলোভিত হয়ে, মহাপ্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে। মায়ার প্রভাবে যে সম্পূর্ণভাবে মোহিত হয়েছে, সেই দুর্ভাগাই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে। অত্যন্ত সাবধান না হলে, মায়া যে কাউকে তার কাছে টেনে নিতে পারে, এমনকি তিনি যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবকও হন, তাকেও। সুতরাং অন্যদের আর কি কথা? ভট্টথারিরা তাদের স্ত্রীলোকদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। এর থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ভগবানের সঙ্গ থেকে যে কেউ, যে কোন সময়ে অধঃপতিত হতে পারে। কেবল তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের একটু অপব্যবহার করলেই হল। ভগবানের সঙ্গ থেকে একবার বিচ্ছিন্ন হলে, জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও কালা কৃষ্ণদাসকে বর্জন করেছিলেন, তবুও তাকে আর একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হবে।

শ্লোক ৬৬

এত শুনি' কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিল ৷
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি' গেল ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে কালাকৃষ্ণদাস ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার সেই ক্রন্দনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে মধ্যাহ্ন করতে গেলেন।

শ্লোক ৬৭

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ৷
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুকুন্দ এবং দামোদর পণ্ডিত, এই চারজনে মিলে যুক্তি করে একটি পরিকল্পনা করলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানও যদি কাউকে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাঁকে পরিত্যাগ করেন না। তাই ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের থেকেও অধিক কৃপালু। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পাঞাছে কেবা"। কখনও কখনও ভগবান অত্যন্ত কঠোর হতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই দয়াময়। তাই কালাকৃষ্ণদাস এইভাবে উপরোক্ত চারজন ভক্তের কৃপা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৮-৭০

গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন ৷
'আই'কে কহিবে যাই, প্রভুর আগমন ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ৷
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন ॥ ৬৯ ॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাঞা ৷
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এই চারজন ভগবদ্ভক্ত বিবেচনা করলেন, "শচীমাতাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাগমনের কথা জানাবার জন্য আমরা কাউকে গৌড়-বঙ্গে পাঠাতে চাই। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীবাস প্রভু প্রমুখ সমস্ত ভক্তরাও তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে জগন্নাথপুরীতে আসবেন। সুতরাং এই কৃষ্ণদাসকে দিয়ে আমরা গৌড়ে খবর পাঠাব।" এই বলে তারা কালাকৃষ্ণদাসকে আশ্বাস দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে পরিত্যাগ করেছেন বলে, কালাকৃষ্ণদাস অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন

করতে শুরু করেন। তাই ভগবদ্ভক্তেরা তার প্রতি কৃপা-পরায়ণ হয়ে তাকে আশ্বাস দেন এবং ভগবানের সেবা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন।

শ্লোক ৭১-৭৩

আর দিনে প্রভুস্থানে কৈল নিবেদন ।
আজ্ঞা দেহ' গৌড়-দেশে পাঠাই একজন ॥ ৭১ ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি' শচী 'আই' ।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই' ॥ ৭২ ॥
একজন যাই' কহুক্ শুভ সমাচার ।
প্রভু কহে,—সেই কর, যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন সমস্ত ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, "তুমি যদি আদেশ দাও তাহলে আমরা কাউকে বঙ্গদেশে পাঠাই। তোমার দক্ষিণে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে শচীমাতা এবং অদ্বৈতাদি ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রয়েছেন। একজন কেউ গিয়ে তোমার ফিরে আসার শুভ সংবাদ দান করুক। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর।"

শ্লোক ৭৪

তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল ।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তারা সেই কালাকৃষ্ণদাসকে বঙ্গদেশে পাঠালেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে মহাপ্রসাদ দিলেন।

শ্লোক ৭৫-৭৬

তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস ।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ ॥ ৭৫ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার ।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু,—কহে সমাচার ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন কালাকৃষ্ণদাস গৌড়দেশে নবদ্বীপে শচীমাতার কাছে এলেন। তাঁকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দিয়ে প্রণতি নিবেদন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ থেকে ফিরে আসার সংবাদ দিলেন।

শ্লোক ৭৭-৮০

শুনিয়া আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন ।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
অদ্বৈত-আচার্য-গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥
আচার্যেরে প্রসাদ দিয়া করি' নমস্কার ।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৯ ॥
শুনি' আচার্য-গোসাঞির আনন্দ হইল ।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্য-গীত কৈল ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শুভ সংবাদ পেয়ে শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিতা হলেন এবং শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ নবদ্বীপের সমস্ত ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে পরম উল্লসিত হলেন। তারপর কালাকৃষ্ণদাস শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে গিয়ে, তাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দিয়ে প্রণতি নিবেদন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত সংবাদ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তা শুনে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহা আনন্দ হল এবং প্রেমাবেশে হুঙ্কার করে তিনি বহুক্ষণ নৃত্য-গীত করলেন।

শ্লোক ৮১-৮৫

হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, সেন শিবানন্দ ॥ ৮১ ॥
আচার্যরত্ন, আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
আচার্যনিধি, আর পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮২ ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত, আর পণ্ডিত দামোদর ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত, আর বিজয়, শ্রীধর ॥ ৮৩ ॥
রাঘবপণ্ডিত, আর আচার্য নন্দন ।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ ॥ ৮৪ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
সবে মেলি' গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শুভ সংবাদ পেয়ে হরিদাস ঠাকুরের পরম আনন্দ হল! বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্যরত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য নিধি, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীরাম-

পণ্ডিত এবং শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীমন্ পণ্ডিত, বিজয়, শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্যের পুত্র আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যত ভক্ত ছিলেন, সকলেই সেই সংবাদ পেয়ে পরম উল্লাসে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে এলেন।

শ্লোক ৮৬

আচার্যের সবে কৈল চরণ বন্দন ।
আচার্য-গোসাঁই সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারা সকলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন, এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন তাদের সকলকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৮৭

দিন দুই-তিন আচার্য মহোৎসব কৈল ।
নীলাচল যাইতে আচার্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু দু-তিন দিন ধরে মহোৎসব করলেন। তারপর তিনি সকলকে নিয়ে নীলাচলে যাওয়ার যুক্তি করলেন।

শ্লোক ৮৮

সবে মেলি' নবদ্বীপে একত্র হঞা ।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা নবদ্বীপে একত্রিত হলেন এবং শচীমাতার অনুমতি নিয়ে জগন্নাথপুরীতে চললেন।

শ্লোক ৮৯

প্রভুর সমাচার শুনি' কুলীনগ্রামবাসী ।
সত্যরাজ-রামানন্দ মিলিলা সবে আসি' ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ-রামানন্দ প্রমুখ সমস্ত ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ৯০

মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে ।
আচার্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ, নরহরি এবং রঘুনন্দন প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা নীলাচলে যাওয়ার জন্য শ্রীখণ্ড থেকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর কাছে এলেন।

শ্লোক ৯১

সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী ।
গঙ্গাতীরে-তীরে আইলা নদীয়া নগরী ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় পরমানন্দপুরীও দক্ষিণ ভারত থেকে গঙ্গার তীরে তীরে ভ্রমণ করে নদীয়া নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৯২

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম ।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী নবদ্বীপে শচীমাতার গৃহে এসে সুখে বিশ্রাম করলেন। শচীমাতা তাকে অনেক সম্মান করে ভিক্ষা দিলেন।

শ্লোক ৯৩

প্রভুর আগমন তেঁহ তাহাঞি শুনিল ।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতার গৃহে অবস্থান করার সময় পরমানন্দপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ নীলাচলে যেতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ৯৪

প্রভুর এক ভক্ত—'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম ।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বিজ কমলাকান্ত নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক ভক্ত ছিলেন। পরমানন্দপুরী তাঁকে নিয়ে নীলাচলে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৯৫

সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে ।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাঞা তাঁহারে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শীঘ্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন এবং তাকে পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হল।

শ্লোক ৯৬

প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমানন্দপুরীর পাদপদ্ম বন্দনা করলেন এবং পরমানন্দপুরী তাঁকে গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ৯৭

প্রভু কহে,—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ।
মোরে কৃপা করি' কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "আমার খুব ইচ্ছা যে, আপনার সঙ্গে থাকি। তাই আমাকে কৃপা করে আপনি জগন্নাথপুরী আশ্রয় করুন।"

শ্লোক ৯৮

পুরী কহে,—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি' ।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ নীলাচল-পুরী ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দপুরী উত্তর দিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। তাই আমি গৌড়বঙ্গ থেকে জগন্নাথপুরীতে এসেছি।

শ্লোক ৯৯-১০০

দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন ।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাঙ ত্বরিতে ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"দক্ষিণ থেকে তুমি ফিরে এসেছ শুনে শচীমাতা এবং সমস্ত ভক্তরা আনন্দিত হয়েছেন।

তারা সকলে তোমাকে দেখতে আসছে। কিন্তু তাদের আসার বিলম্ব দেখে আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

শ্লোক ১০১

কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর ।
প্রভু তাঁরে দিল, আর সেবার কিঙ্কর ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর থাকার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে একটি নিরিবিলি ঘর দিলেন এবং তাঁর সেবার জন্য একজন ভৃত্য দিলেন।

শ্লোক ১০২

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর ।
প্রভুর অত্যন্ত মর্মী, রসের সাগর ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন স্বরূপ দামোদরও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ভগবৎ-প্রেমরূপ রসের সাগর।

তাৎপর্য

'স্বরূপ' শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারীর নাম। বৈদিক-প্রথায় সন্ন্যাসীদের দশটি নামের প্রচলন রয়েছে। 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'-নামক সন্ন্যাসীদের সহকারীর নাম 'স্বরূপ'। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম আচার্যই 'দামোদর স্বরূপ' নামে 'ব্রহ্মচারী' আখ্যা লাভ করেন। সন্ন্যাস প্রাপ্ত হলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের 'স্বরূপ'—উপাধির পরিবর্তে সন্ন্যাস উপাধি—'তীর্থ' হয়। পুরুষোত্তম আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখে 'শিখা-সূত্র ত্যাগরূপ সন্ন্যাস' গ্রহণ করলেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম হল 'স্বরূপ দামোদর'। যোগপট্ট নেওয়ার যে প্রচলন ছিল তা তিনি গ্রহণ করলেন না। কেননা, কোন প্রকার আশ্রম-অহঙ্কার বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর সন্ন্যাস ছিল না; কেবল নিশ্চিন্তভাবে কৃষ্ণভজন করার জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০৩

'পুরুষোত্তম আচার্য' তাঁর নাম পূর্বাশ্রমে ।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর যখন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয়ে ছিলেন তখন তাঁর নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য।

শ্লোক ১০৪

প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা ।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দেখে উন্মত্ত হয়ে তিনিও বারাণসীতে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০৫

'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সন্ন্যাস-গুরু 'চৈতন্যানন্দ ভারতী' তাঁকে আদেশ দিলেন, "বেদান্ত পাঠ করে সকলকে বেদান্ত পড়াও।"

শ্লোক ১০৬-১০৮

পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত ।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৬ ॥
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে ।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥ ১০৭ ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর ছিলেন বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং পরম পণ্ডিত। তিনি কায়মনে 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত' আশ্রয় করেছিলেন। নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করার জন্য উন্মত্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, কিন্তু যোগপট্ট নিলেন না, তাই তাঁর নাম হল 'স্বরূপ'।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস গ্রহণের কতকগুলি বিধি রয়েছে। অষ্ট শ্রাদ্ধ, বিরজা হোম, শিখা মুণ্ডন, সূত্র ত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাস কৃত্য স্বরূপদামোদর সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি গৈরিক বসন, সন্ন্যাস নাম এবং দণ্ডগ্রহণের অপেক্ষা করেন নি। তাই তাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যসূচক 'দামোদর স্বরূপ' নাম থেকেই যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল জড় জাগতিক জীবন ত্যাগ করেছিলেন। তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের বিধিনিষেধ এবং অনুষ্ঠানের দ্বারা বিরক্ত হতে চাননি, তিনি কেবল নিশ্চিন্ত হয়ে কৃষ্ণভজন করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; সন্ন্যাস আশ্রমের অনুষ্ঠানগুলির প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার অর্থ, কোন কিছু না করা নয়; পক্ষান্তরে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। কেউ যখন সেই স্তরে উন্নীত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, উভয়ই। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/১) ভগবান বলেছেন—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

ভগবান বললেন—"কর্মফল আদি ত্যাগ করলেই যে সন্ন্যাসী হয়, সেরকম মনে করবে না, এবং দৈহিক চেষ্টাশূন্য হলে যে অষ্টাঙ্গ যোগী হয়, তাও নয়। কর্মফলের আশা ত্যাগ করে যিনি কর্তব্য কর্ম বলে সমস্ত কর্ম করেন তিনিই 'সন্ন্যাসী' এবং 'যোগী', উভয়ই।"

শ্লোক ১০৯

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে ।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গুরুর অনুমতি নিয়ে স্বরূপ দামোদর নীলাচলে আসেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দে বিহ্বল হন।

শ্লোক ১১০

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে ।
নির্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর ছিলেন পাণ্ডিত্যের অবধি, অর্থাৎ তাঁর মতো এত বড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না কিন্তু তিনি কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। তিনি একটি নির্জন স্থানে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারত না।

শ্লোক ১১১

কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর ছিলেন কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা, এবং তাঁর দেহ ছিল কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত প্রকাশ। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।

শ্লোক ১১২

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে ।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, পাছে প্রভু শুনে ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যখন কোন গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তা শোনাতে চাইতেন, তখন স্বরূপ দামোদর প্রথমে তা পরীক্ষা করে দেখতেন। তারপর সেগুলি তাঁর দ্বারা অনুমোদিত হলেই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা শুনতেন।

শ্লোক ১১৩

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস ।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

কোন রচনা যদি ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরোধী হত অথবা তাতে যদি রসাভাস থাকত, তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা শুনে আনন্দ পেতেন না।

তাৎপর্য

অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনই ভক্তিসিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধ যা তা-ই 'ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ'। 'রসাভাস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে রসের মতো বলে মনে হলেও যা রস নয়। এই দুই প্রকার অভক্তি থেকে আমাদের দূরে থাকা কর্তব্য। ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক এই দুইটি বস্তুই মায়াবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মায়াবাদ আদি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বাক্য শুনলে জীবের পতন হয়। রসাভাস আলোচনা করতে করতে 'প্রাকৃত সহজিয়া', 'বাউল' ও জড়রসে আসক্ত হয়ে পড়ে। এই দোষে যারা দূষিত, তাদের সঙ্গ করতে নিষেধ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখার কথা নির্দেশ করেছেন।

শ্লোক ১১৪

অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাই স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রথমে সমস্ত রচনাগুলির সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখতেন, এবং শুদ্ধ হলেই কেবল সেইগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শোনানো হত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "যাতে কৃষ্ণ ভজনের ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তই ভক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভক্তরা কখনই সেইপ্রকার অশুদ্ধ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করতে পারেন না। অভক্তরাই কেবল রসাভাস এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ অনুমোদন করে। এই সমস্ত অপসিদ্ধান্ত-অনুমোদনকারী কপট ভক্তকে কখনই শুদ্ধ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা রসাভাসপুষ্ট হয়ে যে সমস্ত কুমত আজ জগতে প্রচলিত হয়েছে, লোকাপেক্ষাযুক্ত হয়ে সাধারণের কাছে আদর লাভ করার জন্য যারা ভক্তি-বিরোধী অসৎ সিদ্ধান্তকে আদর করে, তারা 'গৌরগণ' বলে অভিমান করলেও শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাদের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলে স্বীকার করেন না এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যেতে দেন না।"

শ্লোক ১১৫

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দ গেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন।

শ্লোক ১১৬

সঙ্গীতে—গন্ধর্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর সঙ্গীতে ছিলেন গন্ধর্বের মতো সুদক্ষ, এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যায় দেবগুরু বৃহস্পতির মতো পারদর্শী। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর মতো মহামতি আর কেউ ছিলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী গীত-শাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী বলে এই 'দামোদর' নাম দিয়েছিলেন। 'দামোদর' নামের সঙ্গে তাঁর সন্ন্যাস গুরুর দেওয়া 'স্বরূপ' নাম সংযুক্ত হয়ে নাম হয়েছিল 'দামোদর স্বরূপ'। 'সঙ্গীত দামোদর' নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের একটি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেছেন।

শ্লোক ১১৭

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর—অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পরম প্রিয়তম ছিলেন, এবং শ্রীবাস ঠাকুর আদি ভক্তবৃন্দের তিনি প্রাণতুল্য ছিলেন।

শ্লোক ১১৮

সেই দামোদর আসি' দণ্ডবৎ হৈলা ।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্বরূপ দামোদর জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে মহাপ্রভুর বন্দনা করে বললেন—

শ্লোক ১১৯

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ১১৯ ॥

হেলা—অত্যন্ত সহজে; **উদ্ধূনিত**—দূরীকৃত; **খেদয়া**—মনঃকষ্ট; **বিশদয়া**—যা সবকিছু পবিত্র করে; **প্রোন্মীলৎ**—প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত করে; **আমোদয়া**—অপ্রাকৃত আনন্দ; **শাম্যৎ**—প্রশমিত করে; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র; **বিবাদয়া**—বিবাদ; **রসদয়া**—সমস্ত অপ্রাকৃত রস বিতরণ করে; **চিত্ত**—হৃদয়ে; **অর্পিত**—অর্পিত; **উন্মাদয়া**—দিব্য উন্মাদনা; **শশ্বৎ**—সর্বক্ষণ; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তি; **বিনোদয়া**—উদ্দীপ্ত করে; **স-মদয়া**—দিব্য আনন্দে পূর্ণ; **মাধুর্য**—মাধুর্য-প্রেম; **মর্যাদয়া**—সীমা; **শ্রীচৈতন্য**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **দয়া-নিধে**—দয়ার সমুদ্র; **তব**—আপনার; **দয়া**—কৃপা; **ভূয়াৎ**—হোক; **অমন্দ**—সৌভাগ্যের; **উদয়া**—যাতে উদয় হয়।

অনুবাদ

"হে দয়ার সমুদ্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু! যা সমস্ত জড় অনুতাপ হেলায় দূর করে, যার প্রভাবে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে সমস্ত শাস্ত্র-বিবাদ শেষ হয়, যা রসোবর্ষণ দ্বারা উন্মত্ততা বিধান করে, যা ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপ্ত করে, মাধুর্য-মর্যাদার দ্বারা আপনার সেই পরম মঙ্গলময় দয়া আমার প্রতি উদিত হোক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে* (৮/১০) উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার কথা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবানের ঔদার্যময় প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তিনভাবে তাঁর করুণা সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বিতরণ করেন। এই জড় জগতে প্রতিটি জীব সর্বদাই বিষাদগ্রস্ত, কেন না সে সর্বদাই অভাবগ্রস্ত। এই জড় জগতের দুঃখময় অবস্থায় যতটুকু সম্ভব সুখলাভের জন্য সে সর্বদাই কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা কখনই সার্থক হয় না। দুর্দশাক্লিষ্ট অবস্থায় জীব কখনও কখনও ভগবানের কৃপার প্রত্যাশী হয়, কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষদের পক্ষে তা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ

কেউ যখন ভগবানের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা বর্ধিত হয় এবং তিনি তখন জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রভাবে তার চিত্ত নির্মল হয়, তার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়।

বহু প্রকার শাস্ত্র রয়েছে, এবং অধিকাংশ সময়ই সেগুলি পাঠ করে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কৃপা লাভ করেন, তখন সেই সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়। তখন কেবল বিভিন্ন শাস্ত্রের বৈষম্যজনিত বিভ্রান্তিরই নিরসন হয় না, উপরন্তু একপ্রকার দিব্য আনন্দের উন্মেষ হয় এবং তখন পরিপূর্ণ পরাশান্তির উপলব্ধি হয়। অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বদ্ধজীব নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন; এই মঙ্গলময় সেবার প্রভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম বর্ধিত হয়। তার কৃষ্ণসেবা যতই বর্ধিত হতে থাকে ততই তিনি পবিত্র হন, এবং তার হৃদয় দিব্য আনন্দ ও উন্মাদনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত করুণা ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তখন তার কোন জড় জাগতিক প্রয়োজন থাকে না। জড় কামনা-বাসনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যে মনস্তাপ তাও তখন বিদূরিত হয়। ভগবানের কৃপার প্রভাবে জীব তখন অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হয় এবং চিন্ময় জগতের অপ্রাকৃত রসসমূহ তার মধ্যে তখন প্রকাশিত হয়। তার ভগবদ্ভক্তি এমন সুদৃঢ় হয় যে, তিনি তখন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে, এইগুলি একই সঙ্গে ভক্তের হৃদয়ে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। বদ্ধ জীব স্বভাবতই কৃষ্ণভক্তিহীন। সে জড় জাগতিক আসক্তির ফলে সর্বদাই শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জীব পরমসত্যকে জানতে আগ্রহী হয়। তখনই সে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হতে শুরু করে।

ভগবানের কৃপার প্রভাবে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয় এবং সবরকম জড়জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয় মুক্ত হয়, আর তখনই কেবল অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করা যায়। ভগবানের কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তখন সর্বত্রই ভগবানের লীলা দর্শন করা যায়, এবং ভক্ত তখন অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্ত সব রকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত, এবং তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন। কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে জড় আসক্তি এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হয়, তখন প্রতিপদে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক অনুভব করা যায়, এবং ভক্ত তখন গৃহকর্মে যুক্ত থাকলেও নিরন্তর ভগবৎ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ থাকায় জড় জগতের কোন কলুষ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে সকলেই জড়-জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ১২০

উঠাঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে উঠিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন; এবং তাঁরা দুজনেই তখন প্রেমাবেশে অচেতন হলেন।

শ্লোক ১২১-১২২

কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল ।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁরা স্থির হলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলতে লাগলেন, "আজ আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি আসবে। খুব ভাল হল। অন্ধ যেন তার দুটি চোখ ফিরে পেল।

শ্লোক ১২৩

স্বরূপ কহে,—প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর বললেন, "প্রভু দয়া করে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাকে ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলাম, এবং তার ফলে আমি মস্ত বড় ভুল করেছিলাম।

শ্লোক ১২৪

তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার লেশমাত্র প্রেম নেই। তা যদি থাকত, তাহলে তোমাকে ছেড়ে আমি অন্য দেশে গেলাম কি করে? তাই আমি সবচাইতে বড় পাপী।

শ্লোক ১২৫

মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা ।
কৃপা-পাশ গলে বান্ধি' চরণে আনিলা ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তোমাকে ছেড়ে চলে গেলেও তুমি আমাকে ছাড়নি। তোমার কৃপারূপ রজ্জু আমার গলায় বেঁধে আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিয়ে এসেছ।"

শ্লোক ১২৬

তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন ।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর তখন নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন, এবং গভীর প্রেমে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১২৭

জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্বভৌম ।
সবা-সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করার পর স্বরূপ দামোদর জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্বভৌম প্রমুখ সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১২৮

পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর পরমানন্দপুরীর পাদপদ্ম বন্দনা করলেন, এবং পুরী গোসাঞি তখন তাঁকে গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১২৯

মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর ।
জলাদি-পরিচর্যা লাগি' দিল এক কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের থাকার জন্য নিভৃতে একটি ঘর দিলেন; এবং জল আনা ইত্যাদি পরিচর্যার জন্য তাঁকে একটি সেবক দিলেন।

শ্লোক ১৩০

আর দিন সার্বভৌম-আদি ভক্ত-সঙ্গে ।
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করছিলেন।

শ্লোক ১৩১-১৩৪

হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিনয়-বচন ॥ ১৩১ ॥
ঈশ্বর-পুরীর ভৃত্য,—'গোবিন্দ' মোর নাম ।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥ ১৩২ ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে রহি সেবিহ তাঁহারে ॥ ১৩৩ ॥
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া ।
প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় গোবিন্দ এসে উপস্থিত হলেন এবং দণ্ডবৎ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে লাগলেন—"আমি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ। পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আমি আপনার কাছে এসেছি। সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করে এই জড়-জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন, "কৃষ্ণচৈতন্যের কাছে থেকে তুমি তাঁর সেবা করো। সমস্ত তীর্থ পর্যটন করে কাশীশ্বরও আসবে, তবে আমার গুরুদেবের আজ্ঞা পেয়ে আমি সোজা আপনার শ্রীপাদপদ্মে ছুটে এসেছি।"

শ্লোক ১৩৫

গোসাঞি কহিল, 'পুরীশ্বর' বাৎসল্য করে মোরে ।
কৃপা করি' মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমার গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আমার প্রতি সর্বদা বাৎসল্য-স্নেহ-পরায়ণ। তাই তিনি কৃপা করে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

শ্লোক ১৩৬

এত শুনি' সার্বভৌম প্রভুরে পুছিল ।
পুরী-গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে ত' রাখিল ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কেন একজন শূদ্রকে তাঁর সেবকরূপে রেখেছিলেন?"

তাৎপর্য

কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ—উভয়ই ছিলেন ঈশ্বরপুরীর সেবক। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অপ্রকটের পর কাশীশ্বর ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করতে গিয়েছিলেন। আর গোবিন্দ

তার গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। গোবিন্দ ছিলেন শূদ্র-কুলোদ্ভূত, কিন্তু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার ফলে তিনি অবশ্যই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। এখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করছেন, ঈশ্বরপুরী কেন একজন শূদ্রকে দীক্ষা দিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসরণ করার নির্দেশ-প্রদানকারী *স্মৃতি-শাস্ত্র* অনুসারে ব্রাহ্মণ নিম্নকুলোদ্ভূত মানুষকে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন না। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রকে সেবকরূপে গ্রহণ করতে পারেন না। কোন গুরু যদি তা করেন তাহলে তিনি কলুষিত হন। তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঈশ্বরপুরী শূদ্র-কুলোদ্ভূত গোবিন্দকে শিষ্যরূপে বা সেবকরূপে গ্রহণ করেছিলেন কেন? তাঁর উত্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে, তাঁর গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ভগবানের শক্তিতে এমনই আবিষ্ট যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বরপুরী ছিলেন সারা জগতের গুরু। তিনি কোন জাগতিক বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন না। ঈশ্বরপুরীর মতো ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট গুরুদেব ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে যে কোন জীবের প্রতি তাঁর কৃপাবর্ষণ করতে পারেন। অর্থাৎ শক্ত্যাবিষ্ট গুরুদেব যিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো বলে বিবেচনা করতে হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গেয়েছেন—"*সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ*—গুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে।" ভগবান শ্রীহরি যদি স্বতন্ত্র হন, তাহলে তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট গুরুদেবও স্বতন্ত্র। হরি যেমন জড়-জাগতিক বিধিনিষেধের অধীন নন, তেমনই তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট গুরুদেবও সেই সমস্ত বিধি-নিষেধের অধীন নন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* অন্ত্যলীলায় (৭/১১) বর্ণনা করা হয়েছে—"কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।" শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েই গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং তাঁর নামের মহিমা প্রচার করেন, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই জড় জগতেও কেউ যখন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁর হয়ে কাজ করতে পারেন। তেমনই, সদ্‌গুরু তাঁর গুরুদেবের মাধ্যমে কৃষ্ণশক্তিতে আবিষ্ট হওয়ার ফলে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো। *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন* কথাটির এটাই হল অর্থ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবান এবং সদ্‌গুরুর কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করে বলেছেন,—

শ্লোক ১৩৭

প্রভু কহে,—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র ।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, উভয়ই স্বতন্ত্র। তাই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কৃপা বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন নয়।

শ্লোক ১৩৮

ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে ।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের কৃপা জাতি-কুল ইত্যাদি বিচার করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিদুর ছিলেন শূদ্র, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ভোজন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৯

স্নেহ-লেশাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার ।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কেবল স্নেহের অপেক্ষা করে। স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, কিন্তু তাঁর কৃপা জড়-জাগতিক বিধিনিষেধের উপর নির্ভর করে না। তিনি একমাত্র স্নেহের অধীন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্পাদন করা যায় স্নেহের মাধ্যমে অথবা শ্রদ্ধার মাধ্যমে। স্নেহের মাধ্যমে যখন ভগবানের সেবা হয়, তখন ভগবানের বিশেষ কৃপা হয়। শ্রদ্ধার মাধ্যমে যখন ভগবানের সেবা হয়, তখন ভগবানের কৃপা প্রকাশিত হচ্ছে কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা জাতি অথবা বর্ণের বিচার করে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই গুরু এবং তিনি জড়-জাগতিক জাতি ধর্মের বিচার করেন না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম অনুসারে শূদ্র বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন করার দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। তেমনই, ঈশ্বরপুরী একজন শক্ত্যাবিষ্ট আচার্য হিসেবে যে কাউকে কৃপা করতে পারেন। তাই তিনি শূদ্র-কুলোদ্ভূত গোবিন্দকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। গোবিন্দ যখন দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ব্রাহ্মণে পরিণত হন এবং তাই ঈশ্বরপুরী তাকে সেবকরূপে নিয়োগ করেন। *শ্রীহরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যখন সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণে পরিণত হন। ভণ্ড গুরু কখনই কাউকে ব্রাহ্মণে পরিণত করতে পারে না, কিন্তু একজন সদ্‌গুরু তা পারেন। সেটিই সমস্ত শাস্ত্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সমস্ত গোস্বামীদের মত।

শ্লোক ১৪০

মর্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে ।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"যাঁর নাম শ্রবণ করলে পরম আনন্দ লাভ হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্নেহ-আচরণ, তাঁর প্রতি মর্যাদা বা শ্রদ্ধা থেকে কোটিগুণ বেশী সুখ প্রদান করে।"

শ্লোক ১৪১

এত বলি' গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করলেন, এবং গোবিন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর বন্দনা করলেন।

শ্লোক ১৪২-১৪৩

প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য, করহ বিচার ।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥ ১৪২ ॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায় ।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন—"ভট্টাচার্য, আপনি বিচার করে বলুন, আমার গুরুর সেবক তো সর্বদাই আমার মান্য। তাঁকে নিয়ে আমি কি করে আমার সেবা করাই, সেটি আবার আমার গুরুদেবের আদেশ। সুতরাং আমি এখন কি করি?"

তাৎপর্য

গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্য হচ্ছেন অন্য একজন শিষ্য বা সেবকের গুরু-ভ্রাতা, তাই তারা পরস্পরকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেন। গুরু-ভ্রাতাকে অশ্রদ্ধা করা কখনই উচিত নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গোবিন্দকে নিয়ে তিনি কি করবেন? গোবিন্দ হলেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর ব্যক্তিগত সেবক। ঈশ্বরপুরীই গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবা করতে; সুতরাং এখন কি কর্তব্য? তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অভিজ্ঞ বন্ধু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৪

ভট্ট কহে,—গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "গুরুদেবের আদেশ সবচাইতে বলবান, তাই গুরুদেবের আদেশ কখনই লঙ্ঘন করা যায় না। এটিই শাস্ত্র প্রমাণ।

শ্লোক ১৪৫

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

সঃ—তিনি; শুশ্রুবান্—শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা; মাতরি—মাকে; ভার্গবেণ—পরশুরামের দ্বারা; পিতুঃ—পিতার; নিয়োগাৎ—আদেশে; প্রহৃতম্—হত্যা করে; দ্বিষৎ-বৎ—শত্রুর মতো; প্রত্যগৃহীৎ—গ্রহণ করেছিলেন; অগ্রজ-শাসনম্—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ; তৎ—তা; আজ্ঞা—আদেশ; গুরূণাম্—গুরুজনদের, যেমন গুরুদেব ও পিতা; হি—যেহেতু; অবিচারণীয়া—কোনরকম দ্বিধা না করে পালন করা কর্তব্য।

অনুবাদ

"তাঁর পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে পরশুরাম তাঁর মাতা রেণুকাকে হত্যা করেছিলেন, যেন তিনি ছিলেন তাঁর শত্রু। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালনে তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়েছিলেন। গুরুদেবের আদেশ কোনরকম বিচার বিবেচনা না করেই পালনীয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *রঘুবংশ* (১৪/৪৬) থেকে উদ্ধৃত। পরবর্তী শ্লোকে সীতাদেবীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের এই বর্ণনাটিও *রামায়ণ* থেকে (অযোধ্যা কাণ্ড ২২/৯) উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪৬

নির্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্যা মহাত্মনঃ ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥ ১৪৬ ॥

নির্বিচারম্—কোনরকম বিচার না করেই পালনীয়; গুরোঃ—শ্রীগুরুদেবের; আজ্ঞা—আদেশ; ময়া—আমার দ্বারা; কার্যা—অবশ্য পালনীয়; মহাত্মনঃ—মহাত্মাদের; শ্রেয়ঃ—সৌভাগ্য; হি—অবশ্যই; এবম্—এইভাবে; ভবত্যাঃ—তোমার পক্ষে; চ—এবং; মম—আমার জন্য; চ—ও; এব—অবশ্যই; বিশেষতঃ—বিশেষভাবে।

অনুবাদ

"পিতার মতো মহাত্মার আজ্ঞা আমাদের কোনরকম বিচার না করেই পালন করা কর্তব্য; কেননা তার ফলে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হবে, বিশেষ করে আমার তো মঙ্গল হবেই।"

শ্লোক ১৪৭

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এই যুক্তি শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে ভৃত্যরূপে স্বীকার করলেন এবং তাঁর শ্রীঅঙ্গসেবায় অধিকার দিলেন।

শ্লোক ১৪৮

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান ।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য বলে সকলেই গোবিন্দকে সম্মান করতেন এবং গোবিন্দ সমস্ত বৈষ্ণবদের, যাঁর যা প্রয়োজন সেই অনুসারে সেবা করতেন।

শ্লোক ১৪৯

ছোট-বড়-কীর্তনীয়া—দুই হরিদাস ।
রামাই, নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট হরিদাস ও বড় হরিদাস, যাঁরা উভয়েই ছিলেন সুদক্ষ কীর্তনীয়া তাঁরা এবং রামাই ও নন্দাই গোবিন্দের কাছে থাকতেন।

শ্লোক ১৫০

গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন ।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা সকলে গোবিন্দের সঙ্গে থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতেন। গোবিন্দের সৌভাগ্যসীমা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ১৫১

আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে ।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দরশনে ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন মুকুন্দদত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্লোক ১৫২

আজ্ঞা দেহ' যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই ।
প্রভু কহে,—গুরু তেঁহ, যাব তাঁর ঠাঞি ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্ত তখন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি তাঁকে এখানে নিয়ে আসব?" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আমার গুরুর মতো; অতএব আমিই তাঁর কাছে যাব।"

শ্লোক ১৫৩

এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর কাছে এলেন।

শ্লোক ১৫৪

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্মাম্বর ।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী মৃগচর্ম পরেছিলেন, তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে ব্যথিত হলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী শঙ্করাচার্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভারতী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসীদের একটি নাম। সন্ন্যাসী মৃগচর্ম অথবা গাছের ছাল দিয়ে তার দেহ আবৃত করেন। সেই নির্দেশ *মনুসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী যদি কেবল মৃগচর্মই পরিধান করেন অথচ পারমার্থিক উন্নতি লাভ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি কেবল দাম্ভিক এবং অতিশয় আত্মাভিমানী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মৃগচর্ম পরিধান পছন্দ করেননি।

শ্লোক ১৫৫

দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি ।
মুকুন্দেরে পুছে,—কাহাঁ ভারতী-গোসাঞি ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীকে এইভাবে মৃগচর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিনয় করলেন যেন তিনি দেখেও দেখেন নি। তখন তিনি মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার গুরুদেব ভারতী গোসাঞি কোথায়?"

শ্লোক ১৫৬-১৫৭

মুকুন্দ কহে,—এই আগে দেখ বিদ্যমান ।
প্রভু কহে,—তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান ॥ ১৫৬ ॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান ।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্ত বললেন, "এইতো আপনার সামনে ভারতী গোসাঞি দাঁড়িয়ে আছেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, "তুমি ভুল বলছ। ইনি ব্রহ্মানন্দ-ভারতী নন। তোমার কোন জ্ঞান নেই। তুমি একজনকে আর একজন বলছ। ব্রহ্মানন্দ-ভারতী কেন মৃগচর্ম পরিধান করবেন?"

শ্লোক ১৫৮

শুনি' ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে ।
মোর চর্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী মনে বিচার করলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার মৃগচর্ম পরিধান পছন্দ করেন নি।"

শ্লোক ১৫৯

ভাল কহেন,—চর্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি ।
চর্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তার ভুল স্বীকার করে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী ভাবতে লাগলেন, "তিনি যা বলছেন তা ঠিকই। আমি কেবল আমার পদমর্যাদা বিচার করার জন্য মৃগচর্ম পরিধান করি। কেবল মাত্র মৃগচর্ম পরিধান করার ফলে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।"

শ্লোক ১৬০

আজি হৈতে না পরিব এই চর্মাম্বর ।
প্রভু বহির্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"আজ থেকে আমি আর এই মৃগচর্ম পরব না।" ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর অন্তরের কথা জানতে পেরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর বহির্বাস আনালেন।

শ্লোক ১৬১

চর্মাম্বর ছাড়ি' ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন ।
প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

মৃগচর্ম ছেড়ে ব্রহ্মানন্দ যখন সন্ন্যাসীর বসন পরলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার শ্রীচরণ বন্দনা করলেন।

শ্লোক ১৬২

ভারতী কহে,—তোমার আচার লোক শিখাইতে ।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিত্তে ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী তখন বললেন, "তুমি নিজে আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দান কর। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও তুমি আমাকে প্রণাম কর না, কেন না তোমার প্রণাম গ্রহণ করতে আমার চিত্তে ভয় হয়।

শ্লোক ১৬৩

সাম্প্রতিক 'দুই ব্রহ্ম' ইহাঁ 'চলাচল' ।
জগন্নাথ—অচল ব্রহ্ম, তুমি ত' সচল ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সম্প্রতি আমি এই পুরুষোত্তমে 'সচল' এবং 'অচল' দুটি ব্রহ্ম দেখছি। জগন্নাথদেব অচল আর তুমি সচল ব্রহ্ম।

শ্লোক ১৬৪

তুমি—গৌরবর্ণ, তেঁহ—শ্যামলবরণ ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ-তারণ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, আর জগন্নাথদেবের গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ, তোমরা দুজনেই এসেছ সমস্ত জগৎ উদ্ধার করার জন্য।"

শ্লোক ১৬৫-১৬৬

প্রভু কহে,—সত্য কহি, তোমার আগমনে ।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬৫ ॥
'ব্রহ্মানন্দ' নাম তুমি—গৌর-ব্রহ্ম 'চল' ।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন 'অচল' ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "প্রকৃতপক্ষে, আপনার আগমনের ফলে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দুই ব্রহ্মের প্রকাশ হল। 'ব্রহ্মানন্দ' নামক আপনি গৌরব্রহ্ম 'সচল' আর শ্যামবর্ণ জগন্নাথদেব 'অচল' হয়ে বসে আছেন।"

তাৎপর্য

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে কোন ভেদ নেই, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি এবং ব্রহ্মানন্দ-ভারতী উভয়ই জীব। জীব যদিও ব্রহ্ম, কিন্তু তারা অসংখ্য, আর পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান এক। আর ব্রহ্মানন্দ-ভারতী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে জগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উভয়েই এক পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সচল, আর জগন্নাথদেব অচল—এইভাবে তাঁদের মধ্যে পরিহাসচ্ছলে তর্ক হচ্ছিল। অবশেষে, ব্রহ্মানন্দ-ভারতী এই তর্কের মীমাংসা করবার জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মধ্যস্থ করলেন।

শ্লোক ১৬৭-১৬৮

ভারতী কহে,—সার্বভৌম, মধ্যস্থ হঞা ।
ইঁহার সনে আমার 'ন্যায়' বুঝ' মন দিয়া ॥ ১৬৭ ॥
'ব্যাপ্য' 'ব্যাপক'-ভাবে 'জীব'-'ব্রহ্মে' জানি ।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী বললেন, "সার্বভৌম ভট্টাচার্য, দয়া করে আপনি মধ্যস্থ হয়ে এঁর সঙ্গে আমার বিচার মন দিয়ে শুনুন। ব্যাপ্য এবং ব্যাপকভাবে 'জীব' এবং 'ব্রহ্মকে' বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্রহ্ম-ব্যাপক অর্থাৎ সর্বব্যাপক; আর জীব—অণু অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। সমস্ত শাস্ত্রে এই বিশ্লেষণই করা হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মধ্যস্থ হতে বলেছিলেন, তাদের সেই তর্কের মীমাংসা করবার জন্য। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপক। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলা হয়েছে—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

"হে ভারত, আমি সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে জানাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, এটিই আমার মত।" পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সর্বব্যাপ্ত। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

অণ্বন্তরস্থ পরমাণুচয়ান্তরস্থম্—সর্বব্যাপকরূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান, আবার তিনি প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও বিরাজমান। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপক। কিন্তু জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে জীবাত্মার আয়তন কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। তাই জীব ব্যাপ্য। পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে জীবের আশ্রয়।

শ্লোক ১৬৯

চর্ম ঘুচাঞা কৈল আমারে শোধন ।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত' কারণ ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি আমার চর্ম ঘুচিয়ে আমাকে শোধন করলেন, তিনি যে ব্যাপক এবং আমি যে ব্যাপ্য, তা একটু বিচার করে দেখুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মানন্দ ভারতী এখানে দৃঢ়রূপে ঘোষণা করলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, আর তিনি হচ্ছেন সেই পরম ব্রহ্মের অধীনতত্ত্ব অণুচৈতন্যবিশিষ্ট 'জীব ব্রহ্ম'। এই তত্ত্ব বেদেও প্রতিপন্ন হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।* পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম—সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন। পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়েই সবিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিন্তু পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বশক্তিমান নিয়ন্তা, আর জীব হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত।

শ্লোক ১৭০

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৭০ ॥

সুবর্ণ—সুবর্ণের; **বর্ণঃ**—অঙ্গকান্তি; **হেম-অঙ্গঃ**—যাঁর অঙ্গ তপ্ত কাঞ্চনের মতো; **বর-অঙ্গ**—অপূর্ব সুন্দর দেহ; **চন্দন-অঙ্গদী**—যাঁর দেহ চন্দনে চর্চিত; **সন্ন্যাস-কৃৎ**—সন্ন্যাস ধর্ম পালনকারী; **শমঃ**—শমগুণসম্পন্ন; **শান্তঃ**—শান্ত; **নিষ্ঠা**—ভক্তি; **শান্তি**—শান্তি; **পরায়ণঃ**—পরম আশ্রয়।

অনুবাদ

"তাঁর আদিলীলায় তিনি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল বর্ণের সুন্দর দেহ ধারণ করে গৃহস্থরূপে লীলাবিলাস করেন। তাঁর সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং তাঁর চন্দনচর্চিত শ্রীঅঙ্গ তপ্ত-কাঞ্চনের মতো দ্যুতিসম্পন্ন। তাঁর পরবর্তী লীলায় তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তখন তিনি শমগুণসম্পন্ন ও শান্ত। তিনি শান্তি এবং ভক্তির পরম আশ্রয়, কেন না তিনি নির্বিশেষবাদী অভক্তদের নিবৃত্ত করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহাভারতের* দানধর্মে ১২৭ অধ্যায়ে, বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্র (৯২ ও ৭৫ শ্লোক) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৭১

এই সব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর—শ্রীভুজে অঙ্গদ ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্লোকে যে সমস্ত নাম আছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই সেগুলির আস্পদ অর্থাৎ সেগুলি তাঁর মধ্যেই স্থান পেয়েছে। চন্দন-মাখা প্রসাদ-ডোর—তাঁর দুই বাহুতে বলয়স্বরূপ শোভা পাচ্ছে।"

শ্লোক ১৭২

ভট্টাচার্য কহে,—ভারতী, দেখি তোমার জয় ।
প্রভু কহে,—যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বললেন, "ব্রহ্মানন্দ ভারতী, আমি দেখছি যে আপনারই জয় হল।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "তোমার এই বিচার আমি মেনে নিলাম।"

শ্লোক ১৭৩-১৭৫

গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্যের পরাজয় ।
ভারতী কহে,—এহো নহে, অন্য হেতু হয় ॥ ১৭৩ ॥
ভক্ত ঠাঞি হার' তুমি,—এ তোমার স্বভাব ।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৭৪ ॥
আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার'-ধ্যান ।
তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে শিষ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা করে বললেন, "গুরুর সঙ্গে তর্কে শিষ্যের পরাজয় হওয়াটাই স্বাভাবিক।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উক্তির প্রতিবাদ করে ব্রহ্মানন্দ ভারতী তৎক্ষণাৎ বললেন, "তা সত্য নয়, তার আর একটি কারণ আছে,—তা হল তুমি তোমার ভক্তের কাছে পরাজয় স্বীকার কর,—এটি তোমার স্বভাব। আমি তোমার আর একটি প্রভাবের কথা বলছি শোন,—জন্ম থেকে আমি নিরাকারের ধ্যান করে আসছি, কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলাম।"

তাৎপর্য

ব্রহ্মানন্দ ভারতী স্বীকার করলেন যে, গুরু-শিষ্যের তর্কে শিষ্য যত যুক্তি প্রদর্শন করুক না কেন, গুরুদেবের জয় হওয়াটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ, গুরুদেবের বাণী শিষ্যের যুক্তি থেকে অধিক মাননীয়। এই ক্ষেত্রে, ব্রহ্মানন্দভারতী যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুবর্গের অন্যতম, তাই তাঁর জয় হয়েছিল। কিন্তু, ব্রহ্মানন্দ ভারতী সেই যুক্তিটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে তিনি এই জয়-পরাজয়ের প্রকৃত কারণটি বিশ্লেষণ করলেন। তিনি ভক্তপদে অধিষ্ঠিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তের কাছে পরাজয় স্বীকার করা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বভাব। ভগবান স্বেচ্ছায় তাঁর ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করে নেন, কেন না কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।

এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৯/৩৭) ভীষ্মদেবের একটি সুন্দর উক্তি রয়েছে—

স্বনিগমমপহায় মৎ প্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্‌গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥

"আমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রথ থেকে নেমে এসে একটি ভগ্ন রথের চাকা তুলে নিয়ে দ্রুত গতিতে আমার দিকে ধেয়ে এসেছিলেন ঠিক যেভাবে একটি সিংহ হস্তীকে সংহার করতে উদ্যত হয়। তখন তাঁর উত্তরীয় তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে খসে পড়েছিল।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য ভীষ্মদেব এমন প্রবলভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে এসে একটি ভগ্ন রথের চাকা তুলে নিয়ে ভীষ্মদেবকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন তা দেখাবার জন্যই ভগবান তা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী বলেছিলেন "আমার জন্ম থেকেই আমি নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখামাত্রই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।" অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং এইভাবে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী তাঁর ভক্তে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৭৬

কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মানন্দ-ভারতী বললেন, "তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমি শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করছি এবং আমার চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছি! তোমাকে সেই কৃষ্ণরূপেই আমি দর্শন করছি, এবং তোমার সেবা করার জন্য আমার হৃদয় সতৃষ্ণ হয়ে উঠছে।"

শ্লোক ১৭৭

বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার ।
ইহাঁ দেখি' সেই দশা হইল আমার ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি ত্যাগ করে সবিশেষ ভগবানের সেবার পথ অবলম্বন করেছিলেন। একে দর্শন করে আমারও ঠিক সেই দশাই হয়েছে।"

তাৎপর্য

প্রথমে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্যোতির ধ্যান করতেন; পরে তিনি কৃষ্ণভক্তে পরিণত হন। তার সেই পরিবর্তনের কারণ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা উপলব্ধির পর ধীরে ধীরে ভগবান উপলব্ধির অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই কথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রচিত *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাটকে* (৫) বর্ণিত হয়েছে—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরআকাশপুষ্পায়তে ।
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ॥
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে ।
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

"যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা কটাক্ষরূপ বৈভব লাভ করেছেন, সেই ভক্তের কাছে যোগীদের আরাধ্য পরমপদ কৈবল্য নরকতুল্য, কর্মীগণের স্বধর্ম নিষ্ঠতার ফল স্বরূপ স্বর্গ মিথ্যা অকিঞ্চিৎ আকাশ-কুসুমের মতো, যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ীদের পক্ষে দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি ভক্তের নিকট উৎপাটিত দন্ত কালসর্প সদৃশ এবং জগৎ কৃষ্ণানন্দময়, এবং যাঁর কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্বোচ্চ পদারূঢ় দেবতাদের লোভনীয় পদও কীটের মতো তুচ্ছ বলে মনে হয়, আমরা সেই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করি।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাটকে এই তত্ত্ব বর্ণনা করে আরও বহু শ্লোক রয়েছে—

ধিক্ কুর্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ।
তাবদ্ ব্রহ্মকথাবিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবেৎ—
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে ন লোকবেদস্থিতিঃ ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্যঃ ।

"নির্বিশেষ ব্রহ্মের আলোচনা ভগবদ্ভক্তের কাছে মোটেই আস্বাদনীয় নয়। ভক্তের কাছে তথাকথিত শাস্ত্রবিধি অর্থহীন বলে মনে হয়। বহু লোক শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করে, কিন্তু ভক্তের কাছে সেই সমস্ত আলোচনা কেবল কোলাহলের মতো বলে মনে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে এই সমস্ত সমস্যাগুলি অন্তর্হিত হয়।"

শ্লোক ১৭৮

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ১৭৮ ॥

অদ্বৈত-বীথী—অদ্বৈত মার্গ; **পথিকৈঃ**—পথিকদের দ্বারা; **উপাস্যাঃ**—উপাসিত; **স্ব-আনন্দ**—আত্ম উপলব্ধির আনন্দ; **সিংহাসন**—সিংহাসন; **লব্ধদীক্ষাঃ**—দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে; **শঠেন**—একজন প্রতারকের দ্বারা; **কেনাপি**—কোন একজন; **বয়ম্**—আমি; **হঠেন**—বলপূর্বক; **দাসীকৃতা**—দাসীরূপে পরিণত হয়েছি; **গোপ-বধূ-বিটেন**—যে বালকটি সর্বদা গোপবধূদের সঙ্গে পরিহাস করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মানন্দ ভারতী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বললেন, "অদ্বৈত-মার্গের পথিকদের দ্বারা উপাস্য আর আত্মানন্দ-সিংহাসন থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ কর্তৃক বলপূর্বক দাসীরূপে পরিণত হয়েছি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থেও (৩/১/৪৪) এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭৯

প্রভু কহে,—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয় ।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার গভীর প্রেম, তাই যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, সেখানেই আপনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।"

শ্লোক ১৮০-১৮১

ভট্টাচার্য কহে,—দোঁহার সুসত্য বচন ।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥ ১৮০ ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার ।
ইঁহার কৃপাতে হয় দরশন ইঁহার ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "আপনাদের দুজনের কথাই ঠিক। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কৃপার প্রভাবে দর্শন দান করেন। প্রেম ছাড়া কখনও তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ ভারতী ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছেন।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে বলেছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার গভীর প্রেম, তাই আপনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর এই কথোপকথনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মধ্যস্থ ছিলেন, এবং তিনি রায় দিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতো ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শুদ্ধভক্তের সামনে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছিলেন একজন অতি উন্নতমার্গের ভক্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরম্ অচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে ভক্তরা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরের রূপ নিরন্তর দর্শন করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"

শ্লোক ১৮২

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্বভৌম ।
'অতিস্তুতি' হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সার্বভৌম ভট্টাচার্য, আপনি কি বলছেন? 'শ্রীবিষ্ণু' আমাকে রক্ষা করুন! এই ধরনের 'অতিস্তুতি' নিন্দারই নামান্তর।"

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিবৃতি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন, তাই তিনি 'বিষ্ণু' নাম উচ্চারণ করেছিলেন, যাতে 'শ্রীবিষ্ণু' তাঁকে রক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে, অতিস্তুতি বা অতিরিক্ত প্রশংসা এক ধরনের নিন্দা। এইভাবে তিনি তথাকথিত অপরাধজনক বিবৃতির প্রতিবাদ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮৩

এত বলি' ভারতীরে লঞা নিজ-বাসা আইলা ।
ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে এলেন। সেই থেকে ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছেই রইলেন।

শ্লোক ১৮৪

রামভদ্রাচার্য, আর ভগবান্ আচার্য ।
প্রভু-পদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব কার্য ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরে রামভদ্রাচার্য এবং ভগবান আচার্যও সবরকম জড় জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে রইলেন।

শ্লোক ১৮৫

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে ।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন কাশীশ্বর গোসাঞি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন, এবং মহাপ্রভু অনেক সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে তাঁর কাছে রাখলেন।

শ্লোক ১৮৬

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন ।
আগে লোক-ভিড় সব করি' নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীশ্বর গোসাঞি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জগন্নাথদেবের দর্শন করাতে নিয়ে যেতেন, এবং সামনের লোকদের ভিড় সরিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যাবার পথ করে দিতেন।

শ্লোক ১৮৭

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয় ।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহাঁ তাহাঁ হয় ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত নদ-নদী যেভাবে এসে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা যে যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮৮

সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ স্থানে ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সকলে এসে যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁদের প্রতি কৃপা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সকলকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন।

শ্লোক ১৮৯

এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি সমস্ত ভক্তদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের বর্ণনা করলাম। যিনি এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ১৯০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং বৈষ্ণবসহ মিলন' নামক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বেড়া-কীর্তন লীলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহভাষ্যে* একাদশ পরিচ্ছেদের 'কথাসার'-এ লিখেছেন—

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার করবার চেষ্টা করলেন, তখন মহাপ্রভু তা অস্বীকার করলেন। সেই সময় রামানন্দ রায় পুরুষোত্তমে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বহুবিধ বৈষ্ণবগুণের ব্যাখ্যা করলে মহাপ্রভুর চিত্ত পরিবর্তিত হল। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিজের দৈন্য-প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করলেন। সার্বভৌম—মহারাজকে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের একটি উপায় বলে দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হলে জগন্নাথদেবের দর্শন-বিরহে ব্যাকুল হয়ে মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন। পরে গৌড় থেকে সমস্ত ভক্তরা আসছেন শুনে তিনি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তদের যখন আসবার সময় হল, তখন স্বরূপ দামোদর, গোবিন্দ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া মালা নিয়ে তাঁদের আনতে গেলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর প্রাসাদ থেকে বৈষ্ণবদের আগমন দেখতে লাগলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীগোপীনাথ আচার্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সেই সমস্ত বৈষ্ণবদের পরিচয় দিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে রাজার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণত্ব এবং সমাগত বৈষ্ণবদের ক্ষৌর ও উপবাস পরিত্যাগ করে প্রসাদান্ন সেবন-সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হল। তারপর রাজা বৈষ্ণবদের থাকবার বাসস্থান ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্ত আদি বৈষ্ণবদের সঙ্গে অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করলেন। হরিদাসের দৈন্য দর্শন করে তিনি তাঁকে মন্দিরের সন্নিকটে একটি নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর তাঁর ভক্তদের চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে মহাসংকীর্তন করলেন। তারপর বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন।

শ্লোক ১

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে ।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥ ১ ॥

অতি—অত্যন্ত; **উদ্দণ্ডম্**—উদ্দণ্ড; **তাণ্ডবম্**—অত্যন্ত মনোরম নৃত্য; **গৌরচন্দ্রঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **কুর্বন্**—করেছিলেন; **ভক্তৈঃ**—ভক্তদের নিয়ে; **শ্রীজগন্নাথ-গেহে**—শ্রীজগন্নাথদেবের

মন্দিরে; নানাভাব-অলঙ্কৃত-অঙ্গ—বিবিধ ভাবরূপ অলঙ্কারে মণ্ডিত দেহ; স্ব-ধাম্না—তাঁর মাধুর্যের ভাবে; চক্রে—করেছিলেন; বিশ্বম্—সারা জগত; প্রেম-বন্যা-নিমগ্নম্—কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় নিমগ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

"শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে ভক্তদের নিয়ে বিবিধ ভাবরূপ অলঙ্কারে মণ্ডিত দেহে শ্রীগৌরচন্দ্র অতি মনোরম উদ্দণ্ড নৃত্য করে তাঁর মাধুর্য দ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন।"

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জয় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "তুমি যদি আমাকে অভয় দাও, তাহলে তোমাকে আমি কিছু বলব।"

শ্লোক ৪

প্রভু কহে,—কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, "তুমি যা আমাকে বলতে চাও, তা নির্ভয়ে বল। যোগ্য হলে আমি তোমার কথা রাখব, আর অযোগ্য হলে রাখব না।"

শ্লোক ৫

সার্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন তাঁকে বললেন, "মহারাজ প্রতাপরুদ্র তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।"

শ্লোক ৬-৭

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন ॥ ৬ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শোনামাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কানে হাত দিয়ে নারায়ণকে স্মরণ করলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "সার্বভৌম, কেন তুমি এই ধরনের অনুচিত অনুরোধ করছ? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী; তাই আমার পক্ষে রাজাকে দর্শন করা কোন স্ত্রীলোককে দর্শন করারই মতো। এই উভয় দর্শনই বিষভক্ষণের মতো ভয়ঙ্কর।"

শ্লোক ৮

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ৮ ॥

নিষ্কিঞ্চনস্য—যিনি জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত; ভগবদ্—পরমেশ্বর ভগবান; ভজন—সেবা করতে; উন্মুখস্য—যিনি উন্মুখ; পারম্-পরম্—জড় জগতের অতীত পরব্যোম ভগবদ্ধাম; জিগমিষোঃ—গমন করতে ইচ্ছুক; ভব-সাগরস্য—সংসার সমুদ্রের; সন্দর্শনম্—ভোগ-বুদ্ধি-সহ দর্শন; বিষয়িণাম্—জড় জাগতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত মানুষদের; অথ—ও; যোষিতাম্—স্ত্রীলোকদের; চ—ও; হা—হায়; হন্ত হন্ত—অনুশোচনার অভিব্যক্তি; বিষভক্ষণতঃ—বিষ ভক্ষণ; অপি—থেকেও; অসাধু—অধিক ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গভীর খেদের সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, " 'হায়, যিনি ভবসমুদ্র পার হয়ে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবা করতে উন্মুখ সেই নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে, বিষয়ী এবং স্ত্রী-দর্শন বিষপান করার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও* (৮/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পারমার্থিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, বিষয়ের প্রতি বিরক্ত, সন্ন্যাসীর আচরণবিধি

প্রদর্শন করে গেছেন। পারমার্থিক উন্নতি যাদুবিদ্যা বা ভেল্কিবাজীর উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে জড়-জগতের স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় ভগবদ্ধামে অধিষ্ঠিত হবার উপর। *পারং পরং জিগমিষোঃ*—কথাটির অর্থ হচ্ছে, এই জড় জগতের অতীত ভগবদ্ধামে গমন করতে ইচ্ছুক। বিরজা বলে একটা নদী আছে, তার এই পারে জড় জগৎ এবং অপর পারে চিৎ-জগৎ। বিরজা নদীকে যেহেতু একটি মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়, তাই তার নাম ভবসাগর—জন্ম-মৃত্যুর সাগর। পারমার্থিক জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জন্ম-মৃত্যু চক্রের স্তর অতিক্রম করা এবং চিৎ-জগতে প্রবেশ করা, যেখানে পূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দময় নিত্য জীবন লাভ করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ মানুষ চিন্ময় জীবন এবং চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। চিৎ-জগতের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/২০) বলা হয়েছে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

"আরেকটি প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জড় জগতের অতীত। সেই প্রকৃতি সনাতন এবং কখনই তার বিনাশ হয় না। এই জগতের বিনাশ হলেও সেই জগৎটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে বিরাজ করে।"

অর্থাৎ এই জড় জগতেরও অতীত আর একটি চিৎ-জগৎ রয়েছে, এবং সেই জগৎ নিত্য। পারমার্থিক উন্নতির অর্থ হচ্ছে জড় জাগতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া। এই পন্থাটিকে বলা হয় ভক্তিযোগ। জড় জগতে ইন্দ্রিয় তর্পণের মূল মাধ্যম হচ্ছে কামিনী। যারা পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী তাদের স্ত্রী-সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। সন্ন্যাসীর পক্ষে জড়-জাগতিক লাভের জন্য কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীর দর্শন করা উচিত নয়। বিষয়াসক্ত স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গে কথা বলাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাই বিষপান করার সাথে তার তুলনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাই তিনি, স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে লিপ্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ৯

সার্বভৌম কহে,—সত্য তোমার বচন ।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "মহাপ্রভু, তুমি যা বলেছ তা সত্যি, কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্র একজন সাধারণ রাজা নন। তিনি জগন্নাথদেবের সেবক এবং একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত।"

শ্লোক ১০

প্রভু কহে,—তথাপি রাজা কালসর্পাকার ।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "কিন্তু তাহলেও রাজা কালসর্পের মতো ভয়ঙ্কর। কাঠের তৈরি নারীমূর্তি স্পর্শ করলে যেমন চিত্তের বিকার হয়, তেমনই রাজাকে দর্শন করলেও বিষয়াসক্তির উদয় হয়।"

তাৎপর্য

শ্রীচাণক্য পণ্ডিত তার নীতি উপদেশে বলেছেন—*ত্যজ দুর্জন-সংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।* অর্থাৎ বিষয়াসক্ত দুর্জনদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর ও পারমার্থিক জীবনে উন্নত সাধুদের সঙ্গ কর। সকলে জানে যে, সর্প বিষধর এবং ভয়ঙ্কর, তার মাথায় মণি থাকলেও তা কম ভয়ঙ্কর নয় বা কম বিষধর নয়। বিষয়াসক্ত মানুষ যত গুণবানই হন না কেন, তিনি একটি মণিময় সর্পের থেকে কোন অংশে শ্রেয় নন। তাই এই ধরনের বিষয়ীদের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে, ঠিক যেমন মণিময় সর্পের থেকে সাবধানে দূরে থাকতে হয়।

কাঠ বা পাথরের তৈরি নারীমূর্তিও যখন অলঙ্কারে ভূষিত হয়, তখন তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সেই মূর্তিকে স্পর্শ করলেও হৃদয়ে কামভাবের উদয় হয়। তাই কখনও মনকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, যা এতই চঞ্চল যে, যে কোন মুহূর্তে তা শত্রুর কবলীভূত হতে পারে। মনের ছয়টি শত্রু রয়েছে—যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। মন আধ্যাত্মিক ভাবনায় মগ্ন হলেও তার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকা উচিত; ঠিক যেমন বিষধর সর্পের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হয়। কখনও মনে করা উচিত নয় যে আমাদের মন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখন যা ইচ্ছা করতে পারি। পারমার্থিক জীবনে যারা আগ্রহী তাদের সর্বদাই মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখা উচিত, যাতে মনের শত্রুরা, যারা সর্বদাই মনের সঙ্গে রয়েছে, তারা যেন মনকে পরাভূত করতে না পারে। মন যদি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় মগ্ন না থাকে, তাহলে শত্রুর দ্বারা পরাভূত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে আমরা মনের শিকার হয়ে পড়ি।

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে মন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত থাকে, তখন আর মনের শত্রুরা তাকে আঘাত করার সুযোগ পায় না। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মন সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান থাকা উচিত, যাতে আমরা কোন অবস্থাতেই তাকে প্রশ্রয় না দিই। মনকে একবার প্রশ্রয় দিলেই, তা আমাদের সর্বনাশ করতে পারে, তা পারমার্থিক দিক দিয়ে আমরা যতই উন্নত হই না কেন। বিষয়াসক্ত মানুষ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গ প্রভাবে মন বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে আচরণ করে সকলকে বিষয়ী অথবা স্ত্রী-সন্দর্শন করতে নিষেধ করে গেছেন।

শ্লোক ১১

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি ।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ১১ ॥

আকারাৎ—বহিরাকৃতি থেকে; অপি—এমন কি; ভেতব্যম্—ভীত হওয়া উচিত; স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকদের; বিষয়িণাম্—বিষয়াসক্ত মানুষদের; অপি—এমনকি; যথা—যেমন; অহেঃ—সর্পের থেকে; মনসঃ—মনের; ক্ষোভঃ—ক্ষোভ; তথা—তেমন; তস্য—তাঁর; আকৃতেঃ—আকৃতি থেকে; অপি—এমনকি।

অনুবাদ

" 'জীবন্ত সর্প এমন কি তার আকৃতি দর্শন করলেও যেমন ভয় হয়, তেমনই বিষয়ী এবং স্ত্রীলোক দর্শনে ভয় পাওয়া উচিত। এমন কি তাদের দেহের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও উচিত নয়।'

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়-নাটকেও (৮/২৪) এই শ্লোকটির উল্লেখ রয়েছে।

শ্লোক ১২

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভট্টাচার্য, আর কখনও এই ধরনের কথা মুখেও এনো না, যদি আন, তবে আর আমাকে এখানে দেখতে পাবে না।"

শ্লোক ১৩

ভয় পাঞা সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য চিন্তিত হইলা ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভয় পেয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর গৃহে ফিরে গেলেন এবং সেই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪

হেন কালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ।
পাত্র-মিত্র-সঙ্গে রাজা দরশনে চলিলা ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেখতে এলেন, এবং তাঁর পাত্র-মিত্র সহ মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজধানী কটকে থাকতেন। পরে রাজধানী, জগন্নাথপুরী থেকে কয়েক মাইল দূরে, খুর্দায় স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানে খুর্দা রোড নামক একটি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে।

শ্লোক ১৫

রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে ।
প্রথমেই প্রভুরে আসি' মিলিলা বহুরঙ্গে ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

গজপতি-রাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে রামানন্দ রায়ও এলেন। জগন্নাথ পুরীতে রামানন্দ রায় মহা আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

তাৎপর্য

ভারতীয় রাজাদের বিভিন্ন উপাধি থাকত, যেমন 'ছত্রপতি' এবং 'অশ্বপতি'। তেমনই উড়িষ্যার রাজাদের উপাধি ছিল 'গজপতি'।

শ্লোক ১৬

রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামানন্দ রায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন। মহাপ্রভু তখন তাকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। দুজনেই তখন প্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৭

রায়-সঙ্গে প্রভুর দেখি' স্নেহ-ব্যবহার ।
সর্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অন্তরঙ্গ আচরণ দেখে সমস্ত ভক্ত অন্তরে চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১৮

রায় কহে,—তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল ।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "আমি আমার প্রতি তোমার আদেশের কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে জানিয়েছিলাম। তোমার ইচ্ছায়, রাজা আমাকে বৈষয়িক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করেছেন।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দরায়কে অনুরোধ করেছিলেন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা অনুসারে রামানন্দ রায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে সেই আবেদন করেছিলেন। এবং রাজা তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। এইভাবে রামানন্দ রায় রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং সরকারের কাছ থেকে অবসর-ভাতা পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

আমি কহি,—আমা হৈতে না হয় 'বিষয়' ।
চৈতন্যচরণে রহোঁ, যদি আজ্ঞা হয় ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বলেছিলাম, 'মহারাজ, রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে থাকতে আমার ইচ্ছা হয়।"

শ্লোক ২০

তোমার নাম শুনি' রাজা আনন্দিত হৈল ।
আসন হৈতে উঠি' মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার নাম শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রাজা তাঁর আসন থেকে উঠে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন।"

শ্লোক ২১

তোমার নাম শুনি' হৈল মহা-প্রেমাবেশ ।
মোর হাতে ধরি' করে পিরীতি বিশেষ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার নাম শুনেই তৎক্ষণাৎ তিনি গভীর প্রেমে অভিভূত হলেন, এবং আমার হাত ধরে তিনি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করলেন।"

শ্লোক ২২

তোমার যে বর্তন, তুমি খাও সেই বর্তন ।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

তুমি যে বেতন পেতে, রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তুমি সেই বেতনই পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণের সেবা কর।

শ্লোক ২৩-২৪

আমি—ছার, যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ।
তাঁরে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে ॥ ২৩ ॥
পরম কৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মহারাজ প্রতাপরুদ্র তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই তাঁকে দর্শন করার যোগ্যতা আমার নেই। যে তাঁর ভজনা করে তার জীবন সার্থক। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি পরম কৃপালু, তাই কোন না কোন দিন তিনি অবশ্যই আমাকে দর্শন দেবেন।'

শ্লোক ২৫

যে তাঁহার প্রেম-আর্তি দেখিলুঁ তোমাতে ।
তার এক প্রেম-লেশ নাহিক আমাতে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার প্রতি তাঁর যে প্রেম-আর্তি দেখলাম তার এক লেশমাত্রও আমার মধ্যে নেই।"

শ্লোক ২৬-২৭

প্রভু কহে,—তুমি কৃষ্ণ-ভকতপ্রধান ।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৬ ॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার ।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "রামানন্দ রায়, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত; তাই তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান। যেহেতু রাজা তোমার প্রতি এত প্রীতিপরায়ণ; তাই কৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে অঙ্গীকার করবেন।"

তাৎপর্য

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই অনুরোধ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর যখন রামানন্দ রায় তাঁকে জানালেন, তাঁকে দর্শন করতে রাজা কত উৎগ্রীব, মহাপ্রভু তখন অন্তরে প্রসন্ন হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে জগন্নাথপুরীতে এসে তাঁর সঙ্গে বাস করতে। রামানন্দ রায় যখন সেই প্রস্তাব মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে পেশ করেন, তখন রাজা তা মঞ্জুর করেন এবং রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁকে পুরো বেতন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তা শুনেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের ভক্তের সেবা করলে ভগবান অধিক প্রীত হন। ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবকের মাধ্যমে ভগবানের কাছে যেতে হয়। সেইটিই হচ্ছে পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "রামানন্দ রায়, রাজা তোমার প্রতি এত প্রীতি-পরায়ণ, তাই তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। তোমার প্রতি তাঁর এই প্রীতির ফলে কৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে অঙ্গীকার করবেন।"

শ্লোক ২৮

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৮ ॥

যে—যারা; মে—আমার; **ভক্তজনাঃ**—ভক্ত; **পার্থ**—হে পার্থ; **ন**—না; মে—আমার; **ভক্তঃ**—ভক্ত; চ—এবং; তে—তারা; জনাঃ—মানুষেরা; **মদ্ভক্তানাম্**—আমার ভক্তদের; চ—অবশ্যই; যে—যারা; ভক্তাঃ—ভক্ত; তে—তারা; মে—আমার; **ভক্ততমা**—সর্বোত্তম ভক্ত; মতাঃ—আমি মনে করি।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'হে পার্থ, যারা কেবল আমারই ভক্ত, তারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁদেরই 'উত্তম ভক্ত' বলে জেনো।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *আদি পুরাণ* থেকে এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছিলেন। *লঘু-ভাগবতামৃত* (২/৬) গ্রন্থেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯-৩০

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২৯ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্ ॥ ৩০ ॥

আদরঃ—আদর; **পরিচর্যায়াম্**—সেবা; **সর্বাঙ্গৈঃ**—দেহের প্রতিটি অঙ্গের দ্বারা; **অভিবন্দনম্**—বিশেষভাবে বন্দনা করেন; **মদ্ভক্ত**—আমার ভক্তদের; **পূজা**—আরাধনা; **অভ্যধিকা**—অত্যধিক; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত জীবের মধ্যে; **মন্মতিঃ**—আমার সঙ্গে সম্পর্কের উপলব্ধি; **মদর্থেষু**—আমার সেবার জন্য; **অঙ্গ-চেষ্টা**—দৈহিক চেষ্টা; চ—এবং; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **মৎ-গুণ-ঈরণম্**—আমার মহিমা কীর্তন; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পণম্**—অর্পণ; চ—এবং; **মনসঃ**—মনের দ্বারা; **সর্ব-কাম**—সর্বপ্রকার বিষয় ভোগ বাসনা; **বিবর্জনম্**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

" 'আদরের সঙ্গে আমার পরিচর্যা করা, সর্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিনন্দন করা, বিশেষভাবে আমার ভক্তের পূজা করা, সমস্ত জীবকে আমার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা, দেহের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে আমার সেবা করা, বাক্যের দ্বারা আমার মহিমা কীর্তন করা, মনকে আমাতে অর্পণ করা এবং সব রকম জড় ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করা,—এগুলি ভক্তের লক্ষণ।'

তাৎপর্য

এই দুইটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৯/২১-২২) থেকে উদ্ধৃত। উদ্ধব যখন ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন ভগবান এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৩১

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥ ৩১ ॥

আরাধনানাম্—বিবিধ উপাসনার মধ্যে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **আরাধনম্**—উপাসনা; **পরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **পরতরম্**—শ্রেয়; **দেবি**—হে দেবি; **তদীয়ানাম্**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভক্তদের; **সমর্চনম্**—অধিক অনুরাগযুক্ত পূজা।

অনুবাদ

"মহাদেব পার্বতীকে বললেন, 'হে দেবি, অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর আরাধনা থেকেও তাঁর ভক্তের পূজা করা শ্রেষ্ঠ।"

তাৎপর্য

বেদ তিনটি ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড। *বেদে* বিভিন্ন দেব-দেবী এবং শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *পদ্ম পুরাণে* পার্বতীর প্রশ্নের

উত্তরে মহাদেব এই কথা বলেছেন। এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থেও (২/৪) উল্লেখ করা হয়েছে।

'বিষ্ণোরারাধনম্' বলতে শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বুঝায়। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা। কিন্তু তার থেকেও শ্রেয় ভগবানের ভক্তের আরাধনা করা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসে বিভিন্ন রকমের ভক্ত রয়েছেন। যদিও এই সবকটি রসই চিন্ময় স্তরের, তবুও মাধুর্য রস সমস্ত রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, মাধুর্য রসে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত ভক্তদের সেবা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা প্রধানতঃ মাধুর্য-রসে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যেরা বাৎসল্য রস পর্যন্ত আরাধনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু মাধুর্য রসে ভগবানের সেবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রচার করে গেছেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *বিদগ্ধ মাধব নাটকে* (১/২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অবদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করে বলেছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন মাধুর্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা প্রদর্শন করার জন্য—যে দান পূর্বে কখনও কোন আচার্য অথবা অবতার জীবকে অর্পণ করেন নি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মহাবদান্য অবতার। তিনিই কেবল মাধুর্য রসে কৃষ্ণপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে সেই প্রেম বিতরণ করেন।

শ্লোক ৩২

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ৩২ ॥

দুরাপা—দুর্লভ; **হি**—অবশ্যই; **অল্প-তপসঃ**—অল্প তপস্যাবান; **সেবা**—সেবা; **বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মসু**—বৈকুণ্ঠ-পথগামী; **যত্র**—যেখানে; **উপগীয়তে**—আরাধিত এবং বন্দিত; **নিত্যম্**—নিয়ত; **দেব-দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **জনার্দনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

'দেব-দেব জনার্দনের যারা নিত্য কীর্তন করেন, সেই বৈকুণ্ঠ-পথগামী কৃষ্ণভক্তদের সেবা অল্প তপস্যাবান ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (৩/৭/২০) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি বিদুরের প্রতি মৈত্রেয় ঋষির উক্তি।

শ্লোক ৩৩-৩৪

পুরী, ভারতী-গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩ ॥

চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন ।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামানন্দ রায়—পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর, নিত্যানন্দ প্রভু—এই চার গোস্বামীর পাদপদ্ম বন্দনা করলেন, এবং জগদানন্দ, মুকুন্দ ও অন্য সমস্ত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লিখিত চারজন গোস্বামী হচ্ছেন পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর এবং নিত্যানন্দ প্রভু।

শ্লোক ৩৫

প্রভু কহে,—রায়, দেখিলে কমলনয়ন ?
রায় কহে—এবে যাই পাব দরশন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কমলনয়ন জগন্নাথদেবের দর্শন করেছ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "এখনই আমি তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছি।"

শ্লোক ৩৬

প্রভু কহে,—রায়, তুমি কি কার্য করিলে ?
ঈশ্বরে না দেখি' কেনে আগে এথা আইলে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রামানন্দ রায় তুমি এ কি করলে? জগন্নাথদেবকে দর্শন না করে কেন তুমি এখানে এসেছ?"

শ্লোক ৩৭

রায় কহে, চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি ।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "চরণ রথের মতো এবং হৃদয় সারথির মতো, আর জীব হচ্ছে রথী, সেই রথ এবং সারথি যেখানে নিয়ে যায়, জীব সেখানেই যায়।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, ঈশ্বর সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করে মায়ানির্মিত রূপ যন্ত্রে আরূঢ় জীবের ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করেন।"

এইভাবে মায়ানির্মিত রথে (দেহে) চড়ে জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। *কঠোপনিষদেও* (১/৩/৩-৪) এর একটি প্রমাণ রয়েছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথম্ এব তু ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

"জীব এই জড় দেহরূপ রথের রথী; এবং বুদ্ধি তার সারথি। ইন্দ্রিয়গুলি সেই রথের অশ্ব এবং মন তার বল্গা। এইভাবে জীব বিষয়রূপ ক্ষেত্রে বিচরণ করে। মনীষীরা এইভাবে জড় জগতে আত্মার কার্যকলাপ দর্শন করেন।"

দেহরূপ রথে চড়ে জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলির মাধ্যমে এই জড় জগৎকে ভ্রান্তভাবে ভোগ করতে চায়। যারা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নত, তারা মন ও বুদ্ধিকে সংযত করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি মনরূপ বল্গার দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন; যদিও অশ্বগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী। যিনি তার মন ও বুদ্ধির দ্বারা তার ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে পারেন, তিনি অনায়াসে জীবনের পরম উদ্দেশ্য—পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যেতে পারেন। *তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—যারা পারমার্থিক মার্গে প্রকৃতই উন্নত, তারা পরমপদ শ্রীবিষ্ণুর কাছে যেতে পারেন। এই ধরনের মানুষেরা কখনও বিষ্ণুর বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হন না।

শ্লোক ৩৮

আমি কি করিব, মন ইহাঁ লয়া আইল ।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামানন্দ রায় বললেন, "আমি কি করব? জগন্নাথকে দর্শন করার কথা বিবেচনা না করেই আমার মন আমাকে এখানে নিয়ে এল।"

শ্লোক ৩৯

প্রভু কহে,—শীঘ্র গিয়া কর দরশন ।
ঐছে ঘর যাই' কর কুটুম্ব মিলন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "এক্ষুনি গিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন কর। তারপর গৃহে গিয়ে তোমার কুটুম্বদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্লোক ৪০

প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দরশনে ।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পেয়ে রামানন্দ রায় জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে চললেন। রামানন্দ রায়ের প্রেম-ভক্তির রীতি কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ৪১-৪৩

ক্ষেত্রে আসি' রাজা সার্বভৌমে বোলাইলা ।
সার্বভৌমে নমস্করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪১ ॥
মোর লাগি' প্রভুপদে কৈলে নিবেদন?
সার্বভৌম কহে,—কৈনু অনেক যতন ॥ ৪২ ॥
তথাপি না করে তেঁহ রাজ-দরশন ।
ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে এসে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন রাজা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমার কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করেছেন?" সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই 'রাজ-দর্শন' করতে রাজী হচ্ছেন না। তিনি বলেছেন যদি আমি আবার তাঁকে অনুরোধ করি, তাহলে তিনি জগন্নাথ পুরী ছেড়ে চলে যাবেন।"

শ্লোক ৪৪-৪৬

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল ।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ।
জগাই মাধাই তেঁহ করিলা উদ্ধার ॥ ৪৫ ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার ।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ? ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বলতে লাগলেন, "সমস্ত পাপী এবং অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি জগাই-মাধাইয়ের মতো পাপীদেরও উদ্ধার করেছেন। তিনি কি কেবল প্রতাপরুদ্রকে ছাড়া সমস্ত জগৎ উদ্ধার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে অবতরণ করেছেন?"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

"পতিতপাবনহেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করে থাকেন, তাহলে যিনি সবচাইতে পাপী এবং সবচাইতে পতিত, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভের সবচাইতে যোগ্য পাত্র। মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিজেকে সবচাইতে পতিত বলে বিবেচনা করেছিলেন, কেননা তাকে সব সময় জড় বিষয়ে লিপ্ত থাকতে হত, জড়সুখ ভোগ করতে হত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচাইতে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা। তাহলে, কেন তিনি রাজাকে প্রত্যাখ্যান করবেন? যে মানুষ যত বেশী অধঃপতিত, ভগবানের কৃপালাভে সে তত বেশী যোগ্য, অবশ্য যদি সে মহাপ্রভুর শরণাগত হয়। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সর্বতোভাবে মহাপ্রভুর শরণাগত হয়েছিলেন; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বিষয়াসক্ত মানুষ বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।

শ্লোক ৪৭

**অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবতার দেবঃ॥ ৪৭॥**

অদর্শনীয়ান্—যারা দর্শনের অযোগ্য; **অপি**—যদিও; **নীচ-জাতীন্**—নীচ জাতির মানুষকে; **সংবীক্ষতে**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন; **হন্ত**—হায়; **তথা-অপি**—তবুও; **ন উ**—না; **মাম্**—আমার প্রতি; **মৎ**—আমি; **এক**—একা; **বর্জম্**—বর্জন করে; **কৃপয়িষ্যতি**—তিনি কৃপা করবেন; **ইতি**—এইভাবে; **নির্ণীয়**—নির্ণয় করে; **কিম্**—কি; **স**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **অবতার**—অবতরণ করেছেন; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদর্শনীয় নিম্নজাতির মানুষদেরও দর্শন দান করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি আমাকে দর্শন দেবেন না! আমাকে ছাড়া আর সমস্ত জীবকে কৃপা করবেন এইরূপ স্থির করেই কি তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে* (৮/২৮) পাওয়া যায়।

শ্লোক ৪৮

**তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥ ৪৮॥**

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকেন যে, আমাকে তিনি দর্শন দেবেন না, তাহলে আমিও প্রতিজ্ঞা করছি যে তাঁর দর্শন না পেলে আমি আমার জীবন ত্যাগ করব।"

তাৎপর্য

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভক্ত অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করবেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

*সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥*

"সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে, দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে, আমার সামনে প্রণতি নিবেদন করে এই সমস্ত মহাত্মারা সর্বদা আমার আরাধনা করে।"

পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত মহাত্মার এইগুলি লক্ষণ। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দৃঢ় সঙ্কল্প—ভগবদ্ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ এবং তাকে বলা হয় দৃঢ়ব্রত। তার এই দৃঢ় সঙ্কল্পের জন্যই তিনি অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

**যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা-ধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ॥ ৪৯॥**

শ্লোকার্থ

"আমি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে না পারি, তাহলে আমার এই দেহ, এই রাজ্য সবই অর্থহীন।"

তাৎপর্য

দৃঢ়ব্রতের এটি একটি অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত। ভগবানের কৃপা যদি লাভ না করা যায়, তাহলে জীবন অর্থহীন। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (৫/৫/৫) বলা হয়েছে—*পরাভবস্তাবদ্ অবোধ-জাতো*

যাবন্নজিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্। 'পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা না করা হয়, তাহলে সেই জীবন সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন।' পারমার্থিক অনুসন্ধান ব্যতীত আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৫০

এত শুনি' সার্বভৌম হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের এই সঙ্কল্পের কথা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি রাজার এই অনুরাগ দর্শন করে তিনি বিস্মিত হলেন।

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বিস্মিত হয়েছিলেন, কেননা জড় বিষয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত মানুষের পক্ষে এইরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। রাজার অবশ্যই জড় সুখ ভোগ করার বহু সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন না পেলে তাঁর রাজ্য ও জীবন সবই অর্থহীন। এটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবদ্ভক্তি সর্বতোভাবে অহৈতুকী হওয়া উচিত। কোন জড় প্রতিবন্ধক ভগবদ্ভক্তিকে প্রতিহত করতে পারে না, তা সেই ভক্তির অনুশীলনকারী ভক্ত একজন সাধারণ মানুষই হন অথবা একজন রাজাই হন। ভগবদ্ভক্তি, ভক্তের জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবদ্ভক্তির এমনই মহিমা যে, যে কেউ যে কোন অবস্থায় এই ভক্তির অনুশীলন করতে পারেন, তবে তাকে কেবল দৃঢ়ব্রত হতে হবে।

শ্লোক ৫১

ভট্টাচার্য কহে—দেব না কর বিষাদ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বললেন, "মহারাজ, আপনি বিষণ্ণ হবেন না। আপনার এই সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে আপনি অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবেন।"

তাৎপর্য

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই তাঁকে কৃপা করবেন। এই গ্রন্থে (মধ্যলীলা ১৯/১৫১) বর্ণিত হয়েছে—"গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ"—শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের

কৃপার প্রভাবে ভক্তিলতার বীজ লাভ হয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গুরুর মতো এবং তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, মহাপ্রভু তাঁকে অবশ্যই কৃপা করবেন। গুরুদেবের কৃপা এবং কৃষ্ণের কৃপা মিলিত হয়ে, কৃষ্ণভক্তকে ভক্তিমার্গে সাফল্য দান করে। সেই সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে সমস্ত মহাত্মা ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি অনন্য ভক্তি-পরায়ণ, তাঁর হৃদয়ে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩)

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপর মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল; ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তার গুরুদেব, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মানসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন। এইটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) বলা হয়েছে—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

তোমার মনে সর্বক্ষণ তুমি আমার চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর এবং আমার আরাধনা কর। সর্বতোভাবে আমাতে মগ্ন হয়ে তুমি অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে।"

এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। কেবল গুরুদেবের কাছ থেকে জানতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং সম্পূর্ণভাবে তাতে বিশ্বাস করতে হবে। কেউ যদি তা করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করে এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করে এই ভক্তিমার্গে আরও উন্নতি লাভ করা যায়। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ভক্ত ভগবানের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৫২

তেঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ প্রেমের দ্বারাই কেবল তাঁর অনুবর্তী হওয়া যায়। আর তাঁর প্রতি তোমার প্রেম অত্যন্ত গভীর, তাই নিঃসন্দেহে তিনি তোমাকে কৃপা করবেন।"

তাৎপর্য

এই ধরনের দৃঢ় সঙ্কল্পই ভগবদ্ভক্তির প্রথম যোগ্যতা। যে কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী (*উপদেশামৃত*-৩) বলেছেন—*উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ ধৈর্যাৎ।* প্রথমে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস-পরায়ণ হতে হবে। ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হলে এই বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে। তা হলেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেবায় তুষ্ট হবেন। গুরুদেব কৃষ্ণভক্তির পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন। শিষ্য যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবিচলিতভাবে সেই পন্থা অনুসরণ করে, তাহলে সে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করবে; শাস্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৫৩

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ।
এই উপায় কর' প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "তবুও আমি একটি উপায় স্থির করেছি, যাতে তুমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে পার।

শ্লোক ৫৪-৫৭

রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা ।
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৪ ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি' রাজবেশ ॥ ৫৫ ॥
'কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়' করিতে পঠন ।
একলে যাই' মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৫৬ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি, সে-কালে কৃষ্ণনাম শুনি' ।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় 'বৈষ্ণব' জানি' ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"রথযাত্রার দিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে, প্রেমাবিষ্ট হয়ে রথাগ্রে নৃত্য করবেন। তারপর প্রেমাবেশে তিনি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করবেন। তখন তুমি একা তোমার রাজবেশ পরিত্যাগ করে শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়' গাইতে গাইতে একা গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরবে। সেই সময় মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান থাকবে না, তখন কৃষ্ণনাম শুনে তোমাকে বৈষ্ণব জেনে তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করবেন।"

তাৎপর্য

বৈষ্ণব সর্বদাই অপর বৈষ্ণবকে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে একজন শুদ্ধভক্ত বলে চিনতে পেরেছিলেন। মহারাজ

সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করছিলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। বৈষ্ণব সর্বদাই সহানুভূতিশীল; বিশেষ করে তিনি যখন কোন ভক্তকে অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প (দৃঢ়ব্রত) হতে দেখেন। তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে এইভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৫৮

রামানন্দ রায়, আজি তোমার প্রেম-গুণ ।
প্রভু-আগে কহিতে প্রভুর ফিরি' গেল মন ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে বললেন, "রামানন্দ রায় আজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে, তোমার প্রেমের কীর্তন করেছে এবং তা শুনে তোমার প্রতি মহাপ্রভুর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।"

তাৎপর্য

প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান নি, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধে, রামানন্দ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। মহাপ্রভু ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, মহারাজ যেহেতু ভক্তদের সেবা করেছিলেন, তাই কৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করবেন। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। প্রথমে, অবশ্যই ভক্তের কৃপা লাভ করতে হয়; তাহলে কৃষ্ণের কৃপা আপনা থেকেই নেমে আসে। *যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।* তাই আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা, যার কৃপায় কৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। তাই সাধারণ মানুষকে সর্বপ্রথমে গুরুদেবের অথবা ভক্তের সেবা শুরু করতে হয়। তারপর, ভক্তের কৃপায় ভগবান সন্তুষ্ট হন।

ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু মস্তকে ধারণ না করলে ভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩২) প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

"যতদিন মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, ততদিন অনর্থনাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে স্পর্শ করতে পারে না।"

শুদ্ধভক্তের শরণাগত না হলে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। মহারাজ প্রতাপরুদ্র রামানন্দ রায় এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য, উভয়েরই সেবা করেছিলেন। এইভাবে তিনি শুদ্ধভক্তের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করেছিলেন, এবং তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৯

শুনি' গজপতির মনে সুখ উপজিল ।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পরিকল্পনা শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের হৃদয়ে গভীর আনন্দের উদয় হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য তিনি সেই উপায় অবলম্বন করবেন বলে স্থির করলেন।

শ্লোক ৬০

স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ।
ভট্ট কহে,—তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার আর কতদিন বাকী আছে?" সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—"আর মাত্র তিন দিন বাকী আছে।"

শ্লোক ৬১-৬২

রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ।
স্নানযাত্রা-দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥ ৬১ ॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

রাজাকে প্রবোধ দিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৃহে ফিরে গেলেন। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। স্নানযাত্রা দেখে মহাপ্রভু মহাসুখ পেলেন, কিন্তু জগন্নাথদেবের 'অনবসরকালে' তিনি গভীরভাবে তাঁর বিরহ-বেদনা অনুভব করলেন।

তাৎপর্য

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর, রথযাত্রার ঠিক পনের দিন আগে, জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ নতুন করে রঞ্জিত করা হয়, এবং সেই পনের দিনের মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না। সেই সময়কে বলা হয় 'অনবসরকাল'। প্রতিদিন বহুলোক মন্দিরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যান, এবং তাদের কাছে এই 'অনবসর'-এর সময় জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়া অসহ্য বেদনাদায়ক! সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন না পেয়ে গভীর বিরহ-বেদনা অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা ।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণবিরহে ব্রজগোপিকারা যেভাবে বিরহ-বেদনা অনুভব করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও জগন্নাথদেবের বিরহে সেইভাবে ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাই তিনি সবাইকে ছেড়ে একা আলালনাথে চলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৪

পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে,—কৈল নিবেদন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরে ভক্তরা আলালনাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, এবং তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, গৌড় থেকে ভক্তরা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে এসেছেন।

শ্লোক ৬৫

সার্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ।
প্রভু আইলা,—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে নীলাচলে এলেন। তারপর তিনি রাজার কাছে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ফিরে আসার সংবাদ দিলেন।

শ্লোক ৬৬-৬৮

হেন কালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য ।
রাজাকে আশীর্বাদ করি' কহে—শুন ভট্টাচার্য ॥ ৬৬ ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত ।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব—মহাভাগবত ॥ ৬৭ ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন একত্রে ছিলেন, সেই সময় গোপীনাথ আচার্য এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাই তিনি রাজাকে আশীর্বাদ

করলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন—"গৌড় থেকে দুইশত বৈষ্ণব আসছেন। তাঁরা সকলে মহাপ্রভুর ভক্ত, মহাভাগবত। তাঁরা সকলে নরেন্দ্র-সরোবরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের সকলের জন্য বাসস্থান এবং প্রসাদের ব্যবস্থা করতে হবে।"

তাৎপর্য

জগন্নাথপুরীতে যেখানে নরেন্দ্র সরোবর এখনও বিদ্যমান, সেখানে জগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রা উৎসব হয়। গৌড়বঙ্গের ভক্তরা এখনও জগন্নাথপুরীতে গিয়ে সর্বপ্রথমে এই নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান করেন এবং মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে তারা হাত-পা ধুয়ে নেন।

শ্লোক ৬৯

রাজা কহে,—পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ।
বাসা আদি যে চাহিয়ে,—পড়িছা সব দিব ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে রাজা বললেন, "আমি মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পড়িছাকে আদেশ দেব, তাঁদের বাসস্থান আদি যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে।

শ্লোক ৭০

মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে ।
ভট্টাচার্য, একে একে দেখাহ আমাতে ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"সার্বভৌম ভট্টাচার্য, দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে সমস্ত ভক্তরা গৌড়দেশ থেকে এসেছেন, তাঁদের সকলকে আপনি আমাকে একে একে দেখান।"

শ্লোক ৭১-৭২

ভট্ট কহে,—অট্টালিকায় কর আরোহণ ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করাবে দরশন ॥ ৭১ ॥
আমি কাহো নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ।
গোপীনাথাচার্য সবারে করাবে পরিচয় ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে বললেন, "তাহলে চলুন, আমরা অট্টালিকার উপরে যাই। গোপীনাথ আচার্য সকলকে চেনেন, তিনি তাঁদের পরিচয় প্রদান করবেন। আমি কাউকে চিনি না, যদিও তাঁদের দেখতে আমার খুব ইচ্ছা হয়। গোপীনাথ আচার্য যেহেতু সকলকে চেনেন, তাই তিনি তাঁদের পরিচয় দান করবেন।"

শ্লোক ৭৩

এত বলি' তিন জন অট্টালিকায় চড়িল ।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইল ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তারা তিন জন প্রাসাদের চূড়ায় উঠলেন; এবং গৌড়বঙ্গ থেকে সমাগত সমস্ত বৈষ্ণবগণ তখন তাঁদের নিকটে এলেন।

শ্লোক ৭৪

দামোদর-স্বরূপ, গোবিন্দ,—দুই জন ।
মালা-প্রসাদ লঞা যায়, যাহাঁ বৈষ্ণবগণ ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর এবং গোবিন্দ, এই দুইজন তখন মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে, জগন্নাথদেবের প্রসাদী-মালা নিয়ে, বঙ্গদেশ থেকে আগত সেই সমস্ত বৈষ্ণবদের কাছে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৭৫

প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে ।
রাজা কহে, এই দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এদের দুজনকে আগে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা দুজন কে? দয়া করে এদের পরিচয় দান করুন।"

শ্লোক ৭৬-৭৭

ভট্টাচার্য কহে,—এই স্বরূপ-দামোদর ।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর ॥ ৭৬ ॥
দ্বিতীয়, গোবিন্দ—ভৃত্য, ইহাঁ দোঁহা দিয়া ।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "ইনি হচ্ছেন স্বরূপ দামোদর—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর। আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন গোবিন্দ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক। এদের দুজনকে দিয়ে মহাপ্রভু গৌড় থেকে আগত বৈষ্ণবদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মালা পাঠিয়েছেন।"

শ্লোক ৭৮

আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল ।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি' তাঁরে দিল ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে স্বরূপ দামোদর অদ্বৈত আচার্যকে মালা পরালেন। তারপর গোবিন্দ এসে অদ্বৈত আচার্যকে দ্বিতীয় মালাটি দিলেন।

শ্লোক ৭৯

তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্যেরে ।
তাঁরে নাহি চিনে আচার্য, পুছিল দামোদরে ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর যখন গোবিন্দ অদ্বৈত আচার্যকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন, তখন তাকে চিনতে না পেরে অদ্বৈত আচার্য প্রভু স্বরূপ দামোদরকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৮০-৮১

দামোদর কহে,—ইহার 'গোবিন্দ' নাম ।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥ ৮০ ॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ।
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিল ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর তাঁকে বললেন, "ইনি গোবিন্দ। পূর্বে ইনি ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিলেন—ইনি অত্যন্ত গুণবান। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতে। তাই মহাপ্রভু এঁকে তাঁর কাছে রেখেছেন।"

শ্লোক ৮২

রাজা কহে,—যাঁরে মালা দিল দুইজন ।
আশ্চর্য তেজ, বড় মহান্ত,—কহ কোন্ জন? ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বরূপ দামোদর এবং গোবিন্দ যাঁকে মালা দিলেন তিনি কে? তাঁর দেহ এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবেন। দয়া করে আপনি বলুন—ইনি কে?"

শ্লোক ৮৩

আচার্য কহে,—ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য ।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র, সর্ব-শিরোধার্য ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য বললেন, "ইনার নাম অদ্বৈত আচার্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ইনাকে মান্য করেন, এবং তাই তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

শ্লোক ৮৪-৮৮

শ্রীবাস-পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
বিদ্যানিধি-আচার্য, ইঁহ পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৮৪ ॥
আচার্যরত্ন ইঁহ, পণ্ডিত-পুরন্দর ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৫ ॥
এই মুরারি গুপ্ত, ইঁহ পণ্ডিত নারায়ণ ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥ ৮৬ ॥
এই হরি-ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥ ৮৭ ॥
গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, এই বাসুঘোষ ।
তিন ভাইর কীর্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি শ্রীবাস পণ্ডিত, উনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত, তারপর উনি বিদ্যানিধি আচার্য এবং উনি গদাধর পণ্ডিত। এইভাবে গোপীনাথ আচার্য একে একে সমস্ত ভক্তদের দেখাতে লাগলেন—আচার্যরত্ন, পুরন্দর পণ্ডিত, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, ভুবনপাবন হরিদাস ঠাকুর, হরিভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন; গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ এই তিন ভাইয়ের কীর্তনে মহাপ্রভু গভীর আনন্দ আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

গোবিন্দ ঘোষ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে প্রকটিত হয়েছিলেন। তিনি 'ঘোষ ঠাকুর' নামে পরিচিত। আজও কাটোয়ার কাছে অগ্রদ্বীপে ঘোষ ঠাকুরের মেলা হয়। বাসুঘোষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বহু গীত রচনা করেছেন এবং সেগুলি মহাজন গীতের মধ্যে অগ্রগণ্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, লোচনদাস ঠাকুর, গোবিন্দদাস ঠাকুর এবং অন্যান্য মহান বৈষ্ণবদের রচিত গীতকে মহাজন-গীতি বলা হয়।

শ্লোক ৮৯

রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্যনন্দন ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই, শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ইনি রাঘব পণ্ডিত, ইনি আচার্যনন্দন, উনি শ্রীমান পণ্ডিত, তারপর শ্রীকান্ত এবং তার পাশে নারায়ণ।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদদের মহিমা কীর্তন করে নরোত্তম দাস ঠাকুর (প্রার্থনা—১৩) গেয়েছেন।

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।

"অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গীদের যারা নিত্যসিদ্ধ বলে জানেন তারা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। তারা অচিরেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন; কেননা তারা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় যুক্ত। যারা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং কখনও ভগবানকে ভুলে যান না তাদের বলা হয় নিত্যসিদ্ধ। সে সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/১৮৭) বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যিনি তার দেহ, মন এবং বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে তথাকথিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে থাকলেও, জীবন্মুক্ত বলে বিবেচিত হন।"

ভক্ত সব সময় চিন্তা করেন কিভাবে তিনি আরও ভাল করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করবেন এবং কিভাবে আরও ভাল করে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির মহিমা সারা জগত জুড়ে প্রচার করবেন। যিনি 'নিত্যসিদ্ধ', তাঁর পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করা ছাড়া কোন কাজ নেই। এই ধরনের ভক্ত ইতিমধ্যেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব লাভ করেছেন। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—'নিত্যসিদ্ধ করি মানে'। কখনই মনে করা উচিত নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু পাঁচশো বছর আগে এই জগতে উপস্থিত ছিলেন, তাই কেবল যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তারাই শুধু মুক্ত। পক্ষান্তরে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে যিনি ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করছেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের মহিমা প্রচার করছেন তাঁদের নিত্যসিদ্ধ বলে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত এবং কখনই তাঁদের বদ্ধ বলে মনে করা উচিত নয়।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(*ভঃ গীঃ* ১৪/২৬)

যিনি জড়া-প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করেছেন তিনি ব্রহ্মস্তরে অধিষ্ঠিত। সেটিই নিত্যসিদ্ধ স্তর। নিত্যসিদ্ধ জীব ব্রহ্মভূত স্তরে নিষ্ক্রিয় থাকেন না, তিনি সেই স্তরে সক্রিয় হন; অর্থাৎ সেই স্তরেও ভগবানের সেবা করতে থাকেন। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গীদের নিত্যসিদ্ধ বলে মনে করার ফলে অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৯০-৯২

শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ।
বল্লভ-সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ॥ ৯০ ॥
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ-খান ।
রামানন্দ-আদি সবে দেখ বিদ্যমান ॥ ৯১ ॥
মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য ভক্তদের দেখিয়ে দিতে লাগলেন—"উনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, উনি শ্রীধর, তারপর বিজয়, তার পাশে বল্লভ সেন, তারপর পুরুষোত্তম, তারপর সঞ্জয়, উনি কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ-খান, তারপর রামানন্দ, ঐ মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব এবং সুলোচন, এরা সকলেই শ্রীখণ্ডের অধিবাসী।

শ্লোক ৯৩

কতেক কহিব, এই দেখ যত জন ।
চৈতন্যের গণ, সব—চৈতন্যজীবন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কত জনের নাম আর আপনাকে বলব? এখানে যত ভক্ত আপনি দেখছেন তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তাঁদের সকলের একমাত্র জীবন সর্বস্ব।"

শ্লোক ৯৪

রাজা কহে—দেখি' মোর হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা তখন বললেন, "এই সমস্ত ভক্তদের দর্শন করে আমি চমৎকৃত হয়েছি; কেননা এর আগে কখনও আমি বৈষ্ণবদের এরকম জ্যোতির্ময় রূপ দেখিনি।

শ্লোক ৯৫

কোটিসূর্য-সম সব—উজ্জ্বল-বরণ ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের অঙ্গকান্তি কোটিসূর্যের মতো উজ্জ্বল। পূর্বে এরকম মধুর কীর্তনও আমি কখনও শুনিনি।

তাৎপর্য

এইটি শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধভক্তরা সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁদের সংকীর্তন অপূর্ব মধুর। বহু পেশাদারী কীর্তনীয়া, যারা নানা সুরে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র দিয়ে, নানারকম কেরামতি দেখিয়ে সংকীর্তন করতে পারে, তাদের কীর্তন শুদ্ধভক্তদের সংকীর্তনের মতো আকর্ষণীয় নয়। কোন ভক্ত যদি নিষ্ঠাভরে বৈষ্ণব আচরণ অনুশীলন করেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অঙ্গকান্তি আকর্ষণীয়ভাবে উজ্জ্বল হবে, এবং তাঁর কণ্ঠে ভগবানের দিব্যনাম-কীর্তন অত্যন্ত মধুর হবে। নিঃসঙ্কোচে মানুষ এই কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক নাটকও ভক্তদের মঞ্চস্থ করা উচিত। এই ধরনের নাটক অচিরেই দর্শকদের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করবে এবং তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তদের এই দুটি বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা প্রচার করার জন্য সেগুলি প্রয়োগ করা উচিত।

শ্লোক ৯৬

ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ।
কাহাঁ নাহি দেখি, ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এইরকম প্রেম, এইরকম নৃত্য, এইরকম হরিধ্বনি, আমি কখনও দেখিনি, কখনও শুনিনি।"

তাৎপর্য

পুরীতে জগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত আসতেন এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাদের দেখেছিলেন এবং তাদের সংকীর্তন শুনেছিলেন, কিন্তু এখানে তিনি স্বীকার করছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা যেভাবে সংকীর্তন করেছিলেন, সেরকম তিনি তার পূর্বে কখনও দেখেননি বা শোনেননি। সেই সব কীর্তন ছিল অতুলনীয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তদের উচিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে মায়াপুরে সমবেতভাবে সংকীর্তন করা। তাহলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মতো, যারাই তাদের দেখবে তারাই তাদের দেহের

সৌন্দর্য, অঙ্গের জ্যোতি এবং মধুর সংকীর্তন শুনে আকৃষ্ট হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে এই পৃথিবীতে তাঁর আরও অসংখ্য পার্ষদ ছিলেন এবং এখনও যাঁরা শুদ্ধ জীবন-যাপন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করছেন তাঁরাও তাঁর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ।

শ্লোক ৯৭

ভট্টাচার্য কহে এই মধুর বচন ।
চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সংকীর্তন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "এই মধুর সঙ্গীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিশেষ সৃষ্টি—এর নাম প্রেম-সংকীর্তন। অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমে উদ্বেল হয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন।

শ্লোক ৯৮

অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্মপ্রচারণ ।
কলিকালে ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম প্রচার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের সেই যুগধর্ম হচ্ছে নাম-সংকীর্তন।

শ্লোক ৯৯

সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহতজন ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করেন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আর যিনি তা করেন না তিনিই দুর্দশাগ্রস্ত, কলিযুগের প্রভাবে আচ্ছন্ন।

তাৎপর্য

মূর্খেরা প্রচার করে যে, যে কেউ তার নিজের মনগড়া ধর্মমত তৈরি করতে পারে। কিন্তু সেই ধরনের মতবাদ এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। কেউ যদি যথাযথই ধর্ম আচরণ করতে চান, তাহলে তাকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/১৯-২২) বর্ণনা করা হয়েছে—

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য হচ্ছে, ধর্ম মানুষের তৈরি নয়, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের আইন। তাই, কোন মানুষ কখনও ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না, তা তিনি যত বড় মহাপুরুষই হোন না কেন। এমনকি স্বর্গের দেব-দেবীরা অথবা অসুরেরা, সিদ্ধপুরুষেরা, বিদ্যাধরেরা, চারণেরা, কেউই ধর্ম তৈরি করতে পারে না। ভগবানের দেওয়া আইন প্রকৃত ধর্ম পরম্পরার ধারায় দ্বাদশ মহাজনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেই দ্বাদশ মহাজন হচ্ছেন—ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চারি কুমার, দেবহূতির পুত্র কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনকরাজ, ভীষ্মদেব, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং যমরাজ। ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পন্থা। ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য, এবং তা সবরকম জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত, তাই তা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য। কিন্তু কেউ যখন ধর্মের তত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। ভাগবত-ধর্ম বা পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত প্রকৃত ধর্মের তত্ত্বই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধান। যার শুরু হয় ভগবানের নামকীর্তনের মাধ্যমে (*তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ*)।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, "কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্তন"। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ১০০

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণবর্ণম্—'কৃষ্' ও 'ণ' পদাংশ দুইটি বার বার উচ্চারণ করতে করতে; **ত্বিষা**—কান্তি; **অকৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ বা কালো নয় (তপ্ত কাঞ্চনের মতো); **স-অঙ্গ**—সপার্ষদ; **উপাঙ্গ**—সেবকবৃন্দ; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **পার্ষদম্**—অন্তরঙ্গ পার্ষদ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ**—প্রধানতঃ সংকীর্তনের দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা করা; **হি**—অবশ্যই; **সুমেধসঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা।

অনুবাদ

"যে পরমেশ্বর ভগবান 'কৃষ্ণ' নিরন্তর উচ্চারণ করেন কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নাম-সংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনিই কৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।"

শ্লোক ১০১

রাজা কহে,—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ? ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁর প্রতি উদাসীন কেন?"

শ্লোক ১০২

ভট্ট কহে,—তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে ।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার কণা মাত্রও প্রাপ্ত হয়েছেন, তারাই কেবল তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বলে জানতে পারেন। অন্য কেউ নয়।

তাৎপর্য

যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করতে পারেন (কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন)। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করা যায় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায় ভগবানের বাণী যিনি প্রচার করতে পারেন তাকে বলা হয় লব্ধচৈতন্য; লব্ধচৈতন্য কথাটির অর্থ হচ্ছে, যার প্রকৃত চেতনা বা কৃষ্ণচেতনা বিকশিত হয়েছে। এই প্রকার লব্ধচৈতন্য শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের এমনই প্রভাব যে তাদের সান্নিধ্যে আসার ফলে অন্য জীবদেরও কৃষ্ণচেতনার বিকাশ হয় এবং তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। এইভাবে শুদ্ধভক্তদের স্বগোত্র বর্ধনরূপ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনন্দ। *সুমেধসঃ*—শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন'। কারও বুদ্ধিমত্তা বা মেধা যখন তীক্ষ্ণ হয়, তখন তিনি সাধারণ মানুষকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমের মাধ্যমে তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম লাভ করেন। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানতে আগ্রহী নয় তারা ঘোর বিষয়াসক্ত মানুষ। তারা যতই পেশাদারী কীর্তন-নর্তন করার চেষ্টা করুক না কেন তাতে তাদের কোন পারমার্থিক লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে মহাপ্রভুর সংকীর্তনে যথাযথভাবে নৃত্য-গীত বা কীর্তন করা যায় না। জড় আবেগের বশে কৃত্রিমভাবে নৃত্য-কীর্তনের ফলে কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না।

শ্লোক ১০৩

তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা না হলে, তা তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, তাঁকে দেখা সত্ত্বেও তাঁর বাণী শ্রবণ করলেও, তিনি তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পারেন না।

তাৎপর্য

এই কথাটি অসুরদের বেলায়ও প্রযোজ্য। এরকম বহু আসুরিক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে আশ্রয় অবলম্বন করেছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে তাদের বৈষ্ণব বলে মনে হলেও—তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্বিদ্বেষী।

ভগবানের বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে, সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর মহিমা প্রচার করা যায় না। কেউ নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে প্রচার করতে পারেন, এবং তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করে থাকতে পারেন, এবং তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করার চেষ্টা করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ না করেন, তাহলে তিনি ভগবানের শুদ্ধভক্তের দোষ অন্বেষণ করবেন এবং কিভাবে যে একজন প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হতে পারেন তা বুঝতে সক্ষম হবেন না। যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে, যারা সেই আন্দোলনের অথবা আন্দোলনের নেতার দোষ দর্শন করে তারা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা থেকে বঞ্চিত।

শ্লোক ১০৪

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০৪ ॥

অথ—অতএব; অপি—অবশ্যই; তে—আপনার; দেব—হে ভগবান; পদ-অম্বুজদ্বয়—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; প্রসাদ—কৃপা; লেশ—কণামাত্র; অনুগৃহীতঃ—অনুগৃহীত; এব—অবশ্যই; হি—যথার্থ; জানাতি—জানে; তত্ত্বম্—তত্ত্ব; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; মহিম্নঃ—মহিমা; ন—কখনই না; চ—ও; অন্যঃ—অন্য; একঃ—এক; অপি—যদিও; চিরম্—দীর্ঘকাল; বিচিন্বন্—জল্পনা-কল্পনা করে।

অনুবাদ

"হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম-যুগলের কৃপার লেশ মাত্রও লাভ করে থাকেন, তাহলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/২৯) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৮৪ শ্লোকে এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০৫

রাজা কহে,—সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাঞা ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা বললেন, "এই সমস্ত ভক্তরা কেন প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসস্থানের দিকে ধেয়ে চলেছেন?"

শ্লোক ১০৬-১০৭

ভট্ট কহে,—এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত ।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ১০৬ ॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা ।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "এইটিই প্রেমের স্বাভাবিক রীতি। এই সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। প্রথমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যাবেন।"

শ্লোক ১০৮-১০৯

রাজা কহে,—ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ ।
প্রসাদ লঞা সঙ্গে চলে পাঁচ-সাত ॥ ১০৮ ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ।
এত মহাপ্রসাদ চাহি'—কহ কি কারণ ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা বললেন, "ভবানন্দ রায়ের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ-সাতজন লোককে নিয়ে জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসস্থানের দিকে যাচ্ছে। সে এত মহাপ্রসাদ কেন নিয়ে যাচ্ছে? এখন দয়া করে তার কারণ বলুন।"

শ্লোক ১১০

ভট্ট কহে,—ভক্তগণ আইল জানিঞা ।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁরা লঞা ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "সমস্ত ভক্তরা আসছেন জেনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তারা এই প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছে।"

শ্লোক ১১১

রাজা কহে,—উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান ।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তীর্থে এসে উপবাস করা, ক্ষৌর কর্ম করা, ইত্যাদির বিধান শাস্ত্রে রয়েছে। এঁরা তা না করে কেন খাওয়া-দাওয়া করছেন?"

শ্লোক ১১২

ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি-ধর্ম ।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম-মর্ম ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

ভট্টাচার্য রাজাকে বললেন, "আপনি যা বলছেন সেটি বিধি-ধর্ম, কিন্তু তা ছাড়া আর একটি মার্গ রয়েছে যাকে বলা হয় রাগমার্গ, এবং তাতে ধর্ম অনুশীলনের একটি সূক্ষ্ম মর্ম রয়েছে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র-বিধি অনুসারে তীর্থস্থানে যাওয়ার আগে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। সাধারণত মানুষ ইন্দ্রিয়-তর্পণে অত্যন্ত আসক্ত, এবং মৈথুন না করলে তারা রাত্রে ঘুমোতে পারে না। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার আগে সাধারণ মানুষের ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার পর একদিন উপবাসী থাকতে হয়, এবং তারপর মস্তক মুণ্ডন করে সেই তীর্থক্ষেত্রের নিকটবর্তী নদীতে অথবা সমুদ্রে স্নান করতে হয়। পাপস্খালনের জন্য এই সমস্ত বিধির নির্দেশ রয়েছে। পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ সাধারণত তীর্থস্থানে যায়। প্রকৃতপক্ষে তারা তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে তাদের পাপকর্মগুলি ছেড়ে আসে এবং তার ফলে তীর্থযাত্রীদের পাপ তীর্থক্ষেত্রে সঞ্চিত হয়।

কিন্তু কোন শুদ্ধভক্ত যখন তীর্থক্ষেত্রে যান তখন তিনি জনসাধারণের ফেলে আসা সেই সমস্ত পাপ থেকে তীর্থক্ষেত্রকে মুক্ত করেন—*তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি* (ভাঃ ১/১৩/১০)। তাই সাধারণ মানুষের তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া এবং একজন মহাপুরুষের তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ মানুষ তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে তার পাপ

ছেড়ে আসে আর মহাপুরুষেরা অথবা ভক্তরা কেবল তাদের উপস্থিতির দ্বারা তীর্থক্ষেত্রের সেই সঞ্চিত পাপ পরিষ্কার করে দেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না, এবং তাই তাঁদের বিধি-ধর্ম অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল না। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম বিকশিত হয়েছিল। জগন্নাথপুরীতে পৌঁছেই তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর আদেশে তাঁরা শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১১৩

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শাস্ত্রে যে মস্তক মুণ্ডন এবং উপবাস ইত্যাদি করার নির্দেশ রয়েছে, সেগুলি ভগবানের পরোক্ষ নির্দেশ। কিন্তু ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা ছিল মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ তাই স্বাভাবিকভাবেই ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করাকেই তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১১৪

তাহাঁ উপবাস, যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ ।
প্রভু-আজ্ঞা-প্রসাদ-ত্যাগে হয় অপরাধ ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যেখানে মহাপ্রসাদ নেই সেখানেই উপবাস করতে হয়, কিন্তু ভগবান নিজে যখন প্রসাদ গ্রহণ করতে বলছেন, তখন সেই প্রসাদ যদি ত্যাগ করা হয় তাহলে অপরাধ হয়।

শ্লোক ১১৫

বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন ।
এত লাভ ছাড়ি' কোন্ করে উপোষণ ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিজের হাতে সেই প্রসাদ পরিবেশন করছেন, তখন সেই পরম সৌভাগ্য ত্যাগ করে কে উপবাস করবে?

শ্লোক ১১৬

পূর্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল ।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে একদিন সকালবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ এনে দিয়েছিলেন, এবং আমি হাত-মুখ পর্যন্ত না ধুয়ে শয্যায় বসে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেছিলাম।

শ্লোক ১১৭

যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ-লোক-ধর্ম ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যাকে কৃপা করে তিনি হৃদয়ে প্রেরণা দেন, তিনিই ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সবরকম বৈদিক আচার এবং লৌকিক আচার পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৬৬) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বপ্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, কোন ভয় কর না।" ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানের প্রতি এইরকম দৃঢ় বিশ্বাস সম্ভব। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান এবং তিনি যখন তাঁর ভক্তকে অনুপ্রাণিত করেন, তখন সেই ভক্ত বৈদিক আচার অথবা লৌকিক আচার অনুষ্ঠান না করে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* (৪/২৯/৪৬) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১১৮

যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ১১৮ ॥

যদা—যখন; যম্—যাকে; অনুগৃহ্ণাতি—বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; আত্মভাবিতঃ—যিনি সকলের হৃদয়ে বসে আছেন; স—সে; জহাতি—ত্যাগ করেন; মতিম্—মতি; লোকে—লৌকিক ব্যবহারে; বেদে—বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে; চ—ও; পরিনিষ্ঠিতাম্—আসক্ত।

অনুবাদ

"কেউ যখন হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, তখন তিনি সবরকম লৌকিক ব্যবহার এবং বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিকে পুরঞ্জনের উপাখ্যান বর্ণনা করে এই নির্দেশটি দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই কর্মকাণ্ডের দুর্গতি থেকে মুক্ত হতে পারেন না। নারদমুনি উল্লেখ করেছেন (*ভাগবত* ৪/২৯/৪২-৪) যে, ভগবানের কৃপা ব্যতীত—ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতি, চতুঃসন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং তিনি স্বয়ং—কেউই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন নি।

শ্লোক ১১৯

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা ।
কাশীমিশ্র, পড়িছা-পাত্র, দুঁহে আনাইলা ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর মহারাজ প্রতাপরুদ্র অট্টালিকার উপর থেকে নেমে এলেন এবং কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকালেন।

শ্লোক ১২০-১২১

প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে ।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ॥ ১২০ ॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ।
স্বচ্ছন্দ দর্শন করাইহ, নহে যেন বাধ ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র তখন কাশীমিশ্র এবং মন্দিরের পড়িছাকে বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তাঁর যত ভক্ত ও পার্ষদ এসেছেন, তাঁদের সকলের থাকার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বাসস্থান ও প্রসাদের ব্যবস্থা করুন; এবং তাঁদের ভাল করে মন্দির দর্শন করান, যাতে তাঁদের কোন অসুবিধা না হয়।

শ্লোক ১২২

প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা ।
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ, ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ আপনারা ভালভাবে পালন করবেন। যদি তিনি আদেশ নাও দেন, তবুও ইঙ্গিত বুঝে তাঁর যা প্রয়োজন তা সব সরবরাহ করবেন।"

শ্লোক ১২৩

এত বলি' বিদায় দিল সেই দুই-জনে ।
সার্বভৌম দেখিতে আইল বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে রাজা তাদের দুজনকে বিদায় দিলেন। আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন দেখতে গেলেন।

শ্লোক ১২৪

গোপীনাথাচার্য ভট্টাচার্য সার্বভৌম ।
দূরে রহি' দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য দূর থেকে বৈষ্ণবদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ১২৫-১২৬

সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি' সব বৈষ্ণবগণ ।
কাশীমিশ্র-গৃহ-পথে করিলা গমন ॥ ১২৫ ॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে ।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি' পথে বহুরঙ্গে ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সিংহদ্বারকে দক্ষিণে রেখে সমস্ত বৈষ্ণবগণ কাশীমিশ্রের গৃহের দিকে চললেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে মহা আনন্দে পথে বৈষ্ণবদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১২৭-১২৮

অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
আচার্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৭ ॥
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির ।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন, এবং গভীরভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমানন্দে দুজনে পরম অস্থির হলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই পরিবেশের কথা বিচার করে নিজেকে সম্বরণ করলেন।

শ্লোকে ১২৯-১৩০

শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৯ ॥

একে একে সর্বভক্তে কৈল সম্ভাষণ ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীবাস আদি সমস্ত ভক্তরা একে একে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁদের প্রত্যেককে গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে তিনি একে একে সমস্ত ভক্তদের সম্ভাষণ করলেন এবং তারপর সকলকে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে গমন করলেন।

শ্লোক ১৩১

মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান ।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহাঁ হৈল পরিমাণ ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীমিশ্রের গৃহটি স্বল্প-পরিসর হলেও তাতে অসংখ্য বৈষ্ণবের বসবার স্থান হয়েছিল।

শ্লোক ১৩২

আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইলা ।
আপনি শ্রীহস্তে সবারে মাল্য-গন্ধ দিলা ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের তাঁর কাছে বসালেন এবং স্বহস্তে মালা ও চন্দন দিলেন।

শ্লোক ১৩৩

ভট্টাচার্য, আচার্য তবে মহাপ্রভুর স্থানে ।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন গোপীনাথ আচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্থানে সমস্ত বৈষ্ণবদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১৩৪

অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে ।
আজি আমি পূর্ণ হইলাঙ তোমার আগমনে ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে অত্যন্ত মধুরভাবে বললেন—"তোমার আগমনে আজ আমি পূর্ণ হলাম।"

শ্লোক ১৩৫-১৩৬

অদ্বৈত কহে,—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় ।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্বৈশ্বর্যময় ॥ ১৩৫ ॥
তথাপি ভক্তসঙ্গে হয় সুখোল্লাস ।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু উত্তর দিলেন, "পরমেশ্বর ভগবানের এমনই স্বভাব যদিও তিনি স্বয়ং পূর্ণ এবং সকল ঐশ্বর্যমণ্ডিত তবুও তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গ লাভ করে মহা আনন্দ উপভোগ করেন, এবং তাই তাঁর ভক্তদের সঙ্গে তিনি নিত্যকাল বিবিধ লীলা বিলাস করেন।"

শ্লোক ১৩৭-১৩৮

বাসুদেব দেখি' প্রভু আনন্দিত হঞা ।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৭ ॥
যদ্যপি মুকুন্দ—আমা-সঙ্গে শিশু হৈতে ।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

মুকুন্দ দত্তের পিতা বাসুদেব দত্তকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"যদিও মুকুন্দ আমার শৈশবের সাথী, তবুও তার থেকে আপনাকে দেখে আমি বেশী আনন্দ পাই।"

তাৎপর্য

বাসুদেব দত্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শৈশবের সাথী মুকুন্দ দত্তের পিতা। বন্ধুকে দেখে স্বাভাবিকভাবে আনন্দ হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বাসুদেব দত্তকে বললেন, তাঁর শৈশবের বন্ধু মুকুন্দ দত্তকে দেখে যে আনন্দ হয় তার থেকেও অনেক বেশী আনন্দ পান তিনি যখন তাঁকে দেখতে পান।

শ্লোক ১৩৯

বাসু কহে,—মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব দত্ত বললেন, "মুকুন্দ যে শৈশব থেকে তোমার সঙ্গ লাভ করেছে এবং তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছে, তার ফলে সে পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

শ্লোক ১৪০

ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"তার ফলে ছোট হয়েও মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ হল। সে তোমার কৃপাপাত্র, তাই সে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ।"

শ্লোক ১৪১-১৪২

পুনঃ প্রভু কহে—আমি তোমার নিমিত্তে ।
দুই পুস্তক আনিয়াছি 'দক্ষিণ' হইতে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের ঠাঁই আছে, লহ তা লিখিয়া ।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাঞা ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "আপনার জন্য আমি দক্ষিণ-ভারত থেকে দুটি গ্রন্থ নিয়ে এসেছি। সেই গ্রন্থ দুটি স্বরূপের কাছে রয়েছে, তা আপনি লিখে নিন।" সেই গ্রন্থ দুটি পেয়ে বাসুদেব দত্ত অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১৪৩

প্রত্যেক বৈষ্ণব সবে লিখিয়া লইল ।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণবেরা সেই গ্রন্থ লিখে নিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই গ্রন্থ দুটি (ব্রহ্মসংহিতা এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত) ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

শ্লোক ১৪৪

শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি' মহাপ্রীত ।
তোমার চারি-ভাইর আমি হইনু বিক্রীত ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর এবং তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে গভীর প্রীতি-সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমার চার ভাইয়ের কাছে আমি বিক্রিত হয়েছি।"

শ্লোক ১৪৫

শ্রীবাস কহেন,—কেনে কহ বিপরীত ।
কৃপা-মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর তখন তার উত্তরে বললেন, "তুমি কেন বিপরীত কথা বলছ? প্রকৃতপক্ষে আমাদের চার ভাইকে তুমি তোমার কৃপারূপ মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছ।"

শ্লোক ১৪৬-১৪৭

শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে ।
সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ ১৪৬ ॥
শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর-উপরে ।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শঙ্করকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দামোদরকে বললেন, "তোমার প্রতি আমার প্রীতি শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা মিশ্রিত। কিন্তু শঙ্করের প্রতি আমার প্রেম শুদ্ধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তুমি সব সময় তোমার ছোট ভাই শঙ্করকে তোমার সঙ্গে রেখো।"

তাৎপর্য

এই দামোদর পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর নন। দামোদর পণ্ডিত ছিলেন শঙ্করের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মহাপ্রভু এখানে দামোদর পণ্ডিতকে বললেন যে, তার প্রতি তাঁর প্রেম মর্যাদা মিশ্রিত, কিন্তু তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্করের প্রতি তাঁর প্রেম শুদ্ধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

শ্লোক ১৪৮

দামোদর কহে,—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

দামোদর পণ্ডিত তার উত্তরে বললেন, "শঙ্কর যদিও আমার ছোট ভাই, কিন্তু আপনার বিশেষ কৃপা লাভ করার ফলে, আজ থেকে সে আমার বড় ভাই হল।

শ্লোক ১৪৯

শিবানন্দে কহে প্রভু,—তোমার আমাতে ।
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বললেন, "আমি আগে থেকেই জানি যে, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ অত্যন্ত গভীর।"

শ্লোক ১৫০

শুনি' শিবানন্দ-সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হয়ে একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে ভূপতিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ১৫১

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৫১ ॥

নিমজ্জতঃ—নিমজ্জিত; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **ভব-অর্ণব-অন্তঃ**—সংসার সমুদ্রে; **চিরায়**—বহুকাল পরে; **মে**—আমার; **কূলম্**—কূল; **ইব**—মতন; **অসি**—তুমি হও; **লব্ধঃ**—লব্ধ; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অপি**—ও; **লব্ধম্**—লব্ধ হয়েছে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **ইদানীম্**—সম্প্রতি; **অনুত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পাত্রম্**—পাত্র; **ইদম্**—এই; **দয়ায়াঃ**—তোমার কৃপা প্রদর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

"হে অনন্ত! সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত থেকে বহুকাল পরে আপনাকে আমি কূল স্বরূপে লাভ করেছি! হে প্রভু, আপনিও আমাকে লাভ করে সম্প্রতি আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পেলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি আলবন্দারু যামুনাচার্য রচিত। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখ-দুর্দশাময় সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পরেও ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যায়। জড় জগতে চুরাশী লক্ষ জীবদেহ রয়েছে, তার মধ্যে কেবল মনুষ্য-শরীর পাওয়ার ফলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তিনি ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেন। দুঃখ-দুর্দশাময় জড় জগতে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত অধঃপতিত জীবদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে ভগবান সর্বদাই উন্মুখ। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই আমার বিভিন্ন অংশ। জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে তারা মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রকে কর্ষণ করছে।"

এইভাবে প্রতিটি জীবই এই জড় জগতে কঠোর সংগ্রাম করছে। প্রকৃতপক্ষে জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং সে যখন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। অধঃপতিত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে ভগবান সর্বদাই এই ভবসমুদ্র থেকে জীবদের উদ্ধার করতে উদ্গ্রীব। জীব যদি তার অবস্থা

সম্পর্কে অবগত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, তাহলেই তার জীবন সার্থক হয়। অর্থাৎ সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবানের পরম ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ১৫২

প্রথমে মুরারি-গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া ।
বাহিরেতে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মুরারি গুপ্ত প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত না হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে বাইরে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১৫৩

মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

মুরারি গুপ্তকে দেখতে না পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। তখন মুরারি গুপ্তকে খুঁজতে বহু ভক্ত দ্রুত গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শ্লোক ১৫৪

তৃণ দুইগুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া ।
মহাপ্রভু আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

দন্তে দুইগুচ্ছ তৃণ ধারণ করে মুরারি গুপ্ত অত্যন্ত দীনভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে গেলেন।

শ্লোক ১৫৫-১৫৬

মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ।
পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা কহিতে ॥ ১৫৫ ॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, মুঞি ত' পামর ।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

মুরারি গুপ্তকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতে গেলেন, কিন্তু মুরারি গুপ্ত সেখান থেকে পিছনে সরে গিয়ে বলতে লাগলেন—"প্রভু আমাকে স্পর্শ করো না; আমি অত্যন্ত ঘৃণ্য। আমার এই পাপ কলেবর তোমার স্পর্শের যোগ্য নয়।"

শ্লোক ১৫৭

প্রভু কহে,—মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ ।
তোমার দৈন্য দেখি' মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "মুরারি, দয়া করে তুমি তোমার দৈন্য সংবরণ কর। তোমার এই দৈন্য দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।"

শ্লোক ১৫৮

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জন ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারিকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে তাঁর পাশে বসিয়ে তাঁর গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫৯-১৬০

আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ।
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য পুরন্দর ॥ ১৫৯ ॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি' গুণ গান ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য পুরন্দর, এদের সকলের গুণগান করলেন, পুনঃ পুনঃ তাঁদের আলিঙ্গন করে তাঁদের মহিমান্বিত করলেন।

শ্লোক ১৬১

সবারে সম্মানি' প্রভুর হইল উল্লাস ।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে,—কাহাঁ হরিদাস ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম উল্লাস হল। তখন হরিদাসকে না দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিদাস কোথায়?"

শ্লোক ১৬২

দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞে দেখিয়া ।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে হরিদাস ঠাকুর রাজপথের প্রান্তে দণ্ডবৎ হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১৬৩

মিলন-স্থানে আসি' প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

যেখানে সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, হরিদাস ঠাকুর সেখানে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত না হয়ে দূরে রাজপথের প্রান্তে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১৬৪

ভক্ত সব ধাঞা আইল হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা তখন হরিদাসকে নেওয়ার জন্য ছুটে এলেন। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁরা তখন বললেন—"মহাপ্রভু তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চান। তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে চল।"

শ্লোক ১৬৫

হরিদাস কহে,—মুঞি নীচ-জাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর তখন বললেন, "আমি নীচ জাতি এবং আমি অত্যন্ত অধঃপতিত। তাই মন্দিরের কাছে যাওয়ার অধিকার আমার নেই।"

তাৎপর্য

হরিদাস ঠাকুর এত উন্নত স্তরের বৈষ্ণব ছিলেন যে, তাঁকে হরিদাস গোস্বামী বলা হত, কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে তিনি বিচলিত করতে চাননি। তিনি এমনই মহান বৈষ্ণব ছিলেন যে, তাঁকে 'ঠাকুর' ও 'গোসাঞিঃ' বলে সম্বোধন করা হত;—এই উপাধি দুটি সর্বোত্তম বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত গুরুদেবকে এবং পরমহংসদের গোসাঞিঃ এবং ঠাকুর বলা হয়। হরিদাস ঠাকুর পারমার্থিক মার্গের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁকে আহ্বান করেছিলেন তবুও তিনি মন্দিরের কাছে যেতে চাইতেন না। জগন্নাথমন্দিরে এখনও কেবল বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী হিন্দুদেরই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। অন্যান্য জাতির মধ্যে বিশেষ করে অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এটি সেখানকার বহুদিনের প্রথা এবং তাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের কাছেও যেতেন না। একেই বলা হয় বৈষ্ণবের দীনতা।

শ্লোক ১৬৬-১৬৭

নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহাঁ পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ ॥ ১৬৬ ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করে বললেন, "উদ্যানের মধ্যে যদি আমি কোন নিভৃত স্থান পাই, তাহলে সেখানে একলা থেকে আমি কালযাপন করতে পারি। আমি এইভাবে দূরে থাকতে চাই, যাতে জগন্নাথের সেবকদের সঙ্গে আমার স্পর্শ না হয়, এইটিই আমার বাসনা।"

শ্লোক ১৬৮

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হইল ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা গিয়ে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই কথা বললেন, তখন মহাপ্রভু অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১৬৯

হেনকালে কাশীমিশ্র, পড়িছা,—দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় কাশীমিশ্র ও মন্দিরের পড়িছা, দুজনে সেখানে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন।

শ্লোক ১৭০

সর্ব বৈষ্ণব দেখি' সুখ বড় পাইলা।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণবদের দেখে কাশীমিশ্র ও পড়িছা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ১৭১

প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদনে ।
আজ্ঞা দেহ',—বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা দুজনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করলেন—"দয়া করে আপনি আদেশ দিন যাতে আমরা এই সমস্ত বৈষ্ণবের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্লোক ১৭২

সবার করিয়াছি বাসা-গৃহ-স্থান ।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত বৈষ্ণবদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মহাপ্রসাদেরও আয়োজন করা হয়েছে।"

শ্লোক ১৭৩

প্রভু কহে,—গোপীনাথ, যাহ' বৈষ্ণব লঞা ।
যাহাঁ যাহাঁ কহে বাসা, তাহাঁ দেহ' লঞা ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন গোপীনাথ আচার্যকে বললেন, "কাশীমিশ্র ও পড়িছা যেখানে এই সমস্ত বৈষ্ণবদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে তুমি তাঁদের নিয়ে যাও।"

শ্লোক ১৭৪

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে ।
সর্ব বৈষ্ণবের ইঁহো করিবে সমাধানে ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীমিশ্র এবং মন্দিরের পড়িছাকে বললেন, "জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বাণীনাথকে দিন, সে তাহলে সমস্ত বৈষ্ণবদের তা পরিবেশন করার দায়িত্ব নেবে।

শ্লোক ১৭৫-১৭৬

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জনে ॥ ১৭৫ ॥

সেই ঘর আমাকে দেহ'—আছে প্রয়োজন ।
নিভৃতে বসিয়া তাহাঁ করিব স্মরণ ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গৃহের নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে এক পরম নির্জন স্থানে একখানি ঘর আছে। সেই ঘরটি আপনারা আমাকে দিন। কেননা সেটির আমার প্রয়োজন আছে। সেখানে নিভৃতে বসে আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করব।"

তাৎপর্য

'নিভৃতে বসিয়া তাহাঁ করিব স্মরণ'—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিভৃতে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের অনুকরণীয় নয়। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের জন্য অথবা হরিদাস ঠাকুরের জন্য সেই স্থানটি চেয়েছিলেন। হঠাৎ হরিদাস ঠাকুরের মতো ভাগবতস্তরে উন্নীত হয়ে নির্জন স্থানে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা সম্ভব নয়। হরিদাস ঠাকুরের মতো মহাভাগবত অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই এইভাবে আচরণ করতে পারেন।

সম্প্রতি আমি দেখছি, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কিছু ভক্ত প্রচারকার্য পরিত্যাগ করে নির্জনে উৎসাহী হয়েছে। এটি খুব ভাল লক্ষণ নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের নির্জন ভজনের নিন্দা করেছেন। তাঁর রচিত একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—"প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব"। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের এই নির্জন ভজনের অভিনয় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রতারণা মাত্র। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের পক্ষে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবদ্ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায়ই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা হরিদাস ঠাকুরের মতো নির্জন স্থানে বসে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ভগবান স্বয়ং, তবুও তিনি ছ'বছর ধরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন এবং তারপর আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য জগন্নাথপুরীতে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। জগন্নাথপুরীতে অবস্থান কালেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে অগণিত ভক্ত নিয়ে মহা-সংকীর্তন বিলাস করতেন। অর্থাৎ, পারমার্থিক জীবনের শুরুতেই হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করা উচিত নয়। প্রথমে ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করতে হবে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুমোদন লাভ করতে হবে। তখনই কেবল নির্জন স্থানে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত প্রবল, এবং কনিষ্ঠ ভক্ত যদি হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করতে যায়, তাহলে তার শত্রুরা (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং মাৎসর্য) তাকে আক্রমণ করে পরাভূত করবে। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার পরিবর্তে এই কনিষ্ঠ ভক্ত তখন কেবল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকাবে।

প্রচারকার্য উন্নত স্তরের ভক্তদের জন্য, এবং উন্নত ভক্ত যখন ভক্তিমার্গে আরও উন্নতি লাভ করে, তখন তিনি প্রচার কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্জন স্থানে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে পারেন। কিন্তু, কেউ যদি মহাভাগবতদের অনুকরণ করতে যায় তবে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, ঠিক বৃন্দাবনের সহজিয়াদের মতো।

শ্লোক ১৭৭-১৭৮

মিশ্র কহে,—সব তোমার, চাহ কি কারণে?
আপন-ইচ্ছায় লহ, যেই তোমার মনে ॥ ১৭৭ ॥
আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ।
যে চাহ, সেই আজ্ঞা দেহ' কৃপা করি' ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীমিশ্র তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "সবকিছুই আপনার, আপনি চাইছেন কেন? আপনার যা ইচ্ছা তাই আপনি নিয়ে নিন। আমরা দু'জনে আপনার আজ্ঞা পালনকারী দাস। কৃপা করে আপনি আমাদের আদেশ দিন, আপনার যা প্রয়োজন।"

শ্লোক ১৭৯

এত কহি' দুই জনে বিদায় লইল ।
গোপীনাথ, বাণীনাথ—দুঁহে সঙ্গে নিল ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে কাশীমিশ্র এবং পড়িছা, গোপীনাথ ও বাণীনাথকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

শ্লোক ১৮০

গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর ।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্যকে তাঁরা সমস্ত বাসা-ঘরগুলি দেখিয়ে দিলেন, এবং বাণীনাথকে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দিলেন।

শ্লোক ১৮১

বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা ।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

বহু প্রসাদ, পিঠা নিয়ে বাণীনাথ ফিরে এলেন, এবং গোপীনাথ আচার্যও বাসস্থানগুলি সংস্কার করে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১৮২-১৮৩

মহাপ্রভু কহে,—শুন, সর্ব বৈষ্ণবগণ ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥ ১৮২ ॥
সমুদ্রস্নান করি' কর চূড়া দরশন ।
তবে আজি ইহঁ আসি' করিবে ভোজন ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তখন সমস্ত বৈষ্ণবদের বললেন, "আপনারা সকলে আপনাদের নিজ-নিজ বাসস্থানে গমন করুন। তারপর সমুদ্রে স্নান করে, জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করুন, এবং তারপর এখানে এসে ভোজন করুন।"

শ্লোক ১৮৪

প্রভু নমস্করি' সবে বাসাতে চলিলা ।
গোপীনাথাচার্য সবে বাসা-স্থান দিলা ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করে সমস্ত ভক্তরা তাঁদের বাসস্থানে গেলেন, এবং গোপীনাথ আচার্য তাঁদের বাসস্থান দেখিয়ে দিলেন।

শ্লোক ১৮৫

মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস-মিলনে ।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্তনে ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, এবং সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, হরিদাস ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে",—এই মহামন্ত্র কীর্তন করছেন।

শ্লোক ১৮৬

প্রভু দেখি' পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখামাত্রই হরিদাস ঠাকুর তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৮৭

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমে বিহ্বল হয়ে তখন তাঁরা দুজন ক্রন্দন করতে লাগলেন। প্রভুর গুণে ভৃত্য বিকল হলেন এবং ভৃত্যের গুণে প্রভু বিকল হলেন।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে যে, জীব ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই, এবং তারা সিদ্ধান্ত করে যে জীবের বিকার এবং ঈশ্বরের বিকার একই বস্তু। অর্থাৎ, মায়াবাদীরা বলে যে, জীব যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে ভগবানও সন্তুষ্ট হন, এবং জীব যদি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে ভগবানও অসন্তুষ্ট হন। এইভাবে কথার মারপ্যাঁচে, মায়াবাদীরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, জীবে এবং ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই। কিন্তু তা সত্য নয়। এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন—'প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে'। ভগবান এবং জীব সমান নন, কেননা ভগবান সর্ব অবস্থাতেই প্রভু এবং জীব সর্ব অবস্থাতেই ভৃত্য। অপ্রাকৃত গুণের প্রভাবে বিকার হয় এবং তাই বলা হয় যে, ভগবানের ভক্ত হচ্ছেন ভগবানের হৃদয় এবং ভগবান হচ্ছেন ভক্তের হৃদয়। তা *ভগবদ্গীতায়ও* (৪/১১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"হে পার্থ, যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি সেইভাবে তাদের পুরস্কৃত করি। সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করে।"

ভগবান সর্বদাই তাঁর ভৃত্যের অপ্রাকৃত গুণের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতে উৎসুক। ভৃত্য মহাসুখে তাঁর প্রভুর সেবা করেন, এবং ভগবানও গভীর আনন্দে তাঁর ভৃত্যকে তাঁর থেকে বেশী প্রতিদান দেন।

শ্লোক ১৮৮

হরিদাস কহে,—প্রভু, না ছুঁইও মোরে ।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম পামরে ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুর বললেন, "প্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না, কেননা আমি অত্যন্ত অধঃপতিত, অস্পৃশ্য এবং সবচাইতে অধম।"

শ্লোক ১৮৯

প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি নিজে পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাকে স্পর্শ করছি, কেননা তোমার মতো পবিত্র করার ক্ষমতা আমার নেই।"

তাৎপর্য

এইটি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মধুর সম্পর্কের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ভক্ত মনে করেন যে তিনি সব চাইতে অধম, এবং তাই ভগবানের তাকে স্পর্শ করা উচিত নয়, এবং ভগবান মনে করেন যে এত অপবিত্র জীবের সংস্পর্শে তিনি অপবিত্র হয়ে গেছেন বলে তাঁর ভক্তকে স্পর্শ করে তিনি পবিত্র হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত এবং ভগবান উভয়েই পবিত্র। কেন না জড় জগতের কলুষ তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। গুণগতভাবে তাঁরা সমান কেননা তাঁরা উভয়েই পরম পবিত্র। কিন্তু আয়তনগতভাবে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—ভগবান হচ্ছেন অসীম এবং জীব সীমিত। তাই ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অধীন থাকেন, এবং তাঁদের এই সম্পর্ক নিত্য এবং অবিচলিত। ভৃত্য যদি কখনও প্রভু হতে চায়, তাহলেই সে মায়ার কবলিভূত হয়। এইভাবে জীব তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়।

মায়াবাদীরা প্রভু এবং ভৃত্যকে বা ঈশ্বর এবং জীবকে এক করে বিশ্লেষণ করতে চায়, কিন্তু কি করে যে তারা এক হয় তা তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না। জীব এবং ঈশ্বর যদি এক হয় তাহলে জীব মায়ার কবলিভূত হয় কি করে? তারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে যে, জীব যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সে তৎক্ষণাৎ তথাকথিত ঈশ্বরে পরিণত হয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা সন্তুষ্টিজনক নয়। ঈশ্বর যেহেতু অসীম, তাই তিনি কখনও মায়ার অধীন হন না, তা যদি হতেন তাহলে তাঁর অসীমত্ব স্বীকার করা যায় না। তাই মায়াবাদীদের মতবাদ ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সর্ব অবস্থাতেই ঈশ্বর এবং অসীম, এবং জীব সসীম হওয়ার ফলে কখনও কখনও মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মায়াও ভগবানেরই শক্তি, এবং তাই তাও অসীম; তাই সসীম জীব—ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর শক্তি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়। জীব যখন মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে আবার ভগবানের শুদ্ধ সেবকে পরিণত হয়ে গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হতে পারে। এইটিই অসীম ভগবানের সঙ্গে সসীম জীবের সম্পর্ক।

শ্লোক ১৯০-১৯১

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান ।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥ ১৯০ ॥

নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন ।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "প্রতিক্ষণে তুমি সর্বতীর্থে স্নান কর এবং প্রতিক্ষণে তুমি যজ্ঞ, তপশ্চর্যা ও দান কর। নিরন্তর তুমি চার বেদ অধ্যয়ন কর। যে কোন ব্রাহ্মণ কিংবা সন্ন্যাসী থেকেও তুমি অনেক অনেক পবিত্র।"

শ্লোক ১৯২

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৯২ ॥

অহো বত—কি অদ্ভুত; শ্বপচঃ—অন্ত্যজ আদি নীচ কুলোদ্ভূত; অতঃ—দীক্ষিত ব্রাহ্মণদের থেকেও; গরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ; যৎ—যার; জিহ্বাগ্রে—জিহ্বায়; বর্ততে—বিরাজ করে; নাম—দিব্য নাম; তুভ্যম্—আপনার; তেপুঃ—অনুষ্ঠিত হয়েছে; তপঃ—তপশ্চর্যা; তে—তারা; জুহুবুঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিল; সস্নুঃ—সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছে; আর্যাঃ—সদাচারী; ব্রহ্ম—সমস্ত বেদ; অনূচুঃ—পাঠ করেছে; নাম—দিব্য নাম; গৃণন্তি—কীর্তন করে; যে—যিনি; তে—তারা।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন এই শ্লোকটি বললেন—"হে ভগবান, যাদের জিহ্বায় আপনার নাম বিরাজ করে, তাঁরা যদি অত্যন্ত নীচকুলেও জন্ম গ্রহণ করে তাহলেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা আপনার নাম কীর্তন করেন তাঁরা সবরকম তপস্যা করেছেন, সমস্ত যজ্ঞ করেছেন, সর্বতীর্থে স্নান করেছেন এবং সমস্ত বেদ পাঠ করেছেন। সুতরাং তাঁরা আর্য মধ্যে পরিগণিত।"

তাৎপর্য

'আর্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে উন্নত। পারমার্থিক দিক দিয়ে উন্নত না হলে তাকে আর্য বলা যায় না; এবং এইটিই আর্য ও অনার্যের মধ্যে পার্থক্য। অনার্য হচ্ছে তারা যারা পারমার্থিক বিষয়ে উন্নত নয়। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসরণ করে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং বৈদিক বিধি নিষেধ নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা আর্য হওয়া যায়। যথাযথ গুণ অর্জন না করলে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা আর্য হওয়া যায় না। ভাগবত ধর্ম কাউকে লোকদেখানো ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা আর্যতে অনুমোদন করে না। এখানে যে সমস্ত গুণ বা যোগ্যতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩৩/৭) ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার পর কপিলদেবের মাতা দেবহূতির উক্তি। এইভাবে দেবহূতি সর্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তদের মহিমা কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ১৯৩

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে নিয়ে পুষ্পোদ্যানে গেলেন এবং সেখানে অতি নিভৃতে তাঁকে থাকবার জায়গা দিলেন।

শ্লোক ১৯৪

এইস্থানে রহি' কর নাম-সংকীর্তন ।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বললেন—"এখানে থেকে তুমি নাম সংকীর্তন কর। প্রতিদিন এসে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

শ্লোক ১৯৫

মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম ।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"জগন্নাথদেবের মন্দিরের চক্র দেখে তুমি তাঁকে প্রণাম করবে, এবং প্রতিদিন তোমার জন্য এখানে প্রসাদ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

তাৎপর্য

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যেহেতু মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন না। কিন্তু তবুও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুর কিন্তু নিজেকে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য বলে মনে করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি চাইতেন, তাহলে তিনি হরিদাস ঠাকুরকে জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু মহাপ্রভু প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করতে চাননি। তাই প্রভু তাঁর ভৃত্যকে বলেছিলেন, দূর থেকে মন্দিরের চক্র দেখে প্রণতি নিবেদন করতে। অর্থাৎ, কেউ যদি মন্দিরে ঢুকতে না পারে, অথবা নিজেকে মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে তিনি বাইরে থেকে মন্দিরের চক্র দর্শন করতে পারেন, এবং তা মন্দির অভ্যন্তরে বিগ্রহ দর্শন করারই মতো।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি প্রতিদিন তাকে দেখতে আসবেন এবং তা থেকে বোঝা যায় যে হরিদাস ঠাকুর এত বড় ভক্ত

ছিলেন যে, যদিও তিনি নিজেকে মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু তবুও ভগবান স্বয়ং প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। এমনকি প্রসাদ সংগ্রহ করার জন্যও তাঁকে গৃহের বাইরে যেতে হত না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে প্রতিদিন তিনি তাঁর কাছে প্রসাদ পাঠিয়ে দেবেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন—'*যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*'। ভগবান তাঁর ভক্তের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন।

যারা কৃত্রিমভাবে হরিদাস ঠাকুরের আচরণ অনুকরণ করতে উদ্‌গ্রীব, তাদের মনে রাখা উচিত যে এই ধরনের জীবনধারা গ্রহণ করার পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা তাঁর প্রতিনিধির আদেশ পাওয়া অবশ্য কর্তব্য। শুদ্ধভক্ত অথবা ভগবানের সেবকের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বলেছিলেন, গৌড়বঙ্গে গিয়ে প্রচার করতে, এবং তিনি রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন বৃন্দাবনে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে। তেমনই আবার তিনি হরিদাস ঠাকুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জগন্নাথপুরীতে থেকে ভগবানের নাম কীর্তন করতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন ভক্তকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশ ছাড়া হরিদাস ঠাকুরের আচরণ অনুকরণ করা উচিত নয়। এই ধরনের অনুকরণের নিন্দা করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—

দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব' ॥

যদি কেউ প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় নির্জন স্থানে হরিনাম করার অভিনয় করে, তাহলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। কেননা সেই নির্জন স্থানে সে ভগবানের কথা চিন্তা না করে কামিনী-কাঞ্চনের কথা চিন্তা করবে।

শ্লোক ১৯৬

**নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১৯৬ ॥**

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ প্রভু হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ১৯৭

**সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজ স্থানে ।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥ ১৯৭ ॥**

শ্লোকার্থ

সমুদ্রে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর ঘরে ফিরে এলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা সমুদ্রে স্নান করতে গেলেন।

শ্লোক ১৯৮

**আসি' জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন ।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥ ১৯৮ ॥**

শ্লোকার্থ

সমুদ্রে স্নান করে তাঁরা সকলে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দর্শন করলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসস্থানে ভোজন করতে এলেন।

শ্লোক ১৯৯

**সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি' ।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ ১৯৯ ॥**

শ্লোকার্থ

যোগ্যতা এবং বৈষ্ণবতা অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের বসালেন। তারপর তিনি স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২০০

**অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে ।
দুই-তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে ॥ ২০০ ॥**

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর হাতে অল্প অন্ন ওঠে না, তাই তিনি এক একজনের পাতে দু'তিন জনের অন্ন দিতে লাগলেন।

শ্লোক ২০১

**প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ।
ঊর্ধ্ব-হস্তে বসি' রহে সর্ব ভক্তগণ ॥ ২০১ ॥**

শ্লোকার্থ

প্রভু না খেলে ভক্তরা কেউ ভোজন করবেন না, তাই তাঁরা সকলে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

শ্লোক ২০২

**স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন ।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥ ২০২ ॥**

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-গোসাঞি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—"তুমি প্রসাদ গ্রহণ করতে না বসলে কেউ কিছু খাবে না।

শ্লোক ২০৩-২০৪

তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
গোপীনাথাচার্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ২০৩ ॥
আচার্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা ।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার সঙ্গে যে সমস্ত সন্ন্যাসীরা আছেন, গোপীনাথ আচার্য তাঁদের প্রসাদ গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করেছেন। গোপীনাথ আচার্য তাঁদের ভিক্ষার প্রসাদান্ন নিয়ে এসেছেন, এবং পরমানন্দ পুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শ্লোক ২০৫

নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে তুমি ভিক্ষা করতে বস, আর আমি সমস্ত বৈষ্ণবদের পরিবেশন করছি।"

শ্লোক ২০৬

তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা ।
যত্ন করি হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যত্ন করে প্রসাদান্ন গোবিন্দের হাতে দিয়ে হরিদাস ঠাকুরের কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ২০৭

আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসীরে লঞা ।
পরিবেশন করে আচার্য হরষিত হঞা ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসলেন; এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গোপীনাথ আচার্য প্রসাদ পরিবেশন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২০৮

স্বরূপ গোসাঞি, দামোদর, জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে—আনন্দ ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ গোসাঞি, দামোদর এবং জগদানন্দ পণ্ডিত মহা আনন্দে ভক্তদের প্রসাদ পরিবেশন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২০৯

নানা পিঠাপানা খায় আকণ্ঠ পুরিয়া ।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা আকণ্ঠপুরে পিঠা-পানা খেতে লাগলেন, এবং মাঝে মাঝে মহা আনন্দে হরিধ্বনি দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

প্রসাদ গ্রহণ করার সময় 'হরিধ্বনি' দেওয়া এবং 'শরীর অবিদ্যা জাল' আদি কীর্তন করার প্রথা বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রসাদ সেবা করার সময় মনে রাখতে হবে যে, এই প্রসাদ কোন সাধারণ খাবার নয়, প্রসাদ অপ্রাকৃত বস্তু। তাই সেই কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

"যথেষ্ট পুণ্যবান না হলে মহাপ্রসাদ, ভগবান, ভগবানের দিব্যনাম এবং বৈষ্ণবদের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না।" ভগবানের প্রসাদ, ভগবানের নাম এবং ভগবানের শুদ্ধভক্ত চিন্ময়তত্ত্ব। প্রসাদকে কখনও সাধারণ খাবার বলে মনে করা উচিত নয়। তেমনই ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি যে খাদ্য-দ্রব্য তা স্পর্শ করা উচিত নয়। সমস্ত বৈষ্ণবেরা তাই নিষ্ঠাভরে প্রসাদ ছাড়া আর অন্য কোন খাবার গ্রহণ করেন না। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রসাদ এবং ভগবানের দিব্যনাম যে এই জড় জগতের বস্তু নয়, তা হৃদয়ঙ্গম করে গভীর বিশ্বাস সহকারে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত এবং মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-আরাধনা করা উচিত। তাহলে সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় (*ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)।

শ্লোক ২১০

ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন ।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

ভোজন সমাপ্ত হলে সকলে আচমন করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সকলকে মালা-চন্দন পরালেন।

শ্লোক ২১১

বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা ।
সন্ধ্যাকালে আসি' পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসাদ সেবা করার পর তাঁরা সকলে বিশ্রাম করার জন্য তাঁদের বাসায় গেলেন, এবং সন্ধ্যাবেলায় আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক ২১২

হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে ।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণবগণে ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় রামানন্দ রায়ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন, এবং মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্লোক ২১৩

সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয় ।
কীর্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁদের সকলকে নিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গেলেন এবং সকলকে নিয়ে ভগবানের নাম সংকীর্তন আরম্ভ শুরু করলেন।

শ্লোক ২১৪

সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সংকীর্তন ।
পড়িছা আসি' সবারে দিল মাল্য-চন্দন ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথদেবের ধূপ-আরতি দর্শন করে তাঁরা সংকীর্তন করতে আরম্ভ করলেন। তখন পড়িছা এসে তাঁদের সকলকে মালা ও চন্দন দিলেন।

শ্লোক ২১৫

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্তন ।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

চারদিকে চারটি সম্প্রদায় কীর্তন করছিল, এবং মাঝখানে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ২১৬

অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে, বত্রিশ করতাল ।
হরিধ্বনি করে সবে, বলে—ভাল, ভাল ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

চারটি দলে আটটি মৃদঙ্গ এবং বত্রিশটি করতাল বাজছিল; এবং তাঁদের সেই কীর্তন শুনে সকলে হরিধ্বনি দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—"খুব ভাল! খুব ভাল!"

শ্লোক ২১৭

কীর্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ।
চতুর্দশ লোক ভরি' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংকীর্তনের ধ্বনির প্রভাবে মহামঙ্গলের উদয় হল এবং সেই সংকীর্তনের ধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবন ভরে উঠল।

শ্লোক ২১৮

কীর্তন-আরম্ভে প্রেম উথলি' চলিল ।
নীলাচলবাসী লোক ধাঞা আইল ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সংকীর্তন যখন শুরু হল, তখন ভগবৎ-প্রেমে চতুর্দিক প্লাবিত হল, এবং সমস্ত জগন্নাথপুরীর অধিবাসীরা সেখানে ছুটে এলেন।

শ্লোক ২১৯

কীর্তন দেখি' সবার মনে হৈল চমৎকার ।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কীর্তন দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন, এবং তাঁরা সকলে বলতে লাগলেন, "কোথাও আমরা এরকম প্রেমের বিকার দেখিনি।"

শ্লোক ২২০

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া ।
প্রদক্ষিণ করি' বুলেন নর্তন করিয়া ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২১

আগে-পাছে গান করে চারি সম্প্রদায় ।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগে ও পিছনে চারটি সম্প্রদায় কীর্তন করছিল; এবং নৃত্য করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভাবের আবেশে আছাড় খেয়ে পড়ছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে ধরছিলেন।

শ্লোক ২২২

অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার ।
প্রেমের বিকার দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার ইত্যাদি প্রেমের বিকার দেখা দিচ্ছিল। তা দেখে সমস্ত লোকেরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ২২৩

পিচ্‌কারি-ধারা জিনি' অশ্রু নয়নে ।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

পিচকারির ধারার মতো তাঁর দুচোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছিল। সেই প্রেমাশ্রুতে চারদিকের লোকেরা স্নাত হলেন।

শ্লোক ২২৪

'বেড়ানৃত্য' মহাপ্রভু করি' কতক্ষণ ।
মন্দিরের পাছে রহি' করয়ে কীর্তন ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দির প্রদক্ষিণ করে কিছুক্ষণ নৃত্য করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের পিছনে থেকে কীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২৫

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায় ।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

চারদিকে চার সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গান করছিল, এবং মাঝখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাণ্ডব নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ২২৬

বহুক্ষণ নৃত্য করি' প্রভু স্থির হৈলা ।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

বহুক্ষণ নৃত্য করার পর স্থির হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চারজন মহান্তকে নাচতে আদেশ দিলেন।

শ্লোক ২২৭

এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে ।
অদ্বৈত-আচার্য নাচে আর সম্প্রদায়ে ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এক সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ প্রভু নাচতে লাগলেন, এবং অন্য সম্প্রদায়ে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ২২৮

আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

আর এক সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচতে লাগলেন, এবং অন্য সম্প্রদায়ে শ্রীবাস ঠাকুর নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ২২৯

মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন ।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য তাঁর হইল প্রকটন ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

যখন এই নৃত্য-কীর্তন হচ্ছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই চার সম্প্রদায়ের মাঝখানে থেকে তা দর্শন করতে লাগলেন, এবং তখন তাঁর একটি ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়েছিল।

শ্লোক ২৩০

চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন ।
সবে দেখে,—প্রভু করে আমারে দরশন ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

চারদিকে যারা যারা নৃত্য-গীত করেছিলেন, তাঁদের সকলের মনে হল—"মহাপ্রভু আমাকে দেখছেন।"

শ্লোক ২৩১

চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য প্রকাশ ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চারজনের নৃত্য দেখতে অভিলাষ হল, এবং সেই অভিলাষ অনুসারে তিনি কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ২৩২

দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি' মাত্র জানে ।
কেমনে চৌদিকে দেখে,—ইহা নাহি জানে ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁরাই তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখেছিলেন, তাঁরাই বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি কোন অলৌকিক-লীলা বিলাস করছেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না কিভাবে তিনি চারদিকে দেখছিলেন।

শ্লোক ২৩৩

পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য-স্থানে ।
চৌদিকের সখা কহে,—আমারে নেহানে ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে যমুনার তীরে তাঁর সখাদের মাঝখানে বসে কৃষ্ণ যখন বন ভোজন করতেন, তখন তাঁর চারদিকে সমস্ত সখারা বলত, "কৃষ্ণ কেবল আমাকে দেখছে।" ঠিক তেমনই সেই সংকীর্তনের সময় সকলেরই মনে হয়েছিল যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল তাকেই দেখছেন।

শ্লোক ২৩৪

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে ।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্য করতে করতে কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আসছিলেন, মহাপ্রভু তখন তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করছিলেন।

শ্লোক ২৩৫

মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসংকীর্তন ।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মহান নৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসংকীর্তন দর্শন করে প্রেমাবেশে সমস্ত নীলাচলবাসীরা আনন্দসাগরে ভাসছিলেন।

শ্লোক ২৩৬

গজপতি রাজা শুনি' কীর্তন-মহত্ত্ব ।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংকীর্তনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর আপনজনদের সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের চূড়ায় আরোহণ করে সেই নৃত্য-কীর্তন দেখতে লাগলেন।

শ্লোকার্থ ২৩৭

কীর্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কীর্তন দেখে রাজা চমৎকৃত হলেন; এবং তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার উৎকণ্ঠা অনন্তগুণে বর্ধিত হল।

শ্লোক ২৩৮

কীর্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি ।
সর্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংকীর্তন যখন সমাপ্ত হল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করলেন। তারপর সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে তিনি তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২৩৯

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দিরের পড়িছা তখন প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ এনে দিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

শ্লোক ২৪০

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি শয়ন করার জন্য সকলকে বিদায় দিলেন। এইভাবে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৪১

যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্তন-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

যখন সেই সমস্ত ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তখন প্রতিদিন তাঁরা এইভাবে মহা আনন্দে সংকীর্তন লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ২৪২

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্তন-বিলাস ।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন লীলাবিলাস বর্ণনা করলাম, এবং আমি সকলকে আশীর্বাদ করি—এই লীলা যে-ই শ্রবণ করবে, সে-ই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস হবে।

শ্লোক ২৪৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বেড়া কীর্তন লীলা' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য লীলার একাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ* ভাষ্যে এই পরিচ্ছেদের কথাসার-এ বলেছেন ঃ— উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার অনেক চেষ্টা করলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে রাজার মনোভাব মহাপ্রভুকে জানালেন, কিন্তু তবুও মহাপ্রভু রাজাকে দর্শন করতে সম্মত হলেন না। তখন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বহির্বাস তাঁর কাছ থেকে নিয়ে রাজাকে পাঠালেন। আর একদিন রামানন্দ রায় রাজাকে অনুগ্রহ করার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাতে সম্মত না হয়ে রাজার পুত্রকে আনতে আদেশ দিলেন। রাজপুত্রের কৃষ্ণ-উদ্দীপক বেশ দেখে মহাপ্রভু তাকে কৃপা করলেন।

তারপর রথযাত্রার পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচামন্দির ধৌত ও মার্জন করলেন। তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করে উপবনে সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে প্রসাদ সেবা করলেন। মন্দির মার্জন করার সময় কোন গৌড়ীয় ভক্ত মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়ে সেই জল পান করায় একটি প্রেম-রহস্যের উদয় হল। আবার অদ্বৈত আচার্যের পুত্র শ্রীগোপাল মূর্ছিত হলে তার মূর্ছা ভঙ্গ হয় না দেখে মহাপ্রভু তাকে চেতন করালেন। প্রসাদ সেবার সময় অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে প্রেমকলহ হয়েছিল। অদ্বৈত আচার্য প্রভু বলেছিলেন—"অজ্ঞাত কুলশীল নিত্যানন্দের সঙ্গে একসাথে ভোজন করা গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কর্তব্য নয়।" তার উত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন—"অদ্বৈত আচার্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিপুণ। তাই তার মতো অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে একত্রে বসে ভোজন করলে ভদ্রলোকের মনোভাব কি রকম হয়ে যেতে পারে বলা যায় না।" এই উভয় প্রভুর কথারই অনেক-গূঢ় রহস্য আছে, তা কেবল ভগবদ্ভক্তরাই বুঝতে পারেন। বৈষ্ণবদের সেবা হয়ে যাওয়ার পর স্বরূপ দামোদর আদি সজ্জনগণ গৃহের মধ্যে প্রসাদ সেবা করলেন। শ্রীনব-যৌবনে দর্শনের দিনে ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগবন্ধু-দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সংমার্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরম্—শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির; **আত্ম-বৃন্দৈঃ**—অন্তরঙ্গ ভক্তদের; **সংমার্জনয়ন্**—পরিষ্কার করেছিলেন; **ক্ষালনতঃ**—প্রক্ষালন আদির দ্বারা; **সঃ**—সেই; **গৌরঃ**—শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু; স্ব-চিত্ত-বৎ—তাঁর হৃদয়ের মতো; শীতলম্—ভোগ-বাসনারূপ অনলজনিত ত্রিতাপ বিহীন; উজ্জ্বলম্—দীপ্তি বিশিষ্ট; চ—ও; কৃষ্ণ-উপবেশ-ঔপয়িকম্—শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনের যোগ্য; চকার—করেছিলেন।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির সংমার্জন ও প্রক্ষালন করে পরিষ্কার করেছিলেন এবং সেই মন্দিরকে তাঁর হৃদয়ের মতো শীতল ও উজ্জ্বল করে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করেছিলেন।"

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
শক্তি দেহ,—করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের জয় হোক! আমি তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন আমাকে শক্তি দেন যাতে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত বর্ণনা করতে পারি।

শ্লোক ৪

পূর্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা ।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ পুরীতে ফিরে এসেছিলেন, তখন উড়িষ্যার রাজা, প্রতাপরুদ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

কটক হৈতে পত্রী দিল সার্বভৌম-ঠাঞি ।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবারে যাই ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজধানী কটক থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি আদেশ দেন তাহলে তিনি তাঁকে দর্শন করতে আসবেন।

শ্লোক ৬-১০

ভট্টাচার্য লিখিল,—প্রভুর আজ্ঞা না হৈল ।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥ ৬ ॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয় ।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥ ৮ ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায় ।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৯ ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি ।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পত্রের উত্তরে ভট্টাচার্য লিখলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পাওয়া গেল না। তখন রাজা তাঁকে আর একটি পত্র লিখলেন। সেই পত্রে মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন, "আপনি মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তদের কাছে আমার জন্য নিবেদন করবেন তাঁরা যেন আমার প্রতি সদয় হয়ে মহাপ্রভুর কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। তাঁদের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে পারি। মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া আমি রাজ্য-শাসনে উদাসীন। গৌরহরি যদি আমাকে কৃপা না করেন তাহলে রাজ্য ছেড়ে আমি যোগী হয়ে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করব।"

শ্লোক ১১

ভট্টাচার্য পত্রী দেখি' চিন্তিত হঞা ।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই চিঠিটি পেয়ে চিন্তিত হয়ে সেই চিঠিটি নিয়ে ভক্তদের কাছে গেলেন।

শ্লোক ১২

সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দরশন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের তিনি রাজার কথা বললেন এবং তারপর তাঁদের সকলকে তিনি সেই চিঠিটি দেখালেন।

শ্লোক ১৩

পত্রী দেখি' সবার মনে হইল বিস্ময় ।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়! ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিঠিটি পড়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের এত ভক্তি দেখে তাঁরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৪

সবে কহে,—প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে ।
আমি সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা তখন বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনমতেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না, এবং আমরা যদি তাঁকে অনুরোধ করি তাহলে তিনি দুঃখ পাবেন।"

শ্লোক ১৫

সার্বভৌম কহে,—সবে চল' একবার ।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন তাঁদের বললেন, "চল, আমরা সকলে একবার মহাপ্রভুর কাছে যাই। তাঁকে আমরা রাজার সঙ্গে মিলিত হতে বলব না, কেবল রাজার ভগবদ্ভক্তির নিষ্ঠা বর্ণনা করব।"

শ্লোক ১৬

এত বলি' সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে ।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সঙ্কল্প করে তাঁরা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। যদিও তাঁরা মহাপ্রভুকে অনেক কিছু বলতে উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না।

শ্লোক ১৭

প্রভু কহে, কি কহিতে সবার আগমন?
দেখিয়ে কহিতে চাহ,—না কহ, কি কারণ ? ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন,—"তোমরা সকলে আমাকে কি বলতে এসেছ? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমরা কিছু বলতে চাও; অথচ কিছু বলছ না কেন?"

শ্লোক ১৮

নিত্যানন্দ কহে,—তোমায় চাহি নিবেদিতে ।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "আমরা তোমাকে কিছু বলতে চাই। যদিও তা না বলে আমরা থাকতে পারছি না, তবুও সেকথা বলতে আমাদের ভয় হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে ।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বিষয়টি তোমাকে নিবেদন করার যোগ্য না অযোগ্য তা আমি জানি না, তবে আমরা সকলে তোমাকে বলতে চাই যে, তোমার দর্শন না পেলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র যোগী হয়ে যেতে চান।"

শ্লোক ২০

কাণে মুদ্রা লই' মুঞি হইব ভিখারী ।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'গৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম বিনা রাজ্যভোগ করার বাসনা আমার নেই। তাই আমি কানে মুদ্রা ধারণ করে ভিখারী হব।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে এখনও পাশ্চাত্য দেশের বেদেদের মতো এক শ্রেণীর পেশাদারী ভিক্ষুক দেখা যায়। তারা কিছু যাদু-বিদ্যা জানে এবং তাদের পেশা হচ্ছে কখনও অনুনয় বিনয় করা আবার কখনও ভয় দেখিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করা। এদের বলা হয় 'কানফাটা যোগী'। কেননা এরা কানে হাতীর দাঁতের তৈরী একপ্রকার বালা পরে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন না পেয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র এত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি এইরকম যোগী হয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ মনে করে যে, যোগীর কানে হাতীর দাঁতের মুদ্রা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এটি প্রকৃত যোগীর কোন লক্ষণ নয়। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও মনে করেছিলেন যে, যোগী হতে হলে—কানে এই ধরনের মুদ্রা ধারণ করতে হবে।

শ্লোক ২১

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

কবে আমি আমার দুই চোখ ভরে তাঁর সেই মুখচন্দ্র দর্শন করব? কবে আমি সেই পাদপদ্ম আমার হৃদয়ে ধারণ করব।' "

শ্লোক ২২-২৩

যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন ।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ ২২ ॥
তোমা-সবার ইচ্ছা,—এই আমারে লঞা ।
রাজাকে মিলহ ইহঁ কটকেতে গিয়া ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেকথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন যদিও কোমল হয়েছিল, কিন্তু তবুও বাইরে তিনি নিষ্ঠুরভাব দেখিয়ে বলেছিলেন, "আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের সকলের ইচ্ছা যে, আমাকে কটকে নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বভাবতই ছিলেন করুণার সিন্ধু, তাই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মনোভাবের কথা শোনা মাত্রই তাঁর হৃদয় কোমল হয়েছিল। এইরূপে তিনি মহারাজকে দেখার জন্য কটকে যেতেও প্রস্তুত ছিলেন; তাই তিনি মহারাজের কটক থেকে জগন্নাথপুরীতে তাঁকে দেখতে আসার কথা বিবেচনা পর্যন্ত করেন নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত কৃপাময় ছিলেন যে, তিনি রাজাকে দেখতে যাওয়ার জন্য কটক যেতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই মনোভাব

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই রাজা চাননি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কটকে আসুন। কিন্তু কঠোরতা প্রদর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সমস্ত ভক্ত যদি চান, তাহলে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কটকে যাবেন।

শ্লোক ২৪-২৫

পরমার্থ থাকুক—লোকে করিবে নিন্দন ।
লোকে রহু—দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥ ২৪ ॥
তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে ।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার পরমার্থ সাধনের কথা থাক—লোকে আমার নিন্দা করবে। আর লোকের কেন কথা—দামোদরই আমাকে ভর্ৎসনা করবে। তোমাদের সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। তবে দামোদর যদি বলে তাহলে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি।"

তাৎপর্য

পরমার্থ বিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে ভোগী লোকদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে রাজ-দর্শন দোষাবহ। সেই দোষের ত কথাই নেই—সন্ন্যাসীর অল্প দোষ দেখলেই লোকে নিন্দা করে। লোক-নিন্দা পরিত্যাগের একটু তাৎপর্য আছে—জগতে ধর্ম প্রচারই সন্ন্যাসীর কাজ। লোকেরা যদি কোন সন্ন্যাসীর নিন্দা করে, তাহলে তাঁর প্রচারকার্য ফলপ্রসূ হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লোকনিন্দার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, যাতে তাঁর প্রচার কার্য ব্যাহত না হয়। সেই সময় দামোদর পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দামোদর পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং খুবই নীতিপরায়ণ ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরণে কোনরকম অসামঞ্জস্য দেখলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদমর্যাদার কথা বিবেচনা না করেই তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতের এই সরলতা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন—লোকনিন্দার কথা দূরে থাকুক—আমার কাছে এই দামোদর পণ্ডিত আছে, এর হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া কঠিন—সে অবশ্যই আমাকে ভর্ৎসনা করবে। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না; যদি দামোদর মিলিত হতে বলে, তাহলেই পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বাক্যের অনেক গূঢ় অর্থ আছে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দামোদরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার পক্ষে আর মহাপ্রভুকে ভর্ৎসনা করা উচিত নয়—তার এই বাক্‌দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন সমস্ত ভক্তদের পথ প্রদর্শক এবং গুরু। দামোদর পণ্ডিত ছিলেন তাদের মধ্যে একজন, এবং

এইভাবে দামোদর পণ্ডিতকে সাবধান করে দিয়ে তিনি তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছিলেন। ভক্ত অথবা শিষ্য, ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবকে কখনও নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৬

দামোদর কহে,—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার গোচর ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

দামোদর পণ্ডিত তখন বললেন, "হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কি করা কর্তব্য এবং কি করা কর্তব্য নয়, তা সবই তুমি ভালমতো জান।

শ্লোক ২৭

আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, তোমাকে বিধি দিব?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি এক অতি নগণ্য জীব, অতএব তোমাকে নির্দেশ দেওয়ার কোন্ যোগ্যতা আমার রয়েছে? তোমার নিজের ইচ্ছাতেই তুমি রাজার সঙ্গে মিলিত হবে। তা আমি শুধু দেখব।

শ্লোক ২৮

রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি—স্নেহবশ ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রাজা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আর তুমি স্নেহের বশ। অতএব তার স্নেহই তাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ দান করাবে।

শ্লোক ২৯

যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র ।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও তুমি পরমেশ্বর এবং পরম স্বতন্ত্র, তবুও তুমি তোমার ভক্তের প্রেমের অধীন। সেইটিই তোমার স্বভাব।"

শ্লোক ৩০

নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন্ জন ।
যে তোমারে কহে, 'কর রাজদরশন' ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু তখন বললেন, "এমন কে আছে যে, তোমাকে রাজ দর্শন করতে বলবে?

শ্লোক ৩১

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু অনুরাগী মানুষদের স্বভাব হচ্ছে, তার ইপ্সিত বস্তু না পেলে, তার প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে।

শ্লোক ৩২

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ ।
কৃষ্ণ লাগি' পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীরা তার একটি সুন্দর প্রমাণ। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য, তাঁদের পতিদের সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন।"

তাৎপর্য

একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপ-সখাদের সঙ্গে মথুরার নিকটবর্তী গোচারণভূমিতে তাঁদের গাভী চরাচ্ছিলেন। তখন গোপবালকেরা ক্ষুধার্ত হলে কৃষ্ণ তাদের বলেন যে, নিকটস্থ বনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করছেন, তাদের কাছে গিয়ে আমার নামে অন্ন ভিক্ষা কর। রাখালেরা গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করলে, সকাম কর্মী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অন্ন দিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীরা কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশত, রাখালদের সেই আবেদন শুনে তাদের পতিদের যজ্ঞ পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দেওয়ার জন্য অনেক লাঞ্ছনা স্বীকার করলেন, এবং তাঁরা তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান ।
তুমি না মিলিলেহ তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ ॥ ৩৩ ॥
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি' ।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি' ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুকে একটি প্রস্তাব বিবেচনা করতে বললেন—"তুমি তার

সঙ্গে সাক্ষাৎ না করলেও, যদি তাকে কৃপা করে তুমি তোমার একটি বহির্বাস দাও, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে তোমার সাক্ষাৎ লাভের আশায় রাজা প্রাণ ধারণ করবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত বিচক্ষণতা সহকারে প্রস্তাব করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি তাঁর বহির্বাস রাজাকে দেন, তাহলে মহাপ্রভুর পক্ষে রাজাকে দর্শন সম্ভব না হলেও, রাজা কিছুটা আশ্বস্ত হবেন। রাজা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পক্ষে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব ছিল না। সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু এই প্রস্তাব করেছিলেন যাতে রাজা বুঝতে পারেন যে, তার প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে, এই আশায় রাজাও প্রাণ ধারণ করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৫

প্রভু কহে,—তুমি-সব পরম বিদ্বান্ ।
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তোমরা সকলে পরম বিদ্বান, তোমরা যা স্থির করবে, আমি তাই মেনে নেব।"

শ্লোক ৩৬

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দের কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বহির্বাস চেয়ে নিলেন।

শ্লোক ৩৭

সেই বহির্বাস সার্বভৌমপাশ দিল ।
সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠা'ল ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বহির্বাসটি নিত্যানন্দ প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে দিলেন, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেই বস্ত্রটি রাজার কাছে পাঠালেন।

শ্লোক ৩৮

বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বহির্বাসটি পেয়ে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং সেটিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে অভিন্নজ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এইটিও একটি বৈদিক সিদ্ধান্ত। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পরম তত্ত্ব, তাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই তাঁর থেকে অভিন্ন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং যদিও তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারেন নি, কিন্তু তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তির চরম সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সেই বহির্বাসটি পাওয়া মাত্রই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যে ভাবে আগ্রহ সহকারে পূজা করবেন বলে মনে করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা প্রদত্ত সেই বহির্বাসটিকেও মহাপ্রভুর থেকে অভিন্ন জ্ঞানে তিনি সেটির পূজা করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের পরিধেয় বসন, ভূষণ, শয্যা, পাদুকা ইত্যাদি ভগবানের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই শ্রীবলদেবের কলা 'শেষরূপী' বিষ্ণুর প্রকাশ। অতএব ভগবানের বসন ভগবানের থেকে অভিন্ন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই আরাধ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন আরাধ্য, তাঁর ধাম-বৃন্দাবনও তেমনই আরাধ্য; বৃন্দাবন যেমন আরাধ্য, তেমনই বৃন্দাবনের বৃক্ষ, লতা, নদী ইত্যাদি সবকিছুই আরাধ্য। তাই ভগবানের শুদ্ধভক্ত গেয়েছেন—"জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন"। ভক্তের যদি এরকম দৃঢ় ভক্তি থাকে, তাহলে সমস্ত বৈদিক সিদ্ধান্ত তার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩)

"পরমেশ্বর ভগবানে যার পরাভক্তি রয়েছে, আবার ভগবানের প্রতি তার যেরকম ভক্তি তার গুরুদেবের প্রতিও তার তেমনই শুদ্ধ ভক্তি রয়েছে, সেই মহাত্মার কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের মর্ম আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।"

এইভাবে মহারাজ প্রতাপরুদ্র এবং অন্যান্য ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের শিখতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই আরাধ্য। দেবাদিদেব মহাদেবও *কূর্মপুরাণের* নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে *তদীয়ানাম্* শব্দটির মাধ্যমে সেই কথা বলেছেন।

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

"হে দেবী, সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা। কিন্তু তাঁর থেকেও শ্রেয় 'তদীয়' বা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত যা, তাঁর আরাধনা।" শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তেমনই তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক, শ্রীগুরুদেব এবং সমস্ত ভক্তরাও 'তদীয়'।

ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, গুরু, বৈষ্ণব, এবং তাদের ব্যবহৃত সবকিছুই 'তদীয়' এবং নিঃসন্দেহে সকলেরই আরাধ্য।

শ্লোক ৩৯

রামানন্দ রায় যবে 'দক্ষিণ' হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় যখন দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এলেন, তখন তিনি রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকার অনুমতি দিতে।

শ্লোক ৪০

তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপনি মিলন লাগি' সাধিতে লাগিলা ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় যখন মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সেই অনুরোধ করলেন, তখন রাজা পরম সন্তোষে তাকে অনুমতি দিলেন; এবং রাজা তাকেও অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন।

শ্লোক ৪১

মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা রামানন্দ রায়কে বললেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তোমাকে অত্যন্ত কৃপা করেন, তাই তুমি তাঁকে অনুরোধ কর যেন তিনি কৃপা করে আমাকে দর্শন দান করেন।"

শ্লোক ৪২

একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রায় যখন একসঙ্গে জগন্নাথপুরীতে এলেন, তখন রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

শ্লোক ৪৩

প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাঞা ঐছে কহে বারবার ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে রাজার প্রেমভক্তির কথা বললেন, এবং প্রসঙ্গ পেয়ে তিনি বার বার তাঁকে সেই কথা বললেন।

শ্লোক ৪৪

রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ।
রাজপ্রীতি কহি' দ্রবাইল প্রভুর মন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় ছিলেন রাজমন্ত্রী, তাই তিনি ব্যবহারে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি রাজার গভীর অনুরাগের কথা বর্ণনা করে তিনি মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে রাজনীতিবিদেরা মানুষের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা খুব ভালভাবে জানেন, বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যাপারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকজন মহান ভক্ত—যেমন, রামানন্দ রায়, রঘুনাথ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনে তাঁরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তাই তাঁরা জানতেন কিভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময় আমরা রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভুর সেবায় রাজনীতি প্রয়োগ করতে দেখি। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা এবং জ্যাঠাকে যখন রাজ কর্মচারীরা গ্রেপ্তার করতে আসে, তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাদের লুকিয়ে রেখে নিজে রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনীতির মাধ্যমে মীমাংসা করেন। তেমনই সনাতন গোস্বামী যখন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে চান, তখন তাঁকে বন্দী করা হয়, এবং তিনি কারাধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়ে কারামুক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যান। এখানে আমরা দেখছি মহাপ্রভুর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ রামানন্দ রায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিলেন, যদিও মহাপ্রভু রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না বলে মনস্থির করেছিলেন। এইভাবে রামানন্দ রায়ের রাজনীতি এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং অন্য সমস্ত ভক্তদের ঐকান্তিক ইচ্ছা সফল হয়েছিল। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাজনীতিও যদি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা ভগবদ্ভক্তির অঙ্গে পরিণত হয়।

শ্লোক ৪৫

উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবারে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন; তাই রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন তাকে দর্শন দেন।

শ্লোক ৪৬

রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করলেন—"দয়া করে একবার তুমি রামানন্দ রায়কে তোমার শ্রীপাদপদ্মের দর্শন দান কর।"

শ্লোক ৪৭

প্রভু কহে,—রামানন্দ, কহ বিচারিয়া ।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হঞা? ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে বললেন, "রামানন্দ, তুমি বিচার করে বল, সন্ন্যাসী হয়ে কি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত?

শ্লোক ৪৮

রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই লোক নাশ ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সন্ন্যাসীর ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। পরলোকের কথা তো ছেড়েই দিলাম, ইহলোকের মানুষেরাই তাহলে উপহাস করে।"

শ্লোক ৪৯

রামানন্দ কহে,—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় বললেন, "প্রভু তুমি ভগবান এবং তাই তুমি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। তুমি তো কারোর পরতন্ত্র নও, তাহলে তোমার ভয় কিসে?"

শ্লোক ৫০

প্রভু কহে,—আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী ।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিবাদ করে বললেন, "আমি একজন সাধারণ মানুষ এবং আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বী। তাই কায়মনোবাক্যে লৌকিক ব্যবহারে কোন ত্রুটি হতে পারে বলে ভয় পাই।

শ্লোক ৫১

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায় ।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"সাদা কাপড়ে যেমন কালির দাগ লুকায় না, তেমনই সন্ন্যাসীর আচরণে অল্পদোষ দেখলেই লোকেরা সে কথা বলাবলি করে।"

শ্লোক ৫২

রায় কহে,—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি ।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "প্রভু, তুমি কত পাপীকে উদ্ধার করেছ। এই গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবক এবং তোমার ভক্ত।"

শ্লোক ৫৩-৫৪

প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস ।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ ৫৩ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র—সর্বগুণবান্ ।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা'-নাম ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"একটি পূর্ণ দুধের কলসে যদি একবিন্দু সুরা পড়ে, তাহলে যেমন কেউ তা স্পর্শ করে না, তেমনই মহারাজ প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান হওয়া সত্ত্বেও এক 'রাজা' উপাধি তাকে মলিন করে দিল।

শ্লোক ৫৫

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয় ।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু তবুও তুমি যদি আমার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ করাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে থাক, তাহলে তুমি তার ছেলেকে এনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও।

শ্লোক ৫৬

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাণী ।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পুত্র পিতার থেকে অভিন্ন; তাই তার পুত্রের সঙ্গে আমার মিলন হলে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বলে মনে করবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৭৮/৩৬) বলা হয়েছে—*আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্*। অর্থাৎ বেদে বলা হয়েছে যে, পিতা স্বয়ং তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র পিতার থেকে অভিন্ন, এবং তা সমস্ত বৈদিক-শাস্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মেও বিশ্বাস করা হয় যে, ভগবানের পুত্র যীশুখ্রিস্টও ভগবান। তারা উভয়ই অভিন্ন।

শ্লোক ৫৭

তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা ।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন রামানন্দ রায় রাজার কাছে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার সমস্ত আলোচনার কথা বললেন এবং মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে রাজপুত্রকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন।

শ্লোক ৫৮

সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল-বরণ ।
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সুন্দর রাজপুত্রের অঙ্গকান্তি ছিল ঘন শ্যামবর্ণ, বয়সে সে কিশোর, এবং তার নয়নযুগল পদ্মফুলের মতো বিস্তৃত।

শ্লোক ৫৯-৬১

পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা 'উদ্দীপন' ॥ ৫৯ ॥
তাঁরে দেখি, মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল ।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি' কহিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥
এই—মহাভাগবত, যাঁহার দর্শনে ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্বজনে ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

রাজপুত্রের পরণে পীত বসন, এবং তার সারা অঙ্গে নানাপ্রকার রত্ন আভরণ ছিল। তাকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হল। তখন প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বলতে লাগলেন—"এক মহাভাগবত। একে দেখলে সকলের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা স্মরণ হয়।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন যে, জড়বাদীরা ভ্রান্তভাবে দেহ এবং মনকে জড় ইন্দ্রিয় উপভোগের উৎস বলে মনে করে। অর্থাৎ জড়বাদীদের কাছে দেহটিই সব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে, 'বিষয়ীর পুত্র বিষয়ী' বলে মনে করেন নি। এবং তিনি নিজেকেও 'ভোক্তা' বলে মনে করেন নি। মায়াবাদীরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে একটি জড়রূপ বলে মনে করে মহা ভুল করে, কিন্তু তারা জানে না যে, চিন্ময় বস্তুতে কোনরকম জড় কলুষ থাকে না এবং জড় বস্তুতে চিন্ময়ত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। জড় বস্তুকে চেতন বলে গ্রহণ করা যায় না। সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৪/১৩) বলা হয়েছে—*ভৌমে ইজ্যধীঃ*। জড়াসক্ত মায়াবাদীরা কল্পনা করে যে ভগবানের রূপ জড়, যদিও তাদের কল্পনা অনুসারে ভগবান অন্তহীনরূপে নিরাকার। এই মতবাদটি তাদের মনোধর্ম প্রসূত কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি গোপীভাব অবলম্বন করেছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে দর্শন করে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হওয়ায়, তিনি তাকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে দর্শন করেছেন। এটাই শুদ্ধ জীবাত্মার 'অদ্বয়জ্ঞান দর্শন বা বৈষ্ণব দর্শন'। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ* । এই বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শন *মুণ্ডকোপনিষদ* (৩/২/৩) এবং *কঠোপনিষদে* (১/২/২৩) নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

"সুদক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা, গভীর মেধার দ্বারা, এমন কি বহু শ্রবণের দ্বারাও পরমেশ্বর

ভগবানকে জানা যায় না। কেবল তিনি যাকে মনোনীত করেন, তিনিই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। তার কাছে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

এই চিন্ময় দর্শনের অভাবের ফলে জীব জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *কল্যাণ কল্পতরুতে* গেয়েছেন—"সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া 'পুরুষ' অভিমানে মরি"। জীব যখন এই জড় জগতে এসে, নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে, তখন সে জড় জগতের বন্ধনে বন্দী হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৬২

কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইহাঁর দরশনে ।
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এই বালকটিকে দর্শন করে আমি কৃতার্থ হলাম, এবং এই বলে তিনি পুনরায় তাকে আলিঙ্গন করলেন।"

শ্লোক ৬৩

প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ হল, এবং তার অঙ্গে স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক আদি ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণগুলি দেখা দিল।

শ্লোক ৬৪

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন ।
তাঁর ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে সে তখন নাচতে লাগল এবং রোদন করতে লাগল। তাঁর সৌভাগ্য দেখে ভক্তরা তাঁর গুণ গান করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬৫

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য করাইল ।
নিত্য আসি' আমায় মিলিহ—এই আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে স্থির করালেন এবং প্রতিদিন সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ৬৬

বিদায় হঞা রায় আইল রাজপুত্রে লঞা ।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, রামানন্দ রায় রাজপুত্রকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। তার পুত্রের কার্যকলাপের কথা শুনে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৬৭

পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

পুত্রকে আলিঙ্গন করে রাজা প্রেমাবিষ্ট হলেন, যেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্পর্শ পেলেন।

শ্লোক ৬৮

সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন ।
প্রভুভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন থেকেই সেই ভাগ্যবান রাজকুমার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে একজন বলে গন্য হলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখেছেন—*যৎকারুণ্য কটাক্ষ বৈভবে বতাম্*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি কারো প্রতি নিমেষের জন্যও দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে তিনি ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদে পরিণত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনেই মহাপ্রভুর কৃপায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এই বিষয়ে *নগ্ন মাতৃকা ন্যায়* প্রয়োগ করা যায় না। অর্থাৎ মা তার ছোটবেলায় নগ্না ছিলেন বলে তিনি বড় হয়েও নগ্না থাকবেন, এটা ভ্রান্ত যুক্তি। কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ধন্য হন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হতে পারেন। *নগ্ন মাতৃকা ন্যায়*-এ বোঝান হয়েছে যে, 'কেউ যদি পূর্বে উন্নত স্তরের ভক্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে পরেও তিনি উন্নত স্তরের ভক্ত হতে পারবেন না' এই ধারণাটি যে ভ্রান্ত তা রাজকুমারের দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত হয়েছে। একদিন আগেও রাজকুমার ছিলেন একজন সাধারণ বালক, কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তা

সম্ভব হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

শ্লোক ৬৯

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে লীলাবিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ৭০

আচার্যাদি ভক্ত করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ।
তাহাঁ তাহাঁ ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ মুখ্য ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ৭১

এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল ।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পরম উল্লাসে কয়েকদিন কাটল। তারপর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন নিকটবর্তী হল।

শ্লোক ৭২

প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল ।
পড়িছা-পাত্র, সার্বভৌমে বোলাঞা আনিল ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীমিশ্রকে ডাকালেন, তারপর মন্দিরের পড়িছা এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ডাকালেন।

শ্লোক ৭৩

তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল ।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-সেবা মাগি' নিল ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিনজনকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন যে, তিনি গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জন-সেবা করতে চান।

তাৎপর্য

এই গুণ্ডিচামন্দির জগন্নাথ-মন্দিরের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব এক সপ্তাহের জন্য সেখানে যান। তারপর তিনি আবার তাঁর মূল মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নীর নাম ছিল গুণ্ডিচা। প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে গুণ্ডিচা-মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণটি দৈর্ঘ্যে দু'শ অষ্টাশি হাত এবং প্রস্থে দু'শ পনের হাত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ছত্রিশ হাত এবং প্রস্থে ত্রিশ হাত। নাট মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে বত্রিশ হাত এবং প্রস্থে ত্রিশ হাত।

শ্লোক ৭৪

পড়িছা কহে,—আমি-সব সেবক তোমার ।
যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর এই অনুরোধ শুনে মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পড়িছা বললেন, "প্রভু, আমরা সকলে আপনার সেবক। আপনার যা ইচ্ছা সেই অনুসারে সমস্ত আয়োজন করাই আমাদের কর্তব্য।

শ্লোক ৭৫

বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে ।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি যা আদেশ করবেন, সেই আদেশ অনুসারে সত্বর সমস্ত আয়োজন করার জন্য রাজা আমাকে বিশেষভাবে আদেশ করেছেন।

শ্লোক ৭৬

তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জন ।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মন্দির-মার্জন করা আপনার উপযুক্ত সেবা নয়। কিন্তু তবুও আপনি যদি তা করতে চান, তাহলে বুঝতে হবে যে এটিও আপনার একটি লীলা।

শ্লোক ৭৭

কিন্তু ঘট, সংমার্জনী বহুত চাহিয়ে ।
আজ্ঞা দেহ—আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"মন্দির-মার্জন করার জন্য আপনার ঘট এবং সংমার্জনীর প্রয়োজন। তাই আদেশ দিন। আজ আমি সেইসব এখানে এনে দেব।"

শ্লোক ৭৮

নূতন একশত ঘট, শত সংমার্জনী ।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি' ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনের বাসনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে, পড়িছা তখন একশত নতুন ঘট এবং একশত সংমার্জনী এনে দিলেন।

শ্লোক ৭৯-৮০

আর দিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিয়া চন্দন ॥ ৭৯ ॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জনী ।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন সকাল বেলা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর ভক্তদের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করলেন এবং তাঁদের সকলকে এক-একটি সংমার্জনী দিলেন। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলেন।

শ্লোক ৮১

গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন ।
প্রথমে মার্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন করতে গিয়ে ভক্তসহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমেই সংমার্জনী দিয়ে মন্দিরটি ঝাড়ু দিলেন।

শ্লোক ৮২

ভিতর মন্দির উপর,—সকল মাজিল ।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের ভিতরটি এবং মন্দিরের অভ্যন্তরের উপরিভাগ খুব ভাল করে পরিষ্কার করলেন। তারপর সিংহাসনটি নিজে পুনরায় স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৮৩

ছোট-বড় মন্দির কৈল মার্জন-শোধন ।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে ছোট-বড় সমস্ত মন্দির পরিষ্কার করে এবং জল দিয়ে ধুয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে শ্রীজগমোহন (মূল মন্দির ও নাট মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানটি) পরিষ্কার করলেন।

শ্লোক ৮৪

চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জনী করে ।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

একশ' ভক্ত মন্দিরের চারদিক ঝাড়ু দিতে লাগলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে ঝাড়ু দিয়ে সকলকে শেখাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৮৫

প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম ।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমানন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দির মার্জন করছিলেন এবং কৃষ্ণনাম গ্রহণ করছিলেন; আর তাঁর ভক্তরাও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৮৬

ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন ।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সংমার্জন ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধূলিধূসর দেহটি দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন, এবং মন্দিরের কোন কোন স্থান তিনি তাঁর অশ্রু দিয়ে সংমার্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৮৭

ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গন ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভোগমন্দির শোধন করার পর তাঁরা প্রাঙ্গন শোধন করলেন এবং একে একে মন্দিরের বাসস্থানগুলি পরিষ্কার করলেন।

শ্লোক ৮৮

তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া ।
বহির্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর একত্র করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেগুলি তাঁর বহির্বাসে নিয়ে, বাইরে গিয়ে ফেলে দিলেন।

শ্লোক ৮৯

এইমত ভক্তগণ করি' নিজ বাসে ।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ভক্তরা তাঁদের কাপড়ের আঁচলে তৃণ, ধূলি ইত্যাদি নিয়ে পরম আনন্দে বাইরে গিয়ে ফেলে দিলেন।

শ্লোক ৯০

প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছ সংমার্জন ।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের বললেন, কে কতটা সংমার্জন করেছে, এবং পরিশ্রম করেছে, তা তাঁদের তৃণ ও ধূলি দেখে বোঝা যাবে।

শ্লোক ৯১

সবার ঝাঁটাটান বোঝা একত্র করিল ।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সকলের ঝাঁটান বোঝা একত্র করা হল কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বোঝা তার থেকেও অধিক হল।

শ্লোক ৯২

এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জন ।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে মন্দিরের অভ্যন্তর মার্জন করা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় তাঁর ভক্তদের পরিষ্কার করার স্থান নির্ধারণ করে দিলেন।

শ্লোক ৯৩

সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর ।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে বললেন, "সূক্ষ্মধূলি, তৃণ, কাঁকর সব ভালভাবে দূর করে প্রভুর অন্তঃপুর পরিষ্কার কর।"

শ্লোক ৯৪

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দ্বিতীয়বার মন্দির পরিষ্কার করলেন তখন খুব ভালভাবে মন্দির পরিষ্কার হয়েছে দেখে মহাপ্রভু খুব আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৯৫

আর শত জন শত ঘটে জল ভরি' ।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সংমার্জনী দিয়ে যখন মন্দির পরিষ্কার করা হচ্ছিল, তখন আর একশ' জন একশ' ঘটে জল ভরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন।

শ্লোক ৯৬

'জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল ।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু-আগে দিল ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জল আনতে বললেন, তখন তারা একশ' ঘট জল এনে মহাপ্রভুর সামনে রাখলেন।

শ্লোক ৯৭

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ।
ঊর্ধ্ব-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দির প্রক্ষালন করলেন, তারপর মন্দিরের ঊর্ধ্বভাগ, মেঝে, দেয়াল এবং সিংহাসন প্রক্ষালন করলেন।

শ্লোক ৯৮

খাপরা ভরিয়া জল ঊর্ধ্বে চালাইল ।
সেই জলে ঊর্ধ্ব শোধি ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং খাপরায় জল ভরে উপরের দিকে ছুঁড়ে মন্দিরের উপরিভাগ শোধন করলেন, এবং সেই জলে মন্দিরের দেয়াল ও মেঝে ধৌত হয়ে গেল।

শ্লোক ৯৯

শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন ।
প্রভু আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীহস্তে জগন্নাথদেবের সিংহাসন মার্জন করলেন, এবং ভক্তরা ঘটে ভরে তাঁর সামনে জল এনে দিতে লাগলেন।

শ্লোক ১০০

ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন ।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তরা মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ প্রক্ষালন করতে লাগলেন এবং স্ব স্ব হস্তে মন্দির মার্জন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০১

কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে ।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ জল এনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করকমলে দিচ্ছিলেন, আবার কেউ তাঁর চরণকমলের উপর জল ঢালছিলেন।

শ্লোক ১০২

কেহ লুকাঞা করে সেই জল পান ।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ সেই জল লুকিয়ে পান করছিলেন, কেউ তা চেয়ে নিচ্ছিলেন এবং কেউ তা অন্যদের দান করছিলেন।

শ্লোক ১০৩

ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল ।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

মন্দির ধোয়ার পর প্রণালিকায় সেই জল ছেড়ে দেওয়া হল, এবং সেই জলে সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরে রইল।

শ্লোক ১০৪

নিজ-বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জন ।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের বস্ত্র দিয়ে ঘর মুছলেন, এবং সিংহাসনটি মেজে পরিষ্কার করলেন।

শ্লোক ১০৫-১০৬

শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন ।
মন্দির শোধিয়া কৈল—যেন নিজ মন ॥ ১০৫ ॥
নির্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে একশ' ঘট জল দিয়ে মন্দির মার্জন করা হল। মন্দিরটি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ের মতো নির্মল শীতল এবং স্নিগ্ধ হল, যেন তাঁর হৃদয়কে বাহিরে এনে ধরলেন।

শ্লোক ১০৭

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কূপে জল ভরে ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

শত শত মানুষ সরোবরে জল ভরছিলেন, তাই ঘাটে স্থান না হওয়ায় কেউ কেউ কূপে জল ভরছিলেন।

শ্লোক ১০৮

পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

একশ' জন ভক্ত জলপূর্ণ ঘট নিয়ে আসছিলেন, আর একশ'জন শূন্য ঘট পূর্ণ করতে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১০৯

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ।
ইঁহা বিনু আর সব আনে জল ভরি' ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য, স্বরূপ দামোদর, ব্রহ্মানন্দ ভারতী এবং পরমানন্দ পুরী ছাড়া আর সকলেই জল ভরে আনছিলেন।

শ্লোক ১১০

ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি' গেল ।
শত শত ঘট লোক তাহাঁ লঞা আইল ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

ঘটে ঘটে ঠোকা লেগে অনেক ঘট ভেঙে গেল, তখন লোকেরা শত শত ঘট নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১১১

জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ জল ভরছিলেন, কেউ ঘর ধুচ্ছিলেন, কিন্তু সকলেই হরিধ্বনি করছিলেন। সেখানে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

শ্লোক ১১২

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ঘটের প্রার্থন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ঘট সমর্পণ ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ভক্তরা ঘট প্রার্থনা করছিলেন, এবং 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে অন্য ভক্তরা ঘট সমর্পণ করছিলেন।

শ্লোক ১১৩

যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে ।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব-কামে ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

যিনি যা কিছু বলছিলেন, তাই তিনি কৃষ্ণ নামের মাধ্যমে বলছিলেন। এইভাবে সমস্ত ব্যাপারে কৃষ্ণনাম সংকেত হল।

শ্লোক ১১৪

প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'-নাম ।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করছিলেন; এবং প্রেমাবেশে তিনি একাই একশ' জনের কাজ করছিলেন।

শ্লোক ১১৫

শত-হস্তে করেন যেন ক্ষালন-মার্জন ।
প্রতিজন-পাশে যাই' করান শিক্ষণ ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

মনে হচ্ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন একশ' হাতে প্রক্ষালন ও মার্জন করছিলেন এবং সকলের কাছে গিয়ে তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

শ্লোক ১১৬

ভাল কর্ম দেখি' তারে করে প্রশংসন ।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

কাউকে ভালভাবে পরিষ্কার করতে দেখলে তিনি তার প্রশংসা করছিলেন, আর কারো কাজ মনঃপূত না হলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করছিলেন।

শ্লোক ১১৭

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে ।
এইমত ভাল কর্ম সেহো যেন করে ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বলছিলেন, "তুমি খুব ভাল করেছ। অন্যদেরও তুমি শেখাও যাতে তারাও এইরকম ভালভাবে কাজ করে।

শ্লোক ১১৮

এ-কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ।
ভাল-মতে কর্ম করে সবে মন দিয়া ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথা শুনে সকলে সঙ্কুচিত হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে খুব ভালভাবে কাজ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৯

তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন ।
ভোগমন্দির-আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তারা শ্রীজগমোহন প্রক্ষালন করলেন, এবং তারপর ভোগ মন্দিরাদি প্রক্ষালন করলেন।

শ্লোক ১২০

নাটশালা-ধুই' ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ ।
পাকশালা-আদি করি' করিল প্রক্ষালন ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

নাটশালা ধোওয়ার পর তারা মন্দিরের চত্বর প্রাঙ্গণ ধুলেন, এবং তারপর পাকশালা আদি প্রক্ষালন করলেন।

শ্লোক ১২১

মন্দিরের চতুর্দিক্ প্রক্ষালন কৈল ।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

তারা মন্দিরের চতুর্দিক প্রক্ষালন করলেন, এবং সব অন্তঃপুর ভালমতে ধুলেন।

শ্লোক ১২২-১২৩

হেনকালে গৌড়ীয়া এক সুবুদ্ধি সরল ।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘট-জল ॥ ১২২ ॥

সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ।
তাহা দেখি' প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় গৌড়বঙ্গের এক বুদ্ধিমান এবং সরল বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জল ঢেলে সেই জল পান করলেন। তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে দুঃখ হল এবং বাইরে একটু রাগ প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১২৪

যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ ।
ধর্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মসংস্থাপন করার জন্য তিনি বাইরে প্রবল রাগ প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ১২৫-১২৬

শিক্ষা লাগি' স্বরূপে ডাকি' কহিল তাঁহারে ।
এই দেখ তোমার 'গৌড়ীয়া'র ব্যবহারে ॥ ১২৫ ॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল ।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি স্বরূপ দামোদরকে ডেকে বললেন, "তোমার এই গৌড়ীয়ার ব্যবহার দেখ। ভগবানের মন্দিরে সে আমার পা ধোয়াল, তারপর সেই জল সে পান করল।

শ্লোক ১২৭

এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি ।
তোমার 'গৌড়ীয়া' করে এতেক ফৈজতি ! ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই অপরাধে আমার যে কি গতি হবে তা আমি জানি না। তোমার এই গৌড়ীয়া আমাকে এইভাবে অপরাধে বিজড়িত করল!"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে এখানে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে "তোমার গৌড়ীয়া" বলেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাই দামোদর গোস্বামীর অধীন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পরম্পরা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সচীব ছিলেন শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী। তাঁর পরবর্তী ভক্তগোষ্ঠী হচ্ছেন ষড়্‌গোস্বামী, তারপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় এই পরম্পরায় অনুগমন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভগবানের সেবা করার সময় অনেক অপরাধ হতে পারে; সেই সমস্ত সেবা অপরাধ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস* এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে ভগবানের মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সামনে কারোরই প্রণাম গ্রহণ করা উচিত নয়। ভক্তের পক্ষেও শ্রীবিগ্রহের সামনে গুরুদেবের পাদস্পর্শ করা উচিত নয়। তা একটি অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই মন্দিরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করা হলে তাতে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু তিনি জগদ্‌গুরু, লোকশিক্ষক ও আচার্যের কার্য করছেন বলে, তিনি নিজেকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করেছেন। এইভাবে তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে তারা গুরু হলেও যেন তাদের শিষ্যদের মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের সামনে প্রণাম করতে না দেন এবং পা ধুতে না দেন। এটি একটি আচরণ বিধি।

শ্লোক ১২৮

তবে স্বরূপ গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া ।
ঢেকা মারি' পুরীর বাহির রাখিলেন লঞা ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবটিকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরের বাহিরে রেখে এলেন।

শ্লোক ১২৯

পুনঃ আসি' প্রভু পায় করিল বিনয় ।
'অজ্ঞ-অপরাধ' ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর স্বরূপ দামোদর গোস্বামী মন্দিরে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—"সেই লোকটি না জেনে অপরাধ করেছে, তুমি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দাও।"

শ্লোক ১৩০-১৩১

তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইলা ।
সারি করি' দুই পাশে সবারে বসাইলা ॥ ১৩০ ॥
আপনে বসিয়া মাঝে, আপনার হাতে ।
তৃণ, কাঁকর, কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তিনি সারিবদ্ধভাবে সমস্ত ভক্তদের দু'পাশে বসালেন; এবং নিজে মাঝখানে বসে তৃণ, কাঁকর, কুটো ইত্যাদি কুড়াতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩২

কে কত কুড়ায়, সব একত্র করিব ।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা-পানা লইব ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভক্তদের বললেন, "এগুলি কুড়িয়ে আমরা একত্র করে দেখব, কে কত কুড়িয়েছে। যে অন্যদের থেকে কম কুড়াবে, দণ্ড স্বরূপ তাকে আমাদের সকলকে পিঠা পানা খাওয়াতে হবে।"

শ্লোক ১৩৩

এই মত সব পুরী করিল শোধন ।
শীতল, নির্মল কৈল—যেন নিজ-মন ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সমস্ত গুণ্ডিচা-মন্দির পরিষ্কার করা হল; এবং তা নিষ্কলুষ ভক্তের হৃদয়ের মতোই শীতল এবং নির্মল হল।

শ্লোক ১৩৪

প্রণালিকা ছাড়ি' যদি পানি বহাইল ।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর যখন প্রণালিকা দিয়ে জল ছেড়ে দেওয়া হল, তখন মনে হল যেন নতুন নদী সমুদ্রে এসে মিলিত হল।

শ্লোক ১৩৫

এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত ।
সকল শোধিল, তাহা কে বর্ণিবে কত ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে মন্দিরের দরজার সম্মুখে যত পথ ছিল, সেগুলিও পরিষ্কৃত হল। কিভাবে যে তা হল, তা কে কত বর্ণনা করবে?

তাৎপর্য

গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান জীব তার হৃদয়-সিংহাসনে বসাতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্বপ্রথমে তাকে তার হৃদয়ের মল ধৌত করতে হবে। হৃদয়টি নির্মল, শান্ত এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে উজ্জ্বল করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর শিক্ষাষ্টকে বলেছেন ঃ *চেতোদর্পণ মার্জনম্*। এই যুগে সকলেরই হৃদয় অত্যন্ত কলুষিত, সে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণি*। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ময়লা দূর করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে উপদেশ দিয়েছেন 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে। তার ফলে সর্বপ্রথমে হৃদয় পরিষ্কৃত হবে। (*চেতোদর্পণ মার্জনম্*)। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) বলা হয়েছে—

> *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।*
> *হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥*

"সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করলে হৃদয়ের সমস্ত ময়লাগুলি অচিরেই দূর হয়ে যায়।"

ভক্ত যদি তার হৃদয়কে নির্মল করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করতে হবে। (*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ*)। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। কৃষ্ণ নিজেই হৃদয় পরিষ্কার করতে সাহায্য করেন, কেননা তিনি তো সেখানে বসে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি জীবের হৃদয়ে বসে থাকতে চান এবং জীবকে পরিচালিত করতে চান, তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে গুণ্ডিচা-মন্দির পরিষ্কার করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তাকেও তার হৃদয় পরিষ্কার করতে হবে। এইভাবে নির্মল হলে হৃদয় শান্ত হয় এবং ভগবদ্ভক্তির আলোকে উজ্জ্বল হয়। হৃদয় যদি তৃণ, কাঁকর এবং ধূলাবালিতে পূর্ণ থাকে (অর্থাৎ, হৃদয় যদি অন্যাভিলাষে পূর্ণ থাকে) তাহলে পরমেশ্বর ভগবানকে সেখানে অধিষ্ঠিত করা যায় না। সকাম কর্ম, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, ইত্যাদি অন্যাভিলাষ। হৃদয়কে সেই সমস্ত অন্যাভিলাষ থেকে মুক্ত করতে হবে। সে সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। অর্থাৎ, জ্ঞান, কর্ম, আদি অন্যাভিলাষ থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে হবে। জড়-জাগতিক মতি, মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব জানার প্রচেষ্টা, সকাম কর্ম, কঠোর তপশ্চর্যা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত ক্রিয়া জীবের স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। এইগুলি যতক্ষণ হৃদয়ে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ হৃদয় কলুষিত আছে বলে বুঝতে হবে; এবং তাই তা শ্রীকৃষ্ণের বসবাসের উপযুক্ত নয়। আমাদের হৃদয় যতক্ষণ নির্মল না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা সেখানে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি না।

নির্বিশেষবাদ, অদ্বৈতবাদ, মনোধর্মীজ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগ, ঠিক কাঁকরের মতো। সেগুলির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি তো দূরের কথা, ভগবানের দেহে শেল বিদ্ধ করারই প্রয়াস করা হয়। কখনও কখনও যোগী এবং জ্ঞানীরা প্রাথমিক অবস্থায় ভগবানের নাম

কীর্তন করে; কিন্তু, তারা যখন ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে তখন তারা আর এই কীর্তন করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে না। তারা মনে করে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের নাম অথবা ভগবানের রূপ। এই ধরনের হতভাগ্য জীবেরা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপালাভ করতে পারে না, কেননা তারা জানে না ভগবদ্ভক্তি কি। তাদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) বলা হয়েছে—

> *তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।*
> *ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥*

"যারা ভগবানের প্রতি বিদ্রূপ ভাবাপন্ন এবং ক্রূর, তারা নরাধম। আমি তাদের এই জড় জগতে অজস্র অশুভ অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করি।"

অসুরেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্রূপ ভাবাপন্ন এবং তাই তারা সবচাইতে দুষ্কৃতকারী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নিজে আচরণ করে আমাদের শিক্ষা দিলেন, কিভাবে এই সমস্ত কাঁকরগুলি কুড়িয়ে দূরে ফেলে দিতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের বহির্ভাগও পরিষ্কার করেছিলেন, যাতে এই সমস্ত কাঁকরগুলি আবার ভিতরে এসে জমা না হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, অনেক সময় কর্ম, জ্ঞান আদি চেষ্টা দূরীভূত হলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ময়লা থেকে যায়। সেগুলিকে, 'কুটিনাটি' 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা,' 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা' প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। 'কুটিনাটি' শব্দটির অর্থ হচ্ছে কপটতা। প্রতিষ্ঠাশা বলতে নির্জন ভজন বা বুজরুকির দ্বারা 'নির্বোধ লোকেরা' আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক, এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা। যেমন লোকের চোখে বড় সাধু হওয়ার আশায় হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণে নির্জন স্থানে ভজন করা, ইত্যাদি। কনিষ্ঠ ভক্ত সাবধান না হলে, কামিনী-কাঞ্চনরূপ জড় বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হবেই। তার ফলে হৃদয় পুনরায় কলুষিত হয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। অবশেষে তারা 'বড় ভক্ত' অথবা 'অবতার' সাজবার চেষ্টা করে।

'জীবহিংসা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া। ভগবানের বাণী প্রচারকে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ 'পরোপকার'। যারা ভগবদ্ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ, প্রচারের মাধ্যমে তাদের সে সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি ভগবানের বাণীর প্রচার বন্ধ করে দিয়ে কেবল নির্জন স্থানে বসে থাকে তাহলে সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। কেউ যদি 'মায়াবাদী', কর্মী ও 'অন্যাভিলাষীকে', প্রশ্রয় দেয় এবং তাদের 'মন' রেখে কথা বলে, তাহলে সেটিও 'জীবহিংসা'। ভক্তের পক্ষে কখনই অভক্তদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পেশাদারী গুরু, ভেল্কিবাজী দেখানো যোগী, এরা সকলেই জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়ে এবং তাদের প্রতারণা করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। তাই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রচার করা উচিত, যাতে তারা যথার্থই

পারমার্থিক পথ অবলম্বন করতে পারে। সেই সমস্ত প্রচারকদের চারটি বিধি—আমিষ আহার বর্জন, সবরকম নেশা বর্জন, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন, এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন—নিষ্ঠাভরে পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

এইভাবে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দেওয়ার পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু-দুবার করে মন্দিরের সর্বত্র মার্জন ও প্রক্ষালন করলেন। তারপরও যদি কোথাও কোন সূক্ষ্ম দাগ লেগে থাকে, সেজন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষে শ্রীমন্দির ও ভগবানের সিংহাসন মার্জন করলেন। এইভাবে মার্জন-প্রক্ষালন-ঘর্ষণের পর শ্রীমন্দির স্ফটিকের মতো নির্মল হল। শুধু নির্মলই নয়, সুশীতলও হল। অর্থাৎ সাধুদের হৃদয় বিষয় ভোগ-বাসনা জনিত ত্রিতাপ জ্বালা রহিত হয়। বস্তুতঃ তখন তার হৃদয় থেকে অন্যাভিলাষ ও কর্ম-জ্ঞান-যোগ আদি চেষ্টারূপ ভুক্তি-মুক্তির কামনা বিদূরিত হয়ে শুদ্ধভক্তির প্রকাশ হলে তা এই রকমেই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হলেও হৃদয়ের কোন কোন অজ্ঞাত কোণে, দু-একটি সূক্ষ্ম দাগ লেগে থাকে, নির্বোধ জীব বুঝতে পারে না, সেটি 'মুক্তি কামনা'। নির্বিশেষবাদীর 'সাযুজ্য-মুক্তি' কামনা তো দূরের কথা—অপর চতুর্বিধ মুক্তি-কামনারূপ সূক্ষ্ম দাগকেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বস্ত্রের দ্বারা ঘষে ঘষে উঠিয়েছিলেন।

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কিভাবে সাধক তার হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করে শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহার স্থল করবার জন্য, মহা উৎসাহের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করতে করতে হৃদয় মার্জন করেন, সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিটি ভক্তের কাছে গিয়ে, তাদের হাত ধরে, মন্দির মার্জন সেবা শিক্ষা দিয়েছিলেন। যার কাজ ভাল হয়েছিল, তাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন এবং যার সেবা তাঁর মনের মতো হয়নি, তাকেও পবিত্র ভর্ৎসনা করে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেছেন, তাদের সকলেরই কর্তব্য, এই দায়িত্ব গ্রহণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জনের দ্বারা যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যারা আচার্যের কার্য করছেন তাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নিজে আচরণ করে ভক্তদের শিক্ষা দান করা। যিনি যত বেশী পরিমাণ অভদ্র রাশি হৃদয় থেকে আহরণ পূর্বক পরিষ্কার করতে সমর্থ হবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হবেন। এবং যার অনর্থ নিবৃত্তি সামান্যই ঘটেছে, তার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাই বিধি নির্দিষ্ট হয়েছে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জন করে আমাদের শিক্ষা দিলেন কিভাবে, হৃদয়কে নির্মল এবং শান্ত করে সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

শ্লোক ১৩৬

নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল ।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃসিংহ মন্দিরের বাহির এবং অভ্যন্তর পরিষ্কার করলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনি নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন।

তাৎপর্য

গুণ্ডিচা মন্দিরের সন্নিকটে একটি সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহ মন্দির আছে। সেখানে নৃসিংহ চতুর্দশীর দিনে বিরাট মহোৎসব হয়। শ্রীমুরারিগুপ্ত রচিত *শ্রীচৈতন্য-চরিত* গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ ধামে নৃসিংহ মন্দির সংস্করণলীলা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩৭

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ।
মধ্যে নৃত্য করেন প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

চারদিকে ভক্তরা কীর্তন করছিলেন এবং তাদের মাঝখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মত্ত-সিংহের মতো নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ১৩৮

স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাশ্রু, পুলক, হুঙ্কার ।
নিজ অঙ্গ ধুই' আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নাচছিলেন, তখন তাঁর অঙ্গে স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, পুলক আদি প্রেমের বিকার দেখা দিয়েছিল। কখনও তিনি হুঙ্কার করছিলেন এবং তাঁর অশ্রুধারায় তাঁর অঙ্গ ভেসে যাচ্ছিল।

শ্লোক ১৩৯

চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অশ্রুধারা চারদিকে ভক্তদেরও ধৌত করল। শ্রাবণের মেঘের মতো তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল।

শ্লোক ১৪০

মহা-উচ্চসংকীর্তনে আকাশ ভরিল ।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মহা-উচ্চ সংকীর্তনে আকাশ ভরে গেল, এবং মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমি কম্পিত হল।

শ্লোক ১৪১

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায় ।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদরের উচ্চ-কীর্তন মহাপ্রভুর সবসময় ভাল লাগত। তার সেই কীর্তন শুনে আনন্দে তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪২

এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া ।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় বুঝিয়া ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কিছুক্ষণ নৃত্য করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সময় বুঝে বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ১৪৩

আচার্য-গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল-নাম ।
নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌরধাম ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন শ্রীগোপাল নামক অদ্বৈত আচার্যের পুত্রকে নৃত্য করতে আদেশ দিলেন।

শ্লোক ১৪৪

প্রেমাবেশে নৃত্য করি' হইলা মূর্ছিতে ।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে নৃত্য করতে করতে শ্রীগোপাল মূর্ছিত হল এবং অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ল।

শ্লোক ১৪৫

আস্তে-ব্যস্তে আচার্য তারে কৈল কোলে ।
শ্বাস-রহিত দেখি' আচার্য হৈলা বিকলে ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপাল যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাকে কোলে তুলে নিলেন, এবং তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন।

শ্লোক ১৪৬

নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি' মারে জল-ছাঁটি ।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি' ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য তখন নৃসিংহ মন্ত্র পড়ে জল ছিটাতে লাগলেন। তাঁর হুঙ্কারের শব্দে মনে হচ্ছিল যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হচ্ছে।

শ্লোক ১৪৭

অনেক করিল, তবু না হয় চেতন ।
আচার্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন তার চেতনা ফিরে এলো না, তখন অদ্বৈত আচার্য এবং অন্যান্য ভক্তরা ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪৮

তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল ।
'উঠহ গোপাল' বলি' উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীগোপালের বুকে হাত রাখলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন—"গোপাল ওঠ"।

শ্লোক ১৪৯

শুনিতেই গোপালের হইল চেতন ।
'হরি' বলি' নৃত্য করে সর্বভক্তগণ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই ডাক শোনা মাত্রই—গোপাল তার বাহ্য চেতনায় ফিরে এল। তখন সমস্ত ভক্তরা হরিধ্বনি দিতে দিতে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৫০

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।
অতএব সংক্ষেপে করি' করিলুঁ বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এই লীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাই আমি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

এটি বৈষ্ণব আচার। পূর্বতন কোন আচার্য যদি কোন বিষয়ে ইতিমধ্যে লিখে থাকেন, তাহলে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অথবা পূর্বতন আচার্যকে অতিক্রম করার জন্য সে বিষয়ে আর কিছু লেখা উচিত নয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন ব্যতীত তার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৫১

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন।

শ্লোক ১৫২

তীরে উঠি' পরেন প্রভু শুষ্ক বসন ।
নৃসিংহ-দেবে নমস্করি' গেলা উপবন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

স্নান করে তীরে উঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুষ্ক বসন পড়লেন; এবং শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার করে উপবনে গেলেন।

শ্লোক ১৫৩

উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা ।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উদ্যানে বসলেন, তখন বাণীনাথ মহাপ্রসাদ নিয়ে এলেন।

শ্লোক ১৫৪-১৫৫

কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুইজন ।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥ ১৫৪ ॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা, সব পাঠাইল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীমিশ্র এবং তুলসী-পড়িছা উভয়েই পাঁচশ' লোকের খাওয়ার মতো প্রসাদ পাঠালেন। নানা প্রকারের পিঠা, পানা, অন্ন ব্যঞ্জন সমন্বিত সেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

শ্লোক ১৫৬-১৫৭

পুরী-গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ ।
অদ্বৈত-আচার্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ১৫৬ ॥
আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর ।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য, আর রাঘব, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, শ্রীনিবাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, শঙ্কর, নন্দনাচার্য, রাঘব পণ্ডিত এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

শ্লোক ১৫৮

প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্বভৌম ।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পেয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বসলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে পিঁড়ির উপরে বসলেন।

শ্লোক ১৫৯

তার তলে, তার তলে করি' অনুক্রম ।
উদ্যান ভরি' বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রমানুসারে সমস্ত ভক্তরা একের পর এক সারি করে বসলেন। এইভাবে সমস্ত উদ্যান ভরে ভক্তরা ভোজন করতে বসলেন।

শ্লোক ১৬০-১৬২

'হরিদাস' বলি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ।
দূরে রহি' হরিদাস করে নিবেদন ॥ ১৬০ ॥
ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার ।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥ ১৬১ ॥

পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে ।
মন জানি' প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের নাম ধরে ঘন ঘন ডাকতে লাগলেন এবং তখন দূরে দাঁড়িয়ে হরিদাস ঠাকুর বললেন, "আপনি ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করুন। আমি যেহেতু অত্যন্ত নীচ, তাই আমি তাদের সঙ্গে বসার যোগ্য নই। পরে গোবিন্দ আমাকে দ্বারের বাইরে প্রসাদ দেবে।" তার মনোভাব বুঝতে পেরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর তাঁকে ডাকলেন না।

শ্লোক ১৬৩-১৬৪

স্বরূপ-গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর ।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥ ১৬৩ ॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন ।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, কাশীশ্বর, গোপীনাথ আচার্য, বাণীনাথ এবং শঙ্কর, এই সাতজন প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। আর প্রসাদ গ্রহণ করতে করতে ভক্তরা মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬৫

পুলিন-ভোজন কৃষ্ণ পূর্বে যৈছে কৈল ।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে কৃষ্ণ যেভাবে পুলিন-ভোজন করেছিলেন, সেই লীলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে পড়ল।

শ্লোক ১৬৬

যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা অস্থির ।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবেশে যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অস্থির হয়েছিলেন, তবুও স্থান এবং কালের কথা বিবেচনা করে তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন।

শ্লোক ১৬৭

প্রভু কহে,—মোরে দেহ' লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে ।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমাকে কেবল লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন দাও, আর ভক্তদের পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা ইত্যাদি সমস্ত উপাদেয় প্রসাদগুলি দাও।"

তাৎপর্য

লাফ্‌রা ব্যঞ্জন—সামান্য চড়চড়ির মতো এক প্রকার ব্যঞ্জন বিশেষ; মাখা অন্নের সঙ্গে তা মিশিয়ে দুঃখী লোককে পরিবেশন করা হয়। অমৃতগুটিকা—ক্ষীরে ফেলা মোটা পুরী যাকে সচরাচর অমৃতরসাবলী বলা হয়।

শ্লোক ১৬৮

সর্বজ্ঞ প্রভু জানেন যাঁরে যেই ভায় ।
তারে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ, তাই তিনি জানতেন কে কি খেতে ভালবাসে; স্বরূপ দামোদরকে দিয়ে তিনি তাদের সেই সমস্ত পদ দেওয়ালেন।

শ্লোক ১৬৯

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ।
প্রভুর পাতে ভাল-দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রসাদ বিতরণ করতে করতে জগদানন্দ পণ্ডিত হঠাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাতে কিছু ভাল দ্রব্য দিলেন।

শ্লোক ১৭০

যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাতে এই ধরনের ভাল ভাল প্রসাদ দিলে তিনি রাগ করতেন, তবুও জগদানন্দ পণ্ডিত ছলে বলে সেগুলি দেন, এবং তা দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ১৭১

পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেন মহাপ্রভু খাচ্ছেন কি না; তার ভয়ে মহাপ্রভু কিছু ভক্ষণ করেন।

শ্লোক ১৭২

না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ।
তাঁর আগে কিছু খা'ন—মনে ঐ ত্রাস ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু জানতেন যে, জগদানন্দের দেওয়া সেই প্রসাদ যদি তিনি না খান, তাহলে জগদানন্দ উপবাস করবে। সেই ভয়ে তার সামনে মহাপ্রভু কিছু প্রসাদ খান।

শ্লোক ১৭৩-১৭৪

স্বরূপ-গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা ।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাঞা ॥ ১৭৩ ॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প করহ আস্বাদন ।
দেখ, জগন্নাথ কৈছে কর্যাছেন ভোজন ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

খুব ভাল মিষ্ট প্রসাদ নিয়ে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর সামনে এসে নিবেদন করলেন, "এই মহাপ্রসাদ একটু আস্বাদন করে দেখুন, জগন্নাথ কিভাবে তা ভোজন করেছেন।"

শ্লোক ১৭৫

এত বলি' আগে কিছু করে সমর্পণ ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাতে সেই প্রসাদ পরিবেশন করেন, এবং তাঁর স্নেহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার কিছুটা গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৭৬

এই মত দুইজন করে বারবার ।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে স্বরূপ দামোদর এবং জগদানন্দ বার বার মহাপ্রভুকে কিছু প্রসাদ পরিবেশন করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার অতি বিচিত্র।

শ্লোক ১৭৭

সার্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন বাম-পাশে ।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি' সার্বভৌম হাসে ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বামপাশে বসিয়ে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সেই দুই ভক্তের স্নেহ দেখে তিনি হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৮

সার্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ।
স্নেহ করি' বারবার করান ভোজন ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তম প্রসাদ দেওয়ালেন এবং স্নেহ করে তাঁকে বার বার ভোজন করাতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৯-১৮০

গোপীনাথাচার্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি' ।
সার্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥ ১৭৯ ॥
কাহাঁ ভট্টাচার্যের পূর্ব জড়-ব্যবহার ।
কাহাঁ এই পরমানন্দ, করহ বিচার ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য উত্তম মহাপ্রসাদ এনে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তা দিয়ে সুমধুর স্বরে বললেন, "ভট্টাচার্যের পূর্বের সেই জড় ব্যবহার আজ কোথায়। আজ তিনি কিভাবে পরমানন্দ আস্বাদন করছেন তা বিচার করে দেখ।

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্য পূর্বে স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন—অর্থাৎ, তিনি জড় স্তরে অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে বৈদিক নির্দেশগুলি পালন করতেন। প্রাকৃত জড় বিশ্বাস পোষণ করায় তার মহাপ্রসাদে, গোবিন্দ নামে ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ছিল না। সাধারণ বৈদিক পণ্ডিতেরা এই সমস্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকাংশ পণ্ডিতদেরই বৈদান্তিক বলা হয়। তথাকথিত বৈদান্তিকেরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার এবং নির্বিশেষ। তারা মনে করে যে, যার যে ধরনের জন্ম হয়েছে, মৃত্যুর পর জন্মান্তর ছাড়া সেই বর্ণ পরিবর্তন করা যায় না। স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস করে না যে, মহাপ্রসাদ চিন্ময় বস্তু এবং কোন জড় কলুষ

তা স্পর্শ করতে পারে না। পূর্বে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এইরকম স্মার্ত বিচার পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু গোপীনাথ আচার্য দেখলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কি আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত হয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে মহাপ্রসাদ সেবা করছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাশে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

শ্লোক ১৮১

সার্বভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, "আমি ছিলাম কুবুদ্ধি পরায়ণ তার্কিক। কিন্তু তোমার প্রসাদে আমার এই সম্পদ লাভ হয়েছে।

শ্লোক ১৮২

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয় ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া দয়াময় আর কেউ নেই। তিনি ছাড়া আর কে কাককে গরুড়ে পরিণত করতে পারে?

শ্লোক ১৮৩

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তার্কিক শৃগালদের সঙ্গে আমি ভেউ ভেউ করতাম। আজ সেই মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম এবং হরিনাম কীর্তন করছি।

শ্লোক ১৮৪

কাহাঁ বহির্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কোথায় বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যদের সঙ্গ, আর কোথায় অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গ সদৃশ ভক্তদের সঙ্গ।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন, "যারা জড় সুখ ভোগে লিপ্ত তাদের বলা হয় 'বহির্মুখ'। এই ধরনের মানুষেরা সর্বদাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জড়া-প্রকৃতিকে ভোগ করতে তৎপর। বহিরঙ্গা প্রকৃতির আকর্ষণে জীব সবসময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। এই ধরনের মানুষেরা কৃষ্ণভক্ত হতে চায় না। তার বিশ্লেষণ করে প্রহ্লাদ মহারাজ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩০-৩১) বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশ-
তন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥

জড় দেহ, জড় জগৎ এবং জড়-সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত জড়বাদীরা তাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে না। তাই তারা জড় অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়। এই ধরনের মানুষেরা কখনই ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমবেতভাবে কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করতে পারে না। এরা বুঝতে পারে না যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে জানা। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবণতা পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যার জীবন অবলম্বন করতে হয়। জড়বাদীরা সর্বতোভাবে অন্ধ, কেননা তারা সর্বদা কতগুলি মূঢ় অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। জড়বাদীরা মনে করে যে, তাদের যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীনতা রয়েছে। তারা জানে না যে তারা প্রকৃতির কঠোর নিয়মে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত, এবং তারা এও জানে না যে তাদের জন্ম জন্মান্তরে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে এই জড় জগতে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। এই ধরনের নির্বোধ মূর্খেরা কতগুলি মূর্খ নেতার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়। তারা বুঝতে পারে না কৃষ্ণভক্তির অর্থ কি। চিদাকাশের বাহিরে এই জড় জগৎ। মূর্খ জড়বাদীরা এই জড় আকাশের পরিধি অনুমান করতে পারে না; সুতরাং চিদাকাশ সম্বন্ধে তারা কিভাবে জানতে পারবে? জড়বাদীরা কেবল তাদের অশান্ত ইন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ তারা মানতে চায় না। বৈদিক সভ্যতাকে শাস্ত্রের মাধ্যমে দর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দর্শনকে বলা হয় শাস্ত্র-চক্ষুর মাধ্যমে দর্শন। তার ফলে জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু কেউ যদি এই নির্দেশের অবহেলা করে, তাহলে তার পক্ষে চিৎ-জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। জড়বাদীরা যেহেতু তাদের চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে, তাই তারা জড় জগতকে সর্বেসর্বা বলে মনে করে। তাই তাদের বলা হয় 'বহির্মুখ'।

শ্লোক ১৮৫

প্রভু কহে,—পূর্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, "তোমার পূর্ব জন্ম থেকে কৃষ্ণে প্রীতি ছিল। তোমার কৃষ্ণপ্রীতি এত গভীর যে, তোমার সঙ্গ প্রভাবে আমাদের সবার কৃষ্ণে মতি হচ্ছে।"

শ্লোক ১৮৬

ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে ।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তের মহিমা বাড়াতে, ভক্তকে সুখ দিতে, মহাপ্রভু ছাড়া এই ত্রিজগতে আর কেউই নেই।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের সঙ্গে দেবহূতির ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৮৭

তবে প্রভু প্রত্যেকে, সব ভক্তের নাম লঞা ।
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তের নাম ধরে ডেকে ডেকে তাদের পিঠা পানা প্রসাদ দিলেন।

শ্লোক ১৮৮

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি ।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দ প্রভু পাশাপাশি বসেছিলেন, এবং তারা দু'জনে ক্রীড়া কলহ করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৮৯-১৯১

অদ্বৈত কহে,—অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি ।
ভোজন করিলুঁ, না জানি হবে কোন্ গতি ॥ ১৮৯ ॥
প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ।
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৯০ ॥
"নান্নদোষেণ মস্করী"—এই শাস্ত্র-প্রমাণ ।
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, "অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ভোজন করলাম, না জানি আমার কি গতি হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তো সন্ন্যাসী, তিনি তো কোন অসামঞ্জস্য দর্শন করেন না। সন্ন্যাসীর অন্ন স্পর্শে দোষ হয় না। কেননা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সন্ন্যাসীর অন্ন-দোষ লাগে না। কিন্তু আমি তো গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। আমার পক্ষে যার-তার সঙ্গে একত্রে বসে আহার করলে দোষ হয়।

শ্লোক ১৯২

জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার ।
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"যার জন্ম, কুল, শীল, আচারাদি জানা নেই তার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আহার করা—বড় অনাচার।"

শ্লোক ১৯৩

নিত্যানন্দ কহে,—তুমি অদ্বৈত-আচার্য ।
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু তখন বললেন, "তুমি অদ্বৈত জ্ঞানের আচার্য, এই 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত' শুদ্ধ ভক্তির প্রতিবন্ধক।

শ্লোক ১৯৪

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে ।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যেই তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গ করে, সে এক 'ব্রহ্ম' ছাড়া দ্বিতীয় কিছু আর স্বীকার করে না।"

তাৎপর্য

অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বাস করে না যে, ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র আরাধ্য এবং জীব তাঁর নিত্য সেবক। অদ্বৈতবাদীদের মতে, ভগবান এবং জীব জড় অবস্থায় ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু চিন্ময় স্তরে তাদের কোন ভেদ নেই। একে বলা হয় 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত'। অদ্বৈতবাদীরা মনে করে, ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে জড় কার্যকলাপ; তাই তাঁরা ভক্তিকার্যকে কর্মফলের অন্তর্গত কার্যকলাপ বলে মনে করে। অদ্বৈতবাদীদের এই ভ্রান্তি ভগবদ্ভক্তির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক।

প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর এই ক্রীড়া কলহ সমস্ত ভক্তদের একটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, মায়াবাদীদের 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত' বা নির্ভেদ 'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' বাদের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানকে 'এক' বলে আপাত প্রতীয়মান হলেও, প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর যে 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত'—তা শুদ্ধভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানীরা সেই অদ্বয় তত্ত্বকে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' এবং 'ভগবান' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন।" (*ভাগবত* ১/২/১১)

পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। এই সিদ্ধান্ত মায়াবাদীদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক নয়। শ্রীল অদ্বৈত আচার্যকে 'আচার্য' উপাধি দেওয়া হয়েছিল, কেননা তিনি শুদ্ধভক্তি প্রচার করেছিলেন। এখানে 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত' মানে হচ্ছে 'অদ্বয় জ্ঞান'। এই ক্রীড়া-কলহের মাধ্যমে নিত্যানন্দ প্রভু প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত আচার্যের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত অনুসারে (*বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং*) বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রেরণ করেছিলেন। এটি *ছান্দোগ্য-উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'* মন্ত্রেরও সিদ্ধান্ত।

ভক্ত জানেন যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের মন্ত্রগুলি নির্বিশেষবাদীদের 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত' অনুমোদন করে না এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বৈচিত্র্যহীন নির্বিশেষবাদ স্বীকার করে না। ব্রহ্ম বৃহৎ-বস্তু—তার মধ্যেই সবকিছু এবং সেইটিই হচ্ছে একত্ব। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ* "আমার থেকে পরতর আর কিছুই নেই।" তিনিই হচ্ছেন আদি তত্ত্ব, কেননা সবকিছু তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সবকিছুর সঙ্গে তিনি যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। ভগবান সর্বদাই বিবিধ চিন্ময় কার্যকলাপে লিপ্ত, কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদীরা এই চিন্ময় বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শক্তি এবং শক্তিমান যদিও এক এবং অভিন্ন, কিন্তু শক্তিমানের

শক্তিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। শক্তি ও শক্তিমান এক হলেও তার বৈচিত্র্য আছে। তাতে স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ বা জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা,—এই তিনটি অবস্থা নিত্য বর্তমান। জ্ঞেয়, জ্ঞান এবং জ্ঞাতার নিত্যত্বহেতু ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকর আদির নিত্যত্ব অবগত। ভক্তরা কখনও মায়াবাদীদের কেবলাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না। জ্ঞেয়, জ্ঞান এবং জ্ঞাতার পৃথক অধিষ্ঠান না স্বীকার করলে চিন্ময় বৈচিত্র্য অনুভব করা সম্ভব নয়, এবং চিৎ-বৈচিত্র্যজনিত অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

কেবলাদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ বা বৌদ্ধের শূন্যবাদেরই নামান্তর। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে ক্রীড়া-কলহের মাধ্যমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন-করেছেন। বৈষ্ণবেরা অবশ্যই স্বীকার করেন যে, বাস্তব বস্তু 'এক' শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তুতে যে 'দ্বিতীয়' প্রকৃতি—তাই মায়া। মায়া দুই প্রকার—'জীব মায়া' ও 'গুণ মায়া'। গুণ মায়াও 'প্রকৃতি' ও 'প্রধান'-ভেদে দুই প্রকার। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রতীতি, সেখানে 'দ্বিতীয়ের' (মায়ার) প্রতীতি নেই। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধভক্ত সবকিছুই, 'এক'—কৃষ্ণরূপে দর্শন করেন। তাই তিনি বলেছেন—*কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্* (*ভাগবত* ৭/৪/৩৭) যিনি কৃষ্ণভাবনাময় তিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য দর্শন করেন না। তিনি সবকিছুই কৃষ্ণ সম্বন্ধে দর্শন করেন। তাই তাঁর কাছে সবকিছুই চিন্ময়। অদ্বয়জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য শুদ্ধভগবদ্ভক্তির মহিমা কীর্তন করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখানে ক্রীড়া-কলহের মাধ্যমে নির্বিশেষবাদীদের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'-এর নিন্দা করে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর যথার্থ 'অদ্বয় সিদ্ধান্ত'-এর প্রশংসা করেছেন।

শ্লোক ১৯৫

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ।
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু বললেন—"তোমার মতো একজন অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে একত্রে বসে ভোজন করলে আমার মন যে কিভাবে প্রবাহিত হবে তা আমি জানি না।"

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (২/৬২) বলা হয়েছে *সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ*। সঙ্গের প্রভাবে চেতনা প্রভাবিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলেছেন, অভক্তদের সঙ্গ থেকে খুব সাবধানে দূরে থাকা উচিত। এক গৃহস্থভক্ত যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার ।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৮৭)

বৈষ্ণব ভক্তদের কখনও অভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীউপদেশামৃত* গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌ ॥

ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে-এর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল ভক্তদের সঙ্গে ভোজন করা উচিত। খুব সাবধানতার সঙ্গে অভক্তদের দেওয়া খাবার প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ভক্তদের পক্ষে কখনই অভক্তদের দেওয়া খাবার খাওয়া উচিত নয়; বিশেষ করে হোটেল, রেস্টুরেন্ট কিংবা এরোপ্লেনের খাবার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এখানে বুঝিয়েছেন যে, মায়াবাদীদের সঙ্গে অথবা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে খাওয়া উচিত নয়; কেননা তার দ্বারা জড় আসক্তি বৃদ্ধি পায়।

শ্লোক ১৯৬

এইমত দুইজনে করে বলাবলি।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে তাঁরা পরস্পরকে ব্যাজ-স্তুতি করে, অর্থাৎ বাহিরে নিন্দা কিন্তু ভিতরে মাহাত্ম্যসূচক বাক্য প্রয়োগ করছিলেন, এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা পরস্পরকে গালাগালি করছেন।

শ্লোক ১৯৭

তবে প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবের নাম লঞা।
মহাপ্রসাদ দেন মহা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদের নাম ধরে ধরে ডেকে মহা অমৃত সিঞ্চন করে তাঁদের সকলকে মহাপ্রসাদ দান করলেন।

শ্লোক ১৯৮

ভোজন করি' উঠে সবে হরিধ্বনি করি'।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্য ভরি' ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভোজন শেষ হলে সকলে হরিধ্বনি করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাঁদের হরিধ্বনিতে স্বর্গ এবং মর্ত্য ভরে গেল।

শ্লোক ১৯৯

তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজের হাতে সমস্ত ভক্তদের মালা এবং চন্দন পরালেন।

শ্লোক ২০০

তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন স্বরূপ দামোদর প্রমুখ সাতজন যাঁরা প্রসাদ বিতরণ করছিলেন, তাঁরা গৃহের ভিতরে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ২০১

প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ গোবিন্দ সাবধানে রেখে দিয়েছিলেন। সেই প্রসাদের কিছুটা তিনি হরিদাস ঠাকুরকে দিলেন।

শ্লোক ২০২

ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি' নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা গোবিন্দের কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ কিছুটা চেয়ে নিলেন; এবং তার বাকী অংশটি গোবিন্দ নিজে খেলেন।

শ্লোক ২০৩

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়াপাখলা' নাম কৈল এই এক লীলা ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে নানা লীলাবিলাস করলেন। 'ধোয়াপাখলা' নামক গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন-লীলা তার মধ্যে একটি।

শ্লোক ২০৪

আর দিনে জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব' নাম ।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর একদিন জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব' নামক মহোৎসব ছিল। এই মহোৎসবটি ভক্তদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়।

তাৎপর্য

স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের বর্ণ ধৌত হওয়ায় 'অনবসর'-এর সময় তিনটি বিগ্রহই নতুন করে রং করা হয়। তাকে বলা হয় 'অঙ্গরাগ'। 'নব-যৌবন'-এর দিনই সকালে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর 'অঙ্গরাগ' হয়।

শ্লোক ২০৫

পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে ।
দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইল মনে ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

পনের দিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পেয়ে লোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। অবশেষে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে তারা সুখ পেল।

শ্লোক ২০৬

মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে মহা আনন্দে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলেন।

শ্লোক ২০৭

আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন কাশীশ্বর আগে আগে গিয়ে লোক সরিয়ে দিচ্ছিলেন, আর গোবিন্দ মহাপ্রভুর জলের পাত্র নিয়ে পিছন পিছন যাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

করঙ্গ—চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর জলপাত্র।

শ্লোক ২০৮

প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—দুঁহার গমন ।
স্বরূপ, অদ্বৈত,—দুঁহের পার্শ্বে দুইজন ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগে আগে পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী যাচ্ছিলেন; এবং তাঁদের দু'পাশে স্বরূপ দামোদর এবং অদ্বৈত আচার্য ছিলেন।

শ্লোক ২০৯

পাছে পাছে চলি' যায় আর ভক্তগণ ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ-ভবন ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য সমস্ত ভক্তরা মহাপ্রভুর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁরা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গেলেন।

শ্লোক ২১০

দর্শন-লোভেতে করি' মর্যাদা লঙ্ঘন ।
ভোগ-মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে ব্যাকুল হয়ে, তাঁরা মর্যাদা লঙ্ঘন করে ভোগ-মণ্ডপে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিগ্রহ উপাসনায় বহু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন, যেখানে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ নিবেদন করা হয়, সেখানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু পনের দিন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করার ফলে, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মর্যাদা-লঙ্ঘন করে ভোগ মণ্ডপে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২১১

তৃষার্ত প্রভুর নেত্র—ভ্রমর-যুগল ।
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন-কমল ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নেত্র তৃষ্ণার্ত হয়েছিল। সেই গভীর তৃষ্ণায় তাঁর নেত্র-যুগল ভ্রমরের মতো শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলের মধু পান করতে লাগল।

শ্লোক ২১২

প্রফুল্ল-কমল জিনি' নয়ন-যুগল ।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের নয়ন-যুগল প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্যকেও পরাভূত করছিল, এবং তাঁর গলদেশ নীলকান্ত মণি নির্মিত দর্পণের মতো ঝলমল করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধারণত গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন। কিন্তু পনেরো দিন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করার ফলে তিনি তাঁর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। তাই তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শন করার জন্য ভোগ মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। ২১০ শ্লোকে এই আচরণকে 'মর্যাদা লঙ্ঘন' বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির খুব কাছে আসা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ এবং গুরুদেবকে দূর থেকে দর্শন করা উচিত। একে বলা হয় মর্যাদা রক্ষা করা। তা না হলে, অধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে শ্রদ্ধার হানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কখনও কখনও ভগবানের বিগ্রহ অথবা গুরুদেবের খুব কাছে আসার ফলে কনিষ্ঠ ভক্তের অধঃপতন হয়। তাই ভগবানের বিগ্রহ এবং গুরুদেবের সেবকদের সব সময় খুব সতর্ক থাকা উচিত। কেননা, সেই সেবায় কোন রকম অবহেলা হলে অপরাধ হতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নয়নযুগলকে তৃষ্ণার্ত ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং শ্রীজগন্নাথদেবের নয়নযুগলকে প্রস্ফুটিত কমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার এই উপমার মাধ্যমে গাঢ় তৃষ্ণা-বশে কৃষ্ণমুখ-কমল দর্শন রূপ পানকার্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিপাসার আতিশয্য প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২১৩

বান্ধুলীর ফুল জিনি' অধর সুরঙ্গ ।
ঈষৎ হসিত কান্তি—অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের রক্তিম অধর বান্ধুলীর ফুলের বর্ণকেও পরাভূত করেছে, তাঁর মুখের মৃদু হাসি যেন অমৃতের তরঙ্গ।

শ্লোক ২১৪

শ্রীমুখ-সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ।
কোটিভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে মধুপানে ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শ্রীমুখের অপূর্ব সুন্দরকান্তি নিরন্তর বর্ধিত হচ্ছিল এবং কোটি কোটি ভক্তের ভ্রমর সদৃশ নেত্র সেই মুখ-কমলের মধু পান করছিল।

শ্লোক ২১৫

যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ।
মুখাম্বুজ ছাড়ি' নেত্র না যায় অন্তর ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা যতই সেই মধু পান করছিলেন, ততই তাঁদের তৃষ্ণা বর্ধিত হচ্ছিল, এবং সেই মুখকমল ছেড়ে তাঁদের ভ্রমররূপী নেত্র আর কোথাও যাচ্ছিল না।

তাৎপর্য

লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে (১/৫/৫৩৮) শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবানের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বলেছেন—

অসমানোর্ধ্বমাধুর্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ ।
জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥

"নন্দ মহারাজের পুত্রের সৌন্দর্য অসমোর্ধ্ব—তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত আর কিছুই নেই। তাঁর সৌন্দর্য অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। এই সৌন্দর্য স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুকে উল্লসিত করে।"

তেমনই *তন্ত্র-শাস্ত্রে* ভগবানের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কন্দর্পকোট্যর্বুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্য ।
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষে ॥

"তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নখরাজি কোটি কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য বিকিরণ করে; এবং তাঁর দেহের কান্তি এতই সুন্দর যে, সেরকম কোন কিছু পূর্বে দেখা যায়নি এবং শোনা যায়নি। সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আমি ধ্যান করি।" এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/২৯/১৪) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ২১৬

এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দরশন ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের মুখ-কমল দর্শন করলেন।

শ্লোক ২১৭

স্বেদ, কম্প, অশ্রু-জল বহে সর্বক্ষণ ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর দেহে স্বেদ, কম্প, অশ্রু আদি ভগবৎ-প্রেমজনিত ভাবের বিকার দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের লোভে তা সংবরণ করলেন।

শ্লোক ২১৮

মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন ।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্তন ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

মাঝে মাঝে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ নিবেদন করা হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে দর্শন হচ্ছিল। ভোগ নিবেদনের সময় মহাপ্রভু কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ২১৯

দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভুরে লঞা গেলা ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবকিছু ভুলে গেলেন। দুপুরবেলা ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক ২২০

প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া ।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

সকালবেলা রথযাত্রা মহোৎসব হবে জেনে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা দ্বিগুণ পরিমাণে ভোগ লাগালেন।

শ্লোক ২২১

গুণ্ডিচা-মার্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল ।
যাহা দেখি' শুনি' পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

আমি গুণ্ডিচা মার্জন লীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। যা দেখে এবং শুনে বহু পাপী কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছে।

শ্লোক ২২২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্যে* এই অধ্যায়ের 'কথাসার'-এ বর্ণনা করে বলেছেন—"খুব ভোরে স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার রথ দর্শন করলেন। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় পাণ্ডুবিজয়। সেই সময়, মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুবর্ণ মার্জনীর দ্বারা পথ সংমার্জন করতে শুরু করেন। লক্ষ্মীদেবীর অনুমতি নিয়ে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা-মন্দিরে চললেন। বালুকাময় সুপ্রশস্ত পথ, দুই দিকে গৃহ ও উদ্যানাদি, সেই পথের মধ্য দিয়ে গৌড়গণ রথ টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে চৌদ্দমাদলে কীর্তন আরম্ভ করলেন। কীর্তনের সময় মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাবের উদয় হতে লাগল; এমনকি, যেন জগন্নাথ ও মহাপ্রভু পরস্পর ভাব বিনিময়ের পরিচয় দিতে লাগলেন। বলগণ্ডি পর্যন্ত রথ এলে সেখানে সাধারণের একটি ভোগ নিবেদন হতে লাগল। উদ্যানের নিকটবর্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্যপরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ১

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত যঃ ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

স—তিনি; জীয়াৎ—দীর্ঘজীবী হোন; কৃষ্ণচৈতন্যঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; শ্রীরথাগ্রে—শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে; ননর্ত—নৃত্য করেছিলেন; যঃ—যিনি; যেন—যার দ্বারা; আসীৎ—ছিল; জগতাম্—সমগ্র জগতের; চিত্রম্—বিচিত্র; শ্রীজগন্নাথঃ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব; অপি—ও; বিস্মিতঃ—বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হোন! তাঁর সেই নৃত্য দেখে সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্যপ্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

জয় শ্রোতাগণ, শুন, করি' এক মন ।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম-মোহন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রোতাদের জয়! রথযাত্রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে পরম সুন্দর নৃত্য করেছিলেন, তার বর্ণনা আপনারা দয়া করে মন দিয়ে শুনুন।

শ্লোক ৪-৫

আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান ।
রাত্রে উঠি' গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥ ৪ ॥
পাণ্ডু বিজয় দেখিবারে করিল গমন ।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি' সিংহাসন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাত্রি থাকতেই উঠে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে স্নান করে শ্রীজগন্নাথদেবের 'পাণ্ডুবিজয়' দর্শন করতে গেলেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর সিংহাসন ছেড়ে রথে আরোহণ করেন।

শ্লোক ৬

আপনি প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং তাঁর পাত্রদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদদের 'পাণ্ডুবিজয়' উৎসব দর্শন করালেন।

শ্লোক ৭

অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহাসুখে শ্রীজগন্নাথদেবের রথে আরোহণ লীলা দর্শন করলেন।

শ্লোক ৮

বলিষ্ঠ দয়িতা'গণ—যেন মত্ত হাতী ।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

মত্ত হস্তীর মতো বলিষ্ঠ দয়িতারা হাতাহাতি করে শ্রীজগন্নাথদেবকে সিংহাসন থেকে রথে নিয়ে যেতে লাগলেন।

তাৎপর্য

'দয়িতা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন। দয়িতা নামে শ্রীজগন্নাথদেবের এক শ্রেণীর সেবক আছেন। এরা উচ্চকুলোদ্ভূত নন; অর্থাৎ এঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যও নন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা প্রাপ্ত হয়ে এঁরা ভদ্রবর্ণের সম্মান লাভ করছেন। স্নানযাত্রার দিন থেকে আরম্ভ করে রথ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এই দয়িতারা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করেন। *ক্ষেত্র মাহাত্ম্য* গ্রন্থে এই দয়িতাদের 'শবর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁদের 'দয়িতা-পতি' বলা হয়। এঁরা শ্রীজগন্নাথদেবকে অনবসরকালে মিষ্টান্ন ভোগ দেন এবং প্রতিদিন সকালবেলা বাল্যভোগ মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। এঁরা অনবসরকালে 'শ্রীজগন্নাথদেবেরর জ্বর হয়েছে' বলে ঔষধ ও পাচন ফলের রস অর্পণ করেন। কথিত আছে যে, শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি নীলমাধবরূপে শবরদের পূজা গ্রহণ করতেন। পরে তিনি 'জগন্নাথ-রূপে' মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শবর দয়িতাদের অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকার লাভ করেন।

শ্লোক ৯

কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন ।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

কয়েকজন দয়িতা শ্রীজগন্নাথদেবের কাঁধ ধরেছিলেন, আর কয়েকজন দয়িতা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধরেছিলেন।

শ্লোক ১০

কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী ।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

খুব মোটা এবং শক্ত রেশমের দড়ি জগন্নাথের কটিতটে বাঁধা হয়েছিল এবং দু'দিক থেকে দয়িতাগণ তা ধরে তাঁকে উঠাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১১

উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে স্থানে ।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলীতে আনে ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

'তুলী' নামক উঁচু এবং শক্ত তুলার বালিশ সিংহাসন থেকে রথ পর্যন্ত বিছানো হয়েছিল, এবং দয়িতারা শ্রীজগন্নাথদেবকে এক তুলী থেকে ত্বরিতে আর এক তুলীতে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১২

প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড ।
তুলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের পদাঘাতে তুলীগুলি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাচ্ছিল, এবং সেগুলি থেকে তুলো বেরিয়ে চতুর্দিকে উড়ছিল।

শ্লোক ১৩

বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রভু জগন্নাথ হচ্ছেন সমস্ত জগতের পালনকর্তা। কে তাঁকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে? তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় লীলাবিলাস করার জন্য চলছিলেন।

শ্লোক ১৪

মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করে ধ্বনি ।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবকে যখন সিংহাসন থেকে রথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছিলেন, কিন্তু নানারকম বাজনার শব্দ এবং মানুষের কোলাহলে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

তাৎপর্য

উড়িষ্যা দেশের লোকেরা সম্মানীয় ব্যক্তিকে 'মণিমা' বলে সম্বোধন করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে এই নামে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন ।
সুবর্ণ-মার্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জন ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুবর্ণ-মার্জনী দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের পথ সম্মার্জন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৬

চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে ।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পথে চন্দন জল সিঞ্চন করছিলেন। রাজা হওয়া সত্ত্বেও তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের তুচ্ছ সেবা করছিলেন।

শ্লোক ১৭

উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন ।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

উত্তম হওয়া সত্ত্বেও রাজা এইভাবে তুচ্ছ সেবা করছিলেন, তাই তিনি শ্রীজগন্নাথের কৃপার পাত্র ছিলেন।

শ্লোক ১৮

মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে ।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

রাজার সেই সেবা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুখ পেলেন, এবং সেই সেবার ফলে রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা হল।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভগবানকে জানা যায় না অথবা তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া যায় না।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

(ভাগবত ১০/১৪/২৯)

যে ভক্ত ভগবানের কৃপার লেশমাত্র প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল ভগবানকে জানতে পারেন। অন্যেরা তাদের বুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ভগবানকে জানার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু কোন দিনও তারা ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। যদিও মহারাজ

প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রাজাকে শ্রীজগন্নাথের তুচ্ছ সেবা করতে দেখলেন, তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। এইভাবে রাজা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কোন ভক্ত যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জগদ্‌গুরুরূপে এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি গুরু কৃষ্ণের মিলিত কৃপার প্রভাবে পরমার্থ সাধনে সফল হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় সেকথা বলেছিলেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

তারপর ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ভক্তিলতায় পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা বর্ধিত হতে হতে অবশেষে গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছায়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়, এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবানের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি জীবকে জড় জগৎ থেকে চিৎ জগতে নিয়ে যায়।

শ্লোক ১৯

রথের সাজনি দেখি' লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

রথটি এত সুন্দরভাবে সাজান হয়েছিল যে তা দেখে লোকে চমৎকৃত হচ্ছিল। সেই নতুন রথটি মনে হচ্ছিল যেন সোনা দিয়ে তৈরি, আর তা ছিল সুমেরু পর্বতের মতো সুউচ্চ।

তাৎপর্য

১৯৭৩ সালে লণ্ডনে এক চমৎকার রথযাত্রার মহোৎসব হয়েছিল। রথ নিয়ে আসা হয়েছিল লণ্ডন শহরের কেন্দ্রস্থলে ট্রফলগার স্কোয়ারে। লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকা *দি-গার্ডিয়ান*-এর প্রথম পাতায় রথের ছবি দিয়ে লেখা হয়েছিল—"ট্রফলগার স্কোয়ারে নেলসন স্তম্ভের প্রতিদ্বন্দ্বী ইসকনের রথ"। (ইসকন্ রথযাত্রা ইজ রাইভল টু দি নেলসন কোলাম ইন ট্রফলগার স্কোয়ার)। লর্ড নেলসনের মূর্তি সমন্বিত নেলসন স্তম্ভটি যেহেতু উচ্চ এবং তা বহু দূর থেকে দেখা যায়, পুরীর অধিবাসীরা যেমন সুমেরু পর্বতের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথের রথের তুলনা করেন, তেমনই লণ্ডনের অধিবাসীরা শ্রীজগন্নাথদেবের রথকে নেলসনের স্মৃতি সৌধের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ২০

শত শত সু-চামর-দর্পণে উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্মল ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শত শত চামর এবং উজ্জ্বল দর্পণ দিয়ে সেই রথটি সাজান হয়েছিল, এবং রথের উপরিভাগ নির্মল সুন্দর এক চাঁদোয়া দিয়ে ঘেরা ছিল। আর রথের চূড়ায় শোভা পাচ্ছিল একটি অপূর্ব সুন্দর পতাকা।

শ্লোক ২১

ঘাঘর, কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র-পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

নানারকম চিত্রিত পট্টবস্ত্র দিয়ে রথ বিভূষিত হয়েছিল, এবং ঝাঁঝর, নূপুর ও ঘণ্টার ধ্বনি হচ্ছিল।

শ্লোক ২২

লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা, হলধর ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর লীলা বিলাসের জন্য রথের উপর চড়লেন, এবং অন্য দু'টি রথে সুভদ্রা এবং বলদেব উঠলেন।

শ্লোক ২৩

পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

পনের দিন পরে শ্রীজগন্নাথদেব মহালক্ষ্মীর সঙ্গে নিভৃতে লীলাবিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

'অনবসর'-এর পনের দিনকে 'নিভৃত' কালও বলা হয়। নির্জন স্থানটিতে মহালক্ষ্মী বাস করেন। সেখানে পক্ষকাল থাকার পর শ্রীজগন্নাথদেব লক্ষ্মীদেবীর সম্মতি নিয়ে রথে চড়ে যাত্রা করেন।

শ্লোক ২৪

তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে ।
রথে চড়ি' বাহির হৈল বিহার করিতে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবীর সম্মতি নিয়ে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য রথে চড়ে বের হলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথদেব পনেরদিন নির্জনে মহালক্ষ্মীর সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন। কিন্তু অনুরাগ মার্গীয় কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য শ্রীজগন্নাথদেব সেই নিভৃত স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। ভগবান দুভাবে আনন্দ উপভোগ করেন—'স্বকীয়' এবং 'পরকীয়'। দ্বারকায় মর্যাদা সমন্বিত যে মাধুর্য রস তা 'স্বকীয়' রস। সেখানে ভগবানের বহু বিবাহিত মহিষী রয়েছেন, কিন্তু বৃন্দাবনে ভগবানের মাধুর্য প্রেম তাঁর বিবাহিত পত্নীদের সঙ্গে নয়—তাঁর প্রেমিকা গোপীদের সঙ্গে। মাধুর্য রসে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাকে বলা হয় 'পরকীয়া প্রেম'। যে নিভৃত স্থানে শ্রীজগন্নাথদেব স্বকীয় রসে মহালক্ষ্মীর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন, সেই স্থান ত্যাগ করে তিনি পরকীয় রস আস্বাদন করার জন্য বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। তাই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, স্বকীয় রস থেকে পরকীয় রসে ভগবান অধিক আনন্দ আস্বাদন করেন।

জড়-জগতে পরকীয় রস বা পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম সবচাইতে জঘন্য সম্পর্ক। কিন্তু চিৎ-জগতে এই প্রেম সর্বোত্তম। জড় জগতের সবকিছুই চিৎ-জগতের বিকৃত প্রতিফলন, এবং প্রতিফলনে সবকিছু উল্টো দেখায়। এই জড়-জগতে আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা চিৎ-জগতের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তাই জড় পণ্ডিতেরা এবং নীতিবাগীশেরা গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁর নিন্দা করে। অতি উন্নত শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে চিৎ-জগতের পরকীয়া রস নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। চিৎ-জগতের পরকীয়া রসের সঙ্গে জড় জগতের রসের তুলনা করা যায় না। চিৎ-জগতের পরকীয়া রস সোনার মতো, আর জড়-জগতের রস লোহার মতো। এই দুইয়ের পার্থক্য এত বিরাট যে, তার কোন তুলনাই করা চলে না। কিন্তু লোহার মূল্যের সঙ্গে সোনার মূল্যের পার্থক্য সহজেই নির্ণয় করা যায়। যিনি যথাযথভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি অনায়াসেই চিৎজগতের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়-জগতের কার্যকলাপের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন।

শ্লোক ২৫

সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম ।
দুই দিকে টোটা, সব—যেন বৃন্দাবন ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

রথ যাত্রার পথটি যমুনার তীরের মতো সূক্ষ্ম শ্বেত বালুকায় পূর্ণ এবং পথের দুই পার্শ্বে বৃন্দাবনের মতো কানন বেষ্টিত।

শ্লোক ২৬

রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন ।
দুই পার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত-মন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

রথে চড়ে শ্রীজগন্নাথদেব যেতে লাগলেন, এবং পথের দুপাশে সৌন্দর্য দেখে তাঁর মন আনন্দিত হল।

শ্লোক ২৭

'গৌড়' সব রথ টানে করিয়া আনন্দ ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

রথ যারা টানে তাদের বলা হয় 'গৌড়'। তাঁরা মহা আনন্দে রথ টানছিলেন। রথ কখনও দ্রুত চলছিল, আবার কখনও ধীরে চলছিল।

শ্লোক ২৮

ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে ।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও রথ থেমে যাচ্ছিল, এবং থামলে তা চালান যাচ্ছিল না। ভগবানের নিজের ইচ্ছায় ভগবানের এই রথ চলে, মানুষের দৈহিক বলের দ্বারা চলে না।

শ্লোক ২৯

তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য-চন্দন ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের স্বহস্তে মালা-চন্দন পরালেন।

শ্লোক ৩০

পরমানন্দ পুরী, আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের চন্দন পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৩১

অদ্বৈত-আচার্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তেমনই অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের স্পর্শ লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৩২

কীর্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন ।
স্বরূপ, শ্রীবাস,—যাহাঁ মুখ্য দুইজন ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনীয়াদের মালা-চন্দন দিলেন—যাঁদের মধ্যে প্রধান দুজন ছিলেন স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীবাস ঠাকুর।

শ্লোক ৩৩

চারি সম্প্রদায়ে হৈল চব্বিশ গায়ন ।
দুই দুই মার্দঙ্গিক হৈল অষ্ট জন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

চার সম্প্রদায়ে চব্বিশজন গায়ক এবং প্রতি সম্প্রদায়ে দু'জন করে আটজন মৃদঙ্গ-বাদক ছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ।
চারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন মহাপ্রভু বিচার করে চার সম্প্রদায়ের গায়কদের ভাগ করে দিলেন।

শ্লোক ৩৫

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে ।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস ঠাকুর এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত এই চারজনকে নৃত্য করতে আদেশ দিলেন।

শ্লোক ৩৬

প্রথম সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ—প্রধান ।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথম সম্প্রদায়ে তিনি স্বরূপ দামোদরকে প্রধান গায়ক করলেন এবং তার সঙ্গে পাঁচজন দোহার দিলেন।

শ্লোক ৩৭

দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ।
রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পাঁচজন দোহার হচ্ছেন—দামোদর পণ্ডিত, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত এবং শ্রীগোবিন্দানন্দ।

শ্লোক ৩৮

অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল ।
শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি অদ্বৈত আচার্যকে নৃত্য করতে আদেশ দিলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়টিতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে প্রধান গায়ক করলেন।

তাৎপর্য

প্রথম সম্প্রদায়ে মূল গায়ক স্বরূপ দামোদর, এবং দোহার দামোদর পণ্ডিত, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত এবং গোবিন্দানন্দ। অদ্বৈত আচার্য নর্তক। তার পরের সম্প্রদায়টির মূল গায়ক ছিলেন শ্রীবাস ঠাকুর।

শ্লোক ৩৯

গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাহাঁ নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরের সঙ্গে যে পাঁচজন দোহার দিচ্ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ, শ্রীরাম পণ্ডিত এবং সেই সম্প্রদায়ের নর্তক নিত্যানন্দ প্রভু।

শ্লোক ৪০-৪১

বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাহাঁ গায় ।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৪০ ॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুই জন ।
হরিদাস-ঠাকুর তাহাঁ করেন নর্তন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় দলটিতে মূল গায়ক ছিলেন মুকুন্দ আর বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারী, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন এই পাঁচজন ছিলেন দোঁহার; আর সেই সম্প্রদায়ের নর্তক ছিলেন হরিদাস ঠাকুর।

শ্লোক ৪২-৪৩

গোবিন্দ-ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, যাহাঁ গায় ॥ ৪২ ॥
মাধব, বাসুদেব-ঘোষ,—দুই সহোদর ।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্থ সম্প্রদায়ের মূল গায়ক ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ এবং হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ ছিলেন দোহার; আর সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

শ্লোক ৪৪

কুলীন-গ্রামের এক কীর্তনীয়া-সমাজ ।
তাহাঁ নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

কুলীন গ্রামের একটি কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ে রামানন্দ এবং সত্যরাজ নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৪৫

শান্তিপুরের আচার্যের এক সম্প্রদায় ।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্যের একটি সম্প্রদায় এসেছিল, এবং তাতে নৃত্য করছিলেন অচ্যুতানন্দ, এবং অন্য সকলে তাতে গাইছিলেন।

শ্লোক ৪৬

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন ।
নরহরি নাচে তাহাঁ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

খণ্ডবাসীদের কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ে নরহরি প্রভু এবং শ্রীরঘুনন্দন নাচছিলেন।

শ্লোক ৪৭

জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় ।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথের সামনে চারটি সম্প্রদায় কীর্তন করছিল। দুপাশে দুটি সম্প্রদায় এবং পিছনে একটি সম্প্রদায়, এইভাবে সাতটি সম্প্রদায় কীর্তন করছিল।

শ্লোকে ৪৮

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ।
যার ধ্বনি শুনি' বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সাতটি সংকীর্তনের সম্প্রদায়ে চৌদ্দটি মাদল বাজছিল; যার ধ্বনি শুনে সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তেরা পাগল হলেন।

শ্লোক ৪৯

বৈষ্ণবের মেঘ-ঘটায় হইল বাদল ।
কীর্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র-জল ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই কীর্তনের আনন্দে বৈষ্ণবদের চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা ঝরে পড়তে লাগল; তা দেখে মনে হল যেন মেঘের মতো বৈষ্ণবেরা বারি বর্ষণ করছেন।

শ্লোক ৫০

ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্তনের ধ্বনি ।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

কীর্তনের ধ্বনিতে ভুবন পূর্ণ হয়ে উঠল, এবং অন্য কোন বাদ্য আদির ধ্বনি আর তখন শোনা যাচ্ছিল না।

শ্লোক ৫১

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি' ।
'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"হরি, হরি!" বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাতটি সম্প্রদায়েই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, এবং দু'হাত তুলে তিনি "জয় জগন্নাথ!" ধ্বনি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৫২

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন আর একটি অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে, একসঙ্গে সাতটি সম্প্রদায়ে লীলাবিলাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৩

সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায় ।
অন্য ঠাঞি নাহি যা'ন আমারে দয়ায় ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সকলেই বলতে লাগলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সম্প্রদায়ে রয়েছেন। আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হয়ে তিনি আর কোথাও যাচ্ছেন না।"

শ্লোক ৫৪

কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি ।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তি কেউই দেখতে পারে না। অতি অন্তরঙ্গ ভক্তরাই কেবল তাঁদের শুদ্ধভক্তির প্রভাবে তা বুঝতে পারেন।

শ্লোক ৫৫

কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ।
সংকীর্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই সংকীর্তন দেখে শ্রীজগন্নাথদেব অত্যন্ত হরষিত হলেন, এবং তিনি তাঁর রথ থামিয়ে এই সংকীর্তন দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৬

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময় ।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময় ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই সংকীর্তন দেখে মহারাজ প্রতাপরুদ্রও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তা দেখে রাজা ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হয়ে বিবশ হলেন।

শ্লোক ৫৭

কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা ।
কাশীমিশ্র কহে,—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা যখন কাশীমিশ্রকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমার কথা বললেন, তখন কাশীমিশ্র বললেন, "মহারাজ, আপনার ভাগ্যের সীমা নেই।"

শ্লোক ৫৮

সার্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি ।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য, উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত লীলা দর্শন করেছিলেন। অন্য আর কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চাতুরী জানতে পারে নি ।

শ্লোক ৫৯

যারে তাঁর কৃপা, সেই জানিবারে পারে ।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান যাকে কৃপা করেন, তিনিই কেবল জানতে পারেন। ভগবানের কৃপা বিনা ব্রহ্মা আদি দেবতারাও তা জানতে পারেন না।

শ্লোক ৬০

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন।
সেই ত' প্রসাদে পাইল 'রহস্য-দর্শন' ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রসাদে রাজা এই রহস্য দর্শন করতে পারলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপের রহস্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত দর্শন করে শ্রীজগন্নাথদেব বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর রথ থামিয়ে সেই নৃত্য দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রভুও তাঁর নৃত্যের দ্বারা শ্রীজগন্নাথের আনন্দ বিধান করেছিলেন। 'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' এখানে এক পরমেশ্বর ভগবান; কিন্তু ভগবান এক হলেও লীলা বিচিত্রতা-ক্রমে এই অদ্ভুত রহস্যের প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় মহারাজ প্রতাপরুদ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর একটি 'রহস্য দর্শন' হচ্ছে যে, একই সময়ে তিনি সাতটি সম্প্রদায়েই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা তাও উপলব্ধি করেছিলেন।

শ্লোক ৬১

সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও প্রত্যক্ষভাবে তিনি রাজাকে দর্শন দিতে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি রাজাকে তাঁর অহৈতুকী কৃপা দান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মায়া কে বুঝতে পারে?

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্‌গুরু রূপে বা আচার্য রূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, সেহেতু তিনি পার্থিব বস্তু কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত 'রাজা'-কে দর্শন দিতে অসম্মত ছিলেন। বাস্তবিকই 'রাজা' সাধারণত কামিনী-কাঞ্চন পরিবৃত হয়ে থাকেন। তাই একজন সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন বলে রাজাকে দর্শন দিতে পারছিলেন না, কেননা সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন অত্যন্ত অশোভনীয় ব্যাপার। তাই প্রত্যক্ষভাবে 'রাজা' নামের প্রতি মহাপ্রভুর তীব্র বিতৃষ্ণা থাকলেও কিন্তু পরোক্ষভাবে তার প্রতি তাঁর এত কৃপা যে, রাজা মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর গূঢ়লীলার রহস্য পর্যন্ত জানতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাস্তবিকই মহাপ্রভুর এই কৃপাও বঞ্চনার লীলা অর্থাৎ একই সময়ে ঈশ্বর ও জীবের মতোই লীলার অর্থ—তাঁরই ঐকান্তিক ভক্ত ছাড়া আর কেউই বুঝতে সক্ষম নয়।

শ্লোক ৬২

সার্বভৌম, কাশীমিশ্র,—দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি' হইলা বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও কাশীমিশ্র, এই দুই মহাশয় রাজার প্রতি মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা দর্শন করে বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৬৩

এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপনে গায়েন, নাচা'ন নিজ-ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুক্ষণ তাঁর লীলা প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই কীর্তন করলেন এবং তাঁর নিজ-ভক্তগণকে নৃত্য করতে অনুপ্রাণিত করলেন।

শ্লোক ৬৪

কভু এক মূর্তি, কভু হন বহু-মূর্তি।
কার্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

প্রয়োজন অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও এক এবং কখনও বহু মূর্তিতে প্রকাশ হচ্ছিলেন। এ সকলই তাঁর স্বরূপ শক্তির দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৬৫

লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি 'লীলা শক্তি' করে সমাধান ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

লীলার আবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর 'লীলা-শক্তি'র দ্বারা সবকিছু সমাধান হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে (৬/৮) বলা হয়েছে—

পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ অচিন্ত্য-শক্তি এতই নিপুণ যে, তার দ্বারা সমগ্র চরাচরের শক্তি ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত"। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাতটি কীর্তন-সম্প্রদায়ে একই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে থেকে তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। প্রায় সকলেই মনে করেছিলেন তিনি এক, কিন্তু কেউ কেউ দেখলেন, তিনি নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। কেবলমাত্র তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদিও তিনি এক তবুও তিনি বহুরূপে বিভিন্ন কীর্তনদলে প্রকাশিত হয়েছেন। নৃত্যকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র নিজের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর স্বরূপ শক্তি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সব ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানেই অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির পার্থক্য। জড় জগতের বহু চেষ্টায় বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে কার্য অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু যখনই ভগবান কোন ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁর স্বরূপ-শক্তির দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই তার সমাধান হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সবকিছু এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সংগঠিত হয় যে, তা দেখে মনে হয় তা যেন আপনা থেকেই হয়ে গেছে। এই জগতেও কখনও কখনও স্বরূপ-শক্তির কার্য প্রকাশ হতে দেখা যায়, কিন্তু তথাকথিত জড় বৈজ্ঞানিকেরাও তাদের অনুসরণকারীগণ তা কিভাবে কি হচ্ছে—কিছুই বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে সবকিছুই প্রকৃতির দ্বারা হচ্ছে, কিন্তু তারা জানে না যে, প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানেরই শক্তি। এই কথাটি *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

"হে কুন্তীপুত্র! এই বিশ্বচরাচরে আমারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি কার্য করছে। এই প্রকৃতির নিয়মের দ্বারাই এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়।"

শ্লোক ৬৬

পূর্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে ।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার রাসাদি লীলা করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ক্ষণে ক্ষণে সে প্রকার অলৌকিক লীলা-সকল করলেন।

শ্লোক ৬৭

ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন ।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা শুধু ভক্তগণই অনুভব করলেন, অন্যেরা তা জানল না। তার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাসলীলায় ও মহিষী-বিবাহ-লীলায় যে প্রকার একই মূর্তি অনেক হয়ে প্রকাশ হয়েছিলেন, সে প্রকার গৌর-লীলাতেও সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তনদলে ভক্তগণের নিকটে ও প্রতাপরুদ্র আদি দর্শনকারীগণের চক্ষে ভগবান গৌরসুন্দর অনেক মূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। ভক্তগণ ছাড়া তাঁর এই অলৌকিক লীলা দেখবার জন্য অন্য কারও অধিকার হয় না। রাসে ও মহিষী-বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের একই সময়ে অনেক মূর্তিতে প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণ *শ্রীমদ্ভাগবতে* লিপিবদ্ধ আছে।

শ্লোক ৬৮

এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য-রঙ্গে ।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং সমস্ত জগৎ প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত করলেন।

শ্লোক ৬৯

এইমত হৈল কৃষ্ণের রথে আরোহণ ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সামনে তাঁর ভক্তদের নাচতে অনুপ্রাণিত করলেন।

শ্লোক ৭০

আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন ।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্তন ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেব কিভাবে গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলেন এবং তাঁর সামনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে নৃত্য করেছিলেন, তা আমি এখন বর্ণনা করব। আপনারা দয়া করে তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৭১

এইমত কীর্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ।
আপন-উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছুক্ষণ কীর্তন করলেন এবং তাঁর ভক্তদের নাচালেন।

শ্লোক ৭২

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন নাচবার ইচ্ছা হল, তখন তিনি সাতটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করলেন।

শ্লোক ৭৩

শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ এই নয় জনকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একত্রিত করলেন।

শ্লোক ৭৪

উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্য করতে ইচ্ছা হল, তখন এই নয়জনকে তিনি স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে দিলেন।

শ্লোক ৭৫

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায় ।
আর সব সম্প্রদায় চারি দিকে গায় ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই দশজন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গাইতে লাগলেন এবং নৃত্যকালে তাঁর সঙ্গে ধাবিত হলেন; আর সবকটি সম্প্রদায় চারদিকে কীর্তন করতে লাগল।

শ্লোক ৭৬

দণ্ডবৎ করি, প্রভু যুড়ি' দুই হাত ।
ঊর্ধ্ব মুখে স্তুতি করে দেখি' জগন্নাথ ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

দণ্ডবৎ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাতজোড় করে ঊর্ধ্ব মুখে শ্রীজগন্নাথদেবের স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭৭

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭৭ ॥

নমঃ—পূর্ণ প্রণতি; ব্রহ্মণ্য-দেবায়—ব্রহ্মণ্যদেব; গো-ব্রাহ্মণ—গাভী এবং ব্রাহ্মণদের; হিতায়—মঙ্গলের জন্য; চ—ও; জগদ্ধিতায়—যিনি সর্বদা সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন করেন; কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণকে; গোবিন্দায়—গোবিন্দকে; নমঃ নমঃ—পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

" 'ব্রহ্মণ্যদেব, যিনি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের হিতস্বরূপ, জগতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কারক, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও গোবিন্দ-স্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণু-পুরাণ* (১/১৯/৬৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৮

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৭৮ ॥

জয়তি—জয়; জয়তি—জয়; দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; দেবকী-নন্দনঃ—দেবকীর পুত্র; অসৌ—তিনি; জয়তি জয়তি—সর্বাঙ্গীন জয়; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; বৃষ্ণি-বংশ-প্রদীপঃ—বিষ্ণু-বংশের প্রদীপ; জয়তি জয়তি—সর্বাঙ্গীন জয়; মেঘ-শ্যামলঃ—বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামল যাঁর অঙ্গকান্তি; কোমল-অঙ্গঃ—যাঁর শ্রীঅঙ্গ কুসুমের মতো কোমল; জয়তি জয়তি—সর্বাঙ্গীন জয়; পৃথ্বীভারনাশঃ—যিনি পৃথিবীর ভার নাশ করেন; মুকুন্দঃ—যিনি সকলকে মুক্তি দান করেন।

অনুবাদ

" 'এই দেবকী-নন্দন পরমেশ্বর ভগবান জয়যুক্ত হোন। এই বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন; এই নবজলধর শ্যাম কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন; পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হোন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মুকুন্দ-মালা* (৩) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৭৯

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৭৯ ॥

জয়তি—নিত্য জয়যুক্ত হোন; **জন-নিবাসঃ**—যিনি যদু বংশীয়রূপে মানুষদের মধ্যে নিবাস করেছিলেন, এবং যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়; **দেবকী-জন্ম-বাদঃ**—দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত (কেউই পরমেশ্বর ভগবানের পিতা বা মাতা হতে পারেন না। তাই দেবকী-জন্ম-বাদ বলতে বোঝায় যে তিনি দেবকীর পুত্ররূপে পরিচিত ছিলেন, তিনি বসুদেবের পুত্র, যশোদার পুত্র এবং নন্দ মহারাজের পুত্ররূপেও পরিচিত); **যদু-বর-পরিষৎ**—যদু বংশীয়দের এবং ব্রজবাসীদের দ্বারা সেবিত (যারা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্যদ ও নিত্য সেবক); **স্বৈঃ-দোর্ভিঃ**—তার স্বীয় বাহুর দ্বারা, অথবা অর্জুন প্রমুখ ভক্তদের দ্বারা, যারা তাঁর বাহুর মতো; **অস্যন্**—সংহার করে; **অধর্মম্**—অসুর অথবা অধার্মিকদের; **স্থির-চর-বৃজিনঘ্নঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম, সমস্ত জীবের দুর্ভাগ্য নাশকারী; **সু-স্মিত**—সদা হাস্য মুখ; **শ্রীমুখেন**—তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের দ্বারা; **ব্রজ-পুর-বনিতানাম্**—ব্রজবনিতাদের; **বর্ধয়ন্**—বৃদ্ধি করেছিলেন; **কাম-দেবম্**—কামবাসনা।

অনুবাদ

" 'সমস্ত জীবের আশ্রয় স্বরূপ, দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত, যদুদের সভাপতি, নিজ বাহুর দ্বারা অধর্ম নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবের অমঙ্গলহারী, মধুর হাস্য-মুখের দ্বারা ব্রজবনিতাদের কামবর্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৯০/৪৮) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৮০

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৮০ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **ন**—না; **চ**—ও; **নরপতিঃ**—রাজা বা ক্ষত্রিয়; **ন**—না; **অপি**—ও; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য; **ন**—না; **শূদ্রঃ**—শূদ্র; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বর্ণী**—যে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত অথবা ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী যে কোন বর্ণের হতে পারেন। কেননা ব্রহ্মচর্য আশ্রম সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব।) **ন**—না; **চ**—ও; **গৃহপতিঃ**—গৃহস্থ; **ন**—না; **বনস্থঃ**—বানপ্রস্থ; **যতিঃ**—সন্ন্যাসী; **বা**—অথবা; **কিন্তু**—কিন্তু; **প্রোদ্যন্**—উজ্জ্বল; **নিখিল**—বিশ্বজনীন; **পরম-আনন্দ**—পরমানন্দ; **পূর্ণ**—পূর্ণ; **অমৃত-অব্ধেঃ**—অমৃতের সমুদ্রস্বরূপ; **গোপী-ভর্তুঃ**—ব্রজগোপিকাদের পতি পরমেশ্বর ভগবান; **পদকমলয়ঃ**—শ্রীপাদপদ্ম যুগলের; **দাস**—দাস; **দাস-অনুদাস**—দাসের অনুদাস।

অনুবাদ

" 'আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু নিত্য স্বতঃ প্রকাশমান সমুজ্জ্বল নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্ররূপ এবং ব্রজগোপিকাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের অনুদাসের দাস বলে পরিচয় দিই।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্যাবলী* (৭৪) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্লোক ৮১

এত পড়ি' পুনরপি করিল প্রণাম ।
জোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকগুলির দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের বন্দনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং ভক্তরাও তখন হাতজোড় করে ভগবানের বন্দনা করলেন।

শ্লোক ৮২

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার ।
চক্র-ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

হুঙ্কার করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন, এবং তিনি যখন বৃত্তাকারে ঘুরছিলেন তখন তাঁকে 'অলাত-আকার'-এর মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডকে অতি দ্রুত বেগে ঘোরালে যেমন একটি অবিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত চক্রের মতো প্রতিভাত হয়, কিন্তু বাস্তবিক জ্বলন্ত চক্র নয়, তেমনই মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে 'একক'-বিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র 'ব্যাপক'-রূপে দৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮৩

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্য করার সময় মহাপ্রভুর পদক্ষেপে সাগর এবং পর্বত সমন্বিত পৃথিবী টলমল করছিল।

শ্লোক ৮৪

স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।
নানা-ভাবে বিবশতা, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নাচছিলেন, তখন তাঁর শ্রীঅঙ্গে স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য, নানাভাবে বিবশতা, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ইত্যাদি অপ্রাকৃত ভাব সকল প্রকাশিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৮৫

আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায়।
সুবর্ণ-পর্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

নাচতে নাচতে তিনি যখন আছড়ে পড়ে ভূমিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল একটা সোনার পর্বত যেন মাটিতে লোটাচ্ছে।

শ্লোক ৮৬

নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভু তখন দু'হাত বাড়িয়ে, মহাপ্রভুর আশেপাশে ধেয়ে গিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছিলেন।

শ্লোক ৮৭

প্রভু-পাছে বুলে আচার্য করিয়া হুঙ্কার।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিছনে পিছনে গিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হুঙ্কার করে বার বার বলছিলেন, "হরিবোল! হরিবোল!"

শ্লোক ৮৮

লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর খুব কাছে লোকদের আসতে না দেওয়ার জন্য তিনটি মণ্ডল করা হল। প্রথম মণ্ডলে ছিলেন মহাবল নিত্যানন্দ প্রভু।

শ্লোক ৮৯

কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীশ্বর, গোবিন্দ আদি ভক্তরা পরস্পরের হাত ধরে দ্বিতীয় আবরণ রচনা করলেন।

শ্লোক ৯০

বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মণ্ডল হঞা করে লোক নিবারণ ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এবং তাঁর পার্ষদেরা মণ্ডলাকারে, তৃতীয় আবরণ তৈরি করে লোক নিবারণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৯১

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হঞা ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

হরিচন্দনের স্কন্ধে হাত রেখে মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রেমাবিষ্ট হয়ে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ৯২

হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্তন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীবাস ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হয়ে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দেখছিলেন।

শ্লোক ৯৩

রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাসে।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি' কহে,—হও এক-পাশে ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরকে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরিচন্দন তাঁকে স্পর্শ করে একপাশে সরে যেতে বললেন।

শ্লোক ৯৪-৯৫

নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে, তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৯৪ ॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর এত একাগ্র চিত্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দেখছিলেন যে, তাঁর তখন কোন বাহ্য চেতনা ছিল না, তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন হরিচন্দন তাঁকে বার বার ঠেলছে সুতরাং তাঁর একটু রাগ হল এবং তিনি হরিচন্দনকে একটি চাপড় মেরে নিবৃত্ত করলেন। চাপড় খেয়ে হরিচন্দনের ক্রোধ হল।

শ্লোক ৯৬

ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রুদ্ধ হয়ে হরিচন্দন যখন শ্রীবাস ঠাকুরকে কিছু বলতে গেলেন, তখন প্রতাপরুদ্র তাকে নিবারণ করলেন।

শ্লোক ৯৭

ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাই তুমি তাঁর শ্রীহস্তের স্পর্শ

লাভ করলে। তার ফলে তুমি কৃতার্থ হলে। আমি দুর্ভাগা, তাই এই সৌভাগ্য আমার হল না।"

শ্লোক ৯৮

প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকে হৈল চমৎকার।
অন্য আছুক্, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নৃত্য দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন। অন্যের কি কথা, শ্রীজগন্নাথদেবেরও অপার আনন্দ হল।

শ্লোক ৯৯

রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তাঁর রথ থামিয়ে অনিমেষ নেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করতে লাগলেন। রথ তখন আর এগিয়ে গেল না।

শ্লোক ১০০

সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি' দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

সুভদ্রাদেবী এবং বলরাম হৃদয়ে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন এবং সেই নৃত্য দর্শন করে তাঁদের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হল।

শ্লোক ১০১

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন উদ্দণ্ড নৃত্য করছিলেন, তখন তাঁর শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত প্রেম বিকার দেখা দিল—একই সময়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গে আটটি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল।

শ্লোক ১০২

মাংসব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

মাংসব্রণের মতো তাঁর রোমরাজি পুলকিত হয়েছিল এবং তা তখন কন্টক বেষ্টিত শিমূল বৃক্ষের মতো দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ১০৩

এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ।
লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দন্তের কম্প দেখে সকলের ভয় হচ্ছিল যে, হয়তো তাঁর দাঁতগুলি সব খসে পড়বে।

শ্লোক ১০৪

সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম ।
'জজ গগ' 'জজ গগ'—গদগদ-বচন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সর্বাঙ্গে প্রস্বেদের ধারার সঙ্গে রক্তোদ্গম হচ্ছিল এবং গদগদ স্বরে তিনি বলছিলেন "জজ গগ, জজ গগ"।

শ্লোক ১০৫

জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ।
আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

পিচকিরির ধারার মতো তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল; এবং সেই অশ্রুধারায় আশে পাশের সমস্ত লোক ভিজে গেল।

শ্লোক ১০৬

দেহ-কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অঙ্গকান্তি কখনও অরুণের মতো রক্তিম এবং কখনও মল্লিকা পুষ্পের মতো শুভ্র দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ১০৭

কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায় ।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও তিনি স্তম্ভিত হচ্ছিলেন, কখনও তিনি ভূমিতে লোটাচ্ছিলেন, আবার কখনও শুষ্ক কাষ্ঠের মতো তাঁর হাত-পা নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল।

শ্লোক ১০৮

কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন ।
যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

যখন তিনি ভূমিতে পড়ছিলেন তখন তাঁর শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, এবং তা দেখে ভক্তদের প্রাণ ক্ষীণ হচ্ছিল।

শ্লোক ১০৯

কভু নেত্রে নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও তাঁর চোখ দিয়ে এবং কখনও তাঁর নাক দিয়ে জলের ধারা নির্গত হচ্ছিল, এবং তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্র থেকে অমৃতের ধারা নির্গত হচ্ছে।

শ্লোক ১১০

সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ।
কৃষ্ণপ্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ফেনা নিয়ে শুভানন্দ পান করলেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যবান এবং কৃষ্ণপ্রেমরসের রসিক।

শ্লোক ১১১

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য কৈল কতক্ষণ ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কিছুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে এক বিশেষ ভাবের উদয় হল।

শ্লোক ১১২

তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি' স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল ।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

তাণ্ডব নৃত্য ছেড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে গান গাইতে আদেশ দিলেন; এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব জেনে স্বরূপ দামোদর গাইতে লাগলেন—

শ্লোক ১১৩

"সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥" ১১৩ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আমি আমার প্রাণ-নাথকে পেয়েছি, যার বিরহে আমি মদন দহনে দগ্ধ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম।"

তাৎপর্য

এই গানটিতে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর সাক্ষাতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বহুদিনের বিচ্ছেদের পর কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে রাধারাণীর মনে হয়েছিল, "আমি আমার প্রাণনাথকে আবার ফিরে পেয়েছি। তাঁর বিরহে আমি মদন দহনে দগ্ধ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি এখন আমার জীবন ফিরে পেয়েছি।"

শ্লোক ১১৪

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর উচ্চস্বরে এই ধুয়াটি গাইছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দে মধুরভাবে নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ১১৫

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ।
আগে নৃত্য করি' চলেন শচীর নন্দন ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

ধীরে ধীরে শ্রীজগন্নাথদেব এগিয়ে চললেন, আর শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি তাঁর আগে আগে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১১৬

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে, গায় ।
কীর্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথের দিকে তাকিয়ে সমস্ত ভক্তরা নাচছিলেন এবং গান গাইছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনীয়াদের সঙ্গে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১১৭

জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নয়ন এবং হৃদয় জগন্নাথে মগ্ন ছিল এবং তিনি তাঁর হাতের ভঙ্গিতে সেই গীতের অভিনয় করছিলেন।

শ্লোক ১১৮

গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে ।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে-ধীরে ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পিছনে যাচ্ছিলেন, তখন শ্যামসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সামনে যাচ্ছিলেন তখন শ্রীজগন্নাথদেব ধীরে ধীরে চলছিলেন।

শ্লোক ১১৯

এইমত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি ।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মধ্যে ঠেলাঠেলি হচ্ছিল, এবং মহাবলী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁর রথে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাদের ছেড়ে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দ্বারকা লীলাবিলাস করতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব ও সুভদ্রা সহ দ্বারকায় যান, তখন ব্রজবাসীদের সঙ্গে পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন *রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত* অর্থাৎ, শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীজগন্নাথদেব হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া এবং শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার লীলা। শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথপুরী হচ্ছে দ্বারকাপুরী, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যা ছিল একটি সাধারণ গ্রাম এবং সেখানকার অধিবাসীরা ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ। শ্রীক্ষেত্র ঐশ্বর্যলীলার স্থান এবং বৃন্দাবন মাধুর্যলীলার স্থান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রথকে পিছনে ফেলে চলে যাওয়া সূচিত করছিল যে, জগন্নাথদেব কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের ভুলে গেছেন। কৃষ্ণ যদিও ব্রজবাসীদের এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাদের ভুলে যেতে পারেন নি। তাই তাঁর ঐশ্বর্য মণ্ডিত রথযাত্রায় তিনি বৃন্দাবনে ফিরে যাচ্ছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর ভূমিকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরীক্ষা করছিলেন, কৃষ্ণ এখনও ব্রজবাসীদের মনে রেখেছেন কিনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রথের পিছনে চলে যাচ্ছিলেন, তখন জগন্নাথদেব কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর মনোভাব বুঝতে পারছিলেন; তাই দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রীমতী রাধারাণীকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তিনি তাদের ভুলে যাননি। এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব তাদের রথের সামনে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম ব্যতীত তিনি তৃপ্ত হতে পারেন না। এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব যখন দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব সমন্বিত গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সামনে আসছিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করছিলেন। এটি ছিল শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় রাধারাণীর ভাব সমন্বিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হয়েছিল।

শ্লোক ১২০

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচছিলেন তখন তাঁর ভাবান্তর হচ্ছিল এবং তিনি দু'হাত তুলে উচ্চস্বরে শ্লোক পড়ছিলেন।

শ্লোক ১২১

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১২১ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; কৌমার-হরঃ—কৌমারকালে যে আমার হৃদয় হরণ করেছিলেন; সঃ—তিনি; এব হি—অবশ্যই; বরঃ—পতি; তাঃ—এই সমস্ত; এব—নিশ্চিতভাবে; চৈত্রক্ষপাঃ—চৈত্রমাসে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি; তে—তারা; চ—এবং; উন্মিলিত—প্রস্ফুটিত; মালতী—মালতী পুষ্প; সুরভয়ঃ—সৌরভ; প্রৌঢ়াঃ—পূর্ণ; কদম্ব—কদম্ব পুষ্পের সৌরভ; অনিলাঃ—সমীরণ; সা—সেই; চ—ও; এব—নিশ্চিতভাবে; অস্মি—আমি; তথাপি—তথাপি; তত্র—সেখানে; সুরত-ব্যাপার—অন্তরঙ্গ ভাবের বিনিময়ে; লীলা—লীলাবিলাস; বিধৌ—আচরণে; রেবা—রেবা নামক নদী; রোধসী—তটে; বেতসী-তরুতলে—বেতসী গাছের তলায়; চেতঃ—আমার চিত্ত; সমুৎকণ্ঠতে—উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ

"যিনি কৌমার-কালে রেবা নদীর তীরে আমার চিত্ত হরণ করেছিলেন তিনি এখন আমার পতি হয়েছেন। এখন সেই চৈত্রমাসের জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে সেই প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের সৌরভও রয়েছে,—আর সেই মধুর সমীরণ কদম্ব কানন থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরত-ব্যাপার লীলাকার্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবা নদীর তীরে বেতসী তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *পদ্যাবলীতেও* (৩৮৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২২

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার ।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করছিলেন। কিন্তু স্বরূপ দামোদর ছাড়া কেউই তার অর্থ বুঝতে পারছিলেন না।

শ্লোক ১২৩

এই শ্লোকার্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখান ।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে আমি এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমি তার ভাবার্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের শ্লোক ৫৩, ৭৭-৮০ এবং ৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১২৪-১২৫

পূর্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ ১২৪ ॥

জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল ।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে যেমন ব্রজগোপিকারা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে আনন্দিতা হয়েছিলেন, শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই ভাবের উদয় হল। সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি স্বরূপ দামোদরকে দিয়ে একটি ধুয়া গাইয়েছিলেন।

শ্লোক ১২৬-১২৭

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥ ১২৬ ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে বললেন, "তুমি সেই কৃষ্ণ, আমি সেই রাধা। আগের মতো আবার আমাদের মিলন হয়েছে। কিন্তু তবুও আমার মন বৃন্দাবনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। তুমি দয়া করে বৃন্দাবনে তোমার শ্রীপাদপদ্ম যুগল প্রকাশিত কর। (অর্থাৎ তুমি আবার বৃন্দাবনে চল)।

শ্লোক ১২৮

ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি ।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এখানে এত লোকের ভিড়, এত হাতী, এত ঘোড়া এবং রথের এত শব্দ। কিন্তু সেখানে ফুলের বন, আর সেই বন ভ্রমরের গুঞ্জন, আর পাখীর কাকলীতে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ১২৯

ইহাঁ রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ ।
তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এখানে, কুরুক্ষেত্রে, তোমার পরণে রাজবেশ, আর তোমার সঙ্গে রয়েছে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা, কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার গোপবেশ, আর তোমার সঙ্গী কেবল মুরলী।

শ্লোক ১৩০

ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন ।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজে তোমার সঙ্গে যে সুখ আমি আস্বাদন করি, সে সুখসমুদ্রের এক কণাও এখানে নেই।

শ্লোক ১৩১

আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে ।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে নিয়ে তুমি আবার বৃন্দাবনে লীলাবিলাস কর; তাহলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

শ্লোক ১৩২

ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন ।
পূর্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতে রাধারাণীর উক্তি যা আছে, পূর্বে তা আমি সূত্রের আকারে বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১৩৩

সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ।
সেই সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্য অনেক শ্লোক আবৃত্তি করলেন, কিন্তু সেই সমস্ত শ্লোকের অর্থ কেউ-ই বুঝতে পারছিল না।

শ্লোক ১৩৪

স্বরূপ-গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকগুলির অর্থ কেবল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী জানতেন, কিন্তু তিনি কারোর কাছে তা প্রকাশ করেন নি। শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই অর্থ প্রচার করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৫

স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্য করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার সেই শ্লোকটি গাইতে লাগলেন, যার অর্থ তিনি স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৬

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১৩৬ ॥

আহুঃ—গোপিকারা বললেন; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **নলিন-নাভ**—হে পদ্মনাভ; **পদ-অরবিন্দম্**—চরণ কমল; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—বিষয় বাসনামুক্ত যোগীদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিচিন্ত্যম্**—সর্বতোভাবে চিন্তনীয়; **অগাধবোধৈঃ**—অসীম জ্ঞান সম্পন্ন; **সংসার-কূপ**—সংসাররূপী অন্ধকূপ; **পতিত**—যারা পতিত হয়েছে; **উত্তরণ**—উদ্ধারকারী; **অবলম্বম্**—একমাত্র আশ্রয়; **গেহম্**—গৃহস্থলী; **জুষাম্**—যুক্ত; **অপি**—অর্থাৎ; **মনসি**—মনের মধ্যে; **উদিয়াৎ**—উদিত হোক; **সদা**—সর্বদা; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

গোপিকারা বললেন, "হে কমলনাভ! সংসার কূপে পতিত মানুষদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম; যা অসীম জ্ঞানসম্পন্ন মহান যোগীরা সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, গৃহ-ধর্মরত আমাদের মনে উদিত হোক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৮২/৪৮) থেকে উদ্ধৃত। ব্রজগোপিকারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অথবা ধ্যানযোগের প্রতি উৎসাহী ছিলেন না। তারা কেবল ভগবদ্ভক্তিতেই উৎসাহী ছিলেন। তাদের জোর না করা হলে, তারা কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে চাইতেন না। পক্ষান্তরে, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাদের স্তনের উপর রাখতে চাইতেন। কখনও কখনও তারা অনুশোচনা করতেন যে, তাদের স্তন এত কঠিন যে তা হয়ত শ্রীকৃষ্ণের কোমল পাদপদ্মকে ব্যথা দিতে পারে। বৃন্দাবনের গোচারণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম পাথর এবং কাঁটায় আহত হচ্ছে বলে মনে করে তারা ব্যথাতুর হয়ে কাঁদতেন। গোপিকারা সবসময়ই শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে রাখতে চাইতেন এবং এইভাবে তাদের মন সবসময় কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকত। এই ধরনের শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কেবল বৃন্দাবনেই উদয় হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ব্রজগোপিকাদের ভাবে ভাবিত হয়ে, তাঁর হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৭

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি ।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু বলেছিলেন—" 'অন্য লোকের মনই হৃদয়; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন থেকে পৃথক নয়। আমার মন ও বৃন্দাবনকে 'এক' বলেই আমি জানি। তাই সেখানে যদি তুমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম উদয় করাও, তাহলে তা তোমার পূর্ণ কৃপা বলে আমি মনে করব।

তাৎপর্য

মন যখন সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়, তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ কামনা করা যায়। মনের কোন না কোন বৃত্তি থাকবেই—কেউ যদি জড় বিষয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাহলে মনকে বৃত্তিশূন্য করার মাধ্যমে তা করা যায় না; সেখানে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা থাকতেই হবে। মন যদি কৃষ্ণচিন্তায় পূর্ণ না হয়, কৃষ্ণসেবা বাসনায় পূর্ণ না হয়, তাহলে মন জড় বিষয়ে মগ্ন থাকবে। যারা সবরকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেছে এবং সমস্ত জড় বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করেছে তাদের কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হওয়ার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সব সময় পোষণ করা উচিত। কৃষ্ণ ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না, ঠিক যেমন মনের আনন্দ ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারে না।

শ্লোক ১৩৮

প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য নিবেদন ।
ব্রজ—আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ১৩৮ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

" 'প্রাণনাথ, আমার সত্য নিবেদন শোন। বৃন্দাবন আমার গৃহ, এবং সেখানে আমি তোমার সঙ্গ-সুখ কামনা করি। কিন্তু তা যদি না পাই, তাহলে আমার পক্ষে জীবন ধারণ করা বড়ই কষ্টকর হবে।

শ্লোক ১৩৯

পূর্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায় ।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধবের মুখে 'জ্ঞান-যোগ' উপদেশ দিয়েছিলে। এখন তুমিও সেই 'জ্ঞান-যোগ' উপদেশ দিচ্ছ। আমার হৃদয় প্রেমময়, তাতে জ্ঞান ও যোগের স্থান নেই। তা জেনেও আমাকে তোমার এরকম উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।' "

তাৎপর্য

যিনি সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তাঁর কাছে জ্ঞানযোগের পন্থা নিতান্তই অর্থহীন। মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রতি ভগবদ্ভক্তের কোন আগ্রহ নেই। মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলনের পরিবর্তে, ভগবদ্ভক্তের মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত এবং নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। ভক্তের কাছে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে অর্চা-অবতারও বলা হয়; অর্থাৎ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবানেরই অবতার—মাটি, শিলা, ধাতু, দারু ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবানের প্রকাশ। চরমে, জড় পদার্থের মাধ্যমে ভগবানের প্রকাশ এবং কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা উভয়ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের কাছে জড় ও চেতনের কোন পার্থক্য নেই। তাই, জড় পদার্থের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ তাঁর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ থেকে অভিন্ন। শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেব নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সেবারত ভক্ত ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে তিনি তথাকথিত ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানের প্রতি সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

শ্লোক ১৪০

চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে ।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন,—" 'আমি তোমার থেকে চিত্ত উঠিয়ে নিয়ে বিষয়ে লাগাতে চাইলেও তা করতে পারি না। অতএব তোমার প্রতি এইরকম অনুরাগ যখন আমার স্বভাব, তখন আমাকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া—কেবল লোক হাস্যকর মাত্র; সুতরাং তুমি স্থানাস্থান বিচার করনি।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/১/১১) গ্রন্থে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

শুদ্ধভক্তের অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন অথবা জ্ঞান, যোগচর্চা করার কোন অভিলাষ থাকে না। এই ধরনের অর্থহীন কার্যকলাপে মনোনিবেশ করা শুদ্ধভক্তের পক্ষে অসম্ভব। শুদ্ধভক্ত যদি চেষ্টাও করেন, তথাপি তাঁর মন তাকে তা করতে দেয় না। এইটিই হচ্ছে শুদ্ধভক্তের স্বভাব—তিনি সবরকম সকাম কর্ম, মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান এবং ধ্যান যোগের অতীত। তাই গোপীরা তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৪১

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'গোপীরা যোগেশ্বর নয় যে, তোমার পাদপদ্মের ধ্যান করে আনন্দ লাভ করবে। তোমার বাক্যে পরিপাটী যথেষ্ট থাকলেও গোপীদের ধ্যান শেখানো—একটি কুটিনাটি মাত্র; এই ধ্যান শিক্ষার আবশ্যকতা শুনে গোপীদের আরও অভিমান হয়।' "

তাৎপর্য

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর *শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে* (৫) উল্লেখ করেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে ।
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ॥
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে ।
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির পন্থা উপলব্ধি করেছেন, সেই শুদ্ধভক্তের কাছে, অদ্বৈত দর্শনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পন্থা নারকীয় বলে মনে হয়। জ্ঞান যোগের মাধ্যমে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার পন্থাও শুদ্ধভক্তের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়। শুদ্ধভক্তের মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ এমনিতেই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত। তাই তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষদন্তহীন সর্পের

মতো। কারও মন যদি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে, তাহলে জড়স্তরে চিন্তা করার বা অনুভব করার কোন অবকাশ থাকে না। তেমনই, সকাম কর্মীর স্বর্গলোকে আরোহণের পন্থা ভক্তের কাছে আকাশ-কুসুমের মতো। কেননা, স্বর্গলোকও জড়-জগতের একটি স্থান, এবং কালের প্রভাবে স্বর্গলোকও লয় হয়ে যাবে। ভগবদ্ভক্তরা কখনো এই ধরনের অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত, কেননা তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হতে চান, সেখানে তাঁরা নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ণ-জ্ঞান এবং পূর্ণ-আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।

বৃন্দাবনের গোপীরা, গোপবালকেরা, গাভী, গোবৎস, বৃক্ষ, জল ইত্যাদি সবই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট নন।

শ্লোক ১৪২

দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার ।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গাইতে লাগলেন,—" 'গোপীদের স্বভাবতই যখন দেহ-স্মৃতি নেই, তখন সংসারকূপ বলে তাঁদের কিছুই নেই। সুতরাং মুক্তিজনক ধ্যান পদ্ধতিতে তাঁদের প্রয়োজন নেই, তোমার বিরহ সমুদ্রে পতিতা গোপীদের, তোমাকে সেবা করার ঐকান্তিক বাসনারূপ তিমিঙ্গিল (সুবৃহৎ মৎস্য বিশেষ) তাঁদের অবিরত গিলছে। সেই তিমিঙ্গিলের মুখ থেকে তুমি তাদের উদ্ধার কর। নিত্যসিদ্ধা গোপীরা, যোগী ও জ্ঞানীর অভীপ্সিত মুক্তি কখনই চায় না।

তাৎপর্য

জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা থেকে দেহচেতনার উদ্ভব হয়। তাকে বলা হয় 'বিপদস্মৃতি' যা প্রকৃত জীবনের বিপরীত অবস্থা। জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, কিন্তু সে যখন জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা করে, তখন সে চিন্ময় স্তর থেকে বঞ্চিত হয়। জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। সে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩০) বর্ণনা করা হয়েছে—*অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্।* অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কেবল নারকীয় অবস্থার দিকে উন্নতি সাধন হয়। সে পুনঃ পুনঃ চর্বিত বস্তু চর্বণ করতে পারে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে মরতে পারে, কিন্তু তার মাধ্যমে শত চেষ্টা করেও সে তার ঈপ্সিত নিত্যানন্দ লাভ করতে পারবে না। বদ্ধজীব জন্ম এবং মৃত্যুর অন্তর্বর্তী অবস্থাকে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের চিরাচরিত প্রথায় ব্যয় করতে পারে; যা নিম্নস্তরের পশুরা পর্যন্ত করে থাকে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আনন্দ পায় না। যেহেতু একই কার্যকলাপে জীব বার বার প্রবৃত্ত হয়, তাই তার সঙ্গে চর্বিত বস্তু চর্বণ করার তুলনা করা হয়েছে। কেউ যদি এই নীরস জড়-জীবন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে তিনি জড়া-প্রকৃতির কঠোর নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। মুক্ত হবার জন্য তাকে আর কোন পৃথক প্রচেষ্টা করতে হয় না। কেউ যদি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাহলে তিনি আপনা থেকেই মুক্ত হন। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর গেয়েছেন—*মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্*—"মুক্তি তখন করজোড়ে ভক্তের সেবা ভিক্ষা করে।"

শ্লোক ১৪৩

বৃন্দাবন, গোবর্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ।
সেই ব্রজের ব্রজজন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'বৃন্দাবন, গোবর্ধন, যমুনা-পুলিন, বন এবং সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা, তোমার সেই ব্রজজন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, এদের কথা তুমি কিভাবে ভুলে গেলে? এ বড় আশ্চর্যের বিষয়!

শ্লোক ১৪৪

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্‌গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস ।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দৈব-বিলাস ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণ, তুমি—বিশুদ্ধ পুরুষ, মৃদু, বৈদগ্ধ প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা সর্বদা সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, অতএব তোমার এই রকম ব্যবহারে দোষের আভাস নেই। তবে যে তুমি ব্রজবাসীদের আর স্মরণ কর না, তা কেবল আমারই দুর্দৈব ছাড়া আর কিছুই না।

শ্লোক ১৪৫

না গণি আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে ।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে? ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমি আমার দুঃখের কথা ভাবি না, কিন্তু ব্রজেশ্বরী মা যশোদার দুঃখ দেখে ব্রজজনদের হৃদয় বাস্তবিকই বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাসীদের বিচ্ছেদের দ্বারা কখনও মৃতবৎ কর, কখনও সঙ্গদানে জীবিত কর,—কেন যে দুঃখ সহ্য করার জন্য জীবিত রাখ, তা বুঝতে পারি না।

শ্লোক ১৪৬

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

" ' তোমার যে রাজবেশ, এবং ব্রজ থেকে পৃথক স্থানে অবস্থান এবং মহিষীদের সঙ্গ, তা ব্রজজনের আদৌ ভাল লাগে না। ব্রজবাসীরা ব্রজভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখেও মৃতবৎ হয়ে পড়ে। অতএব ব্রজজনের কি উপায় হবে?

শ্লোক ১৪৭

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে কৃষ্ণ, তুমি ব্রজের জীবন। তুমি ব্রজরাজ নন্দ মহারাজের প্রাণধন। তুমি ব্রজের একমাত্র সম্পদ। তোমার মন কৃপার্দ্র, তুমি এসে ব্রজবাসীদের প্রাণ বাঁচাও, দয়া করে তুমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম ব্রজে উদয় করাও।'

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করেননি। তিনি বৃন্দাবনে অন্য সকলের অবস্থা—মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, গোপবালক, গোপিকা, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, যমুনা-পুলিন, যমুনার জল, আদি সকলের কৃষ্ণ-বিরহের কথা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পার উদয় করাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাই তিনি শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করেছিলেন বৃন্দাবনে ফিরে যাবার জন্য। সেইটিই শ্রীজগন্নাথদেবের রথে করে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমনের তাৎপর্য।

শ্লোক ১৪৮

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে 'ঋণী' মানি,'
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর বাণী শুনে, তাঁর প্রতি ব্রজবাসীদের গভীর প্রেম স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও মন ভাবে ব্যাকুলিত হল। ব্রজবাসীদের প্রেমের মহিমা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে তাঁদের কাছে 'ঋণী' বলে মনে করে, শ্রীমতী রাধারাণীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪৯

প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ সত্য-বচন।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ১৪৯ ॥ ধ্রু ॥

শ্লোকার্থ

" 'প্রাণপ্রিয়ে, রাধে, দয়া করে আমার সত্য বচন শোন। তোমাদের সকলের কথা স্মরণ করে আমি দিন-রাত রোদন করি। আমার এই দুঃখের কথা কেউ জানে না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি*—"স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*) বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কখনও কোথাও এক পা-ও যান না।" কিন্তু বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে হয়েছিল। কংসকে সংহার করার জন্য তাঁকে মথুরায় যেতে হয়েছিল। তারপর তাঁর পিতা তাঁকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে নানারকম রাজকার্যে ব্যস্ত হতে হয়েছিল এবং অসুরদের দৌরাত্ম্য থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্যও সুখী ছিলেন না, যে কথা তিনি শ্রীমতী রাধারাণীকে এখানে বলেছেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রাণধন, এবং তাঁর কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন—

শ্লোক ১৫০

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ— সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি—মোর জীবনের জীবন ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—" 'সমস্ত ব্রজবাসীরা—আমার মাতা, পিতা, সখাগণ, এরা সকলেই আমার প্রাণসম। তার মধ্যে ব্রজগোপীরা সাক্ষাৎ আমার জীবনস্বরূপ, আর তুমি স্বয়ং আমার জীবনের জীবন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী বৃন্দাবনের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর হাতের পুতুল। তাই ব্রজবাসীরা "জয় রাধে" বলে শ্রীমতী রাধারাণীর মহিমা কীর্তন করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন বৃন্দাবনের রাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর অলঙ্কার। শ্রীকৃষ্ণের নাম মদনমোহন, মদনকেও যিনি মোহিত করেন, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করেন; তাই তাঁর নাম মদনমোহন-মোহিনী।

শ্লোক ১৫১

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমাদের সকলের প্রেম আমাকে বশীভূত করেছে, আমি কেবল তোমারই অধীন। আমার প্রবল দুর্দৈব তোমাদের সকলের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দূর দেশে নিয়ে রেখেছে।'

শ্লোক ১৫২

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে,—এ সত্য প্রমাণ ।
মোর দশা শোনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

' "প্রিয়-সঙ্গহীনা প্রেয়সী, প্রিয়া-সঙ্গহীন প্রেমিক যে বাঁচতে পারে না,—এইটিই সত্য প্রমাণ; তথাপি তাঁরা এই মনে করে বেঁচে থাকে যে, "আমি মরেছি শুনলে তাঁরও মৃত্যু হবে।"

শ্লোক ১৫৩

সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে ।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই সতী প্রেমবতী এবং সেই পতি প্রেমবান, যাঁরা বিরহেও পরস্পরের হিত কামনা করেন। তাঁরা নিজেদের দুঃখের কথা বিবেচনা না করে কেবল প্রিয়জনের সুখ কামনা করেন। সেই প্রেমিক-প্রেমিকা অচিরেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন।

শ্লোক ১৫৪

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি ।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্তি ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তুমি আমার নিত্য প্রিয়া, এবং আমার বিরহে তুমি যে বাঁচবে না, তা জেনে আমি নারায়ণের সেবা করে, তাঁর বিভুত্ব শক্তিবলে প্রতিদিন ব্রজে এসে তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করে আবার যদুপুরীতে ফিরে যাই, তাই তুমি বৃন্দাবনে সবসময় আমার উপস্থিতি অনুভব কর।

শ্লোক ১৫৫

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম—পরম প্রবল ।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার অনেক সৌভাগ্য যে, আমার প্রতি তোমার যে প্রেম তা পরম প্রবল। তা লুকিয়ে আমাকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে সঙ্গ করায়। আমি আশা করি যে শীঘ্রই আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রকট হব।'

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি দুই প্রকার—প্রকট এবং অপ্রকট। এই উভয় প্রকার উপস্থিতিই একনিষ্ঠ

ভক্তের কাছে সমানভাবে প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত নাও থাকেন, কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করেন। সে সম্বন্ধে *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমের ফলে, শুদ্ধভক্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজবাসীদের সামনে প্রকট ছিলেন না, তখন তাঁরা সবসময় তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকলেও, তিনি সমস্ত ব্রজবাসীদের কাছেও উপস্থিত ছিলেন। এটিই তাঁর অপ্রকট প্রকাশ। যে সমস্ত ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন, তারা নিঃসন্দেহে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দর্শন করবেন। যে সমস্ত ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থেকে কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন তারা অবশ্যই ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। তখন তারা প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করবেন, তাঁর সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করবেন এবং তাঁর সঙ্গসুখ লাভ করবেন। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৪/৯) বলা হয়েছে—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।*

জীবিত অবস্থায় শুদ্ধভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, এবং দেহত্যাগ করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যান, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যলীলা-বিলাস করেন। তখন প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সেইটিই হচ্ছে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এইটিই *'প্রকটেহ আনিবে সত্বর'* কথাটির অর্থ। শুদ্ধভক্ত অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা দর্শন করবেন।

শ্লোক ১৫৬

যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈলুঁ সব ক্ষয় ।
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন,
আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'যদুবংশীয়দের শত্রু কংসের সমস্ত দুষ্ট অনুচরদের আমি সংহার করেছি। কেবলমাত্র দুই-চার জন এখনও বাকী আছে, তাদের মেরে আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরে আসব। সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান না, কৃষ্ণ-ভক্তরাও তেমন বৃন্দাবন ছেড়ে

কোথাও যেতে চান না। কিন্তু কৃষ্ণসেবা করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য, তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে বাইরে যান। সেই কাজ সম্পন্ন হলে শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে যান। শ্রীমতী রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সমস্ত অসুরদের সংহার করে তিনি শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরে যাবেন। তিনি তাই শ্রীমতী রাধারাণীকে বলেছিলেন, "আরও দুই-চারজন অসুরদের সংহার করা বাকী আছে তাদের সংহার করে আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসব।"

শ্লোক ১৫৭

সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা ।
যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে করি রাজ্য আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই সমস্ত শত্রুদের থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য আমি রাজ্যে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমার এই রাজপদের প্রতি আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি যে আমার রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমার স্ত্রী-পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করি, তা কেবল যাদবদের সন্তুষ্ট করার জন্য।

শ্লোক ১৫৮

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে ।
পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তোমার প্রেমের গুণ আমাকে সর্বদা বৃন্দাবনে আকর্ষণ করে। দশ-বিশ দিনের মধ্যেই আমি সেখানে ফিরে আসব; এবং পুনরায় বৃন্দাবনে এসে তোমার এবং অন্য সমস্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে দিন-রাত লীলা-বিলাস করব।

শ্লোক ১৫৯

এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শ্রীমতী রাধারাণীকে একথা বলে ব্রজে যাবার জন্য সতৃষ্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে একটি শ্লোক শোনালেন। সেই শ্লোক শুনে শ্রীমতী রাধারাণীর সমস্ত বাধা দূর হল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হল যে, শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অচিরেই প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৬০

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ১৬০ ॥

ময়ি—আমাকে; ভক্তিঃ—ভক্তি; হি—অবশ্যই; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের; অমৃতত্বায়—অমৃতত্ব; কল্পতে—যোগ্য হয়; দিষ্ট্যা—সেই ভাগ্যের ফলে; যৎ—যা; আসীৎ—ছিল; মৎ—আমার জন্য; স্নেহ—স্নেহ; ভবতীনাম্—তোমাদের সকলের; মৎ—আমার; আপনঃ—সাক্ষাৎকার।

অনুবাদ

" 'জীব আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে অমৃতত্ব লাভ করে। হে ব্রজবালাগণ, তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছ, তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণজনক, কেননা এই অনুরাগই আমাকে লাভ করার একমাত্র উপায়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮২/৪৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬১

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি' করে আস্বাদনে ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে দিন-রাত ঘরে বসে এই সমস্ত আস্বাদন করতেন।

শ্লোক ১৬২

নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা ।
শ্লোক পড়ি' নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে, শ্রীজগন্নাথদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সমস্ত শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে, ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৩

স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সৌভাগ্যের কথা কেউ ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন না, কেননা তাঁর দেহ, মন এবং বাক্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট ছিল।

শ্লোক ১৬৪

স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ ।
আবিষ্ট হঞা করে গান-আস্বাদন ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইন্দ্রিয় এবং স্বরূপ দামোদরের ইন্দ্রিয় অভিন্ন ছিল; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদরের গান আস্বাদন করছিলেন।

শ্লোক ১৬৫

ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া ।
তর্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনো ভূমিতে বসে, অধোমুখ হয়ে, তাঁর তর্জনী দিয়ে ভূমিতে লিখছিলেন।

শ্লোক ১৬৬

অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি' দামোদর ।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে লেখার ফলে মহাপ্রভুর অঙ্গুলি ক্ষত হবে জেনে, স্বরূপ দামোদর তাঁর নিজের হাত দিয়ে তাঁকে নিবারণ করছিলেন।

শ্লোক ১৬৭

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান ।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্তিমান্ ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে স্বরূপ দামোদর গান গাইছিলেন। মহাপ্রভুর যখন

যে ভাবের উদয় হত, স্বরূপ দামোদরের তখন ঠিক তদ্রূপ গানের মাধ্যমে সেই রস মূর্ত হয়ে উঠছিল।

শ্লোক ১৬৮

শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ-কমল ।
তাহার উপর সুন্দর-নয়নযুগল ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ-কমল এবং তার উপর তাঁর সুন্দর নয়ন-যুগল দর্শন করছিলেন।

শ্লোক ১৬৯

সূর্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল ।
মাল্য, বস্ত্র, দিব্য অলঙ্কার, পরিমল ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ ফুলের মালা, সুন্দর বস্ত্র, দিব্য অলঙ্কার এবং সুগন্ধের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, এবং তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের কিরণে ঝলমল করছিল।

শ্লোক ১৭০

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল ।
উন্মাদ, ঝঞ্ঝা-বাত তৎক্ষণে উঠিল ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দের সিন্ধু উদ্বেলিত হল, এবং তখন প্রবল ঝড়ের মতো দিব্য উন্মাদনার লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে দেখা দিল।

শ্লোক ১৭১

আনন্দোন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ।
নানা-ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

আনন্দ উন্মাদনায় ভাবের তরঙ্গ উঠতে লাগল, এবং বিবিধ ভাবসমূহ সৈন্যের মতো পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল।

শ্লোক ১৭২

ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য ।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী স্বভাব-প্রাবল্য ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

ভাবের লক্ষণগুলি বর্ধিত হতে লাগল। এইভাবে ভাবের উদয়, ভাবের শান্তি, সন্ধি, শাবল্য, সঞ্চারী, সাত্ত্বিক ও স্থায়ী ভাবসমূহের প্রাবল্য দেখা দিল।

শ্লোক ১৭৩

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল ।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীর যেন এক অপ্রাকৃত সুবর্ণ পর্বত; এবং তাতে ভাবরূপ পুষ্পবৃক্ষ সমূহ পুষ্পিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭৪

দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত-মন ।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত লক্ষণগুলির দর্শনে সকলের চিত্ত এবং মন আকৃষ্ট হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন প্রেমামৃত বর্ষণ করে সকলকে সিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১৭৫-১৭৬

জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥ ১৭৫ ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি' হয় চমৎকার ।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের সমস্ত সেবক, রাজার সমস্ত পাত্রগণ, সমস্ত তীর্থযাত্রী এবং সমস্ত নীলাচলবাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য এবং প্রেমবিকার দেখে চমৎকৃত হলেন; এবং সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উচ্ছল হয়ে উঠল।

শ্লোক ১৭৭

প্রেমে নাচে, গায়, লোক, করে কোলাহল ।
প্রভুর নৃত্য দেখি' সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

গভীর প্রেমে সকলে নাচতে লাগলেন, গাইতে লাগলেন এবং কোলাহল করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দেখে সকলেই আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭৮

অন্যের কি কায, জগন্নাথ-হলধর ।
প্রভুর নৃত্য দেখি' সুখে চলিলা মন্থর ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য সকলের কি কথা, এমন কি শ্রীজগন্নাথদেব এবং বলদেব পর্যন্ত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দেখে মহাসুখে মন্থর গতিতে চলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৭৯

কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি' ।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই তার সাক্ষী ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথ, বলদেব কখনো কখনো তাঁদের রথ থামিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য রঙ্গ দেখতে লাগলেন। সেই দৃশ্য যারাই দেখেছিলেন তারাই তার সাক্ষী।

শ্লোক ১৮০-১৮২

এইমত প্রভু নৃত্য করিতে ভ্রমিতে ।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৮০ ॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল ।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল ॥ ১৮১ ॥
রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার ।
ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সামনে এসে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহা সম্ভ্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরলেন। তাঁকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল, এবং রাজাকে দেখে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন, "ছি, ছি, আমার বিষয়ী স্পর্শ হল!"

শ্লোক ১৮৩

আবেশেতে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে ।
কাশীশ্বর-গোবিন্দ আছিলা অন্য-স্থানে ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকার ফলে সতর্ক ছিলেন না, এবং কাশীশ্বর ও গোবিন্দ অন্যত্র ছিলেন।

শ্লোক ১৮৪-১৮৫

যদ্যপি রাজারে দেখি' হাড়ির সেবনে ।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে ॥ ১৮৪ ॥
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান ।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে ঝাড়ুদারের মতো শ্রীজগন্নাথদেবের পথ পরিষ্কার করতে দেখে যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা করেছিলেন, তবুও তাঁর আপনজনদের সাবধান করার জন্য বাইরে তিনি কিছু রোষের আভাস প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলে, তৎক্ষণাৎ তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮/২৩)

নিষ্কিঞ্চনস্য বলতে, যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, তাদের বোঝান হয়েছে। এই ধরনের মানুষেরাই কেবল সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এই ধরনের মানুষদের পক্ষে বিষয়ীদের সঙ্গে এবং স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুখোমুখিভাবে মেলামেশা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান তাদের পক্ষে এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের সেই সমস্ত তথ্য শিক্ষা দেবার জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাইরে এইরূপ রোষ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু রাজার বিনীত ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি স্বেচ্ছায় রাজাকে তাঁর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সাবধান করার জন্য বাইরে রোষ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮৬

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয় ।
সার্বভৌম কহে,—তুমি না কর সংশয় ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে এই রোষপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত ভীত হলেন, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে বললেন, "মহারাজ, আপনি বিচলিত হবেন না।"

শ্লোক ১৮৭

তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজ গণ ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে বললেন, "মহাপ্রভু আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের এইভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন।"

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে মহারাজ প্রতাপরুদ্র যদিও ছিলেন, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত বিষয়ী, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে অন্তরে তিনি পবিত্র হয়েছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য, রথযাত্রার পথ তাকে ঝাঁড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে দেখে, তা বোঝা গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে কোন মানুষকে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত বিষয়ী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি যদি অত্যন্ত দীনভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তাহলে আর তিনি বিষয়ী থাকেন না। এই বিচার অবশ্য কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরাই করতে পারেন। কিন্তু সাধারণত, কোন ভক্তেরই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত বিষয়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৮৮

অবসর জানি' আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই' করিহ প্রভুর মিলন ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "অবসর বুঝে আমি তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করব, এবং তখন আপনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।"

শ্লোক ১৮৯

তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া।
রথ-পাছে যাই' ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের রথ প্রদক্ষিণ করে, রথের পিছনে গিয়ে মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯০

ঠেলিতেই চলিল রথ 'হড়' 'হড়' করি'।
চতুর্দিকে লোক সব বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

ঠেলা মাত্রই রথ 'হড়' 'হড়' শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলল। তখন চারিদিকের সমস্ত লোক 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯১

তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে বলদেবের এবং সুভদ্রার রথের সামনে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯২

তাহাঁ নৃত্য করি' জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি' নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

বলদেব এবং সুভদ্রার রথের সামনে নৃত্য করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সামনে এলেন, এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯৩

চলিয়া আইল রথ 'বলগণ্ডি'-স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি' দেখে ডাহিনে বামে ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

রথ যখন 'বলগণ্ডি' নামক স্থানে এল, তখন শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর রথ থামিয়ে ডাহিনে এবং বামে দেখতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯৪

বামে—'বিপ্রশাসন', নারিকেল-বন।
ডাহিনে ত' পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

বামদিকে শ্রীজগন্নাথদেব দেখলেন 'বিপ্রশাসন' নামক ব্রাহ্মণদের বসবাসের স্থান এবং নারিকেলের বন। আর ডানদিকে পুষ্পোদ্যান, যা ঠিক বৃন্দাবনের মতো।

তাৎপর্য

উড়িষ্যা দেশে ব্রাহ্মণ পল্লীকে 'বিপ্রশাসন' বলা হয়।

শ্লোক ১৯৫

আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দরশন ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে রথের সামনে নৃত্য করছিলেন, এবং রথ থামিয়ে শ্রীজগন্নাথদেব তা দেখছিলেন।

শ্লোক ১৯৬

সেই স্থলে ভোগ লাগে,—আছয়ে নিয়ম ।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, সেই 'বিপ্রশাসন' নামক স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ লাগে। শ্রীজগন্নাথদেবকে সেখানে অসংখ্য ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল, এবং তিনি তাঁর প্রত্যেকটি পদ আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯৭

জগন্নাথের ছোট-বড় যত ভক্তগণ ।
নিজ নিজ উত্তম-ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট এবং বড়, সমস্ত ভক্তরাই স্বহস্তে উত্তম ভোগ তৈরি করে তা শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯৮

রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্রগণ ।
নীলাচলবাসী যত ছোট-বড় জন ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র, তাঁর মহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্র, এবং নীলাচলের ছোট বড় সমস্ত অধিবাসীরাই শ্রীজগন্নাথদেবকে সেখানে ভোগ নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯৯

নানা-দেশের দেশী যত যাত্রিক জন ।
নিজ-নিজ-ভোগ তাহাঁ করে সমর্পণ ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

নানা দেশ থেকে যত তীর্থযাত্রী এসেছিলেন, তারাও নিজের হাতে তৈরি করে ভোগ নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২০০

আগে পাছে, দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে ।
যেই যাহা পায়, লাগায়,—নাহিক নিয়মে ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

রথের আগে, রথের পিছনে, রথের দু'পাশে, পুষ্পোদ্যানে, বনে, যে যেখানে পেরেছিলেন সেখানেই শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করেছিলেন। তাতে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না।

শ্লোক ২০১

ভোগের সময় লোকের মহা ভিড় হৈল ।
নৃত্য ছাড়ি' মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

ভোগের সময় লোকের মহাভীড় হল। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য বন্ধ করে নিকটবর্তী উপবনে গেলেন।

শ্লোক ২০২

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা ।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

উপবনে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে একটি গৃহপিণ্ডার উপর পড়ে রইলেন।

শ্লোক ২০৩

নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম ।
সুগন্ধি শীতল-বায়ু করেন সেবন ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্য করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর সারাদেহে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম নির্গত হচ্ছিল। তাই তিনি সুগন্ধি শীতল বায়ু সেবন করছিলেন।

শ্লোক ২০৪

যত ভক্ত কীর্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতিবৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রামে ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত ভক্তরা কীর্তন করছিলেন, তারা সকলে সেখানে এসে প্রতিটি বৃক্ষের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

শ্লোক ২০৫

এই ত' কহিল প্রভুর মহাসংকীর্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্তন ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাসংকীর্তন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যেভাবে তিনি নৃত্য করেছিলেন, তা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২০৬

রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্তন।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোসাঞি কর্যাছে বর্ণন ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে নৃত্য করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যাষ্টকে শ্রীল রূপ গোস্বামী তা বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর স্তবমালা নামক গ্রন্থে তিনটি 'চৈতন্যাষ্টকে' রচনা করেন, তার মধ্যে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রথম অষ্টকের সপ্তম শ্লোক।

শ্লোক ২০৭

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২০৭ ॥

রথারূঢ়স্য—পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি রথের উপর স্থিত ছিলেন; আরাদ্—সম্মুখে; অধিপদবি—প্রধান পথে; নীলাচলপতে—নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথ; রদভ্র—মহান; প্রেমোর্মি—ভগবৎ-প্রেমের তরঙ্গ; স্ফুরিত—যা প্রকাশিত হয়েছিল; নটনোল্লাসবিবশঃ—নৃত্য করার অপ্রাকৃত আনন্দে বিহ্বল হয়ে; সহর্ষম্—মহা আনন্দে; গায়দ্ভিঃ—যিনি গান গাইছিলেন; পরিবৃত—পরিবৃত; তনু—দেহ; বৈষ্ণবজনৈঃ—ভক্তদের দ্বারা; স চৈতন্যঃ—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; কিম্—কি; মে—আমার; পুনরপি—পুনরায়; দৃশো—দৃষ্টি; যাস্যতি—প্রবেশ করবেন; পদম্—পথ।

অনুবাদ

"রথারূঢ়-নীলাচলপতির সম্মুখে ভগবৎপ্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গে নৃত্যজনিত উল্লাসে বিবশ হয়ে আনন্দের সঙ্গে সংকীর্তনকারী এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসবেন?

শ্লোক ২০৮

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তন বিলাসের এই বর্ণনা যিনি শ্রবণ করবেন তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পাবেন। তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসসহ ভগবানের প্রেমভক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ২০৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য' বর্ণনাকারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হেরা-পঞ্চমী যাত্রা

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশ ধারণ করে একাকী উদ্যানে প্রবেশ করে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করতে লাগলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন দান করে কৃপা করলেন। ভক্তদের সঙ্গে মহাপ্রভু বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ সেবন করলেন। তারপর রথ না চলায়, রাজা অনেক মত্ত হস্তী লাগিয়েও রথ চালাতে না পারায়, মহাপ্রভু স্বয়ং মাথা দিয়ে রথ ঠেলে চালালেন। ভক্তরা সেই সময় রথের দড়ি টানতে লাগলেন। গুণ্ডিচার কাছে আইটোটায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থান করা হল। শ্রীজগন্নাথদেব সুন্দরাচলে বসলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন লীলা স্ফূর্তি হল। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে মহাপ্রভু জলক্রীড়া করেছিলেন। নব রাত্র যাত্রায় মহাপ্রভুর জগন্নাথ বল্লভে অবস্থিতি এবং পঞ্চমী দিবসে 'হেরাপঞ্চমী'-লীলা দর্শনে (শ্রীস্বরূপ দামোদরের সঙ্গে) লক্ষ্মী ও গোপীদের স্বভাব নিয়ে অনেক কথোপকথন হয়েছিল। শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবের সর্বোৎকর্ষতা শ্রীস্বরূপ দামোদরের মুখ থেকে শুনে মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁকে প্রতিবছর শ্রীজগন্নাথদেবের 'পট্টডোরী' আনবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্ ।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত সঃ ॥ ১ ॥

গৌরঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **আত্ম-বৃন্দৈঃ**—তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে; **শ্রীলক্ষ্মী**—লক্ষ্মীদেবীর; **বিজয়োৎসবম্**—বিজয়োৎসব; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **গোপী**—গোপিকাদের; **রসোল্লাসম্**—রসের উল্লাস; **হৃষ্টঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **প্রেম্ণা**—পরম প্রীতি সহকারে; **ননর্ত**—নৃত্য করেছিলেন; **সঃ**—তিনি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

অনুবাদ

তাঁর ভক্তদের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিজয় উৎসব দর্শন করে এবং ব্রজগোপিকাদের রসোল্লাস শ্রবণ করে হৃষ্টচিত্তে শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ২

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জয়যুক্ত হউন! ধন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জয়যুক্ত হউন!

শ্লোক ৩

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
জয় শ্রোতাগণ,—যাঁর গৌর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা জয়যুক্ত হউন! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যাঁদের প্রাণধন সেই শ্রোতাগণ জয়যুক্ত হউন!

শ্লোক ৪

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে ।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেন, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র সেখানে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৫

সার্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি' রাজবেশ ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে করিল প্রবেশ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুসারে, রাজবেশ পরিত্যাগ করে বৈষ্ণববেশ ধারণ করে তিনি একা উদ্যানে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যরা, পাশ্চাত্য দেশে কখনও কখনও বৈষ্ণববেশ ধারণ করে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থ বিতরণ করতে অসুবিধা বোধ করেন। কেননা পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা বৈষ্ণববেশের সঙ্গে পরিচিত নন। তাই ভক্তরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তারা গ্রন্থ বিতরণের জন্য পাশ্চাত্য দেশের পোশাক পরতে পারে কিনা। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দেওয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপদেশ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সুবিধার জন্য, বেশ পরিবর্তন করা যেতে পারে। আমাদের সদস্যরা যখন জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অথবা আমাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য, তাঁদের পোশাক পরিবর্তন করে, তার ফলে ভগবদ্ভক্তির নিয়মগুলি ভঙ্গ হয় না। প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে প্রচার করা, এবং সেইজন্য যদি তাদের পাশ্চাত্য দেশের মানুষদের মতো পোশাক পরতে হয়, তাতে কোন বাধা নেই।

শ্লোক ৬

সব-ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়-হাত হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত জোড় করে মহারাজ প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তদের অনুমতি নিলেন। তারপর সাহস করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করলেন।

শ্লোক ৭

আঁখি মুদি' প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ান ।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে চোখ বন্ধ করে যখন মাটিতে শুয়ে ছিলেন তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর পাদসম্বাহন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৮

রাসলীলার শ্লোক পড়ি' করেন স্তবন ।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীমদ্ভাগবত থেকে রাসলীলার শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে পাঠ করতে লাগলেন। তিনি "জয়তি তেঽধিকং" শ্লোকটি দিয়ে শুরু হয়েছে যে অধ্যায়টি সেই অধ্যায়টি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায় থেকে যা *গোপী-গীতা* নামে পরিচিত।

শ্লোক ৯

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোক শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসীম আনন্দ হল, এবং তিনি বারবার বলতে লাগলেন, "বল, বল"।

শ্লোক ১০

"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল ।
উঠি' প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন "তব কথামৃতং" শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঠে প্রেমাবেশে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১১

তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন ।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলুঁ আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাজাকে বললেন, "তুমি আমাকে বহু অমূল্য রত্ন দান করলে, কিন্তু তার প্রতিদানে তোমাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, তাই আমি তোমাকে আমার আলিঙ্গন দান করলাম।"

শ্লোক ১২

এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বার বার ।
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার সেই শ্লোকটি পাঠ করতে লাগলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রাজা, উভয়েরই অঙ্গ প্রেমাবেশে কম্পিত হচ্ছিল এবং তাদের চোখ দিয়ে জলের ধারা বইছিল।

শ্লোক ১৩

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১৩ ॥

তব—তোমার; **কথামৃতম্**—কথারূপ অমৃত; **তপ্তজীবনম্**—বিরহতাপক্লিষ্টদের প্রাণস্বরূপ; **কবিভিঃ**—মহান্ উন্নত ব্যক্তিদের দ্বারা; **ঈড়িতম্**—আরাধিত; **কল্মষাপহম্**—সবরকম পাপ দূর করে; **শ্রবণ মঙ্গলম্**—শ্রবণকারীর সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করে; **শ্রীমৎ**—সর্ববিধ পারমার্থিক শক্তি সমন্বিত; **আততম্**—সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করে; **ভুবি**—জড় জগতে; **গৃণন্তি**—কীর্তন করেন এবং প্রচার করেন; **যে**—যাঁরা; **ভূরিদাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা; **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

"হে প্রভু, বহুজন্মের বহু সুকৃতিকারী মানুষেরা জগতে এসে, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদের জীবনস্বরূপ, কবিদের সঙ্গীত কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্বতাপক্লিষ্ট, সর্ব-ব্যাপক তোমার কথামৃত সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৪

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন ।
ইঁহো নাহি জানে, ইহোঁ হয় কোন্ জন ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

'ভূরিদা' ভূরিদা' বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি তখন জানতেন না, কাকে তিনি আলিঙ্গন করছেন।

শ্লোক ১৫

পূর্ব-সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল ।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে রাজার সেবা দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তার প্রতি কৃপার উদয় হয়েছিল। তাই কোনরকম অনুসন্ধান না করেই তিনি তাকে কৃপা প্রসাদ দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

এই দেখ, চৈতন্যের কৃপা-মহাবল ।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা কত বলবান! রাজা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করেই তিনি সবকিছু সফল করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা এতই বলবান যে তা আপনা থেকেই কার্যকরী হয়। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাহলে তার সেই সেবা বিফল হয় না। চিন্ময় স্তরে তার হিসাব থাকে, এবং যথা সময়ে তা ফলপ্রসূ হয়। সে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৪০) বলা হয়েছে—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—"ভগবানের সেবা কখনও বিফল হয় না; এবং সেই পথে অল্প অগ্রসর হলেও তা মহাভয় থেকে রক্ষা করে।"

এই জগতের সবচাইতে অধঃপতিত মানুষদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবচাইতে শক্তিশালী ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রদান করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যিনি তা গ্রহণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (ভাঃ ১১/৫/৩২)।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তদের অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে হবে; তাহলে তার ভগবদ্ভক্তি অচিরে সার্থক হবে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের তাই হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নজরে আসতে হবে, এবং নিষ্ঠাভরে ভগবানের সেবা করলে মহাপ্রভু তাকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্য পাত্র বলে বিবেচনা করবেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয় নি, কিন্তু তাঁকে জগন্নাথের রথযাত্রার পথ ঝাঁট দিতে দেখে মহাপ্রভু তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। বৈষ্ণব বেশে মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন মহাপ্রভুর সেবা করছিলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর পরিচয় পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নি। পক্ষান্তরে, তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দেখাতে চেয়েছেন যে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার তুলনা হয় না; তাই তিনি 'দেখ, চৈতন্যের কৃপা মহাবল' বলে সে কথা বুঝিয়েছেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতীও সে সম্বন্ধে বলেছেন—*যৎ-কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভব-বতাম্ (চৈতন্য-চন্দ্রামৃত—৫)*। শ্রীচৈতন্যের অতি অল্প কৃপাও পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার মহাসম্পদ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছিলেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

"কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এখন গৌরাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।" শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরও গেয়েছেন, "পরম করুণ পহুঁ দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র"। তেমনই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।
দীন-হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

কলিযুগের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য কৃষ্ণ-ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে, নিরন্তর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করা।

শ্লোক ১৭

প্রভু বলে,—কে তুমি, করিলা মোর হিত?
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত? ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তুমি কে? আমার এত উপকার করলে। আচম্বিতে এখানে এসে তুমি আমাকে কৃষ্ণ-লীলামৃত পান করালে।"

শ্লোক ১৮

রাজা কহে,—আমি তোমার দাসের অনুদাস ।
ভৃত্যের ভৃত্য কর,—এই মোর আশ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা উত্তর দিলেন, "হে প্রভু, আমি আপনার দাসের অনুদাস। আমাকে আপনি আপনার ভৃত্যের ভৃত্য হবার সৌভাগ্য প্রদান করুন, সেইটিই আমার একমাত্র অভিলাষ।"

তাৎপর্য

ভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসনা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়া। সরাসরিভাবে ভগবানের দাস হবার বাসনা করা উচিত নয়। সেই অভিলাষ যথাযথ নয়। নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দান করেছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ অন্য কোন কিছু না চেয়ে ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। স্বর্গের দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে বর দিতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ অন্তহীন জড় ঐশ্বর্য প্রার্থনা করতে পারতেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি কেবল ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়ার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন। খোলা বেচা শ্রীধর ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি দরিদ্র এক পার্ষদ, কিন্তু মহাপ্রভু যখন তাকে বর দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনিও প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি ভগবানের দাসের অনুদাস হতে পারেন। অতএব, পরমেশ্বর ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়া জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

শ্লোক ১৯

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল ।
'কারেহ না কহিবে' এই নিষেধ করিল ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাজাকে তাঁর কিছু দিব্য ঐশ্বর্য দেখালেন, এবং তাঁকে নিষেধ করলেন সেকথা কাউকে বলতে।

শ্লোক ২০

'রাজা'—হেন জ্ঞান কভু না কৈল প্রকাশ ।
অন্তরে সকল জানেন, বাহিরে উদাস ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

তাকে যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র বলে তিনি চিনতে পেরেছেন তা তিনি বাইরে প্রকাশ করলেন না। অন্তরেতে তিনি সবকিছু জানতেন, কিন্তু বাইরে তিনি সেভাব প্রকাশ করলেন না।

শ্লোক ২১

প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি' ভক্তগণে।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত-মনে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করতে দেখে সমস্ত ভক্তরা রাজার সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এইটিই বৈষ্ণবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কাউকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করতে দেখলে বৈষ্ণব তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না। যখন শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন শুদ্ধভক্ত অত্যন্ত আনন্দিত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তথাকথিত কিছু বৈষ্ণব কাউকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা ব্যতীত ভগবানের বাণী প্রচার করা যায় না। সেকথা প্রতিটি বৈষ্ণবই জানেন, কিন্তু তবুও কিছু ঈর্ষা-পরায়ণ মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার সহ্য করতে পারছেন না। তারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রচারকের দোষ দর্শন করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সার্থক করে যে অপূর্ব সেবা তিনি করছেন সেজন্য তার প্রশংসা না করে তাঁর নিন্দা করেন।

শ্লোক ২২

দণ্ডবৎ করি' রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড় হস্ত করি' সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন, এবং হাত জোড় করে সমস্ত ভক্তদের বন্দনা করলেন।

শ্লোক ২৩

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা কৈল আগমন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, বাণীনাথ প্রসাদ নিয়ে সেখানে এলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের নিয়ে মধ্যাহ্নকালীন প্রসাদ সেবা করলেন।

শ্লোক ২৪

সার্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠা'ল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায় এবং বাণীনাথকে দিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পাঠিয়ে ছিলেন।

শ্লোক ২৫

'বলগণ্ডি ভোগে'র প্রসাদ—উত্তম, অনন্ত।
'নি-সকড়ি' প্রসাদ আইল, যার নাহি অন্ত ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

অপর্যাপ্ত পরিমাণে 'বলগণ্ডি' ভোগের অতি উত্তম প্রসাদ এবং সেই সঙ্গে 'নি-সকড়ি' প্রসাদ আনা হল।

শ্লোক ২৬

ছানা, পানা, পৈড়, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক, আর বীজ-তাল ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

ছানা, ফলের রস, ডাব, আম, নারিকেল, কাঁঠাল, নানাবিধ কলা এবং তালের শাঁস আনা হল।

তাৎপর্য

এইটিই জগন্নাথদেবের প্রসাদের প্রথম তালিকা।

শ্লোক ২৭

নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর।
বাদাম, ছোহারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জুর ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সঙ্গে ছিল নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলালেবু, বীজপূর, বাদাম, শুষ্ক ফল, দ্রাক্ষা এবং শুষ্ক খেজুর।

শ্লোক ২৮

মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার ।
অমৃতগুটিকা-আদি, ক্ষীরসা অপার ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

মনোহরা-লাড়ু অমৃতগুটিকা-আদি শত শত প্রকারের মিষ্টি ছিল, আর ছিল অপর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষীর।

শ্লোক ২৯

অমৃতমণ্ডা, সরবতী, আর কুম্‌ড়া-কুরী ।
সরামৃত, সরভাজা, আর সরপুরী ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল পেঁপে, সরবতী লেবু, কুমড়া-কুরী, সরামৃত, সরভাজা এবং সরপুরী।

শ্লোক ৩০

হরিবল্লভ, সেঁওতি, কর্পূর, মালতী ।
ডালিমা মরিচ-লাড়ু, নবাত, অমৃতি ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল হরিবল্লভ (ঘিয়ে ভাজা একপ্রকারের মিষ্ট রুটি), সেঁওতি, কর্পূর ও মালতী ফুলের তৈরি মিষ্টি, মুগের লাড়ু, নবাত (চিনির রসে পক্ক একপ্রকার মিষ্টান্ন), অমৃতি (জিলিপি-জাতীয় ঘৃতপক্ক মিষ্টি)।

শ্লোক ৩১

পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার ।
বিয়রি, কদ্‌মা, তিলাখাজার প্রকার ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি (কলাইয়ের ডালে প্রস্তুত সরু চাক্‌লি, বা চন্দ্রাকৃতি ফুল বড়ি), খাজা, খণ্ডসার, বিয়রি (চালভাজার চাক), কদ্‌মা, তিলাখাজা (খাজার সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা তিলের মিশ্রণে প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ)।

শ্লোক ৩২

নারঙ্গ-ছোলঙ্গ-আম্র-বৃক্ষের আকার ।
ফুল-ফল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল মিছরির তৈরি কমলা, লেবু, আম ইত্যাদি ফল এবং সেইগুলি ফুল ও পাতাযুক্ত ছিল।

শ্লোক ৩৩

দধি, দুগ্ধ, ননী, তক্র, রসালা, শিখরিণী ।
স-লবণ মুদ্‌গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল দধি, দুধ, ননী, ঘোল, ফলের রস, শিখরিণী, লবণ মেশানো মুগের অঙ্কুর এবং আদার টুকরো।

শ্লোক ৩৪

লেম্বু-কুল-আদি নানা-প্রকার আচার ।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

আর ছিল লেবু, কুল ইত্যাদির নানা প্রকার আচার। জগন্নাথদেবের সে সমস্ত প্রসাদ আমি লিখে শেষ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

২৬-৩৪ শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদিত বিবিধ প্রসাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি যথাসাধ্য তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অবশেষে তিনি স্বীকার করেছেন যে যথাযথভাবে তা বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৫

প্রসাদে পূরিত হইল অর্ধ উপবন ।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই উপবনের অর্ধাংশ প্রসাদে পূর্ণ হয়ে গেল, এবং তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

শ্লোক ৩৬

এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন ।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে জগন্নাথদেবকে ভোজন করতে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নয়ন সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জগন্নাথদেব অথবা রাধাকৃষ্ণকে নিবেদিত বিবিধ প্রকার ভোগ দর্শন করেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়া উচিত। বৈষ্ণবের পক্ষে নিজের উদর

পূর্তির জন্য বিবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্য দর্শনেই তার তৃপ্তি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীগুর্বষ্টকম্*-এ লিখেছেন—

চতুর্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদস্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"শ্রীগুরুদেব সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্বিধ (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়) অতি উপাদেয় ভোগ নিবেদন করেন। গুরুদেব যখন দেখেন যে ভক্তেরা সেই ভগবৎ-প্রসাদ সেবা করে তৃপ্ত হয়েছেন, তখন তিনিও তৃপ্ত হন। সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।"

ভগবানের ভোগ নিবেদন করার জন্য শিষ্যদের নানাবিধ অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে নিয়োগ করা শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য। এই ভোগ নিবেদন করার পর তা ভগবানের প্রসাদরূপে ভক্তদের বিতরণ করা হয়। এই ধরনের কার্যকলাপ গুরুদেবকে তৃপ্তিদান করে, যদিও তার নিজের বিবিধ প্রকার প্রসাদের প্রয়োজন হয় না। ভগবানকে ভোগ নিবেদন করতে দেখে এবং তারপর প্রসাদ বিতরণ করতে দেখে তিনি গভীর তৃপ্তি এবং আনন্দ অনুভব করেন।

শ্লোক ৩৭

কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ-সাত ।
এক এক জনে দশ দোনা দিল,—এত পাত ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

পাঁচ-সাত বোঝা কেয়াপাতার ডোঙ্গা নিয়ে আসা হল; এবং প্রত্যেককে দশ-দশটি করে সেই ডোঙ্গা দেওয়া হল।

শ্লোক ৩৮

কীর্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌররায় ।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

কীর্তনীয়াদের পরিশ্রম উপলব্ধি করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাতে ইচ্ছা করলেন।

শ্লোক ৩৯

পাঁতি পাঁতি করি' ভক্তগণে বসাইলা ।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

প্রভু না খাইলে, কেহ না করে ভোজন ।
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ গ্রহণ না করায় ভক্তরাও ভোজন করছিলেন না; তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৪১

আপনে বৈস, প্রভু, ভোজন করিতে ।
তুমি না খাইলে, কেহ না পারে খাইতে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর বললেন, "প্রভু, তুমি দয়া করে ভোজন করতে বস। তুমি যদি না খাও তাহলে অন্য কেউ তো খেতে পারবে না।"

শ্লোক ৪২

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা ।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের নিয়ে বসলেন, এবং সকলকে আকণ্ঠ পূর্ণ করে ভোজন করালেন।

শ্লোক ৪৩

ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন ।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভোজনান্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আচমন করে বসলেন। এত উদ্বৃত্ত প্রসাদ ছিল যে হাজার হাজার মানুষকে তা বিতরণ করা হল।

শ্লোক ৪৪

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন জনে ।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন দুঃখী কাঙালদের ডেকে এনে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করালেন।

শ্লোক ৪৫

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি ।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

কাঙ্গালদের ভোজন-রঙ্গ দেখে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরিবোল' বলে তাদের দিব্যনাম কীর্তন করতে উপদেশ দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই ।
জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

"মায়ার প্রভাবে সকলেই ভবসমুদ্রের তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে এবং নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে তার নিত্য প্রভু রূপে জানতে পেরে তার দাসত্ব বরণ করে, তাহলে সে এ ভব-সমুদ্র থেকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার লাভ করে এবং তখন আর কোন দুঃখ থাকে না।" শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতকে তিনটি গুণের দ্বারা পরিচালিত করেন এবং তার ফলে জীবনের তিনটি স্তরও রয়েছে—উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন। যেই স্তরেই জীব অধিষ্ঠিত হউক না কেন, তাকে ভব-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে যেতে হয়। কেউ ধনী হতে পারে, কেউ মধ্যবিত্ত হতে পারে, আবার কেউ দরিদ্র ভিক্ষুক হতে পারে—তাতে কিছু যায় আসে না। জীব যতক্ষণ জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ তাকে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৪৬

'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায় ।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"হরিবোল" বলা মাত্রই কাঙ্গালেরা ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্ভুত লীলাবিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবৎ-প্রেম অনুভব করার অর্থ হচ্ছে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। কেউ যদি চিন্ময় স্তরে স্থিত হতে পারেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। চিন্ময় জগতে ধনী বা দরিদ্র বলতে কিছু নেই। *ঈশোপনিষদে* সপ্তম মন্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক
একত্বম্ অনুপশ্যতঃ ॥

"যিনি সর্বদা সমস্ত জীবকে গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক চিৎ-স্ফুলিঙ্গ রূপে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা। তিনি কখনও মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হন না।"

শ্লোক ৪৭

ইহাঁ জগন্নাথের রথ-চলন-সময় ।
গৌড় সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এদিকে, উদ্যানের বাইরে, যখন শ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলার সময় হল, তখন সমস্ত গৌড়েরা রথ টানতে লাগলেন, কিন্তু রথ চলল না।

শ্লোক ৪৮

টানিতে না পারে গৌড়, রথ ছাড়ি' দিল ।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়েরা যখন দেখলেন যে তাঁরা রথ টানতে পারছেন না, তখন তারা সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলেন। তখন অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে রাজা তার পাত্র-মিত্রদের নিয়ে সেখানে এলেন।

শ্লোক ৪৯

মহামল্লগণে দিল রথ চালাইতে ।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

রাজা তখন মহামল্লদের দিয়ে রথ টানাতে লাগলেন এবং তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, তবুও রথ চলল না।

শ্লোক ৫০

ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত-হাতীগণ ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রাজা তখন মত্ত-হাতীদের আনিয়ে, তাদের দিয়ে রথ টানাবার চেষ্টা করলেন।

শ্লোক ৫১

মত্ত-হস্তিগণ টানে যার যত বল ।
এক পদ না চলে রথ, হইল অচল ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মত্ত-হস্তীরা রথ টানতে লাগলেও কিন্তু রথ একটুও নড়ল না।

শ্লোক ৫২

শুনি' মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা ।
মত্তহস্তী রথ টানে,—দেখে দাণ্ডাঞা ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংবাদ পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের নিয়ে সেখানে এলেন, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে মত্ত-হস্তীরা রথ টানছে।

শ্লোক ৫৩

অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার ।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

অঙ্কুশের আঘাতে হাতীগুলি চিৎকার করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও রথ চলছিল না, এবং সেখানে সমবেত সমস্ত লোকেরা তখন হাহাকার করছিল।

শ্লোক ৫৪-৫৫

তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥ ৫৪ ॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ।
হড় হড় করি, রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত হাতীগুলিকে রথ থেকে খুলে দিলেন এবং তাঁর পার্ষদদের রথ টানবার জন্য রথের দড়ি দিলেন, এবং তিনি নিজে রথের পিছনে গিয়ে মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলেন। তখন হড় হড় করে রথ এগিয়ে চলল।

শ্লোক ৫৬

ভক্তগণ কাছি হাতে করি' মাত্র ধায় ।
আপনে চলিল রথ, টানিতে না পায় ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

রথ আপনা থেকেই চলছিল, তাই ভক্তরা কেবল রথের দড়ি হাতে নিয়ে ছুটে চলছিলেন, তাঁরা রথ টানবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

শ্লোক ৫৭

আনন্দে করয়ে লোক 'জয়' 'জয়' ধ্বনি ।
'জয় জগন্নাথ' বই আর নাহি শুনি ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

রথ যখন এইভাবে এগিয়ে চলতে লাগল তখন সকলে আনন্দে 'জয়' ধ্বনি দিতে লাগলেন; এবং 'জয় জগন্নাথ' ছাড়া আর কিছু তখন শোনা যাচ্ছিল না।

শ্লোক ৫৮

নিমেষে ত' গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

অল্পক্ষণের মধ্যেই রথ গুণ্ডিচা মন্দিরের দ্বারে গিয়ে পৌঁছল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতাপ দর্শন করে সকলে চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ৫৯

'জয় গৌরচন্দ্র', 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

'জয় গৌরচন্দ্র' 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে সমস্ত লোকেরা উচ্চস্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬০

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে ।
প্রভুর মহিমা দেখি' প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা দর্শন করে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তার পাত্রমিত্র সহ পুলকিত হলেন।

শ্লোক ৬১

পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে ।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ-সিংহাসনে ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকেরা তখন তাঁকে রথ থেকে নামালেন এবং শ্রীজগন্নাথদেব তখন তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।

শ্লোক ৬২

সুভদ্রা-বলরাম নিজ-সিংহাসনে আইলা ।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সুভদ্রা দেবী এবং বলরামও তাঁদের নিজ নিজ সিংহাসনে বসলেন। তারপর শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নান করিয়ে ভোগ নিবেদন করা হল।

শ্লোক ৬৩

আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্তন-কীর্তন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের আঙ্গিনায় তাঁর ভক্তদের নিয়ে মহানন্দে নৃত্য করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৬৪

আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ।
দেখি' সব লোক প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

আনন্দে তখন মহাপ্রভুর প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠল, এবং তা দেখে সমস্ত লোকেরা ভগবৎ-প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন।

শ্লোক ৬৫

নৃত্য করি' সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ।
আইটোটা আসি' প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

নৃত্য করে সন্ধ্যাবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরতি দর্শন করলেন, এবং তারপর আইটোটা নামক স্থানে গিয়ে বিশ্রাম করলেন।

শ্লোক ৬৬

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল ।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ নয়জন মুখ্য ভক্ত নয়দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

শ্লোক ৬৭

আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্যে যত দিন ।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য সমস্ত ভক্তরা, চাতুর্মাস্যের সময়, এক এক দিন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করার দিন বণ্টন করে নিলেন।

শ্লোক ৬৮

চারি মাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি' নিল ।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

মুখ্য ভক্তেরা চারিমাসের দিন বেঁটে নিলেন। অন্য ভক্তেরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পেলেন না।

শ্লোক ৬৯

এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিনে মিলি' ।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু তারা এক এক দিন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পেলেন না, তাই তারা দুই-তিন জনে মিলে এক এক দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ লীলা-বিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ৭০

প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি জগন্নাথ ।
সংকীর্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সকালবেলা স্নান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যেতেন, এবং তারপর তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন করে নৃত্য করতেন।

শ্লোক ৭১

কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে ।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও অদ্বৈত আচার্যকে নাচাতেন, কখনও নিত্যানন্দ প্রভুকে, কখনও হরিদাস ঠাকুরকে, আবার কখনও অচ্যুতানন্দকে।

শ্লোক ৭২

কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে ।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বক্রেশ্বর পণ্ডিত এবং অন্য ভক্তদের নাচাতেন। এইভাবে তিনি ত্রিসন্ধ্যা গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে নৃত্য-কীর্তন করতেন।

শ্লোক ৭৩

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হৈল অবসান ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুভব করতেন যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে এসেছেন। তাই তখন তাঁর বিরহের অবসান হয়েছিল।

শ্লোক ৭৪

রাধা-সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা—এই হৈল জ্ঞানে ।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুভব করতেন যে, রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় মিলন হয়েছে, এবং সেই রসে তিনি নিরন্তর মগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ৭৫

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা ।
'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

গুণ্ডিচা মন্দিরের বিভিন্ন উদ্যানে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা বিলাস করেছিলেন, এবং 'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে জলকেলি করেছিলেন।

শ্লোক ৭৬

আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া ।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু নিজে ভক্তদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবং সমস্ত ভক্তরা তখন চতুর্দিক থেকে মহাপ্রভুকে বেষ্টন করে তাঁর গায়ে জল ছিটালেন।

শ্লোক ৭৭

কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল ।
জলমণ্ডুক-বাদ্যে সবে বাজায় করতাল ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তারা একটি মণ্ডলে, আবার কখনো বহু মণ্ডলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে জলের মধ্যে ব্যাঙ যেভাবে ডাকে, সেইভাবে শব্দ করে তালি দিতে দিতে জলকেলি করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

দুই-দুই জনে মেলি' করে জল-রণ ।
কেহ হারে, কেহ জিনে—প্রভু করে দরশন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

দুইজন দুইজন করে তাঁরা জলে রণ-কেলি করতে লাগলেন, কেউ হারল এবং কেউ জিতল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা দর্শন করলেন।

শ্লোক ৭৯

অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি ।
আচার্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়ে জলকেলি হতে লাগল, এবং অদ্বৈত আচার্য হেরে গিয়ে পরিহাস ছলে নিত্যানন্দ প্রভুকে গালাগালি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ৮০

বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে ।
গুপ্ত-দত্তে জলকেলি করে দুইজনে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপের সঙ্গে বিদ্যানিধির এবং মুরারি গুপ্তের সঙ্গে বাসুদেব দত্তের জল-কেলি হতে লাগল।

শ্লোক ৮১

শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর ।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে গদাধর পণ্ডিত এবং রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের জল-কেলি হতে লাগল।

শ্লোক ৮২

সার্বভৌম-সঙ্গে খেলে রামানন্দ-রায় ।
গাম্ভীর্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের জল-কেলি হতে লাগল। তারা তাদের গাম্ভীর্য হারিয়ে শিশুর মতো আচরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৩-৮৪

মহাপ্রভু তাঁ দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া ।
গোপীনাথাচার্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥ ৮৩ ॥
পণ্ডিত, গম্ভীর, দুঁহে—প্রামাণিক জন ।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জন ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের শিশু সুলভ চপলতা দর্শন করে মৃদু হেসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোপীনাথ আচার্যকে বললেন—"এরা দুই জনেই মহাপণ্ডিত, গম্ভীর এবং প্রামাণিক ব্যক্তি; এদের এই শিশু সুলভ চপলতা ত্যাগ করতে বল।"

শ্লোক ৮৫

গোপীনাথ কহে,—তোমার কৃপা-মহাসিন্ধু ।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীনাথ আচার্য উত্তর দিলেন, "আমি বুঝতে পারছি যে তোমার কৃপারূপ মহাসমুদ্রের এক বিন্দু এদের হৃদয়কে এইভাবে উদ্বেলিত করেছে।

শ্লোক ৮৬

মেরু-মন্দর-পর্বত ডুবায় যথা তথা ।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার কৃপা-সমুদ্রের একটি বিন্দু মেরু ও মন্দর পর্বতকে ডুবাতে পারে। এরা দুইজন তো সেই তুলনায় ছোট ছোট দুইটি পাহাড়ের মতো। সুতরাং এরা দুইজন যে নিমজ্জিত হয়েছে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

শ্লোক ৮৭

শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর ।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও,—এ কৃপা তোমার ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তর্ক সরষের খোলের মতো শুষ্ক, তা খেয়ে যার জীবন গেল, তাকে তুমি লীলারূপ অমৃত পান করাও; এমনই তোমার কৃপা।"

শ্লোক ৮৮

হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল ।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন মৃদু হেসে অদ্বৈত আচার্যকে ডেকে আনলেন এবং তাঁকে জলের উপর শেষ-শয্যা করালেন।

শ্লোক ৮৯

আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন ।
'শেষশায়ী-লীলা' প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

জলের উপর ভাসমান শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর উপর শয়ন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'শেষশায়ী-লীলা' প্রকট করলেন।

শ্লোক ৯০

অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া ।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

স্বীয় শক্তি প্রকট করে অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে জলের উপর ভেসে বেড়াতে লাগলেন।

শ্লোক ৯১

এইমত জলক্রীড়া করি' কতক্ষণ ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কিছুক্ষণ জল-ক্রীড়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে আইটোটায় গেলেন।

শ্লোক ৯২

পুরী, ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ।
আচার্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্য সমস্ত মুখ্য ভক্তেরা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর নিমন্ত্রণে তাঁর স্থানে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৯৩

বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল ।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

আর বাণীনাথ যে প্রসাদ এনেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তেরা তাও গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৯৪

অপরাহ্নে আসি' কৈল দর্শন, নর্তন ।
নিশাতে উদ্যানে আসি' করিলা শয়ন ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে নৃত্য করলেন; এবং রাত্রিবেলা উদ্যানে শয়ন করলেন।

শ্লোক ৯৫

আর দিন আসি' কৈল ঈশ্বর দরশন ।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন, এবং মন্দির প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ নৃত্য-গীত করলেন।

শ্লোক ৯৬

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া ।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে উদ্যানে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন-লীলা বিহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, এই বৃন্দাবন বিহার—পরকীয়া রসে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে লীলাবিলাস নয়। শ্রীজগন্নাথ পুরীর উদ্যানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মতো পরস্ত্রীর সঙ্গে ভোক্তৃলীলা করেন নি। তিনি নিজেকে শ্রীমতী রাধারাণীর দাসী বলে মনে করে, তাঁর সেব্য আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধার সঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মিলনে আনন্দসাগরে মগ্ন—এই রসে মত্ত অবস্থাতেই তাঁর ভক্তদের নিয়ে তিনি 'বৃন্দাবনবিহার' লীলাবিলাস করেছিলেন। জগন্নাথ পুরীর উদ্যানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই 'বৃন্দাবন-বিহার'-এর সঙ্গে গৌরাঙ্গ নাগরীবাদের কার্যকলাপের কোন সংস্পর্শ নেই।

শ্লোক ৯৭

বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দরশনে ।
ভৃঙ্গ-পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই উদ্যানের বৃক্ষরাজি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করে খুব প্রফুল্লিত হল, মৌমাছি এবং পাখীরা গান গাইতে লাগল; এবং শীতল বায়ু বইতে লাগল।

শ্লোক ৯৮

প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্তন ।
বাসুদেব-দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিটি বৃক্ষের তলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করলেন, এবং বাসুদেব দত্ত কেবল তখন গান গাইছিলেন।

শ্লোক ৯৯

এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায় ।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব দত্ত এক একটি বৃক্ষের তলায় এক একটি গান গাইলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে একা নাচলেন।

শ্লোক ১০০

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে নাচতে বললেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন নাচতে লাগলেন, তখন তিনি গান গাইতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১০১

প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্তনীয়া গায় ।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর প্রমুখ কীর্তনীয়ারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গান গাইতে লাগলেন, এবং ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় তাঁরা সকলেই তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১০২

এই মত কতক্ষণ করি' বন-লীলা ।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কিছুক্ষণ 'বন লীলা' বিহার করে তাঁরা জলক্রীড়া করতে নরেন্দ্র-সরোবরে গেলেন।

শ্লোক ১০৩

জলক্রীড়া করি' পুনঃ আইলা উদ্যানে ।
ভোজনলীলা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

জল-ক্রীড়া করে তাঁরা পুনরায় উদ্যানে এলেন এবং তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে 'ভোজন-লীলা' করলেন।

শ্লোক ১০৪

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

নয় দিন ধরে গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথদেবের সঙ্গে অবস্থান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে এইভাবে লীলা-বিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ১০৫

'জগন্নাথ-বল্লভ' নাম বড় পুষ্পারাম ।
নব দিন করেন প্রভু তথাই বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নয় দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক এক বিশাল পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করেছিলেন।

শ্লোক ১০৬-১০৭

'হেরা-পঞ্চমী'র দিন আইল জানিয়া ।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥ ১০৬ ॥
কল্য 'হেরা-পঞ্চমী' হবে লক্ষ্মীর বিজয় ।
ঐছে উৎসব কর যেন কভু নাহি হয় ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

'হেরা-পঞ্চমী'র দিন নিকটবর্তী হয়েছে জেনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র কাশী মিশ্রকে বললেন, "কাল হেরা-পঞ্চমী বা লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হবে। এমনভাবে এই উৎসবের আয়োজন করতে হবে যা পূর্বে কখনও হয়নি।"

তাৎপর্য

রথযাত্রার পরের পঞ্চমী তিথিকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেই বৃন্দাবন হচ্ছে এই গুণ্ডিচা মন্দির। শ্রীজগন্নাথদেবের বিরহে ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের অন্বেষণে গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন। তাই ঐ দিনটিকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলা হয়। ঐদিন শ্রীজগন্নাথকে হারিয়ে লক্ষ্মীদেবী তাঁকে খুঁজতে যান বলে আবার 'অতিবাড়ি'-রা তাকে 'হারা-পঞ্চমী' বলে। 'হেরা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দর্শন করা' এবং লক্ষ্মীদেবী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলা হয়।

শ্লোক ১০৮

মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ।
দেখি' মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "এত আড়ম্বরে এই মহোৎসব কর, যাতে তা দেখে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত এবং বিস্মিত হন।

শ্লোক ১০৯-১১২

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ।
চিত্রবস্ত্র-কিঙ্কিণী, আর ছত্র-চামরে ॥ ১০৯ ॥
ধ্বজাবৃন্দ-পতাকা-ঘণ্টায় করহ মণ্ডন ।
নানাবাদ্য-নৃত্য-দোলায় করহ সাজন ॥ ১১০ ॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১১১ ॥
সেইত' করিহ,—প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দরশন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে যত চিত্রিত বস্ত্র, কিঙ্কিনী, ছত্র, চামর, ধ্বজা, পতাকা এবং ঘণ্টা রয়েছে, সেই সমস্ত সংগ্রহ করে উৎসবের সজ্জার আয়োজন কর; এবং বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যগীত সহকারে লক্ষ্মীদেবীর দোলা নিয়ে যাওয়ার আয়োজন কর। দ্বিগুণ পরিমাণে প্রসাদের আয়োজন কর, যাতে তা রথযাত্রার মহোৎসব থেকেও চমৎকার হয়। এমনভাবে সমস্ত আয়োজন কর যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে স্বচ্ছন্দে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে পারেন।"

শ্লোক ১১৩

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচলে যাঞা ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সকালবেলা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

সুন্দরাচল হচ্ছে গুণ্ডিচা মন্দির। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে বলা হয় 'নীলাচল', তেমনই গুণ্ডিচা মন্দিরকে বলা হয় 'সুন্দরাচল'।

শ্লোক ১১৪

নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে ।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পার্ষদদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হেরা-পঞ্চমীর মহোৎসব দর্শন করার জন্য নীলাচলে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১১৫

কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া ।
স্বগণ-সহ ভাল-স্থানে বসাইল লঞা ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত সমাদর করে কাশীমিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর স্বজনসহ ভাল স্থানে নিয়ে বসালেন।

শ্লোক ১১৬

রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির বিশেষ রস সম্বন্ধে শুনতে ইচ্ছা করে ঈষৎ হেসে স্বরূপ-দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ১১৭-১১৮

যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার ।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ ১১৭ ॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার ।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর স্বাভাবিক পরম উদারতা প্রকাশ করে দ্বারকায় বিরাজ করেন, তথাপি বছরে একবার তিনি বৃন্দাবন দর্শন করার জন্যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন।"

শ্লোক ১১৯

বৃন্দাবন-সম এই উপবন-গণ ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

গুণ্ডিচা মন্দিরের উপবনগুলি দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এই সমস্ত উপবনগুলি বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন, তাই তা পুনরায় দর্শন করার জন্য শ্রীজগন্নাথদেব উৎকণ্ঠিত হন।

শ্লোক ১২০

বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল ।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"রথযাত্রায় যাওয়ার ছলে শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচল ছেড়ে বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন সুন্দরাচল গুণ্ডিচা মন্দিরে যান।

শ্লোক ১২১

নানা-পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে ।
লক্ষ্মীদেবীরে সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে? ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"সেখানকার পুষ্পোদ্যানগুলিতে তিনি দিন-রাত তাঁর লীলা-বিলাস করেন; কিন্তু তিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?"

শ্লোক ১২২

স্বরূপ কহে,—শুন, প্রভু, কারণ ইহার ।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর উত্তর দিলেন, "প্রভু, তার কারণ হচ্ছে, ভগবানের বৃন্দাবন লীলায় অংশগ্রহণ করার অধিকার লক্ষ্মীদেবীর নেই।

শ্লোক ১২৩

বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবন লীলায় কেবল ব্রজগোপিকারাই শ্রীকৃষ্ণের সহায়। ব্রজগোপিকারা ছাড়া কেউই শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারেন না।"

শ্লোক ১২৪-১২৬

প্রভু কহে,—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন ।
সুভদ্রা আর বলদেব, সঙ্গে দুই জন ॥ ১২৪ ॥
গোপী-সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে ।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ? ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রথযাত্রার ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রা ও বলদেবের সঙ্গে বৃন্দাবনে যান। সেখানকার উপবনে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তিনি যে লীলাবিলাস করেন, তার

নিগূঢ় ভাব কেউই জানে না। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় কোন দোষ নেই, তাহলে লক্ষ্মীদেবী কেন এত রোষ প্রকাশ করেন?"

শ্লোক ১২৭

স্বরূপ কহে,—প্রেমবতীর এই ত' স্বভাব ।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধভাব ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর উত্তর দিলেন, "এইটিই প্রেমবতীর স্বভাব, কান্ত যদি তাঁর প্রতি লেশমাত্র ঔদাস্য প্রদর্শন করেন, তাহলে তাঁর চিত্তে ক্রোধের সঞ্চার হয়।"

শ্লোক ১২৮-১৩১

হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন ।
সুবর্ণের চৌদোলা করি' আরোহণ ॥ ১২৮ ॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা পতাকার গণ ।
নানাবাদ্য-আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৯ ॥
তাম্বুল-সম্পুট, ঝারি, ব্যজন, চামর ।
সাথে দাসী শত, হার দিব্য ভূষাম্বর ॥ ১৩০ ॥
অলৌকিক ঐশ্বর্য সঙ্গে বহু-পরিবার ।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং স্বরূপ দামোদর যখন এইভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন বিবিধ রত্ন-খচিত সুবর্ণের চৌদোলায় আরোহণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মীদেবী সিংহদ্বারে এলেন। সেই চতুর্দোলা ছত্র, চামর, ধ্বজা এবং পতাকা দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল; এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে দেব-দাসীরা সেই চতুর্দোলার সম্মুখে নৃত্য করছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর শত শত দাসী দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে তাম্বুল সম্পুট, জলের ঝারি, ব্যজন, চামর বহন করছিলেন। এইভাবে তাঁর পরিকর সহ অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রকাশ করে ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মীদেবী সিংহদ্বারে এলেন।

শ্লোক ১৩২

জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে ।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধনে ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর জগন্নাথদেবের মুখ্য মুখ্য সমস্ত সেবকদের লক্ষ্মীদেবীর দাসীরা বন্ধন করলেন।

শ্লোক ১৩৩

বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ।
চোরে যেন দণ্ড করি' লয় নানা-ধনে ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারা তাদের বেঁধে লক্ষ্মীদেবীর কাছে নিয়ে এলেন। চোরের সমস্ত ধন-সম্পদ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেমন তাকে দণ্ড দান করা হয়, তাদেরও ঠিক সেইভাবে দণ্ডদান করা হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীজগন্নাথদেব যে সময় রথে যাত্রা করেন, সেই সময় তিনি লক্ষ্মীদেবীকে বলে যান, "আমি কালই ফিরে আসব।" দুই তিন দিন বিগত হবার পরেও জগন্নাথদেব ফিরে না আসায়, তাঁর প্রতি কান্তের ঔদাস্য দর্শন করে প্রেমবতী লক্ষ্মীদেবী স্বাভাবিক ভাবেই ক্রুদ্ধ হন। তখন সমস্ত দাসীদের নিয়ে বিমানে সজ্জীভূত হয়ে লক্ষ্মীদেবী শ্রীমন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন। লক্ষ্মীদেবীর পরিচারিকারা জগন্নাথদেবের প্রধান প্রধান পরিচারকদের বেঁধে লক্ষ্মীদেবীর কাছে নিয়ে আসেন।

শ্লোক ১৩৪

অচেতনবৎ তারে করেন তাড়নে ।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের পরিচারকেরা যখন লক্ষ্মীদেবীর শ্রীপাদপদ্মে অচেতনবৎ পতিত হন, তখন লক্ষ্মীদেবীর পরিচারিকারা পরিহাস ছলে তাদের নানাভাবে গালি দেন।

শ্লোক ১৩৫

লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া ।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবীর দাসীদের এই প্রাগল্‌ভ্য দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৬

দামোদর কহে,—ঐছে মানের প্রকার ।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর বললেন, "এই ধরনের মান ত্রিজগতের কোথাও দেখিনি অথবা শুনিনি।

শ্লোক ১৩৭

মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ।
ভূমে বসি' নখে লেখে, মলিন-বদন ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রেমিকা অবহেলিত হয়ে বিফল মনোরথ হলে, অভিমান ভরে নিরুৎসাহে তাঁর বিভূষণ পরিত্যাগ করে বিষণ্ণ বদনে ভূমিতে বসে নখ দিয়ে লেখে।

শ্লোক ১৩৮

পূর্বে সত্যভামার শুনি এবম্বিধ মান ।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে আমি শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে অভিমানিনী মহিষী সত্যভামার এই প্রকার মান প্রদর্শনের কথা শুনেছি, এবং সমস্ত অপ্রাকৃত রসের আধার ব্রজগোপিকাদেরও এই প্রকার মান প্রদর্শন করার কথা শুনেছি।

শ্লোক ১৩৯

ইঁহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া ।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাঞা ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু লক্ষ্মীদেবীকে ভিন্ন প্রকার মান প্রদর্শন করতে দেখছি। তিনি তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করে, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, প্রিয়কে আক্রমণ করতে চলেছেন।"

তাৎপর্য

স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী লক্ষ্মীদেবীর এই ঔদ্ধত্য দর্শন করে ব্রজগোপিকাদের প্রেমের উৎকর্ষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানাবার জন্য বললেন, "প্রভু, লক্ষ্মীদেবীর এই ধরনের মানের প্রকার আমি কখনও ত্রিজগতে শুনিনি। প্রিয়া মানিনী হলে উৎসাহহীন হয়ে ভূষণাদি পরিত্যাগ করে মলিন বদনে ভূমিতে বসে নখ দিয়ে লেখেন। ব্রজে গোপীদের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী সত্যভামারও এই প্রকার মানের কথা শোনা গেছে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান তার বিপরীত দেখছি। ইনি তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করে সৈন্য সাজিয়ে প্রিয়ের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।"

শ্লোক ১৪০

প্রভু কহে,—কহ ব্রজের মানের প্রকার ।
স্বরূপ কহে,—গোপীমান-নদী শতধার ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "বৃন্দাবনের বিবিধ প্রকার মানের কথা দয়া করে আমাকে বল।" স্বরূপ-দামোদর উত্তর দিলেন, "ব্রজগোপিকাদের মান শতধারা সমন্বিত নদীর মতো।

শ্লোক ১৪১

নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্তে বহু ভেদ ।
সেই ভেদে নানা-প্রকার মানের উদ্ভেদ ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তি—নানা প্রকার, সেই ভেদ অনুসারেই প্রতি নায়িকার মানের উদয় হয়।

শ্লোক ১৪২

সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন ।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌-দরশন ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজগোপিকাদের মান সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কয়েকটি পার্থক্য প্রদর্শন করার মাধ্যমে আমি দিগ্‌-দরশন করছি।

শ্লোক ১৪৩

মানে কেহ হয় 'ধীরা', কেহ ত' 'অধীরা' ।
এই তিন-ভেদে, কেহ হয় 'ধীরাধীরা' ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

মানিনীগণ প্রধানতঃ তিনভাবে বিভক্ত—'ধীরা', 'অধীরা', এবং 'ধীরাধীরা'।

শ্লোক ১৪৪

'ধীরা' কান্তে দূরে দেখি' করে প্রত্যুত্থান ।
নিকটে আসিলে, করে আসন প্রদান ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

ধীরা নায়িকা কান্তকে দূর থেকে আসতে দেখে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান; এবং কান্ত কাছে এলে তাঁকে বসতে আসন দেন।

শ্লোক ১৪৫

হৃদয়ে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন ।
প্রিয় আলিঙ্গিতে, তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"ধীরা নায়িকা তাঁর হৃদয়ের ক্রোধ প্রকাশ না করে মুখে মধুর বচনে কথা বলেন। যখন তাঁর প্রিয় তাঁকে আলিঙ্গন করতে চান, তিনিও তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করেন।

শ্লোক ১৪৬

সরল ব্যবহার, করে মানের পোষণ ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ধীরা নায়িকা সরল ব্যবহারে তাঁর মান পোষণ করেন; অথবা ঈষৎ-হাস্যপরিহাসযুক্ত বাক্যের দ্বারা বা ব্যাজস্তুতি বাক্যের দ্বারা প্রেমিকের আচরণের প্রতিবাদ করেন।

শ্লোক ১৪৭

'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন ।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"অধীরা নায়িকা কখনও নিষ্ঠুর বাক্যে প্রিয়কে ভর্ৎসনা করেন, কখনও তার কর্ণের দ্বারা তাড়না করেন এবং কখনও তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বাঁধেন।

শ্লোক ১৪৮

'ধীরাধীরা' বক্র-বাক্যে করে উপহাস ।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ধীরাধীরা নায়িকা কখনও বক্রোক্তির দ্বারা প্রিয়কে উপহাস করেন, কখনও তাঁর স্তুতি করেন, কখনও তাঁর নিন্দা করেন, আবার কখনও উদাস হন।

শ্লোক ১৪৯

'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্‌ভা',—তিন নায়িকার ভেদ ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নায়িকা তিন প্রকার,—'মুগ্ধা', 'মধ্যা' এবং 'প্রগল্‌ভা'। মুগ্ধা নায়িকারা মান-চাতুর্যে কোন প্রকার ভেদই জানেন না।

শ্লোক ১৫০

মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি' হয় পরসন্ন ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"মুগ্ধা নায়িকা মুখ আচ্ছাদন করে কেবল রোদন করেন, এবং কান্তের প্রিয় বাক্য শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

শ্লোক ১৫১

'মধ্যা' 'প্রগল্‌ভা' ধরে ধীরাদি-বিভেদ ।
তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন ভেদ ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"যে সমস্ত নায়িকা—'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা', তাঁরা ধীরাদি ভেদে তিন প্রকার।

শ্লোক ১৫২

কেহ 'প্রখরা', কেহ 'মৃদু', কেহ হয় 'সমা' ।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম-সীমা ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"তাদের কেউ 'প্রখরা', কেউ 'মৃদু', আবার কেউ 'সমা'। তারা তাদের নিজ নিজ স্বভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের সীমা বর্ধিত করেন।

শ্লোক ১৫৩

প্রাখর্য, মার্দব, সাম্য স্বভাব নির্দোষ ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও কোন কোন গোপী 'প্রখরা', কেউ 'মৃদু' এবং কেউ 'সমা' তাঁরা সকলেই অপ্রাকৃত এবং নির্দোষ। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ স্বভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করেন।"

শ্লোক ১৫৪

একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ।
'কহ, কহ, দামোদর',—বলে বার বার ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদরের এই বর্ণনা শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং বারবার বলতে লাগলেন—"বল, দামোদর, বল!"

শ্লোক ১৫৫

দামোদর কহে,—কৃষ্ণ রসিকশেখর ।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ-দামোদর বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। তিনি রস আস্বাদক এবং তাঁর কলেবর রসময়।

শ্লোক ১৫৬

প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন ।
শুদ্ধপ্রেমে, রসগুণে, গোপিকা—প্রবীণ ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের বপু প্রেমময় এবং তিনি ভক্তের প্রেমের অধীন। গোপিকারা শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম এবং ভক্তির রস সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ।

শ্লোক ১৫৭

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপিকাদের প্রেমে কোন রকম রসাভাস বা দোষ নেই; তাই তা শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তুষ্টি বিধান করে।

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ককে বলা হয় রস, এবং আভাস মানে প্রতিবিম্ব। রসাভাস তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ; অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরস। এক প্রকার রস আস্বাদনের সময় অন্য কোন রসের আরোপ হলে তাকে বলা হয় উপরস। মুখ্য রস থেকে অন্য কোন রসের উদ্ভব হলে তাকে বলা হয় অনুরস। মুখ্য রস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন কিছুর আস্বাদন হলে তাকে বলা হয় অপরস। উপরস, অনুরস এবং অপরস যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ রসাভাস। সে সম্বন্ধে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (৪/৯/১-২) গ্রন্থে বলা হয়েছে—

পূর্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা ।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্তিতাঃ ॥
স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে ।
উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ ॥

শ্লোক ১৫৮

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **শশাঙ্কাংশু**—চন্দ্র কিরণের দ্বারা; **বিরাজিতাঃ**—সুন্দরভাবে বিরাজমান; **নিশাঃ**—রাত্রি সকল; **সঃ**—তিনি; **সত্যকামঃ**—নিত্য সত্য-সংকল্প শ্রীকৃষ্ণ; **অনুরত**—যার প্রতি আকৃষ্ট; **অবলাগণঃ**—স্ত্রীগণ; **সিষেব**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **আত্মনি**—তিনি স্বয়ং; **অবরুদ্ধ-সৌরতঃ**—অপ্রাকৃত কামদেব; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **শরৎ**—শরৎকালে; **কাব্য**—কাব্য; **কথা**—বর্ণনা; **রসাশ্রয়াঃ**—সব রকম অপ্রাকৃত রসে পূর্ণ।

অনুবাদ

" 'নিত্য সত্যসংকল্প শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালে প্রতি নিশায় রাসনৃত্যবিলাস করেছিলেন। পূর্ণ চিন্ময় রসে, চন্দ্রালোকিত রাত্রে, তিনি সেই নৃত্য-বিলাস করেছিলেন। তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট অবলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, তিনি কাব্যকথা বর্ণনা করেছিলেন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৩/২৫) থেকে উদ্ধৃত। ব্রজগোপিকারা সকলেই শুদ্ধ চিন্ময়ী। কখনই মনে করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজগোপিকাদের দেহ জড়। শ্রীবৃন্দাবন—শুদ্ধ চিন্ময় ধাম, এবং সেখানকার দিন ও রাত্রি, বৃক্ষ-লতা, পুষ্প, জল এবং সবকিছুই চিন্ময়। জড়-কলুষের লেশ মাত্র নেই। পরমব্রহ্ম পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণ কোন জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লীলাবিলাস সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তা চিৎ-জগতে সম্পাদিত হয়। এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীকৃষ্ণের কাম এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত লীলা চিন্ময় স্তরে সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের লীলা আস্বাদন করার কথা বিবেচনা পর্যন্ত করতে হলেও চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। যারা জড় স্তরে রয়েছে, তাদের সর্বপ্রথমে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার মাধ্যমে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাহলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজগোপিকাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কের কথা আলোচনা করছেন; তাই এই বিষয় বস্তুটি জড়-জাগতিক নয় অথবা জড়-কাম নয়। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আচরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাস চিন্ময় না হলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই স্বরূপ-দামোদরের কাছে সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন না। অতএব এই আলোচনা অবশ্যই জড়-জাগতিক ক্রীড়া-কলাপের আলোচনা নয়।

শ্লোক ১৫৯

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপীগণ দুই প্রকার—'বামা' ও 'দক্ষিণা'। তাঁরা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে রস আস্বাদন করান।

শ্লোক ১৬০

গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী ।
নির্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রেষ্ঠা। তিনি নির্মল, উজ্জ্বল রসের আধার এবং প্রেমরূপ রত্নের আকর।

শ্লোক ১৬১

বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা' ।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী বয়সে—'মধ্যমা', স্বভাবে—'সমা' এবং নিরন্তর 'বামা'।

তাৎপর্য

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী 'বামা' এবং 'দক্ষিণা' গোপিকাদের বর্ণনা করেছেন। 'বামা' গোপিকাদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনাঃ ।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্যতে ॥

"যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্বদা উদ্‌যোগবিশিষ্টা ও মান শৈথিল্যে কোপ-বিশিষ্টা, নায়কের বশ্য নন ও তাঁর প্রতি কঠিনা, তিনি 'বামা' নামে কথিতা।"

'দক্ষিণা' গোপিকাদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অসহা মান নির্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী ।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্তিতা ॥

"যে নায়িকা মান গ্রহণে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য-প্রয়োগকারিণী, নায়কের সোল্লুণ্ঠবাক্যে প্রসন্না, তিনি 'দক্ষিণা' নামে কথিতা।"

শ্লোক ১৬২

বাম্য-স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর ।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর বাম্য-স্বভাব থেকেই মানের উদয় হয়; এবং তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১৬৩

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১৬৩ ॥

অহেঃ—সর্পের; ইব—মতো; গতিঃ—গতি; প্রেম্ণঃ—প্রেমের; স্বভাব—প্রকৃতিগত ভাবে; কুটিলা—কুটিল; ভবেৎ—হয়; অতঃ—সুতরাং; হেতোঃ—কারণবশতঃ; অহেতোঃ—অকারণেও; চ—এবং; যূনোঃ—যুবক-যুবতীর; মানঃ—অভিমান; উদঞ্চতি—উদয় হয়।

অনুবাদ

"সর্পের মতোই প্রেমের স্বভাব—কুটিল গতি। সেইজন্য, যুবক-যুবতীর মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুই প্রকার মানের উদয় হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *উজ্জ্বল-নীলমণি* (শৃঙ্গার ভেদ প্রকরণ-১০২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬৪

এত শুনি' বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর ।
'কহ, কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সে কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরের আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হল। তাই তিনি স্বরূপ-দামোদরকে বললেন, "বল! বল"। স্বরূপ-দামোদর তখন বর্ণনা করে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ১৬৫

'অধিরূঢ় মহাভাব'—রাধিকার প্রেম ।
বিশুদ্ধ, নির্মল, যৈছে দশবাণ হেম ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম 'অধিরূঢ় মহাভাব'। তাঁর প্রেম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং নির্মল—তা স্বর্ণ থেকেও দশ গুণ বিশুদ্ধ ও নির্মল।

শ্লোক ১৬৬

কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে ।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী যখন আচম্বিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রীঅঙ্গ নানা প্রকার ভাবরূপ ও ভূষণে বিভূষিত হয়।

শ্লোক ১৬৭

অষ্ট 'সাত্ত্বিক', হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' যাঁর ।
'সহজ প্রেম', বিংশতি 'ভাব'-অলঙ্কার ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের অপ্রাকৃত অলঙ্কার হচ্ছে—আটটি 'সাত্ত্বিক' ভাব, হর্ষ আদি তেত্রিশটি 'ব্যভিচারী' ভাব, যা তাঁর স্বাভাবিক প্রেম; এবং কুড়িটি 'ভাব' রূপ অলঙ্কার।

তাৎপর্য

সাত্ত্বিক বিকার আট প্রকার—১) স্তম্ভ, ২) স্বেদ, ৩) রোমাঞ্চ, ৪) স্বরভঙ্গ, ৫) বেপথু, ৬) বৈবর্ণ্য, ৭) অশ্রু এবং ৮) প্রলয়।

তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব—১) নির্বেদ, ২) বিষাদ, ৩) দৈন্য, ৪) গ্লানি, ৫) শ্রম, ৬) মদ, ৭) গর্ব, ৮) শঙ্কা, ৯) ত্রাস, ১০) আবেগ, ১১) উন্মাদ, ১২) অপস্মার, ১৩) ব্যাধি, ১৪) মোহ, ১৫) মৃতি, ১৬) আলস্য, ১৭) জাড্য, ১৮) ব্রীড়া, ১৯) অবহিত্থা, ২০) স্মৃতি, ২১) বিতর্ক, ২২) চিন্তা, ২৩) মতি, ২৪) ধৃতি, ২৫) হর্ষ, ২৬) ঔৎসুক্য, ২৭) ঔগ্র্য, ২৮) অমর্ষ, ২৯) অসূয়া, ৩০) চাপল্য, ৩১) নিদ্রা, ৩২) সুপ্তি, এবং ৩৩) প্রবোধ।

কুড়িটি ভাব রূপ অলঙ্কার—ক) অঙ্গজ—১) ভাব, ২) হাব, ৩) হেলা, খ) অযত্নজ—৪) শোভা, ৫) কান্তি, ৬) দীপ্তি, ৭) মাধুর্য, ৮) প্রগল্‌ভতা, ৯) ঔদার্য, ১০) ধৈর্য, গ) স্বভাবজ—১১) লীলা, ১২) বিলাস, ১৩) বিচ্ছিত্তি, ১৪) বিভ্রম, ১৫) কিলকিঞ্চিত, ১৬) মোট্টায়িত, ১৭) কুট্টমিত, ১৮) বিব্বোক, ১৯) ললিত ও ২০) বিকৃত।

শ্লোক ১৬৮

'কিলকিঞ্চিত', 'কুট্টমিত', 'বিলাস', 'ললিত' ।
'বিব্বোক', 'মোট্টায়িত', আর 'মৌগ্ধ্য', 'চকিত' ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পরবর্তী শ্লোকগুলিতে কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত, বিব্বোক, মোট্টায়িত, মৌগ্ধ্য এবং চকিত, ভাবসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬৯

এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণসুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত ভাব-রূপ ভূষণে যখন শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ ভূষিত হয়, তখন তা দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমুদ্রের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়।

শ্লোক ১৭০

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ ।
যে ভাব-ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"কিলকিঞ্চিত আদি যে সমস্ত ভূষায় শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তহরণ করেন, তাঁর বিবরণ শ্রবণ কর।

শ্লোক ১৭১

রাধা দেখি' কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন ।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জেন গমন ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি যমুনা পার হবার দান-ঘাটি পথে তাঁর পথ অবরোধ করেন।

শ্লোক ১৭২

যবে আসি' মানা করে পুষ্প উঠাইতে ।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীকে ফুল তুলতে নিষেধ করেন, এবং সেই সময়ে সখীদের সামনেই তাঁর গায়ে হাত দিতে চান।

শ্লোক ১৭৩

এইসব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত' উদ্গম ।
প্রথমে 'হর্ষ' সঞ্চারী—মূল কারণ ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের উদ্গম হয়। প্রথমে 'হর্ষ' পূর্ণ সঞ্চারী ভাব তাঁর মূল কারণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী যখন বাড়ির বাইরে যান, তখন তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় সজ্জায় সজ্জিত হন। এটি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করার জন্য তাঁর স্ত্রীসুলভ স্বভাব এবং তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে ইচ্ছা করেন। তখন কোন আছিলায় দানঘাটি যাবার পথে, অথবা পুষ্প কাননে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাধা দেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর লীলা বিলাস করেন। শ্রীমতী রাধারাণী গোপবালিকা, তাই তিনি কলসীতে দুধ নিয়ে যমুনার অপর পারে তা বিক্রি করতে যান। নদী পার হতে হলে শুল্ক দিতে হয় এবং যেখানে মাঝি শুল্ক সংগ্রহ করে, সেই স্থানটিকে বলা হয় 'দানঘাটি'। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বাধা দিয়ে বলেন, "যে পর্যন্ত তুমি শুল্ক না দেবে, সে পর্যন্ত তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।" এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তাকে বলা হয় 'দানকেলী-লীলা'। তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী যখন পুষ্প চয়ন করতে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পবনের অধিকারী হয়ে 'তুমি আমার ফুল চুরি করছ' বলে তাঁকে বাধা দেন। এইসব স্থলে এই সময়ে শ্রীমতী রাধারাণীর 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের উদ্গম হয়। এই সমস্ত ভাবের লক্ষণগুলি শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচিত *উজ্জ্বল-নীলমণি* (অনুভাব প্রকরণ ৩৯) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৭৪

গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্ ।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ১৭৪ ॥

গর্ব—গর্ব; অভিলাষ—আকাঙ্ক্ষা; রুদিত—রোদন; স্মিত—মিতহাস্য; অসূয়া—ঈর্ষা; ভয়—ভয়; ক্রুধাম্—ক্রোধ; সঙ্করীকরণম্—মিশ্রণ করা; হর্ষাদ্—হর্ষসহ; উচ্যতে—বলা হয়; কিলকিঞ্চিতম্—কিলকিঞ্চিত ভাব।

অনুবাদ

" 'গর্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাবের, হর্ষ সহ সঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রণ করাকে 'কিলকিঞ্চিত' ভাব বলে।'

শ্লোক ১৭৫

আর সাত ভাব আসি' সহজে মিলয় ।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মূল কারণ হর্ষের সঙ্গে গর্ব আদি সাতটি ভাব মিলিত হয়ে ঐ অষ্টভাব সম্মিলনে 'কিলকিঞ্চিত'—মহাভাব হয়।

শ্লোক ১৭৬

গর্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করুদিত ।
ক্রোধ, অসূয়া হয়, আর মন্দস্মিত ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাভাবের সাতটি উপাদান—গর্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক রোদন, ক্রোধ, অসূয়া এবং স্মিত হাস্য।

শ্লোক ১৭৭

নানা-স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন ।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্ময় স্তরে আট প্রকার ভাব রয়েছে এবং সেগুলি যখন একত্রে মিলিত হয়, তখন তা আস্বাদন করে শ্রীকৃষ্ণের মন সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়।

শ্লোক ১৭৮

দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরীচ, কর্পূর ।
এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"দধি, মিছরি, ঘি, মধু, মরীচ, কর্পূর এবং এলাচির মিলনে যে অপূর্ব মধুর স্বাদের উদয় হয়, এমনই এই আটটি ভাবের মিশ্রণও অত্যন্ত মধুর।

শ্লোক ১৭৯

এই ভাব-যুক্ত দেখি' রাধাস্য-নয়ন ।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি-গুণ ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত ভাবযুক্ত রাধারাণীর মুখ ও নয়ন দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করার থেকেও কোটি গুণ সুখ পায়।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বল-নীলমণি* (অনুভাব-প্রকরণ, ৪১) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে এই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮০

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী ।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ১৮০ ॥

অন্তঃ—অন্তরের অথবা অব্যক্ত; স্মেরতয়া উজ্জ্বল—ঈষৎ হাস্যের দ্বারা উজ্জ্বল; জল-কণ—জলের কণা; ব্যাকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; পক্ষ্ম-অঙ্কুরা—চক্ষুর পক্ষ্ম থেকে; কিঞ্চিৎ—অতি অল্প; পাটলিত-অঞ্চলা—শ্বেত-রক্তাভ নয়ন প্রান্তদেশ; রসিকতোৎসিক্তা—শ্রীকৃষ্ণের চতুর ব্যবহারের দ্বারা সিক্ত হল, অর্থাৎ গর্ব, অভিলাষ আদি ভাবের উদয় হল; পুরঃ—সম্মুখে; কুঞ্চতী—কুঞ্চিত হল; রুদ্ধায়াঃ—বাধাপ্রাপ্ত হয়ে; পথি—পথে; মাধবেন—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; মধুর—মধুর; ব্যাভুগ্ন—বক্র; তারোত্তরা—চক্ষুদ্বয়; রাধায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর; কিল-কিঞ্চিত—কিলকিঞ্চিত নামক ভাব; স্তবকিনী—পুষ্পস্তবকের মতো; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টিপাত; শ্রিয়ম্—সৌভাগ্য; বঃ—আপনাদের সকলের; ক্রিয়াৎ—সম্পাদন করুক।

অনুবাদ

" 'শ্রীমতী রাধিকার গর্ব আদি সপ্তভাব মিলিত হর্ষজনিত কিলকিঞ্চিতভাব থেকে উত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক! দান-ঘাটি পথে শ্রীকৃষ্ণ এসে তাঁর গতিরোধ করলে, শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তঃকরণে হাসির উদয় হল; তখন তাঁর নয়ন উজ্জ্বল হল; নেত্র পক্ষ্মগুলি নবোদ্গত অশ্রুজলে পূর্ণ হল; অপাঙ্গ দুটি ঈষৎ রক্তবর্ণ হল; রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদিত হল; নয়নাশ্রু স্বল্প নিমীলিত হতে লাগল এবং অতি সুন্দরভাবে নয়ন তারা দুটি ঊর্ধ্বগতি লাভ করল।'

শ্লোক ১৮১

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্ ।
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ১৮১ ॥

বাষ্প—অশ্রুজলে; ব্যাকুলিত—ব্যাকুল; অরুণাঞ্চল—রক্তিম অঞ্চল; চলন্—চঞ্চল; নেত্রম্—নেত্র; রসোল্লাসিতম্—চিন্ময় রসের দ্বারা উৎফুল্ল; হেলোল্লাস—ভাবের আতিশয্যে; চলাধরম্—কম্পমান ওষ্ঠ-অধর; কুটিলিত—কুঞ্চিত; ভ্রূযুগ্ম—ভ্রূ-যুগল; উদ্যৎ—উদয় হল; স্মিতম্—স্মিত হাস্য; রাধায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর; কিলকিঞ্চিত—কিলকিঞ্চিত ভাব; অঞ্চিতম্—অভিব্যক্তি; অসৌ—সে (কৃষ্ণ); বীক্ষ্য—দর্শন করে; আননম্—মুখ; সঙ্গমাৎ—সঙ্গম থেকেও; আনন্দম্—আনন্দ; তম্—সেই; অবাপ—প্রাপ্ত; কোটিগুণিতম্—কোটি গুণ; যঃ—যা; অভূৎ—হয়েছিল; ন—না; গীর্গোচরঃ—বাক্যের দ্বারা বর্ণনা।

অনুবাদ

" 'রাধিকার নেত্র বাষ্পদ্বারা আকুল, তাঁর অরুণবরণ অঞ্চল চঞ্চল হল; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাব হেতু অধর কম্পিত হল; ভ্রূযুগল কুটিল হল; মুখপদ্ম ঈষৎ হাস্যে বিকশিত হল এবং কিলকিঞ্চিত-ভাব জনিত সুখ ব্যক্ত হতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখ দর্শনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম অপেক্ষা কোটিগুণ যে সুখ লাভ করলেন, তা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না।" '

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* (৯/১৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৮২

এত শুনি' প্রভু হৈলা আনন্দিত মন ।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মুখে এই বর্ণনা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সুখাবিষ্ট হয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ১৮৩

'বিলাসাদি'-ভাব-ভূষার কহ ত' লক্ষণ ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন? ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিলাস আদি যে সমস্ত ভাব শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গ অলঙ্কৃত করে এবং যার দ্বারা তিনি গোবিন্দের মন হরণ করেন, তার লক্ষণ তুমি মুখে বল।"

শ্লোক ১৮৪

তবে ত' স্বরূপ-গোসাঞি কহিতে লাগিলা ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর এই অনুরোধে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বর্ণনা করতে লাগলেন; এবং তা শুনে সমস্ত ভক্তরা মহাসুখ পেলেন।

শ্লোক ১৮৫-১৮৬

রাধা বসি' আছে, কিবা বৃন্দাবনে যায় ।
তাহাঁ যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ-দরশন পায় ॥ ১৮৫ ॥

দেখিতে নানা-ভাব হয় বিলক্ষণ ।
সে বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'-ভূষণ ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বসে থেকে অথবা বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় শ্রীমতী রাধারাণী যদি আচম্বিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান, তখন তাকে দেখে নানাপ্রকার ভাবের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেই বিশেষ লক্ষণের নাম 'বিলাস'-ভূষণ।

তাৎপর্য

উজ্জ্বল-নীলমণির (অনুভাব প্রকরণ, ৩৯) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮৭

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাম্ ।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ১৮৭ ॥

গতি—গমনশীল; স্থান—দণ্ডায়মান; আসনাদীনাম্—উপবেশন আদি; মুখ—মুখের; নেত্র—নেত্রের; আদি—ইত্যাদি; কর্মণাম্—কার্যকলাপের; তাৎকালিকম্—তাৎকালিক; তু—তখন; বৈশিষ্ট্যম্—বিভিন্ন লক্ষণ; বিলাসঃ—বিলাস নামক; প্রিয়-সঙ্গজম্—প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের ফলে।

অনুবাদ

" 'প্রিয়সঙ্গ থেকে উৎপন্ন, প্রিয়সঙ্গম-স্থানে গমন ও অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখ-নেত্র আদি অঙ্গের সেই সময় যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয়, তাকে 'বিলাস' বলে।' "

শ্লোক ১৮৮

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয় ।
এত ভাব মিলি' রাধায় চঞ্চল করয় ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর বললেন, "লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য এবং ভয়, এই সমস্ত ভাব একত্রে মিলিত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণীকে চঞ্চল করে।

তাৎপর্য

গোবিন্দ-লীলামৃত (৯/১১) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮৯

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি ।

চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ১৮৯ ॥

পুরঃ—তাঁর সম্মুখে; কৃষ্ণালোকাৎ—শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে; স্থগিত-কুটিলা—স্থির হয়ে কুটিলভাব ধারণ করলেন; অস্যা—শ্রীমতী রাধারাণীর; গতিঃ—গতি; অভূৎ—হয়েছিল; তিরশ্চীনম্—বক্রীভূত; কৃষ্ণাম্বর—শ্যামবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা; দরবৃতম্—আবৃত; শ্রীমুখমপি—তাঁর মুখ মণ্ডলও; চলত্তারম্—গতিশীল তারকার মতো; স্ফারম্—বিস্তৃত; নয়নযুগম্—নয়ন যুগল; আভুগ্নম্—অতি বক্র; ইতি—এইভাবে; সা—ইনি (শ্রীমতী রাধারাণী); বিলাসাখ্য—বিলাস নামক; স্বালঙ্করণ—নিজের অলঙ্কারের দ্বারা; বলিত—অলঙ্কৃত; আসীৎ—ছিল; প্রিয়-মুদে—শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধনের জন্য।

অনুবাদ

" 'শ্রীমতী রাধারাণী যখন শ্রীকৃষ্ণকে তার সম্মুখে দর্শন করলেন, তখন তাঁর গতি স্তব্ধ হল এবং তিনি কুটিলভাব ধারণ করলেন। যদিও তাঁর বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প আচ্ছাদিত ছিল, তবুও তার তারকাসদৃশ নয়নযুগল বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হল, এবং বিলাস রূপ অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণসুখ উৎপাদন করতে লাগলেন।'

শ্লোক ১৯০

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাঞা ।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাঞা ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী যখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়ান, তখন তাঁর গ্রীবা, কটি এবং চরণ (বা জানু) এই তিনটি অঙ্গ ভঙ্গ হয় এবং তাঁর ভ্রূ-যুগল নাচতে থাকে।

শ্লোক ১৯১

মুখে-নেত্রে হয় নানা-ভাবের উদ্গার ।
এই কান্তা-ভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে এবং নয়নযুগলে নানা ভাবের উদয় হয়। এই কান্তাভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার।

শ্লোক ১৯২

বিন্যাস-ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা ।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥ ১৯২ ॥

বিন্যাস—বিন্যাস; ভঙ্গিঃ—ভঙ্গি; অঙ্গানাম্—অঙ্গসমূহের; ভ্রূ-বিলাস—ভ্রূভঙ্গি; মনোহরা—অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর; সুকুমারা—অতি কোমল; ভবেৎ—হতে পারে; যত্র—যেখানে; ললিতম্—ললিত; তৎ—তা; উদাহৃতম্—বলা হয়।

অনুবাদ

"যখন অঙ্গের বিন্যাস ভঙ্গি ও ভ্রূ-বিলাস মনোহর ও সুকুমার হয়, তাকে 'ললিত অলঙ্কার' বলা হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *উজ্জ্বল-নীলমণি* (অনুভাব-প্রকরণ, ৫১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯৩

ললিত-ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ ।
দুঁহে দুঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন ললিত অলঙ্কারে ভূষিত শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করেন, তখন তারা দুজনেই পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সতৃষ্ণ হন।

শ্লোক ১৯৪

হ্রিয়া তির্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গী-সুমধুরা
চলচ্চিল্লী-বল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জিত-ধনুঃ ।
প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১৯৪ ॥

হ্রিয়া—তাঁর লজ্জার দ্বারা; তির্যক—তির্যক; গ্রীবা—গ্রীবা; চরণ—চরণ; কটি—কটিদেশ; ভঙ্গী—ভগ্ন; সুমধুরা—অত্যন্ত মধুর; চলচ্চিল্লী—চঞ্চল ভ্রূ-যুগলের; বল্লী—লতা সমূহের দ্বারা; দলিত—বিজিত; রতিনাথ—কামদেবের; উর্জিত—শক্তিশালী; ধনুঃ—ধনু; প্রিয়-প্রেমোল্লাস—প্রিয়তমের প্রেমোল্লাস জনিত; উল্লসিত—উল্লসিত; ললিত—ললিত নামক ভাবের দ্বারা; আলালিত তনুঃ—যার দেহ আচ্ছাদিত হয়েছে; প্রিয়প্রীত্যৈ—প্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য; সা—শ্রীমতী রাধারাণী; আসীৎ—ছিল; উদিত—উদিত; ললিতালঙ্কৃতি-যুতা—ললিত-অলঙ্কার সমন্বিত।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্ধন করার জন্য রাধিকা যখন ললিত অলঙ্কারে ভূষিতা হয়েছিলেন, তখন লজ্জায় তাঁর গ্রীবার বক্রভাব, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গি ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনুরও পরাজয় হয় এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাসে উল্লসিত ললিতভাবে তাঁর শ্রীঅঙ্গ পুষ্ট হয়।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গোবিন্দ-লীলামৃত* (৯/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯৫

লোভে আসি' কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ ।
অন্তরে উল্লাস, রাধা করে নিবারণ ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যখন লোভাতুর হয়ে শ্রীমতী রাধারাণীর বসনাঞ্চল আকর্ষণ করেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণী অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু বাইরে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করার চেষ্টা করেন।

শ্লোক ১৯৬

বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মনে ।
'কুট্টমিত'-নাম এই ভাব-বিভূষণে ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর এইভাব-বিভূষণের নাম 'কুট্টমিত'। যখন এই ভাবের উদয় হয়, তখন তিনি বাইরে বামতা এবং ক্রোধ প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

শ্লোক ১৯৭

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ১৯৭ ॥

স্তন—বক্ষ; অধর—অধর; আদি—ইত্যাদি; গ্রহণে—স্পর্শে; হৃৎপ্রীতৌ—অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলেও; অপি—তথাপি; সম্ভ্রমাৎ—সম্ভ্রমবশতঃ; বহিঃ—বাইরে; ক্রোধঃ—ক্রোধ; ব্যথিতবৎ—ব্যথিতবৎ; প্রোক্তম্—বলা হয়; কুট্টমিতম্—কুট্টমিত; বুধৈঃ—শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা।

অনুবাদ

"কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র ধারণ সময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হলেও সম্ভ্রম ক্রমে বাইরের ব্যথিতের মতো ক্রোধ লক্ষণকে 'কুট্টমিত' বলে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *উজ্জ্বল নীলমণি* (অনুভাব-প্রকরণ, ৪৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯৮

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণি-রোধ ।
অন্তরে আনন্দ রাধা, বাহিরে বাম্য-ক্রোধ ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও শ্রীমতী রাধারাণী হাত দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু অন্তরে তিনি ভাবেন, 'শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হোক।' এইভাবে অন্তরে আনন্দিত হলেও শ্রীমতী রাধারাণী বাইরে বাম্য ক্রোধ প্রকাশ করেন।

শ্লোক ১৯৯

ব্যথা পাঞা' করে যেন শুষ্ক রোদন ।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী বাইরে শুষ্করোদন করেন, যেন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তারপর ঈষৎ হেসে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন।

শ্লোক ২০০

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥ ২০০ ॥

পাণি—হস্ত; রোধম্—বাধা দিয়ে; অবিরোধিত—বাধা না দিয়ে; বাঞ্ছম্—শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা; ভর্ৎসনাঃ—ভর্ৎসনা; চ—এবং; মধুর—মধুর; স্মিতগর্ভাঃ—মন্দ হাস্যমুখে; মাধবস্য—শ্রীকৃষ্ণের; কুরুতে—করেন; করভোরু—যার উরু যুগল হস্তি-শাবকের শুঁড়ের মতো; হারি—মনোহর; শুষ্ক-রুদিতম্—কপট রোদন; চ—এবং; মুখে—মুখে; অপি—ও।

অনুবাদ

" 'শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর হস্ত দ্বারা তাঁর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে চান, তখন তাঁকে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও করভোরু শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁকে বাধা দিয়ে মধুর স্মিত হাস্যে ভর্ৎসনা করলেন এবং ক্রন্দন করার ভান করলেন।'

শ্লোক ২০১

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে, শ্রীমতী রাধারাণী ভাব রূপ অলঙ্কারে বিভূষিত হন যার দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন।

শ্লোক ২০২

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ।
আপনে বর্ণেন যদি 'সহস্রবদন' ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণের অন্তহীন লীলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এমন কি অনন্তদেব তাঁর অনন্ত বদনে অনন্তকাল ধরে বর্ণনা করেও তা শেষ করতে পারেন না।"

শ্লোক ২০৩

শ্রীবাস হাসিয়া কহে,—শুন, দামোদর ।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শ্রীবাস ঠাকুর হেসে স্বরূপ দামোদরকে বললেন, "দামোদর! দেখ আমার লক্ষ্মীদেবীর কি অসীম বৈভব!

শ্লোক ২০৪

বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প-কিসলয় ।
গিরিধাতু-শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাফল-ময় ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের সম্পদ তো কেবল ফুল, কিশলয়, গিরিধাতু, শিখিপিচ্ছ, আর গুঞ্জা ফল।"

শ্লোক ২০৫

বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ।
শুনি' লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীজগন্নাথদেব যখন বৃন্দাবন দর্শন করতে গেলেন, তখন সেই সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মীদেবী অস্বস্তি এবং চাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ২০৬

এত সম্পত্তি ছাড়ি, কেনে গেলা বৃন্দাবন ।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, 'এত সম্পদ ছেড়ে শ্রীজগন্নাথদেব কেন বৃন্দাবনে গেলেন?' তাঁকে উপহাস করার জন্য লক্ষ্মীদেবী নানা প্রকার সাজ-সজ্জার আয়োজন করলেন।

শ্লোক ২০৭-২০৮

"তোমার ঠাকুর, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি' ।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ২০৭ ॥

এই কর্ম করে কাহাঁ বিদগ্ধ-শিরোমণি?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥" ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মীদেবীর দাসীরা জগন্নাথের সেবকদের বললেন, 'দেখ, লক্ষ্মীদেবীর এত ধন-সম্পদ ছেড়ে কেন তোমাদের ঠাকুর পত্র, ফল এবং ফুলের লোভে পুষ্পবাড়ীতে গেলেন? সর্ববিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন এরকম কাজ করলেন? এক্ষুণি তোমাদের প্রভুকে লক্ষ্মীদেবীর সামনে এনে দাও।'

শ্লোক ২০৯-২১০

এত বলি' মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণে ।
কটিবস্ত্রে-বান্ধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥ ২০৯ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি ।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বলে মহালক্ষ্মীর সমস্ত দাসীরা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদের কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে লক্ষ্মীদেবীর সামনে নিয়ে এলেন, এবং লক্ষ্মীদেবীর শ্রীপাদপদ্মে তাদের প্রণাম করিয়ে, ধন-দণ্ডদান করিয়ে মিনতি করালেন।

শ্লোক ২১১

রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।
চোর-প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মীদেবীর দাসীরা লাঠি দিয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের রথকে প্রহার করতে লাগলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদের চোরের মতো তিরস্কার করতে লাগলেন।

শ্লোক ২১২

সব ভৃত্যগণ কহে,—যোড় করি' হাত ।
'কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ' ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন জগন্নাথদেবের সেবকেরা হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—'কাল আমরা আপনার সামনে শ্রীজগন্নাথদেবকে এনে দেব।'

শ্লোক ২১৩

তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর ।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য অগোচর ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন শান্ত হয়ে লক্ষ্মীদেবী তার ঘরে ফিরে গেলেন। দেখ! আমার লক্ষ্মীদেবীর সম্পদ বাক্যের অগোচর।

শ্লোক ২১৪

দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে ।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার গোপীরা দুধ জ্বাল দেয় আর দধি মন্থন করে, কিন্তু আমার ঠাকুরাণী লক্ষ্মীদেবী রত্ন সিংহাসনে বসেন।"

শ্লোক ২১৫

নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

নারদমুনির ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীবাস ঠাকুর এইভাবে পরিহাস করতে লাগলেন। আর তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদেরা হাসতে লাগলেন।

শ্লোক ২১৬

প্রভু কহে,—শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব ।
ঐশ্বর্যভাবে তোমাতে, ঈশ্বর-প্রভাব ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে বললেন, "শ্রীবাস, তোমার স্বভাব ঠিক নারদমুনির মতো। পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যভাবের দ্বারা তুমি প্রভাবিত।

শ্লোক ২১৭

ইঁহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধ-ব্রজবাসী ।
ঐশ্বর্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি' ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আর এই স্বরূপ দামোদর হচ্ছেন শুদ্ধ ব্রজবাসী। শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন থাকায়, ঐশ্বর্য যে কী বস্তু তা তিনি জানেন না।"

শ্লোক ২১৮

স্বরূপ কহে,—শ্রীবাস, শুন সাবধানে ।
বৃন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে? ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর তখন বললেন, "শ্রীবাস, সাবধানে শোন, বৃন্দাবনের সম্পদের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

শ্লোক ২১৯

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু ।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের স্বাভাবিক সম্পদ সমুদ্রের মতো অন্তহীন; আর দ্বারকা এবং বৈকুণ্ঠের সম্পদ তার একবিন্দু মাত্র।

শ্লোক ২২০

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী, তাহাঁ বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান, এবং বৃন্দাবনে তাঁর ঐশ্বর্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ২২১

চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণ-ভূষণ ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবন ধামের ভূমি চিন্তামণি, বৃন্দাবনের গৃহগুলি চিন্তামণি দিয়ে রচিত, এবং শ্রীকৃষ্ণের দাসীদের চরণের ভূষণ চিন্তামণির।

শ্লোক ২২২

কল্পবৃক্ষ-লতার—যাহাঁ সাহজিক-বন ।
পুষ্প-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের বনের বৃক্ষ সমূহ কল্পবৃক্ষ, কিন্তু বৃন্দাবনবাসীরা তাদের কাছ থেকে ফল ফুল ছাড়া আর কিছু চান না।

শ্লোক ২২৩

অনন্ত কামধেনু তাহাঁ ফিরে বনে বনে ।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্তহীন কামধেনু বৃন্দাবনের বনে বনে চারণ করে, কিন্তু ব্রজবাসীরা তাদের কাছ থেকে দুধ ছাড়া আর অন্য কোন সম্পদ চান না।

শ্লোক ২২৪

সহজ লোকের কথা—যাহাঁ দিব্য-গীত ।
সহজ গমন করে,—যৈছে নৃত্য-প্রতীত ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের লোকেদের স্বাভাবিক কথা দিব্য সঙ্গীতের মতো; আর তাঁদের স্বাভাবিক গতি নৃত্যের মতো।

শ্লোক ২২৫

সর্বত্র জল—যাহাঁ অমৃত-সমান ।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য—যাহাঁ মূর্তিমান্ ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃন্দাবনের জল অমৃত, চিদানন্দময় জ্যোতি সেখানকার আলোক, এবং সেখানে তা মূর্তিমান হয়ে প্রকাশিত।

শ্লোক ২২৬

লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখী-কায ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"সেখানকার গোপিকারা হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী, এবং তাঁদের গুণাবলী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর থেকে অনেক অনেক গুণে শ্রেয়; আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বংশীবাদন করেন, যা হচ্ছে তাঁর প্রিয়সখী।

শ্লোক ২২৭

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ২২৭ ॥

শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবী; কান্তাঃ—যুবতী রমণীগণ; কান্তঃ—ভোক্তা; পরমপুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান; কল্পতরবঃ—কল্পবৃক্ষ সমূহ; দ্রুমা—সমস্ত বৃক্ষ; ভূমিঃ—ভূমি; চিন্তামণি-গণময়ী—চিন্তামণির দ্বারা রচিত; তোয়ম্—জল; অমৃতম্—অমৃত; কথা—কথা; গানম্—গান; নাট্যম্—নৃত্য; গমনম্—গমন; অপি—ও; বংশী—বংশী; প্রিয়সখী—নিত্য সহচরী; চিদানন্দম্—চিন্ময় আনন্দ; জ্যোতিঃ—জ্যোতি; পরম্—পরম; অপি—ও; তৎ—তা; আস্বাদ্যম্—আস্বাদন করা যায়; অপি চ—ও।

অনুবাদ

" 'ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। বৃন্দাবনের ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেখানকার তরুরাজি কল্পবৃক্ষ এবং ভূমি চিন্তামণির দ্বারা রচিত। সেখানকার জল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নৃত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশী—প্রিয়সখী। সেই স্থান চিদানন্দ জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। তাই বৃন্দাবন ধামই কেবল একমাত্র আস্বাদ্য।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৫৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২২৮

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্ ।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥ ২২৮ ॥

চিন্তামণিঃ—চিন্তামণি; চরণ—শ্রীপাদপদ্মের; ভূষণম্—অলঙ্কার; অঙ্গনানাম্—ব্রজাঙ্গনাদের; শৃঙ্গার—শৃঙ্গার; পুষ্পতরবঃ—পুষ্প বৃক্ষরাজি; তরবঃ—তরুরাজি; সুরাণাম্—দেবতাদের (কল্পবৃক্ষ); বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনে; ব্রজধনম্—ব্রজবাসীদের বিশেষ সম্পদ; ননু—অবশ্যই; কামধেনু—কামধেনু; বৃন্দানি—যূথ সমূহ; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; সুখসিন্ধুঃ—আনন্দের সমুদ্র; অহো—আহা; বিভূতিঃ—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

" 'ব্রজগোপিকাদের চরণের ভূষণ—চিন্তামণি। সেখানকার বৃক্ষরাজি কল্পবৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের ফুল দিয়ে ব্রজগোপিকারা শৃঙ্গার করে। বৃন্দাবনের গাভীগুলি কামধেনু এবং এই গাভীগুলি বৃন্দাবনের প্রকৃত সম্পদ। বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য আনন্দের সমুদ্রের মতো।" '

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচিত।

শ্লোক ২২৯

শুনি' প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শুনে শ্রীবাস ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং কক্ষতালি দিয়ে অট্টহাস্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩০

রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল ।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারাণীর শুদ্ধ চিন্ময়-রসের বর্ণনা শুনলেন এবং সেই রসের আবেশে নৃত্য করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৩১

রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান ।
'বল' 'বল' বলি' প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করছিলেন, তখন স্বরূপ দামোদর প্রভু গান গাইতে শুরু করলেন। সেই গান শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কান পেতে বলতে লাগলেন 'বল' 'বল'।

শ্লোক ২৩২

ব্রজরস-গীত শুনি' প্রেম উথলিল ।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজরস বর্ণনাকারী গীত শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম উদ্বেলিত হল। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের বন্যায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে ভাসালেন।

শ্লোক ২৩৩

লক্ষ্মী-দেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর ।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল তৃতীয় প্রহর ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবী যখন তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন, তখন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচতে শুরু করেছিলেন এবং নাচতে নাচতে তৃতীয় প্রহর হল।

শ্লোক ২৩৪

চারি সম্প্রদায় গান করি' বহু শ্রান্ত হৈল ।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

চারি সম্প্রদায় গান করে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ল; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ মাত্রায় বর্ধিত হল।

শ্লোক ২৩৫

রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্তি ।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাবেশে নৃত্য করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারাণীর মূর্তি ধারণ করলেন। দূর থেকে সেই মূর্তি দর্শন করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বন্দনা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৩৬

নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ ।
নিকটে না আইসে' রহে কিছু দূরদেশ ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভাবাবেশ দর্শন করে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর কাছে না এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ২৩৭

নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্তন ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরার ক্ষমতা আর কার আছে? তাই মহাপ্রভুর এই প্রেমের আবেশ কেউ রোধ করতে পারছিল না এবং কীর্তনও বন্ধ করতে পারছিল না।

শ্লোক ২৩৮

ভঙ্গি করি' স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর ইঙ্গিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সমস্ত ভক্তদের পরিশ্রান্ত হওয়ার কথা জানালেন। তখন ভক্তদের পরিশ্রান্ত হতে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাহ্য চেতনায় ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৩৯

সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা মাধ্যাহ্নিক স্নানে ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে গেলেন; এবং সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনি মাধ্যাহ্নিক স্নান করলেন।

শ্লোক ২৪০

জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন প্রচুর পরিমাণে জগন্নাথদেব ও লক্ষ্মীদেবীর বহুবিধ প্রসাদ উপহার স্বরূপ এল।

শ্লোক ২৪১

সবা লঞা নানা-রঙ্গে করিলা ভোজন ।
সন্ধ্যা স্নান করি' কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

সকলকে নিয়ে মহা আনন্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই প্রসাদ ভোজন করলেন; এবং সন্ধ্যা বেলায় স্নান করে জগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন।

শ্লোক ২৪২

জগন্নাথ দেখি' করেন নর্তন-কীর্তন ।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য কীর্তন করলেন। তারপর তাঁর ভক্তদের নিয়ে তিনি নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করলেন।

শ্লোক ২৪৩

উদ্যানে আসিয়া কৈল বন-ভোজন ।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্টদিন ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, পুষ্পোদ্যানে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বন-ভোজন করলেন। এইভাবে আটদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিবিধ ক্রীড়া করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৪

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয় ।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপরের দিন শ্রীজগন্নাথদেব মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এবং রথে চড়ে তাঁর নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ২৪৫

পূর্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
পরম আনন্দে করেন নর্তন-কীর্তন ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার মতো শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রায়ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে পরম আনন্দে নৃত্য-কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪৬

জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হইল ।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি' গেল ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

পাণ্ডু-বিজয়ের সময় শ্রীজগন্নাথদেবকে যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এক গুটি পট্টডোরী ছিঁড়ে যায়।

শ্লোক ২৪৭

পাণ্ডু-বিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায় ।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে তুলোর বালিশের উপর তাঁকে রাখা হয়। পট্টডোরী যখন ছিঁড়ে গেল তখন শ্রীজগন্নাথদেবের ভারে তুলোর বালিশ ফেটে গিয়ে চতুর্দিকে তুলো উড়তে লাগল।

শ্লোক ২৪৮-২৪৯

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ ২৪৮ ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান ।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্মাণ ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

কুলীন গ্রামের রামানন্দ বসু এবং সত্যরাজ খাঁনকে সম্মান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আদেশ দিলেন—"তোমরা এই পট্টডোরীর যজমান হও। প্রতি বৎসর তোমরা 'ডোরী' নির্মাণ করে নিয়ে আসবে।"

তাৎপর্য

এ থেকে বোঝা যায় যে, সেই রেশমের 'পট্টডোরী' কুলীন গ্রামে তৈরি হত; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ বসু এবং সত্যরাজ খাঁনকে প্রতি বছর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় পট্টডোরী আনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫০

এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী ।
ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি' ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সেই ছেঁড়া পট্টডোরী দেখিয়ে বললেন—"এটি দেখে খুব শক্ত করে দড়ি তৈরি করে আনবে।"

শ্লোক ২৫১

এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান ।
দশ-মূর্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ ও সত্যরাজ খাঁনকে বললেন যে, এই পট্টডোরীতে অনন্তশেষের অধিষ্ঠান, যিনি দশ মূর্তিতে নিজেকে বিস্তার করে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন।

তাৎপর্য

আদি লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১২৩ এবং ১২৪ শ্লোকে শেষনাগের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫২

ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

এই সেবার নির্দেশ পেয়ে ভাগ্যবান্ সত্যরাজ এবং রামানন্দ বসু পরম আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ২৫৩

প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে ।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন থেকে প্রতিবছর গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনের সময় সত্যরাজ এবং রামানন্দ বসু পট্টডোরী নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ পুরীতে আসতেন।

শ্লোক ২৫৪

তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে ।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে সিংহাসনে বসলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে তাঁর বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২৫৫

এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের রথযাত্রা মহোৎসব দর্শন করালেন এবং তাদের সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা-বিলাস করলেন।

শ্লোক ২৫৬

চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার ।
'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত এবং অপার। সহস্র-বদন শেষনাগও তাঁর লীলার অন্ত খুঁজে পান না।

শ্লোক ২৫৭

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'হেরা-পঞ্চমী যাত্রা' নামক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা

(সংস্কৃত শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে পরিচ্ছেদ ও শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

অনুক্রমণিকা

(বাংলা শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে পরিচ্ছেদ ও শ্লোক সংখ্যা-জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

অ

আ

ই

ঐ

ঔ

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ট

ঠ

ত

দ

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

ষ

স

হ

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত

এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।